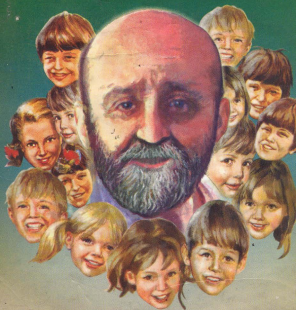


মৃত্যোর্মা অমৃতম্...



নারায়ণ সান্যাল

“মୃତ୍ୟୋର୍ମା ଅମୃତମ୍...”

ନାରାୟଣ ସାମ୍ୟାଲ

‘মৃত্যোমা অমৃতম্.....’

"Mrtyorma Amrtam....."

[Biographical novel on Dr. Janusz Korczak & his proteges of Krochmalna Orphanage; Frauline Anna Frank & Life of Simon Wisenthal and the 'Holocaust' victims in Europe, during Nazi Regime]

প্রকাশ করেছেন :

শ্রী অরুণচন্দ্র মজুমদার

দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড

২১, বামাপুকুর লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯

Code No :

72 M 26

রচনাকাল : ২০০১-২০০২ / গ্রন্থক্রম : ১৩৩

ধারাবাহিক প্রকাশ : নবকল্লোল/শারদীয় প্রসাদ

প্রথম প্রকাশ : কলকাতা পুস্তকমেলা, ২০০৪, মাঘ ১৪১০

অক্ষর বিন্যাস :

শ্রীমতী সুস্মিতা দাস

কম্পিউ হাউস

১৭২ রিজেন্ট এস্টেট, ‘আশীর্বাদ’, কলকাতা ৭০০ ০৯২

ছেপেছেন :

বি. সি. মজুমদার

বি. পি. এম’স. প্রিন্টিং প্রেস

রঘুনাথপুর, দেশবন্ধুনগর, ২৪ পরগণা (উঃ)

প্রফ-নিরীক্ষা : সুচিতা সান্যাল

প্রচ্ছদ : রঞ্জন দত্ত

ISBN

দাম : টা. ১০০.০০

উৎসর্গ

১৮. ৭. ১৯৪২ তারিখে পোল্যান্ডের ওয়ারস শহরে

রবীন্দ্রনাথের ডাকঘর-নাটকের

পোলিশ ভাষায় একবারমাত্র অভিনয়-রজনীর

অনুবাদক-নাট্যকার তথা প্রযোজক : ডঃ জানুস্ কোরচখ (Dr. Janusz Korczak)

পরিচালিকা : আশ্রমমাতা স্টেফানিয়া বিলৎজিন্স্কা

(Frauline Stefania Wilczynska)

কুশীলববৃন্দ : আব্রাসা, উইনি, মার্টিন, ব্রচ,

ব্রনো, লিজা, নীনা, কোরচখ প্রভৃতি

তৎসহ আশ্রমের সেবক-সেবিকা, শিক্ষক-শিক্ষিকা,

যাঁরা মৃত্যুভয় অতিক্রম করে হিটলারের ট্রেনিঙ্ক গ্যাস-চেম্বারে তমুতময়-লোকে যাত্রা

করেছিলেন, তাঁদের স্মৃতিতর্পণে

এবং

‘আওয়ার হোম’ আশ্রমের একমাত্র ‘হলোকস্ট-সার্ভাইভার’,

যাঁর সাহায্য ব্যতিরেকে এ গ্রন্থরচনা ছিল অসম্ভব, সেই

কুমারী (অ্যালিসিয়া/সুধা) রেবেকা রথচাইল্ডকে

প্রীতি ও শুভেচ্ছাসহ

"Political philosophers have judged the unification of Europe and Asia to be aims desirable in themselves. Future historians perhaps may find that Germany, Italy and Japan had valid complaints, but even if so, it seems inconceivable that the methods of their leaders could ever be excused. In these pages Hitler emerges as a man of fallacies...the instigator of unspeakable horror and abomination. As the years roll on, the poets and dramatists may make myths and legends out of him...and present him to posterity, not as a vicious muddle-head, but as a picturesque, lonely hero posing against a background of the Alps at Berchtsgarden. And then other fools may be tempted to follow his examples. If this volume can contribute in the very smallest degree to preventing that, the author will be well-content."

স্যার ডেভিড লো বিংশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক
ব্যঙ্গচিত্র-শিল্পী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে তাঁর অসংখ্য কার্টুন
মুদ্রিত হয়েছিল লন্ডনের Evening Standard,
Picture-post ও আমেরিকার Collier's-এ। যুদ্ধান্তে
শিল্পী যে সঙ্কলন গ্রন্থটি প্রকাশ করেছিলেন তার ভূমিকা
থেকে উপরোক্ত উদ্ধৃতি মুদ্রিত। স্যার লো-র কিছু ব্যঙ্গ-
চিত্র এবং অবলম্বনে-আঁকা চিত্র এখানে পরিবেশিত। তাঁর
বক্তব্যের মূল সুরটি আমার গ্রহেও অনুরণিত। আজও
যারা আমেরিকার 'ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার' ধ্বংসে অথবা
ইরাকের নিরীহ নরনারীর মর্মান্তিক মৃত্যুতে উল্লসিত হয়
সেই ধর্মান্ধ ও প্রতিক্রিয়াশীলদের উদ্দেশ্যে এই বাণী
আজও প্রাসঙ্গিক। হিটলার সম্বন্ধে লো যা বলেছেন তা
বিন লাভেন, বুশ, সাদ্দাম সম্বন্ধে আজও বলা যায়! তাই
সবিনয়ে বলতে চাই: If this volume can contribute
in the very smallest degree to preventing
that, the author will be well-content !

লেখক



বালক বয়সে জানুস্ কোরচখ

[পোলিশ ভাষায় লিখিত তাঁর অত্যন্ত জনপ্রিয় কিশোর উপন্যাস KING MATT THE FIRST-গ্ৰন্থে চিত্রটি মুদ্রিত। ইংরাজি অনূবাদক : Richard Lourie.

প্রকাশক: Farrar, Straus, & Giroux, New York]

Wardha
C. P.
India
23-7-'39

DEAR FRIEND,

Friends have been urging me to write to you for the sake of humanity. But I have resisted their request, because of the feeling that any letter from me would be an impertinence. Something tells me that I must not calculate and that I must make my appeal for whatever it may be worth.

It is quite clear that you are today the one person in the world who can prevent a war which may reduce humanity to the savage state. Must you pay that price for an object however worthy it may appear to you to be ? Will you listen to the appeal of one who has deliberately shunned the method of war not without considerable success ? Anyway I anticipate your forgiveness, if I have erred in writing to you.

I remain,
Your sincere friend
M. K. Gandhi

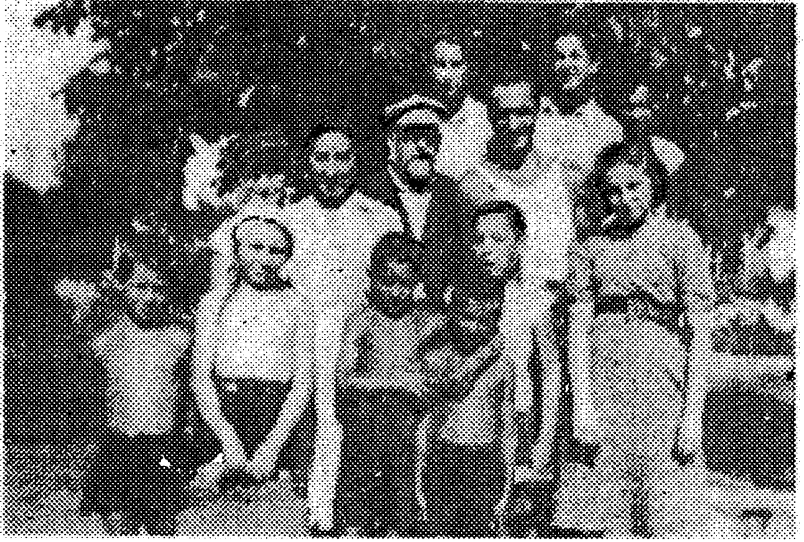
Herr HITLER,
BERLIN
GERMANY

From a photostat : S. N. 23126

[দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার মাত্র দুমাস আগে মহাত্মা গান্ধী এই চিঠিখানি ওয়ার্ধা থেকে পাঠিয়েছিলেন হিটলারকে। জবাব পাননি। সম্ভবত সেটির অন্তিমগতি হয়েছিল ছেঁড়া কাগজের বুড়ি স্টেশন পার হয়ে ইনসিনিরেটরে। ওয়ার্ধা-আশ্রমের সৌজন্যে কৃতজ্ঞতা স্বীকারসহ মুদ্রিত এটি।

সূচিপত্র

কৈফিয়ত	৯
কোরাখ ডাকঘরের সন্ধানে প্রথম পর্ব	১৯
আনা ফ্রাঙ্কের সন্ধানে	১১৬
তিতিক্ষা	১৬৩
কোরাখ ডাকঘরের সন্ধানে শেষ পর্ব	২৫২



“ডাকঘর”

অভিনয়কালে তোলা একটি সুদূর্লভ আলোকচিত্র (1942)
[কেন্দ্রে ডঃ কোরচখ; তাঁর দক্ষিণে পরিচালিকা স্টেফানিয়া,
বামে ডঃ ডন ব্লচ; ব্লচের উপরে তাঁর দক্ষিণে উইনী,
বামে আব্রাসা (অমল)। চিত্রের সর্বদক্ষিণে দণ্ডায়মানা রেবা (সুধা)।]

সৌজন্যে : ফটো আর্কাইভস, কোরচখ ইন্সটিটিউট

কৈফিয়ত

‘কোরচথ’-এর নামে দুনিয়ায় কোথাও কোনো ডাকঘর আছে বলে আমার জানা নেই। বরং যতদূর জানি : নেই। তাহলে এই পাগলামির কী অর্থ? এই ‘রুট-ওভার মাইনাস ওয়ান’-টাকে বাস্তব জগতে খুঁজে ফেরা? দর্শনের ছাত্র একে হয়তো বলবেন : নীরন্ধ্র অঙ্ককার কক্ষে এক দৃষ্টিহীনের পক্ষে একটি কালো বেড়ালকে খুঁজে বার করার বাতুলতা। বাস্তবে হয়তো বেড়ালটা ও ঘরে আদৌ নেই। মানছি। তবু একটা কথা : মার্জারের অন্তিস্থিতি কি ঐ অন্ধ মানুষগুলোর আন্তরিকতাকে, তাদের বিশ্বাস, সংস্কার অথবা নিষ্ঠাকে মিথ্যা নিঃশেষে বিলীন করতে পারে?

কোরচথের নামে বাস্তব-দুনিয়ায় কোনও ‘ডাকঘর’ না থাকাটাও তেমনি।

আমাদের সমকালে কয়েক লক্ষ নরনারী, যারা যমজাঙালের মোড় থেকে ফিঁরে এল, যারা সহস্রাব্দীর পর সহস্রাব্দী ধরে প্রতিবেশীর প্রতিবন্ধকতায় অনিকেত, তাদের অপরিসীম ব্যথাবেদনা, নির্যাতন কি তাতে ব্যর্থ হতে পারে? বছরের পর বছর এই অন্ধ মানুষগুলো একমুঠো বিশ্বাসকে সম্বল করে নীরন্ধ্র অঙ্ককার টানেলের শেষপ্রান্তে একটা আলোর আভাস খুঁজে ফিরেছিল—আউসউইৎজ্ (Auschwitz), ট্রেব্লিকা, বেলসেক, সবিবর, আর শেলমো গ্যাস-চেম্বারের মৃত্যুপুরীতে। আমরা কোরচথ - ডাকঘরের সন্ধান পেলাম না বলে তাদের সব যন্ত্রণা, সব নির্যাতন অলীক? মিথ্যা?

নিজের কথা বলি : এই নিয়ে ভারতের বাইরে এসেছি ছয়বার। প্রতিবারই নিজের গরজে, নিজের খরচে, কিছু একটা খুঁজে বার করতে। প্রথমবার ছুটে গিয়েছিলাম পূর্ব এশিয়ায়—রেঙ্গুন, হংকং, ব্যাংকক, টোকিও, তাইহকু। যাঁর সন্ধানে ছুটে বেড়িয়েছি তাঁর শেষ পরিণতির সন্ধান পাইনি। আবার জীবন-সায়াহে—এই তো গতবছর—খুঁজতে গেছিলাম বাঙলাদেশে আমার কৈশোরকালে হারিয়ে যাওয়া এক সহপাঠিনীকে। তাকেও খুঁজে পেলাম না। কিন্তু এবার মার্কিন মুলুকে এসেছি কোনো কিছুর সন্ধানে নয়। কাশীনরেশের কারাগারে বন্দি এক নারীর মুক্তির ব্যবস্থা করতে। সে কারাগারের চাবি আমাকে বাইরে খুঁজতে হবে না। তা সঞ্চিত আছে আমার মস্তিষ্কেই। এতদিন সেই অসমাপ্ত কাহিনীর উপসংহার টানতে পারিনি নিজেরই দোষে, পল্লবগ্রাহীর মতো ক্রমাগত প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গ স্তরে ছুটে যাওয়ায়। এবার এই চারমাসের প্রবাসজীবনে সেই অসমাপ্ত কাহিনীর উপসংহারটা রচনা করার সঙ্কল্প নিয়ে এসেছি। অষ্টাদশ শতাব্দীর কিছু প্রামাণ্য ইতিহাস-গ্রন্থ চার-চারটে স্যুটকেসে চড়িয়ে কলকাতা থেকে নিয়েই এসেছি। দীর্ঘদিন সেসব দুর্মূল্য গ্রন্থ বন্দি ছিল আমার দেরাজে—কাশীনরেশের কারাগারে বন্দিনী রূপমঞ্জরীর মতো।

সানফ্রান্সিস্কো বিমান পোতাশ্রয়ে ঘূর্ণ্যমান রবার-বেণ্টের শয্যা থেকে সেই চারজন স্থূলাঙ্গিনী যাত্রাসঙ্গিনীকে টেনে নামাতে গিয়ে আমি হিমশিম। নতুন করে মালুম হলো ইতিমধ্যে চারদুগুনে আটটি দশক পাড়ি দিয়ে এসেছি। কিন্তু উপায় কী? অসমাপ্ত রূপমঞ্জরীর উপসংহার রচনা করতে হলে ওই প্রামাণ্য আকরগ্রন্থগুলি আমার চাইই। ফলে সানফ্রান্সিস্কো বিমান পোতাশ্রয়ের নির্গমনদ্বারে সগিন্নি আমার আবির্ভাব ঘটতে বেশ কিছু বিলম্ব হলো। বস্তুত আমরা আসছিলাম সবার শেষে। ইতিমধ্যে ওই প্লেনের যাবতীয় যাত্রী কলরব করতে করতে, আত্মীয়বন্ধুদের সাক্ষাতে আনন্দ করতে করতে বার হয়ে গেছে। বুলবুল তার দুই মেয়েকে আগলে একটেরে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে। জামাই অমিতাভ অনিকেত। গাড়ি পার্ক করার সুযোগ পায়নি। সিনাই পর্বতে মোজেস-এর মতো ক্রমাগত বিমান পোতাশ্রয়কে পাক মেরে চলেছে। মাস ছয়েক আগে বুলবুলের মা ছিলেন নার্সিং হোমে। বাড়ি ফিরেও হপ্তা দুই-তিন ছিলেন শয্যাশায়িনী। এসব তথ্য বুলবুলের জানা। তাই আখানা পৃথিবী পাড়ি দিয়ে ওর মায়ের নিরাপদ আবির্ভাবের প্রত্যাশায় সে আকুল। আর বাবা? তাঁকে লঙ ডিস্টেন্সে পইপই করে বারণ করে রেখেছে, “প্লেনে আজকাল হার্ড-ড্রিঙ্কসও ফ্রি সরবরাহ করে, তুমি কিন্তু সেসব চক্করে পড়বে না; সফট্ ড্রিঙ্কস ছাড়া আর কিছু ছোঁবে না, বাবা। অনেক গুরুদায়িত্ব তোমার কাঁধে—এ কথা ভুলো না।”

কিন্তু বাপকে চিনতে তো আর তার বাকি নেই। তাই গোটা প্লেনের যাত্রীদল যখন একপাল রাজহাঁসের মতো প্যাঁকপ্যাঁক করতে করতে এয়ারপোর্ট ফাঁকা করে দিয়ে চলে গেল, অথচ পরিচিত সেই দুই বুড়োবুড়ির পান্ডা নেই তখন বুলবুল আর তার দুই ছানাপোনার অবস্থা সঙ্গীন।

দুর্ভাগ্য একেই বলে! ওরা তিনজন যখন সহ্যের শেষ-সীমান্তে, আর অমিতাভ পার্কিং লটটাকে সাত পাকে বেঁধে ফেলেছে, ঠিক তখন—হবি তো হ, ঘটল এক কাকতালীয় ঘটনা : ওঁয়া-ওঁয়া করতে করতে ছুটে গেল একটা অ্যাম্বুলেন্স বিমান-অবতরণ ক্ষেত্রের দিকে। কী ব্যাপার? লাউডস্পিকারে সান্দ্রনাবাক্য ঘোষিত হলো : প্যানিকি হবার কিছু নেই, ও কিছু নয়, এই বিমানের এক বৃদ্ধ অথবা বৃদ্ধা যাত্রী বুঝি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, তাঁকে এমার্জেন্সি বিভাগে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

ঠিক সেই ব্রাহ্মমুহূর্তে চারটি গতরে-সতরে যাত্রাসঙ্গিনীকে টুলিতে বোঝাই করে ঠেলতে ঠেলতে এবং পঞ্চাশ বছরের জীবনসঙ্গিনীর শাঁখাপরা হাতখানি ধরে এক তালচোঙা বৃদ্ধকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। নাতনি অন্তরা পরে আমাকে বলেছিল, “দাদু, তখন তোমাকে দেখে সুকুমার রায়ের পাগলা দাণ্ডুর চেহারাটা আমার মনে পড়ে গেছিল।” হঠাৎ দূর থেকে আমাকে টলতে টলতে এগিয়ে আসতে দেখে আমার ধেড়ে মেয়ে সবার সামনেই—আর ওকেই বা কী দোষ দেব? আমি নিজেও তখন ওর হাতটা ধরে ভাঁ করে কেঁদে ফেলেছি। সে কান্নার উৎসমূলে কতখানি মিলনানন্দ, কতটা টেনশনমুক্তি, আর কতটাই বা অ্যালকহলের প্রভাব, তা আজ আর হিসেব করে বলতে পারব না।

দিন-দুয়েক পরের কথা। ‘জেটল্যাগ’ তখনো ভালো করে কাটেনি। প্লেজেন্ট হিল থেকে প্লেজেন্ট সাপ্রাইজ দিতে এল সঙ্গীক শক্তি দাশ। ডক্টর শক্তি দাশ আর ডক্টর মিসেস মায়া দাশ। শক্তি পশ্চিম-আমেরিকার একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ শল্যচিকিৎসক। ইউরোলজিস্ট-কাম-নেফ্রলজিস্ট সার্জেন। পকেট নয়, মানুষের পেট কাটাই তার পেশা। তার রাজ্যটা ছোট—ডায়াফ্রামের তলায় আর ফিমার বোনের উপরে; কিন্তু এই ক্ষুদ্ররাজ্যে সে নিরঙ্কুশ একচ্ছত্র সম্রাট। মজার কথা : প্রথম শ্রেণীর শল্যচিকিৎসক হওয়া সত্ত্বেও ওর অন্তরে সজীব আছে কৈশোরের কৌতূহল : শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি-সঙ্গীত।

দেখা করতে এসে যখন শুনল ওর মেসো ভারি-ভারি সুটকেস হ্যাঁচকা টানে বেষ্ট-কেরিয়ার থেকে নামিয়েছেন, তখন মৃদু ধমকও দিল। বলল, “কেন? অল্পবয়সী কেউ কি কাছেপিঠে ছিল না?”

জবাবে আমি বলতে পারতাম, কিন্তু বলিনি,—যীশাস-এর নির্দেশ—“ওয়ান শুড ক্যারি ওয়াগ ওন ক্রস।”

প্রাথমিক কুশলবিনিময় শেষ হতেই ও বললে, “আমি কিন্তু আজ আপনার কাছে একটা আবদার নিয়ে এসেছি, মেসোমশাই। একটা জিনিস চাইতে....”

শক্তিকে অদেয় আমার কিছুই নেই। কারণ তেমন তেমন ‘অদেয়’ কোনো কিছু সে আমার কাছে চাইতেই পারবে না। তাই দানবীর কর্ণের মতো নির্ভয়ে বলি, “আপন পৌরুষ আর ধর্ম ছাড়া”

ও আমাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বললে, “আপনাকে একটা জীবনী-ভিত্তিক উপন্যাস লিখতে হবে।”

সেইরেছে! আবার জীবনী-ভিত্তিক উপন্যাস! আমি সম্প্রতি তেমন জাতের একজোড়া উপন্যাস নামিয়েছি। অদ্বিতীয়া কনক পুরকায়স্থ এবং অদ্বিতীয় শের আলি খান। আমি স্বভাব-পল্লবগ্রাহী। একই ধরনের সাহিত্য রচনা আমার স্বভাববিরুদ্ধ। তবু আরও একটি জীবনী-ভিত্তিক উপন্যাস লিখব বলে যাবতীয় মালমশলা কলকাতা থেকে বয়ে এনেছি। রূপমঞ্জুরীর উপসংহার। কিন্তু আশঙ্কা হচ্ছে, শক্তি কোনও শক্তিমান মানুষের প্রভাবে হঠাৎ বে-এজিয়ার হয়ে তার মেসোর দরবারে হাজির হয়েছে। লেখক মাত্রেরই এই এক জাতের বিড়ম্বনা—অপরের ফরমায়েসি রচনার অনুরোধ।

ভয়ে ভয়ে জানতে চাই : লোকটা কে?

মনের গহনে একটা ক্ষীণ আশা ছিল যে, শক্তি একটি অতি পরিচিত মহামানবের নাম করবে, আর আমি বিনয়ে বিগলিত হয়ে বলব, — “কী যে বল শক্তি ! আমি চুনোপুঁটি ! অমন মানুষের জীবনী কি আমার পক্ষে লিখতে যাওয়াটা ধাত্তামো হয়ে যাবে না?”

ও আমাকে সম্পূর্ণ নিরাশ করে বলল : জানুস কোরচখ।

আমি তো থ। আমতা আমতা করে বলি : জানুস চোরখক কে?

—‘কোরচক’ নয়, মেসোমশাই, কোরচখ। Janusz Korczak.

ইংরাজি বানানটা ও শুনিয়ে দিল যাতে আমি ‘উৰুশ্চারণটা’ সমঝে নিতে পারি; কিন্তু ডবল ‘Z’-এর ধাক্কায় আমার আরও গুলিয়ে গেল। নামটা এড়িয়ে জানতে চাই, “তিনি... মানে... কোন দেশের লোক?”

—পোল্যান্ড।

—অ। তা... ইয়ে... কী জন্য তিনি বিখ্যাত?

—না, মেসো, বিখ্যাত তিনি আদৌ নন। বছর দুই আগে আপনার মতো আমিও তাঁর নামটা জানতাম না। তাই তো বলছি, আপনি তাঁর জীবনী আশ্রয় করে তাঁর যুগের যন্ত্রণাটা লিখুন। যাতে বাঙালি পাঠক তাঁর কথা জানতে পারে। ওঁর সমকালের মানুষগুলোর যুগযন্ত্রণার একটা ছবি বাঙলা সাহিত্যকে প্রভাবিত করে, বিশেষ করে রবীন্দ্র-অনুরাগীদের।

এর মধ্যে হঠাৎ রবীন্দ্রনাথকে পেড়ে ফেলার কী অর্থ? যতদূর জানি, রবীন্দ্রনাথ কখনো পোল্যান্ড যাননি, পোলিশ ভাষা জানতেন না। সে যাই হোক ওর প্রস্তাবটা কী করে মোলায়েম ভাষায় প্রত্যাখ্যান করব এটাই তখন আমার একমাত্র চিন্তা। শক্তি আমার গুণগ্রাহী। আমিও শক্তির। কাচের প্লেটে নিজে হাতে রবীন্দ্রনাথের একটি অনবদ্য এচিং তৈরি করে এককালে শক্তি সেইটি আমাকে উপহার দিয়েছিল—ভঙ্গুর শিল্পবস্তুটিকে নিয়ে আধখানা পৃথিবী পাড়ি দিয়ে। আমার স্ত্রী নার্সিং হোমে ভর্তি হয়েছেন একথা আমার মেয়ের কাছে শুনে সে নিজে থেকে ‘লং-ডিস্টেন্স ওভারসীজ’ কলে তত্ত্বালাশ নিয়েছে; পরামর্শ দিয়েছে। ফলে প্রত্যাখ্যানটা অতি মোলায়েম ভাষায় হওয়া উচিত।

ও নিজে থেকেই বললে, আমি জানতাম, আপনাকে রাজি করানোটা শক্ত হবে। এখানকার কোনও বইয়ের দোকানে কোরচখের জীবনী খুঁজে পাইনি। লাইব্রেরি থেকে এককপি যোগাড় করেছি। মাত্র একটি কপিই আছে। অথচ তাঁর আমলে কোরচখ পোল্যান্ডে ছিলেন ততটাই বিখ্যাত যতটা লুইস্ ক্যারল ছিলেন ইংল্যান্ডে অথবা হাস্ ক্রিশ্চিন অ্যাভারসন ডেনমার্ক।

—বুঝলাম। অর্থাৎ কোরচখ ছিলেন পোলিশ ভাষার এক জবরদস্ত শিশুসাহিত্যিক। সরল শিশুদের জন্য আজগুবি গল্প বানিয়ে বানিয়ে লিখে গেছেন?

শক্তি স্নান হাসল। বলল, হনলুলুর কোনো জিজ্ঞাসু মানুষ যদি আপনাকে বলে, ‘বুঝলাম! অর্থাৎ রামকৃষ্ণ ছিলেন কলকাতার কাছে গঙ্গার ধারে একটি মন্দিরের পুরোহিত। সরল ভক্তদের জন্য আজগুবি গল্প বানিয়ে বানিয়ে শোনাতেন’—তাহলে আপনি তাকে কী জবাব দিতেন, মেসোমশাই?

বুঝতে অসুবিধা হয় না—ডাকসাইটে শিশুসাহিত্যিক হওয়া সত্ত্বেও জানুস কোরচখ আরও কিছু ছিলেন। বুঝতে পারি, ক্রমশ জড়িয়ে পড়ছি শক্তির কথার প্যাঁচে। প্রসঙ্গটা

বদল করে আমি বলি, মহামানবদের জীবনী অনেক অনেক লেখা হয়েছে শক্তি। ওতে কোনও কাজ হয় না। কেউ পড়ে না। তোমাকে এই প্রসঙ্গে ডক্টর মারিয়া মন্টেসরির একটি উদ্ধৃতি শোনাই, শোন। মন্টেসরি লিখেছেন :

আমি যখন স্কুলে পড়তাম তখন আমাদের এক দিদিমণির ছিল এক বিচিত্র বাতিক। তিনি চাইতেন আমরা সবাই যেন ইতিহাস-বিখ্যাত যাবতীয় মহিলাদের জীবনীগুলো মুখস্থ করি। যাতে তাঁদের অনুকরণ করা যায়। প্রতিদিনই শুনতে হয় দিদিমণির একঘেয়ে উপদেশ : ‘তোমরাও নিশ্চয় ওঁদের মতো বিখ্যাত হবার চেষ্টা করবে। তাই না?’

একদিন আর সহ্য করতে না পেরে আমি বলে ফেলেছিলাম, ‘ও নো মিস্! আমি কোনোদিন বিখ্যাত হতে চাইব না। আর কিছু না হোক, তাতে আগামী যুগের বাচ্চারা আরও একখানা জীবনী মুখস্থ করার বিড়ম্বনা থেকে মুক্তি পাবে!’*

শক্তি জবাবে বলল, অথচ মজা দেখুন মেসোমশাই, অনিচ্ছা সত্ত্বেও মারিয়া মন্টেসরি আজ জগৎবিখ্যাত! তাঁর ছাত্র ই. এম. স্ট্যান্ডিং-এর লেখা জীবনী শিশুশিক্ষার জগতে অবশ্যপাঠ্য!

চোরকথ অথবা কোরচখ থেকে আলোচনাটা মন্টেসরিতে বাঁক নেওয়ায় আমি কিছুটা নিশ্চিত্ত বোধ করি। শক্তি কিন্তু নাছোড়বান্দা। পরমুহূর্তেই সে ফিরে এল আমড়াতলার মোড়ে। বললে, মন্টেসরি ছিলেন কোরচখের চেয়ে বয়সে আট বছরের ছোট; কিন্তু বেঁচেছিলেন এগারো বছর বেশি। দুজনেই শিশু শিক্ষা, শিশু পালনের জগতে আনতে চেয়েছিলেন এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন। ঘটনাচক্রে একজন সফলকাম, জগৎবিখ্যাত—অন্যজন অকালে নিহত এবং অপরিজ্ঞাত।

একটু চমকে উঠে বলি, কী বললে? নিহত?

—আপ্তে হ্যাঁ। তাঁর স্কুলের একশ তিরানব্বই জন বাচ্চা আর বাইশজন টিচিং স্টাফ একই সঙ্গে নিহত হন। আগস্টের প্রথম সপ্তাহে, 1942-তে। মহাত্মা গান্ধী যখন কুইট ইন্ডিয়া রেজলিউশনের খসরা ড্রাফট করছেন।

—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কালে? পোল্যান্ডে? তার মানে আর. এ. এফ.-এর ডাইরেক্ট বম্বিংও? স্কুল বিল্ডিং-এ ডাইরেক্ট হিট!

—না মেসোমশাই, বোমার আঘাতে নয়—ওঁরা সবাই একই সঙ্গে মারা গিয়েছিলেন ট্রেন্সিল্কা গ্যাস-চেম্বারে। ইহুদি হবার অপরাধে!

কী জবাব দেব বুঝে উঠতে পারি না।

* Maria Montessori – Her Life & Work, by E. M. Standing, Signet, New York, p.21.

শক্তি তার কাঁধব্যাগ থেকে ধীরে ধীরে বার করে আনে একটা ঢাউস প্যাকেট। জানুস কোরচখের জীবনী। ইংরেজি বই : The King of Children : Janusz Korczak। লেখিকা বেটি জীনস্ লিফটন, প্রকাশ করেছেন মিউনিকের কোরচখ কম্যুনিকেশন সেন্টার। বইটি দুস্ত্রাপ্য। শক্তি দাশ তার ফোটো কপি বানিয়েছে, তার মেসোমশাই আমেরিকা আসছেন একথা বুলবুলের কাছে শুনে। 'দুশ' ছাপ্পান পৃষ্ঠার মোটা মোটা কাগজে। কাগজ পৃষ্ঠার উচ্চতা দেড় ইঞ্চি। সেই প্রকাণ্ড গ্রন্থটি সে আমার দিকে বাড়িয়ে ধরে কললে, পাতা উল্টে দেখুন। উৎসাহিত যদি না হন, তাহলে এই গন্ধমাদন কলকাতায় বয়ে নিয়ে যাবার প্রয়োজন নেই। আমি জানি, মেসোমশাই, উপরোধে টেকি গেলা যায়, সৎ- সাহিত্য সৃজন করা যায় না। অন্তরের তাগিদে না হলে সেটা শৌখিন মজদুরি, নেহাৎ বিড়ম্বনা!

আমি চুপ করে বসে থাকি।

ও বলতে থাকে, ওঁর সম্বন্ধে দু-চার কথা বলি। আর কিছু না, পাতা উলটে দেখার উৎসাহটা যাতে হয় : কোরচখ ছিলেন বড়লোকের ছেলে। পোলিশ জুইশ অভিজাত্যের বাতাবরণে কেটেছে তাঁর বাল্যকাল। শৈশবে বন্দি ছিলেন উপকরণের দুর্গে। অ্যাটিকের বন্দিশালায়। চুপচাপ বসে থাকতেন। গরাদ-দেওয়া বে-উইভোর পাশে, কাচের শার্সিতে গাল দিয়ে ঠিক যেমন কেটেছে রবীন্দ্রনাথের শৈশবের দিনগুলি। চিলেকোঠার জানলা থেকে শুনতেন ওয়ারসর (Warsaw) পাথর-বাঁধানো রাস্তায় ল্যান্ডোর খপখপ, দেখতেন রাস্তায় দামাল বাচ্চাগুলোর দাপাদাপি। খেলছে; শীতে ছোঁড়াছুঁড়ি করছে স্নো-বল, 'ফল'-এ ঝোড়ো হাওয়ায় ঝরা পপ্লার পাতার দল খোলা মাঠে দাপাদাপি করছে। ভূত্যরাজতন্ত্রের শিশু বন্দি মুক্ত পৃথিবীর নাগাল পেত না। ক্রমে স্কুলজীবন শেষ হলো। ওয়ারস মেডিকেল কলেজ থেকে চিকিৎসা-বিদ্যায় হলেন স্নাতক। তাঁর সমকালে ডক্টর কোরচখ ছিলেন ওয়ারস শহরের সবচেয়ে বিখ্যাত, সবচেয়ে পশারওয়ালা শিশু-চিকিৎসক। প্রথম যুগের পেডিয়াট্রিশিয়ান এবং গাইনো। শহরের শত শত সদ্যজননী, সম্ভাব্য জননীরা ওঁর কাছে ছুটে আসত। কী পোলিশ, কী জার্মান! মা-মেরীর জাতবিচার করা সম্ভব নয়। মা-মেরী রোমান ক্যাথলিক নন, প্রটেস্টান্ট নন, জুইশ বা মুসলিম নন! জাতে তিনি জননী, ধর্ম তাঁর : মাতৃত্ব! ডাক্তার হিসাবে প্রথম যৌবনে তাঁকে দু-দুবার যুদ্ধে যেতে হয়। র‍্যাঙ্কে ছিলেন ক্যাপ্টেন। যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে আবার প্র্যাকটিসে বসেন। তখন হয়েছিলেন ওয়ারস ব্রডকাস্টিং স্টেশনের একজন নিমন্ত্রিত নিয়মিত ঘোষক। প্রতি সপ্তাহে একটা প্রোগ্রাম করতেন : 'মাতৃকলাণ'। স্টোর নাম ছিল, বদ্যিবুডোর আসর : Old Doc's Chatting!

1912 সাল। সেই যে বছর ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে সরে গেল দিল্লিতে। সে বছর ডক্টর কোরচখ ওয়ারসতে খুলে বসলেন একটি অনাথ আশ্রম। পিতৃমাতৃহীন ইহুদি বাচ্চাদের। পরের বছর রবীন্দ্রনাথ পেলেন নোবেল-প্রাইজ, আর তার পরের বছর শুরু হয়ে গেল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ।

অনাথ আশ্রমে শিশুদের তিনি স্বাবলম্বী, স্বনির্ভর হতে শেখাতেন। সেখানেই

থামলেন না। তাদের করে তুললেন স্বয়ং-শাসিত। গড়ে উঠল একটা শিশু-স্বরাজ! আজব কাণ্ড : প্রতিটি শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী নিজেরাই নির্বাচন করত তাদের প্রতিনিধি। না, ক্লাসের মনিটর নয়! সাংসদ! প্রতিটি ক্লাসের দুজন প্রতিনিধি—একজন ছাত্র, একজন ছাত্রী—মিলে গঠিত হতো শিশু-পার্লামেন্ট! বিশ্বের প্রথম এবং শেষ : Children's Parliament.! সে প্রতিষ্ঠানের এক্তিয়ার স্কুলের গণ্ডিতেই সীমিত নয়, ওদের ছাত্রাবাসের জীবনেও প্রাণিত! বিভিন্ন মন্ত্রকের এক-একজন মন্ত্রী, একজন করে উপমন্ত্রী। ‘মিনিষ্ট্রি অফ মার্কেটিং’-এর দায়িত্ব ছিল বাজার করে আনার, ‘মিনিষ্ট্রি অব কিচেন’ ছিল রান্নাঘরের দায়িত্বে। তেমনি ছিল মিনিষ্টার অব গেমস্। মিনিষ্টার অব সিনোগগ্! কোনো মন্ত্রী অন্যায় করলে স্কুলের টিচাররা তাদের শাস্তি দিতেন না—দিত শিশু পার্লামেন্ট। বাড়াবাড়ি রকমের অন্যায় হলে বিরোধীদল মন্ত্রিমণ্ডলীর পতন ঘটিয়ে শাসনভার গ্রহণ করত।

ডক্টর মারিয়া মন্তেসরি এবং ডক্টর জানুস্ কোরচখ পরস্পরকে চিনতেন না, অথচ দুজনেই সমকালে ভিন্ন ভিন্ন ভূখণ্ডে একই জাতের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে গেছেন। শিশু জগতের যুগান্তকারী পদক্ষেপ!

ইহুদি-অনাথ আশ্রমের কার্যকারিতায় মুগ্ধ হয়েছিল ওয়ারস। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে শহরে গড়ে উঠল আরও একটি অনাথ আশ্রম—এবার খ্রিস্টান অনাথদের। বিশ্বযুদ্ধে অনেক শিশু অনাথ হয়েছে। এক-একটি যুদ্ধে কত নর কত খুন দেয় তার হিসেব লেখা থাকে ইতিহাসে, কত নারী দেয় সিঁথির সিঁদুর তার হিসাব রাখেন নজরুল; কিন্তু কত শিশু যে অনাথ হয় তা কারও খেয়াল হয় না! ওয়ারসর যাবতীয় খ্রিস্টান চার্চ—প্রটেস্ট্যান্ট, রোমান ক্যাথলিক, মেথডিস্ট ইত্যাদি মিলিয়ে গড়ে তুলল একটি খ্রিস্টান অনাথ আশ্রম! কী অপরিসীম আশ্চর্যের কথা! চার্চের কর্তাব্যক্তির এই অনাথ আশ্রমটির পরিচালনা করতে ডেকে আনলেন সেই আদিম ‘বদ্যি-বুড়োটাকেই’।

আমি শক্তি দাশকে থামিয়ে প্রশ্ন করি : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে তো?

—তা তো বটেই। শুধু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নয়, হিটলার রাইব্‌স্ট্যাগ দখল করার আগে। তারপর শুরু হলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। মাত্র আঠারো দিনের মধ্যে নাৎসি-বাহিনী দখল করে নিল গোটা পোল্যান্ড! অনাথ আশ্রম সহ কোরচখ নিষ্কিপ্ত হলেন জুইশ ঘেটোয়! ওঁর গুণগ্রাহীরা—যে সব মায়ের সন্তানদের উনি এতদিন চিকিৎসা করেছেন তাদের স্বামীরা, অথবা যারা ছেলেবেলায় ওঁর গল্প পড়ে মুগ্ধ হয়েছিল তারা, তিনবার ওঁকে সেই ঘেটো থেকে উদ্ধার করার চেষ্টা করে। ওঁর ফল্‌স্ পাসপোর্ট পর্যন্ত তৈরি করে এনে ওঁকে পোল্যান্ডের বাইরে পাঠাবার ব্যবস্থা করে। অথচ তিনবারই উনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। শেষ পর্যন্ত এস. এস. বাহিনীর অস্তিম নির্দেশ এসে গেল : একমাস পরে তাঁকে সদলবলে গ্যাস-চেম্বারে যেতে হবে! তিনি তাঁর অফিসিয়াল স্কুলের শ-দুয়েক ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকাকে নিয়ে মার্চ করে চলে যান ট্রেব্লিন্‌কা গ্যাস-চেম্বারে। বিশ্বাস করবেন : মুক্তির গান গাইতে গাইতে। আর কী আশ্চর্যের কথা! মোসোমশাই! নিশ্চিত মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে —

গ্যাস-চেম্বারে নীত হবার মাত্র এক মাস আগে, তিনি রবীন্দ্রনাথের ‘ডাকঘর’ নাটকটা পোলিশ ভাষায় অনুবাদ করেন; ওঁর অনাথ আশ্রমের ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে সে নাটক অভিনয় করান; ওঁদের শেষ মরণযাত্রার তারিখ : 5.8.1942, আর ডাকঘর অভিনয়ের তারিখ : 18.7.1942 ! গোনাগুনতি সতের দিনের ব্যবধান ! ভাবতে পারেন ?

স্তুভিত হয়ে প্রশ্ন করি, কী বলছ শক্তি ? সতের দিন পরে গণহত্যা হবে এ কথা জেনেও ওঁরা অভিনয়ের ব্যবস্থা করতে পারলেন ? বাচ্চারা—মানে, ওই যারা অভিনয় করল—তারা জানত এ কথা ? ওই কবিরাজ, চৌকিদার, ঠাকুরদা, অমল, সুধা ?

শক্তি দাশ স্নান হেসে বলল, এ প্রশ্নের জবাব তো আমার দেবার কথা নয়, মেসোমশাই। বলবেন আপনি, আপনার পাঠক-পাঠিকাকে। আমরা তো শুনব ! আমরাই তো আপনাকে শুধাব—বলুন। অভিনয় রাত্রে আব্রাসা কি সে কথা জানত ? ডাকঘরের চিঠি পৌঁছাতে আর মাত্র সতের দিন বাকি ?

আমি তোৎলামি করে ফেলি, আব-আব্রাসা কে ?

—যে ছেলেটি ‘অমল’ সাজে। চৌদ্দ বছর তখন তার বয়স। ইহুদি অফগ্যান ! চিরকুমার ডক্টর কোরচখকে যে ‘বাবা’ ডাকত, ডাকঘর নাটকে যে অমলের চরিত্রটা অভিনয় করে।

তারপর একটি ইংরেজি গ্রন্থের একটি পৃষ্ঠা খুলে নিয়ে ও পড়তে শুরু করল। ডক্টর কোরচখ আর তাঁর চতুর্দশবর্ষীয় পাতানো-পুত্র আব্রাসার কথোপকথন। গণহত্যার প্রায় একমাস আগে, ডক্টরের অ্যাটিক চেম্বারে। কোরচখ সেই বালককে বলছেন :*

—যদি কোনো খুনির হাতে আমাদের মরতেই হয়, তাহলে আমাদের হাতেও থাকা উচিত আত্মরক্ষার উপযুক্ত একটা অস্ত্র, তাই নয় ?

—হ্যাঁ, এটাই স্বাভাবিক। এটাই মরণখেলার নিয়ম।

—কিন্তু ধর যদি নিরস্ত্র অবস্থায় হতভাগ্যটাকে মরতে হয় ? নিতান্ত বাধ্য হয়ে ? তখনো কিন্তু সে খুনিটাকে একটা প্রত্যাঘাত করতে পারে। তার হাতে অস্ত্র না থাক, সে গান গেয়ে প্রতিবাদ করতে পারে ! খুনিটা তো শুধু হত্যা করতেই জানে ! তার ধারণা : মৃত্যুটাই বাস্তব ! মৃত্যুটাই হচ্ছে শেষ কথা ! কিন্তু যে নিরস্ত্র মানুষটাকে সে খুন করছে সে যদি ঠাশ করে খুনিটার গালে ছুঁড়ে মারে একটা গানের কলি ? যদি সে নির্ভয়ে বলে বসে : ‘আমারে বাঁধবি তোরা সেই বাঁধন কি তোদের আছে?’ যদি বলে : ‘আমি মৃত্যু চেয়ে বড় ! এই শেষকথা বলে যাব আমি চলে।’ ?

আমি শক্তিকে থামিয়ে দিয়ে বলি : কোরচখের ডায়েরিতে ওই কথাগুলো আছে ? ঐ গানের কলি ?

* Jansuz Korczak – Ghetto Diary : The Last Walk (translated by Aaron Zeitlin)
Published by Holocaust Library, N. Y. P 60-61

—না, মেসোমশাই, নেই! কোরচখ এ গানের কলি কখনো শোনেননি। তাঁর ডায়েরিতে তা লিখেও যাননি। কিন্তু আপনি আপনার জীবনী-ইতিহাসে একথা কবিকল্পনায় লিখতে পারেন। মনে রাখবেন; এ ডায়েরির তারিখ হচ্ছে : জুন, ১৯৪২—ঠিক যখন মহাত্মা গান্ধী ‘কুইট ইন্ডিয়া’র কথা ভাবছেন—জার্মান খুনি নয়, ব্রিটিশ খুনির গালে অহিংসার থাপ্পড়মারা গানের কথা ভাবছেন।

আমি বলি, ডায়েরিটা পড়ে যাও—

ও পড়ে চলে :

আব্রাসা বলে, ঠাশ করে গানের কলি কেমন করে মারা যায় ?

—খুব সহজেই। শোন বুঝিয়ে বলি : দেড় দু-মাস পরে ওরা আমাদের সবাইকে সারিবদ্ধভাবে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে উম্শ্লাগপ্লাৎজ * স্টেশনে। ওদের আশা, ওরা আমাদের ব্যাটনপেটা করতে করতে হাঁটিয়ে নিয়ে যাবে। হিংস্র ‘পুলিস-ডগ’ লেলিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে আমাদের ওরা বাধ্য করবে। কিন্তু ধর যদি আমরা ওদের সে সুযোগ না দিই ? ধর যদি আমাদের চিল্‌ড্রেন্স ‘আওয়ার হোমের’ সবাই পায়ে পায়ে মার্চ করে এগিয়ে যাই ? যেন আমরা ছুটির মেজাজে কোথাও হিচ-হাইকিং-এ যাচ্ছি। এক : দুই : তিন, এক.....দুই.....তিন! পায়ে পায়ে পা ফেলে ? আর সেই সঙ্গে মার্চিং সঙ! তুই তো জানিস কোথায় রাখা থাকে আমাদের হোম-এর সবুজ পতাকাটা! খুনিগুলো এলেই তুই পতাকাটা চট করে কাঁধে তুলে নিবি। কেমন ? আমি চাই সেদিন আমি তোর হাত ধরে যাব। পারবি না ? এক হাতে বুড়োমানুষটার হাত ধরে, অন্য হাতে পতাকাটা তুলে ধরে। আমরা সবাই কোরাসে আমাদের চিলড্রেন্স রিপাবলিকের জাতীয়-সঙ্গীতটা গাইব! খুনিগুলো অবাক হয়ে চেয়ে থাকবে! ভাববে : কী আশ্চর্য! ওরা ভয় পাচ্ছে না কেন ? কীরে আব্রাসা, আমরা পারব না ?

উৎসাহে লাফিয়ে ওঠে আব্রাসা : আলবাৎ পারব। পারতে হবেই!

কোথাও কিছু নেই আব্রাসা ছুটে এসে ডক্টর কোরচখের দাড়িওয়ালা গালে একটা চুমু খেয়ে বসল।

—আরও একটা কথা, বললেন কোরচখ, তুই তো জানিস আব্রাসা, আমাদের ট্র্যাডিশন। আমরা প্রতি চারমাস অন্তর একটা নাটক মঞ্চস্থ করি। এবারও আমরা তাই করব। নাটকটা আমি নির্বাচন করেই রেখেছি। মূল নাটকটার নাম : ডাকঘর। ওটা লিখেছিলেন একজন ভারতীয় ভদ্রলোক : টেগোর। পুরো নাম : রবীন্দ্রনাথ টেগোর।

Umschlagplatz' : উম্শ্লাগপ্লাৎজ হচ্ছে একটি বিশেষ রেলস্টেশন। সেই স্টেশন পর্যন্ত ইহুদি হয়ে জন্মাবার অপরাধে মৃত্যুপথযাত্রীরা পদব্রজে যেতে বাধ্য হতো। ওয়ারস' ঘেটো থেকে সেখানে তাদের মাথা-ঢাকা ক্যাটল-ওয়াগনে তুলে দেওয়া হতো। মালগাড়ি ট্রেল্লিঙ্কা গ্যাস-চেম্বার স্টেশনে পৌঁছলে ওয়াগনে যুঁয়ে কজন দমবন্ধ হয়ে মারা যায়নি তাদের গ্যাস-চেম্বারে পাঠানো হতো।

আব্রাসা অবাক হয়ে জানতে চায় : তিনি পোলিশ ভাষা জানতেন ?

—না, রে। জানতেন না। তিনি কী একটা ভারতীয় ভাষায় মূল নাটকটা লেখেন। তার একটি জার্মান অনুবাদ আমাকে উপহার দিয়েছিল মিস্ এসটার্কা*, ধরা পড়ার আগে। আমার এক জন্মদিনে। আমি সেটাকে পোলিশ ভাষায় অনুবাদ করেছি, তোদের দিয়ে অভিনয় করাবো বলে। নাটকটা আমাদের বলতে চায় : মৃত্যুকে ভয় করার কোনও মানে হয় না। কারণ মৃত্যু তো জীবনের শেষ কথা নয়। মৃত্যু কী? মৃত্যু হচ্ছে এক রকমের মুক্তি : আরোগ্য। সে নাটকে একটি ছোট ছেলে আছে—অমল; এই তোরই বয়সী। তাকে জোর করে ঘরে বন্ধ করে রাখা হয়েছে। ঠিক যেমন তোরা সবাই বন্দি আছিস এই ঘেটোতে। অমল তোরই মতো চাইতো রাস্তায় ছুটে বেরিয়ে যেতে। ঝোড়ো হাওয়ায় লুটোপুটি খাওয়া পপলার পাতার মতো খোলামাঠে লুটোপুটি খেতে। জানলা দিয়ে সে লোকজনের যাতায়াত দেখতে পেত—আইসক্রিম ভেড়ার (দইওয়ালা), ভিলেজ গার্ড (চৌকিদার)....

আব্রাসা ওঁকে বাধা দিয়ে বলল, আমরা কিন্তু জানলা দিয়ে রাস্তা দেখতে পাই না, ড্যাড। নাৎসিদের নিষেধ আছে!

—আই নো। কিন্তু আমি আজ যেমন তোকে বলছি, ঠিক তেমনি এক ‘ওল্ড ডক’ (বদ্যি বুড়ো) অমলকে এসে খবর দিলেন : পোস্ট অফিস থেকে রাজামশাই-এর মোহর করা নিমন্ত্রণপত্র এই এল বলে—

আব্রাসা আবার বাধা দিয়ে বলে, রাজামশাইটা কে ?

—চিনতে পারলি না? গোলিয়াথকে দেখে ছোট ডেভিড যখন ঘাবড়ে গেছে তখন যিনি তার কানে-কানে বলেছিলেন : ভয় কিরে ?

চোখ দুটো নাটা-নাটা হয়ে ওঠে আব্রাসার।

বলে, ইউ মীন আওয়ার গড ?

সে বাহুল্য প্রশ্নের জবাব না দিয়ে ডক্টর বলেন, তুই সেই অমলের চরিত্রটা অভিনয় করবি, আব্রাসা? তোর বেলাতেও তো গোলিয়াথ সশস্ত্র; কিন্তু তোরও হাতে আছে ডেভিডের গুলতি বাঁটুল—আমাদের হোমের পতাকাটা! পারবি না?

হঠাৎ সোজা অ্যাটেনশনে দাঁড়ালো ছেলেটা। বললে, পারব, ড্যাড!

এসটার্কা : পুরো নাম : Ester Winogron ; ওয়ারস বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান মাত্রক। কোরচখের চিল্ড্রেনস হোম সংলগ্ন হাসপাতালে নার্সের কাজ করতেন। তাঁর ইহুদি পরিচয় জানতে পেরে নাৎসি এস. এস. তাঁকে ওয়ারসর রাস্তায় গ্রেপ্তার করে। গ্যাস-চেম্বারে পাঠায়। প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথের ডাকঘর নাৎসি জার্মানিতে নিষিদ্ধ পুস্তক ছিল [“Staging of *The Post Office* by Rabindranath Tagore was prohibited by Hitler’s Censors.”— vide *GHETTO DIARY* by Janusz Korczak. Holocaust Library. New York. p. 186]

কোরচখ-ডাকঘরের সন্ধানে

প্রথম পর্ব

নাতি-নাতনি-নাতজামাইদের সঙ্গে এক সন্ধ্যায় একটি মার্কিনী ‘কুইজ-গেম’ খেলছিলাম। প্রত্যেকটি খেলোয়াড় ইচ্ছামতো তার প্রশ্নরাজ্যের লক্ষ্মণগণ্ডিটা টানতে পারে। বড় নাতনি অন্তরা বেছে নিল ‘অ্যাস্ট্রনমি’, নাতজামাই ম্যাথু ‘জেনারেল সায়াস’, নীনা ‘টেনিস’, আর তার সহপাঠী বরিস ‘কম্পুটার সায়েন্স’। আমি বেছে নিলাম ‘বিশ্ব ইতিহাস’। সে সন্ধ্যায় দু-দুটি ইতিহাস-সংক্রান্ত সহজ প্রশ্নের জবাব আমি দিতে পারিনি। প্রথম প্রশ্নটা ছিল : ইউ. এন. ও.-র একটি সদস্যরাষ্ট্র স্বাধীনতালাভের অব্যবহিত পরে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে মেনে নিয়েছিল জার্মান, ফ্রেঞ্চ, স্প্যানিশ ও রাশিয়ান—বিশেষ কয়েক বছর পরে : ইংরেজি। সেই সার্বভৌম রাষ্ট্রটির নাম কী ?

আমি আন্দাজিক্যালি যে দেশের নামটা বলেছিলাম সেটা ‘সহি-জবাব’ নয়।

দ্বিতীয় প্রশ্নটি ছিল :

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে এপ্রিল, 1919-এ ভার্সাই সন্ধি হয়, তাতে যে চারটি যুযুধান রাষ্ট্র স্বাক্ষর করে তার ভিতর গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইউনাইটেড স্টেটস ব্যতীত চতুর্থ স্বাক্ষরকারী কে ছিল ?

আমি দু-দুবারই গাড্ডু মেরেছিলাম! পরে ভেবে দেখেছি, তার হেতু প্রথম ক্ষেত্রে সদ্যস্বাধীন রাষ্ট্রের সেকালীন মানসিকতা, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বিজয়ী রাষ্ট্রসমূহের তৎকালীন চিন্তাভাবনার কথাটা আন্দাজ করতে পারিনি। তার কারণ আমি ইতিহাসে এসব জেনেছি; সমকালে দাঁড়িয়ে সংবাদপত্র পাঠ করে নয়।

জার্মানির ‘থার্ড রাইখ্’-এর উত্থান-পতনের সঙ্গে ঐকতান রচনা করে যে ইহুদি-নিধন যজ্ঞ সম্পাদিত হয়েছিল—যাকে ইতিহাস আদর করে বলে Holocaust—তা আমাদের মতো স্মৃতিভারনশ্র বৃদ্ধ-বৃদ্ধার দল প্রাত্যহিক সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় পড়েছে, সাময়িকী বা বেতার মাধ্যমে জেনেছে—আমার অধিকাংশ পাঠিকা-পাঠকের মতো জরাজীর্ণ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় নয়। তবু আমি বা আমার সমকালীন সাহিত্যসেবীরা সে বিষয়ে পাঠককে কতটুকু দিয়েছি? আমি বিজ্ঞানের ছাত্র, বাংলা সাহিত্যের নানা দিগন্তের সন্ধান জানি না—কিন্তু আমার সীমিত জ্ঞানমতে মাত্র তিনখানি বইয়ের কথা মনে পড়ছে : আনা ফ্রাঙ্কের ডায়েরির একটি বঙ্গানুবাদ, অ্যাইখম্যানের নৃশংসতা বিষয়ে একটি গ্রন্থ আর নুরেমবার্গ বিচার সংক্রান্ত কী একখানা বই। কোনোটাই সেকালীন কোনো প্রথিতযশা সাহিত্যিকের কলমে নয়। আপনাদের কি মনে পড়ছে আর কোনও উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের কথা? বরেন্য-সাহিত্যিকের লেখা? অথচ ঘটনা যখন ঘটে তখন আমরা যুবক, কলেজের

ছাত্র। সাম্যবাদের জয়গানে আমরা ছিলাম মুখর, হিরোসিমা-নাগাসাকির নারকীয়তার বিরুদ্ধে আমরা ছিলাম সোচ্চার। জার্মানির ইহুদি-নিধন যজ্ঞের বিষয়ে আমরা ছিলাম উদাসীন। অথচ হিসাব কষে দেখছি, আনা ফ্রাঙ্ক ছিল বয়সে আমার চেয়ে পাঁচ বছরের ছোট, ‘ডাকঘরে’ যে ছেলেটি অমলের চরিত্রে অভিনয় করে সেই আব্রাসাও তাই। কোরচখ-এর অনবদ্য জীবনকথা রচনা করতে হলে আমাকে ওই ‘হলোকস্ট’ সম্বন্ধে অনেক কিছু পড়াশুনা করতে হবে। বস্তুত হলোকস্ট-চিতার লেলিহান শিখার আলোতেই কোরচখ-এর স্বরূপ ফুটে উঠতে পারে। কিন্তু আমার পাঠক-পাঠিকার কাছে এই অমানুষিক নির্যাতনের তথ্য অজানা। আপনাদের কেউ কেউ তা ইতিহাসের বইতে হয়তো পড়েছেন। সংবাদপত্রে বা সাময়িকীতে নয়। বাংলা সাহিত্যও দুর্ভাগ্যক্রমে এ বিষয়ে মিতভাষ। কলকাতার বুকেই যে একটি সিনাগগ আছে, প্রতি সপ্তাহান্তে সেখানে যে সাবাথ অনুষ্ঠিত হয় তা আমরা জানি না। বুদ্ধমন্দির, জৈনমন্দির, গুরুদ্বারা কোথায় আছে তা আমাদের নখদর্পণে—সেন্ট পল্‌স চার্চ আর নাখোদা মসজিদ তো কলকাতা শহরে সুপরিচিত দিকচিহ্ন—কিন্তু সিনাগগটা কোথায় কেউ জানে না!

অথচ এই ইহুদি-নিধন যজ্ঞ যে কী ভয়ঙ্কর, কী ব্যাপক তা সহজেই বোঝা যাবে একটা সংখ্যাতত্ত্ব থেকে : হিরোসিমা আর নাগাসাকিতে দু-দুটি অ্যাটম বোমার আঘাতে মিলিতভাবে নিহত হয়েছিল প্রায় দুই লক্ষ জাপানী; আর হিটলার-জমানায় পাঁচটি গ্যাস-চেম্বারে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল ষাট লক্ষ ইহুদি নরনারী—শিশু-বৃদ্ধ-বৃদ্ধা! অঙ্কের হিসাবে ত্রিশ গুণ! তার উপর আরও দশ লক্ষ স্লাভ—যারা পোল্যান্ড, চেকোস্লোভাকিয়া, যুগোস্লাভিয়ায়, ইউক্রেনে বসবাস করত—ইহুদি নয়, ধর্মে খ্রিস্টান। তবে হিটলারের হিসাব মতো : অনার্য! সর্বমোট প্রায় এক কোটি মানুষ! এটাকেই সংক্ষেপে বলা হয় : হলোকস্ট!

ফলে এই নারকীয় যজ্ঞের মূল হোতাটির উত্থান-পতনের একটা সংক্ষিপ্ত ইতিকথা — ‘রাইজ অ্যান্ড ফল অব দ্য থার্ড রাইখ্’-এর একটি চুম্বকসার প্রথমে আলোচনা করে নিলে দু-পক্ষেরই সুবিধা। পাঠক ও লেখকের। কিন্তু তা শুরু করার আগে আমি যে দুটি ইতিহাস প্রশ্নে গাড়ু মেরেছিলাম—সেই যে দুটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর আপনাদের জানা—তার ‘সহি-জবাবটা’ লিপিবদ্ধ করি :

প্রথম প্রশ্নের জবাব : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। দ্বিতীয়ের—আজ্ঞে না, জার্মানি নয়, ইতালি!

বিংশ শতাব্দী যখন মহাকাালের সূতিকাগারে তখন ইয়োরোপে সবচেয়ে ক্ষমতাসালী ছিলেন : জার্মান সম্রাট। শতাব্দীর সাবালকত্ব প্রাপ্তির পূর্বেই — 1918 সালে ঘটে গেল তার অকালমৃত্যু : অল কোয়ায়েট অন দ্য ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট! রণাঙ্গনে নেমে এলে শ্মশানের স্তব্ধতা। জার্মানির বিশ্বত্রাস সম্রাট, কাইজার পালিয়ে গেলেন হল্যান্ডে। কয়েকজন ক্ষমতাসালী রাজনীতিবিদ বার্লিনে প্রতিষ্ঠা করলেন একটি নয়া জার্মান রিপাবলিক।

তারা বিজয়ী মিত্রবাহিনীর কাছে সন্ধির প্রস্তাব পাঠালেন। জানালেন যে, মহামহিম কাইজার দেশত্যাগী, রাইফ্‌স্ট্যাগের দখল নিয়েছে এই নয়া জার্মান রিপাবলিক—তারা যুদ্ধ চায় না, শান্তি চায়।

কালটা : এপ্রিল, 1919 ! অর্থাৎ বিশ্ববিজয়ী ইংরাজ যখন জালিয়ানওয়ালাবাগে লিখছে অত্যাচারের নয়া ইতিহাস, আর রবীন্দ্রনাথ বিনোদ্র রাতে রচনা করছেন তাঁর ঐতিহাসিক নাইটহুড ত্যাগের প্রতিবাদপত্র। ঠিক তখনই রচনা করতে বসেছে বিশ্বযুদ্ধজয়ী রাষ্ট্রসমূহ ঐতিহাসিক ভার্সাই সন্ধিপত্র। সদ্যগঠিত জার্মান রিপাবলিকের প্রতিনিধিদের সে কক্ষে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। বিজয়ী রাষ্ট্রচতুষ্টয়—গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা ও ইতালি—সন্ধিপত্রের খসড়া প্রস্তুত করে পাঠিয়ে দিল জার্মান শিবিরে। জার্মান ডেলিগেটদের বলা হলো—ওই সন্ধিপত্রে নিঃশর্ত স্বাক্ষর না দিলে জার্মানিকে পুনরাক্রমণ করে পদানত করা হবে। তখন জার্মানি হয়ে যাবে মিত্রশক্তির অধীনস্থ একটি রাজ্য—যেমন ছিল ভারত, কানাডা বা অস্ট্রেলিয়া।

জার্মান প্রতিনিধিরা এই অবমাননাকর সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর দিতে বাধ্য হলেন।

এই চুক্তিপত্রে বলা হয়েছে : প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাধানোর জন্য একটি মাত্র রাষ্ট্র দায়ী—জার্মানি। ফলে, জার্মানিকে যাবতীয় ক্ষয়ক্ষতি পরিপূরণ করতে হবে কড়ায়-গুণ্ডায়। জার্মান সাম্রাজ্যের যে সব উপনিবেশ ছিল—আফ্রিকায়, এশিয়ায়, দক্ষিণ আমেরিকায়—তা চারজন বিজয়ী নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিলেন। যুদ্ধপূর্ব যুগে জার্মানির যে মূল ভূখণ্ড ছিল তার বেশ কিছুটা অংশ ছাঁটাই করা হলো। জার্মানির সমরশক্তিকে নির্মমভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হলো—জল-স্থল-বিমান বিভাগে। যাতে সামরিক শক্তি হিসাবে জার্মানি যেন আর কোনদিন ইয়োরোপে মাথা তুলে-দাঁড়াতে না পারে। জার্মান সরকারকে বলা হলো, ধীরে ধীরে যুদ্ধাধীন পরিশোধ করতে হবে। জার্মান রিপাবলিকের প্রতিনিধিরা এই নির্মম শর্ত স্বীকার করে নিতে বাধ্য হলেন।

যুদ্ধক্লান্ত ক্ষতবিক্ষত জার্মানির ভিতরে এই ভার্সাই চুক্তির বিচিত্র প্রতিঃক্রিয়া ঘটল। অধিকাংশ জার্মান-মনে প্রশ্ন জাগল, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য একা জার্মানি কেন দায়ী হবে? বিবাদমান সব কয়টি রাষ্ট্রই তো দায়ী! তাহলে সকলের সব ক্ষতিপূরণের দায় একা জার্মানিকেই বা কেন বহন করতে হবে? জাতীয়তাবাদী জার্মান কিছু নেতা প্রচার শুরু করে দিল যে, রিপাবলিক দলের ওই যে নেতারা ভার্সাই সন্ধিতে স্বাক্ষর দিয়েছে ওরা বিশ্বাসহতা। তারা জার্মানিকে পিছন থেকে ছুরিকাঘাত করেছে। আগ বাড়িয়ে সন্ধির প্রস্তাব তুলে দেশের সর্বনাশ করেছে। অনেক আত্মাভিমानी জার্মান এভাবে সাস্তুনা খুঁজতে থাকেন তাঁদের পরাজয়ের।

জার্মান সম্রাট কাইজারের দেশত্যাগের পর যে রাজনৈতিক নেতার দল শাসন ক্ষমতা দখলকরেছিলেন তাঁদের বলা হয় ওয়েইমার রিপাবলিক (Weimar Republic)।

কারণ ওয়েইমার শহরে এই গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। জন্ম থেকেই এই সরকারের সামনে একাধিক সমস্যার উদয় হলো। প্রথমত, দেশের মানুষ তাদের দায়ী করছে ভার্সাই চুক্তির জন্য। এ সন্ধিপত্রে তাঁরা যে নিতান্ত বাধ্য হয়ে স্বাক্ষর দিয়েছেন এটা সবাই মস্তিষ্ক দিয়ে মেনে নিলেও হৃদয় দিয়ে বুঝতে চাইল না। অথচ কোনো দলই এই শাসকদলকে গদীচ্যুত করে ক্ষমতাদখলে সক্ষম হলো না। ফলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সাময়িক সমঝোতা করে এক ‘মিলিজুলি-সরকার’ রাইস্ট্যাগে টিকে রইল।

মানুষজনের অসন্তুষ্টি কিন্তু নানাভাবে দানা বেঁধে উঠতে থাকে। ১৯২০-এর শুরু থেকেই মধ্যবিত্তশ্রেণীর মানুষ সরকারের পতন কামনা করছে; কারণ মুদ্রাস্ফীতি ততদিনে গগনচুম্বী। বাজারে গিয়ে একটা পাঁউরুটি কিনতে হলে এক ঠেলাগাড়ি ভর্তি ডয়েশমার্কের নোট বয়ে নিয়ে যেতে হতো। বেকারসমস্যা চরমে। রেমার্কের তিনসঙ্গী উপন্যাসে তা আমরা পড়েছি। তার একটি অনবদ্য বঙ্গানুবাদও আছে। জমিদারশ্রেণী, শিল্পপতিরা এবং সেনানায়কের দল একটা বৈপ্লবিক আমূল পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখছেন—যাতে প্রাথমিক জার্মান সাম্রাজ্যের সম্মান-প্রতিপত্তি ফিরে আসে। পুবালাই হাওয়ায় তাঁরা একটা ঝড়ের অমঙ্গল-সঙ্কেতও পাচ্ছেন—সাম্যবাদের ঝোড়ে হাওয়া। কড়া হাতে কোনো একজন একনায়ক যদি এক হাতে সাম্যবাদকে রুখতে সক্ষম হয়, অন্য হাতে জার্মান জাতিটার অর্থাভাব, অনাভাব মোটামুটি মেটাতে পারে তবে সে স্বাগত।

যুদ্ধাবসানের কয়েক বছরের ভিতরেই গড়ে উঠল একাধিক রাজনৈতিক দল। নানারকম মতপার্থক্য থাকলেও দুটি বিষয়ে তারা একমত। প্রথমত, ওয়েইমার সরকারের পতন। দ্বিতীয়ত, ভার্সাই চুক্তিকে অস্বীকার করা। এদের মধ্যে একটি উগ্রপন্থী রাজনৈতিক দল ক্রমশ ক্ষমতালালী হয়ে ওঠে: ন্যাশনাল সোশালিস্ট জার্মান ওয়ার্কার্স পার্টি বা নাৎসি পার্টি। এই চরমপন্থী দলটি জার্মান জাতির অসন্তুষ্টিকে মূলধন করে দাবানলের মতো বেড়ে উঠতে থাকে। বিশেষ করে সেনাশিবিরে, যুবসংগঠনে, ছাত্রদলে, বেকারমহলে। এদিকে যারা জন্মগতভাবে সমাজবিরোধী, স্বভাবগতভাবে অপরাধজীবী তারাও এই উগ্রপন্থীদলের পতাকাতে সানন্দে এসে সমবেত হলো। বিক্ষুব্ধ জার্মান জনমানসকে নাৎসি পার্টি বলল, যদি ওদের সাময়িকভাবে নিরক্ষুশ ক্ষমতা দেওয়া হয়, তাহলে জার্মানির হতগৌরবকে তারা ফিরিয়ে আনবে। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসার আগে জলে-ডোবা মানুষ যেভাবে খড়কুটোর দিকে হাত বাড়ায়—খড়কুটোর রক্ষা করার ক্ষমতা, তার ভাসমানতার কথা বিচার করে না—ঠিক সেভাবেই জার্মানির আবালবৃদ্ধবনিতা সেদিন নাৎসি পার্টিকে আঁকড়ে ধরেছিল।

এই নাৎসি দলে যে লোকটা নেতা হয়ে উঠল তার নাম অ্যাডল্ফ হিটলার। তার বাবা ছিলেন নিম্নশ্রেণীর সরকারী কর্মচারী, আর মা এক কৃষক রমণী। বাল্যে সে নানাভাবে

অত্যাচারিত হয়েছে। নীতিজ্ঞান বলে তার চরিত্রে কিছু গড়ে ওঠার অবকাশ পায়নি। স্বভাবতই সে নিষ্ঠুর প্রকৃতির। স্কুলে তার পড়াশুনায় না ছিল মন, না বুদ্ধি। স্কুলের গণ্ডিটা তাই পার হতে পারেনি। ছবি আঁকার নেশা ছিল। ভর্তি হতে চেয়েছিল ভিয়েনার আর্ট স্কুলে। পর পর দু'বার চেষ্টা করেও সে ওই স্কুলে ভর্তি হতে পারেনি।

একটা আপাত-অপ্রাসঙ্গিক কথা বলি : ভিয়েনার ঐ আর্ট স্কুলের নির্বাচক ও পৃষ্ঠাপোষকরা সবাই ছিলেন ইহুদি!

অত্যন্ত ধূর্ত, সন্ধানী, স্বার্থপর, নীতিজ্ঞানহীন এই মানুষটার একটা মস্ত গুণ ছিল— স্বীকার করতেই হবে। বক্তৃতামঞ্চে অনর্গল জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়ে যাবার ক্ষমতা। নাৎসি পার্টি এবং বিশেষ করে হিটলারের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ অনুসারে জার্মানরা হচ্ছে খাঁটি আর্য আর ইহুদিরা নিম্নজাতের। শুধু ইহুদি নয়, 'স্লাভ' রাও মানবেতর শ্রেণীর। অর্থাৎ পোল্যান্ডের পূর্বাংশে ও দক্ষিণাংশে বসবাসকারী রাজ্যের বাসিন্দারা সবাই অনার্য—যুগোস্লাভিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, রুম্যানিয়া, ইউক্রেন প্রভৃতি অঞ্চলের মানুষরা। 1930-এর নির্বাচনে দেখা গেল নাৎসি পার্টি রাইখ্‌স্ট্যাগে যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। দু-বছর পরে 1932-তে দেখা গেল রাইখ্‌স্ট্যাগে, অর্থাৎ জার্মান পার্লামেন্টে নাৎসি পার্টি এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ।

তার পরের বছর 1933 সালের জানুয়ারির ত্রিশ তারিখে জার্মান রিপাবলিকের বর্ষিয়ান প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল পল ফন হিডেনবার্গ সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা অ্যাডল্‌ফ হিটলারকে জার্মানির চান্সেলার পদে বরণ করলেন। তৎক্ষণাৎ হিটলার চান্সেলারের ক্ষমতাবলে নিজেকে রাইখ্‌স্ট্যাগের সর্বময় একচ্ছত্র নায়করূপে (ফ্যুরার) আত্মঘোষণা এবং একসঙ্গে জার্মান রিপাবলিকের মৃত্যু ঘোষণা করে। তারপর হিটলার রাইখ্‌স্ট্যাগের কাছে দাবি করে তাকে দেওয়া হোক চারবছরের জন্য 'এমার্জেন্সি পাওয়ার' বা জরুরি আইনের ক্ষমতা। ঠিক যা একদিন চেয়েছিলেন ইন্দিরা গান্ধী। তাহলে চারবছরের ভিতরে সে জার্মান জাতিকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হবে।

23 মার্চ হিটলারকে একনায়কতন্ত্রের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দান করে রাইখ্‌স্ট্যাগ আত্মবিলোপ ঘটায়। এরপর থেকে জার্মান সরকার ওই একটি মানুষের অঙ্গুলিহেলনে পরিচালিত হতে শুরু করে।

নাৎসি পার্টি ব্যতিরেকে যাবতীয় রাজনৈতিক দলকে বেআইনী ঘোষণা করা হলো। যাবতীয় শ্রমজীবী প্রতিষ্ঠান, যুবসংগঠন, ছাত্র ইউনিয়ন এমন কি চার্চের পরিচালন দায়িত্ব এসে গেল রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে। তদানীন্তন যাবতীয় গণ প্রচারমাধ্যম—সংবাদপত্র, বেতার, সিনেমা, থিয়েটার, গ্রন্থপ্রকাশ, খেলাধুলা সবকিছুই চলে এল নাৎসি পার্টির নিয়ন্ত্রণে। হয়তো আপনাদের মনে পড়ে যাবে বার্লিন অলিম্পিকের কথা। কৃষ্ণকায় অনার্য অ্যাথলেট জেসি ওয়েন্স পরপর চারটি স্বর্ণপদক লাভ করায় হিটলার বিরক্ত হয়ে সত্রোদ্রে অলিম্পিক মঞ্চ ত্যাগ করে চলে যায়।

একথা অনস্বীকার্য যে, পরাজিত, নির্যাতিত জার্মানির অধিকাংশ জননেতা, বুদ্ধিজীবী এবং সাধারণ মানুষ প্রথম অবস্থায় হিটলারের বর্ণবিদ্বেষের তাত্ত্বিক নীতি আর তার সমাধানসংক্রান্ত কার্যক্রমের কথা জানতে পারার পর অনেকেই প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠতে চায়। কিন্তু ততদিনে হিটলার গড়ে তুলেছে তার গেস্টাপো বাহিনী, এস. এস. এবং প্যারট্রুপার বাহিনী। মধ্যরাত্রে শহরের এখানে-ওখানে গেস্টাপো বাহিনী হানা দেয়। বিরোধী নেতা বা বুদ্ধিজীবীদের তারা উঠিয়ে নিয়ে যেত। তারপর আর তাদের কোনও খবর পাওয়া যেত না। রাইখ্‌স্ট্যাগে বিরোধীদল এবং আদালতে ন্যায়াধীশ না থাকায় নাৎসি বাহিনীর অত্যাচার হয়ে উঠল নিরঙ্কুশ। যে কয়জন এই এস. এস. বাহিনীর ঝটিকা আক্রমণ এড়িয়ে আত্মগোপন করতে পেরেছিলেন, তাঁরা কোনও বিরোধী সংগঠন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। প্রসঙ্গত বলি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে হিটলারকে হত্যা করার চার-চারটি জার্মান পরিকল্পনা করা হয়েছিল—যুযুধান বিরোধীদলের গোয়েন্দা পরিচালিত হয়ে নয়—জার্মান-মস্তিষ্ক-প্রসূত গুপ্ত হত্যার পরিকল্পনা। নিতান্ত সৌভাগ্যক্রমে চারবারই হিটলার প্রাণে বেঁচে যায়।

সর্বময় ক্ষমতালাভের সঙ্গে সঙ্গে ইহুদিদমন ব্যাপারে হিটলার সক্রিয় হয়ে ওঠে। অধিকাংশ রাজনৈতিক ঐতিহাসিকের মতে তার হেতু, হিটলার ছিল আন্তরিকভাবে বর্ণবিদ্বেষী। আমাদের তা মনে হয় না। আমাদের মনে হয়েছে, ইহুদিদের উপর জাতক্রোধের একটা হেতু ভিয়েনার আর্ট স্কুলে তার ভর্তি হতে না পারা। এটি নিতান্ত ব্যক্তিগত বিদ্বেষ এবং তা খুব প্রখর ছিল না নিশ্চয়। মূল হেতুটা হয়তো এই জাতের : হিটলার জানত গোটা বিশ্বকে নিজের মুঠোয় ধরতে হলে তার প্রভূত অর্থের প্রয়োজন। অথচ জার্মানি তখন অর্থাভাবে ধুঁকছে। হিটলার জানত, যদি কোনোক্রমে ইহুদিবিদ্বেষ-নীতিটাকে অর্থাৎ তার ‘আর্য-শ্রেষ্ঠতার’ তাত্ত্বিক ফর্মূলাটাকে জার্মান জনগণ সর্বতোভাবে গ্রহণ করে, তাহলে নাৎসি পার্টির অর্থাভাব আর থাকবে না। কারণ সেই সময়েও খণ্ডিত জার্মান রাজ্যে বাস করত দু-আড়াই লক্ষ ইহুদি—যারা অত্যন্ত ধনী। ইহুদিরা জার্মানি ও পোল্যান্ডে বাস করছে স্বরণাভীত কাল থেকে। নিরলস নিষ্ঠায় তারা ধনসম্পদ সঞ্চয় করে গেছে। মাতৃভূমি বলে তাদের কিছু নেই, ফলে মাতৃভূমি রক্ষার জন্য কোনোকালেই তাদের যুদ্ধ অর্থাৎ অর্থের অপচয় করতে হয়নি। তারা ক্রমাগত শিল্প-সংস্কৃতি, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় আর সিনাগগই গড়ে গেছে সহস্রাব্দী ধরে। ইহুদিরা খতম হলে এই কুবেরীর্ষিত সম্পদ এসে যাবে নাৎসি পার্টির হাতে। কিন্তু সাধারণ মানুষ কি এই নৃশংস পদ্ধতিটা মেনে নেবে?

এ পথে হিটলারের প্রথম পদক্ষেপটি লক্ষ্য করে দেখুন। সেটার মূল বর্ণবিদ্বেষজনিত কারণে নয়। জার্মান যুবকদের কাছে প্রিয়তর হবার আয়োজন। হিটলারের আদেশে সমস্ত

সরকারী চাকরি থেকে রাতারাতি বিতাড়িত হলো ইহুদিরা। শূন্যস্থান পূরণ করা হলো বেকার জার্মান যুবক দিয়ে। দ্বিতীয় অর্ডিনান্স-এ ইহুদি আইনজীবীদের আদালতে প্রবেশ নিষিদ্ধ হলো। ইহুদি ডাক্তারদের হাসপাতাল থেকে তাড়ানো হলো। তাদের প্রাইভেট-প্র্যাকটিসও স্তব্ধ করে দেওয়া হলো। বলা বাহুল্য, এতে খুশি হলো জার্মান আইনব্যবসায়ীরা এবং চিকিৎসকেরা। তৃতীয় দফায় প্রতিটি বেসরকারী জার্মান প্রতিষ্ঠানকে—বাণিজ্য-ব্যবসায়ী, স্কুল-কলেজ, দোকানপাটকে নির্দেশ দেওয়া হলো ইহুদিদের কর্মচ্যুত করে আর্য জার্মানদের নিয়োগ করতে হবে। স্কুলে-কলেজে যে ইহুদি ছাত্র-ছাত্রীরা পাঠরত ছিল তাদের তাড়ানো হলো—শূন্যস্থান পূর্ণ করল আর্য জার্মান ছাত্র-ছাত্রী। এইভাবে ধাপে ধাপে হিটলার নিরন্ন, বেকার ‘আর্য’ জার্মানদের কাছে প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠে। পূর্ব পাকিস্তান বা বাংলাদেশ থেকে হিন্দুদের বিতাড়নে সে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ রাষ্ট্রক্ষমতাকে কোনদিন সক্রিয় বাধা দেয়নি, দেয়নি অসমপ্রদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ‘বংগাল-খেদা’ আন্দোলনে। দেয়নি ব্যক্তিগত ও দলগত স্বার্থে। হিটলারের জমানায় একই হেতুতে সারা জার্মানি নাৎসি পার্টির কার্যক্রমকে শুধু সহ্য নয়, সাদরে অনুমোদন করেছিল। তাছাড়া ছিল নাৎসি পার্টির নৃশংস দমননীতি, প্রতিবাদের উপক্রম করলেই তাকে হত্যা করা হতো।

জান-মান বাঁচাতে ইহুদিরা দেশত্যাগ করতে শুরু করল। জার্মানি ছেড়ে বিদেশে পালানোই একমাত্র পথ। হিটলারের নাৎসি পার্টির এতে আপত্তি নেই। প্রথম কথা, বিদেশে যেতে হলে সব সম্পদ জার্মানিতে ফেলে রেখে যেতে হবে। যার পুনরুদ্ধারের কোনো সম্ভাবনা নেই। ইহুদিদের এতদিনের প্রতিবেশী ‘আর্য জার্মান’ পরিবার নির্বিচারে ইহুদি সম্পত্তি গ্রাস করে নিল—ঠিক যেভাবে পূর্ব পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ বিতাড়িত হিন্দুদের জমি-বাড়ি আত্মসাৎ করে নিয়েছে। যে সব জার্মান পরিবার এভাবে বিনা-আয়াসে প্রভূত সম্পত্তির মালিক হয়ে গেল তারা নাৎসিবাদের বিরুদ্ধাচরণ করল না। দ্বিতীয়ত, যারা সবকিছু ফেলে বিদেশে গেল তাদের প্রচুর ঘুষ দিতে হলো নাৎসি পার্টিতে। অথবা নাৎসি পার্টির কর্মীদের, ব্যক্তিগতভাবে। একশ্রেণীর মুৎসুদ্দি দালাল এভাবে ধনী হয়ে ওঠে।

তখনো হিটলার ইহুদিনিধন যজ্ঞ শুরু করেনি—তাদের বিভিন্ন ঘেটোয় পৃথকীকরণের কাজ চলছিল। কারণ ওদের গৃহচ্যুত না করলে তাদের প্রাসাদোপম আবাসগুলি জবরদখল করা যাবে কী করে? বড় বড় শহরে ঘেটো নির্মাণ করে পৃথকীকরণ সম্ভব হলো। ছোট ছোট জনপদে বা গ্রামে তা করা সম্ভব হলো না। সেখানে ইহুদিদের বাজারে যেতে দেওয়া হতো না, কোনো দোকানে কিছু কিনতে দেওয়া হতো না; অনেক দোকানে, হোটেলে বা ভোজনাগারে সাইনবোর্ড ঝুলতে দেখা গেল : কুকুর এবং ইহুদিদের প্রবেশ নিষেধ। ফলে সেই সব জনপদের মানুষ বড় বড় শহরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলো—এবং সেখান থেকে অনিবার্যভাবে ঘেটোয়।

চান্সেলার হবার পর হিটলার সর্বশক্তিতে তার সৈন্যবাহিনীকে ক্ষমতাশালী করে তুলতে থাকে। বস্তুত তার যুদ্ধায়োজন এই পাঁচ-ছয় বছরে যে কী প্রচণ্ডভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে ও পাচ্ছে তা বাইরের দুনিয়া জানতে পারেনি। ভার্সাই চুক্তি অনুসারে পোল্যান্ডকে দেওয়া হয়েছিল একটা করিডর—জার্মান-ভূখণ্ডের মাঝখান দিয়ে। যাতে পোল্যান্ড বাণ্ট্রিক উপসাগরে ডানজিগ বন্দর ব্যবহার করতে পারে। হিটলার দাবি করল এই ভূখণ্ড। পরে ছিনিয়ে নিল সেটা। গ্রেট ব্রিটেন আর ফ্রান্স যুদ্ধ ঘোষণা করতে বাধ্য হলো জার্মানির বিরুদ্ধে—সেপ্টেম্বর ১৯৩৯-এ। হিটলার তৎক্ষণাৎ আক্রমণ করল পোল্যান্ড। মাত্র আঠারো দিনে গোটা পোল্যান্ড পদানত হলো হিটলারের। পোল্যান্ড আক্রমণের আগে হিটলার রাশিয়ান রাষ্ট্রনায়ক স্ট্যালিনের সঙ্গে একটি অনাক্রমণাত্মক চুক্তি সম্পাদন করে।

এপ্রিল ১৯৪০ : জার্মানি পদানত করল ডেনমার্ককে। আক্রমণ করল নরওয়ে।

মে মাসের দশ তারিখে হিটলারের পানজার বাহিনী পশ্চিম দিকে মুখ ফেরাল। হল্যান্ড ও বেলজিয়াম যুদ্ধে যোগদান করেনি। মাত্র দু-এক সপ্তাহে হিটলার সেই নিরপেক্ষ রাজ্য দুটি দখল করে নিল। তারপর আক্রমণ করল ফ্রান্সকে। হিটলারের দুর্ধর্য পানজার বাহিনীর আক্রমণে ফ্রান্স পদানত হলো বাইশে জুন ১৯৪০। ডানকার্ক বন্দর থেকে কোনোক্রমে ব্রিটিশ বাহিনী পালিয়ে যেতে সক্ষম হলো। পুরো একটি বছর হিটলার ছিল মধ্য ইউরোপের একচ্ছত্র সম্রাট। ও রাজ্যে তখন তার দুটি শত্রু : পূর্বে স্ট্যালিনের রাশিয়া, আর পশ্চিমে চার্লিলের গ্রেট ব্রিটেন।

হিটলার বেছে নিল তার পশ্চিমের শত্রুকে। এই প্রথম তার অগ্রগতিতে বাধা পেল হিটলার। ব্রিটিশ নৌবাহিনীকে পরাজিত করে তার রণতরী কোনো ব্রিটিশ বন্দরকে দখল করতে পারল না। তার দুর্ধর্য সমরশক্তির সবচেয়ে ক্ষমতাশালী ছিল পানজার বাহিনীর ট্যাঙ্ক। কিন্তু ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করে একটি ট্যাঙ্কও নামিয়ে দিতে পারল না হিটলারের কোনো যুদ্ধজাহাজ। তাই এরপর শুরু হলো লাফতায়ের (জার্মান বিমানবাহিনীর) কার্পেট বম্বিং—লন্ডনের প্রতি বর্গফুট জমিতে! লন্ডনের বাসিন্দারা ভূগর্ভে আশ্রয় নিল। আর. এ. এফ. চালিয়ে গেল প্রত্যাঘাত। পুরো একটি বছর ১৯৪০-এর গ্রীষ্মকাল থেকে পরের বছরের গ্রীষ্মকাল পর্যন্ত। নিরবচ্ছিন্ন কার্পেট বম্বিং করেও হিটলার সক্ষম হলো না চার্লিলকে নতজানু করতে।

ক্ষতবিক্ষত গ্রেট ব্রিটেনকে ছেড়ে এবার হিটলার পূর্বাভিমুখী হলো। আপাতদৃষ্টিতে কম্যুনিষ্ট রাশিয়ার সঙ্গে তার কোনো বিরোধ ছিল না। ভার্সাই চুক্তিতে স্বাক্ষর ছিল না রাশিয়ার। জারের পতন হবার পরে লেনিন বা স্ট্যালিনের জমানাতে রাশিয়া জার্মানির

বিরুদ্ধে কোনো কিছু করেনি। হিটলারের একের পর একটি পররাজ্য অধিকারে সে একবারও প্রতিবাদ জানায়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সে মিত্রপক্ষে যোগদান করেনি, বরং নাৎসি জার্মানির সঙ্গে অনাক্রমণাত্মক চুক্তি সম্পাদন করে বসে আছে। অবশ্য হিটলার যখন



পোল্যান্ডের পূর্বসীমান্ত আক্রমণ করে তখন রাশিয়াও পশ্চিম দিক থেকে কিছু কিছু স্কীণজীবী সার্বভৌম রাষ্ট্রকে দখল করে পদানত করে নিয়েছিল—রুমেনিয়া বা বুলগেরিয়ার কিছু ভূখণ্ড। এছাড়া পোল্যান্ডের পশ্চিমসীমান্তেও পড়েছিল রাশিয়ান ভালুকের থাবা। তবু তখনো ম্যাপে অক্ষশক্তি—হিটলার ও মুসোলিনীর মিলিত শক্তি ইউরোপের মানচিত্রে সিংহভাগ দখল করে আছে। এই সময়—১৯৪১-এর জুন মাসে হিটলার এমন একটি ক্রান্তিকারী পদক্ষেপ করে বসে, যাকে অনেক ঐতিহাসিক বলেছেন তার চরমতম মূর্খতা। অতিদর্পিত লঙ্কেশ্বরের মতো হিটলার আক্রমণ করে বসল সোভিয়েত রাশিয়াকে।

বেচারি হিটলার! স্কুল-ফাইনালে ইতিহাস পেপারে সে ফেল করেছিল। তাই বোধহয় জানত না তার পূর্বজমানায়, ১৩০ বছর পূর্বেকার ইতিহাস : বিশ্বজয়ী নেপোলিয়ানের পতনের কথা। লিও টলস্টয়ের ‘যুদ্ধ ও শান্তি’ মহাগ্রন্থটা হয়তো তার পড়া ছিল না। ইতিহাস নিজের পুনরাবৃত্তি। নেপোলিয়ান হেরে গিয়েছিলেন জার নিকোলাসের কাছে নয়, রাশিয়ার দরন্ত শীতের কাছে। নেপোলিয়ান মস্কো দখল করেছিলেন, কিন্তু রাশিয়াকে পদানত করতে পারেননি। রাশিয়ান বাহিনী সরে গিয়েছিল আরও উত্তর-পূর্বে। মস্কোজয়ী নেপোলিয়ান ফ্রান্সে প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হয়েছিলেন হতসর্বস্ব হয়ে। যাত্রামুহূর্তে তাঁর সৈন্যসংখ্যা ছিল পৌনে সাত লক্ষ; আর ১৮১২ সালের শীতকালে ফ্রান্সে ফিরে আসে মাত্র ত্রিশ হাজার রণক্লান্ত মূন্যু মানুষ।

ইতিহাস নিজের পুনরাবৃত্তি। ‘ব্যাটল অফ ব্রিটেন’ যখন চরমে—জার্মান সৈন্য গ্রেট ব্রিটেনের কোনো প্রান্তে সৈন্য নামাতে পারছে না, আর লাফতাক লন্ডনে ক্রমাগত

বোমাবৰ্ষণ করে চলেছে, তখন হিটলার-মুসোলিনীৰ সংযুক্ত অক্ষশক্তি, ইউৰোপেৰ বৃকোদৰভাগ দখল করে আছে।

জুন, ১৯৪১-এ হিটলার আক্রমণ করে বসল সোভিয়েত রাশিয়া। স্ট্যালিনেৰ সঙ্গে দুই বছৰ আগে যে অনাক্রমণাত্মক চুক্তিটি করা হয়েছিল, সেটাকে অনায়াসে হিটলার ছুঁড়ে ফেলে দিল ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িতে।

স্ট্যালিনগ্ৰাডেৰ শহরসীমান্তে উপনীত হতে হতেই শুরু হলো শীতের আক্রমণ। নেপোলিয়ান মস্কো জয় করেছিলেন, কিন্তু হিটলার স্ট্যালিনগ্ৰাড দখল করতে পারল না। যে পথ দিয়ে নেপোলিয়ানেৰ অশ্বারোহী বাহিনী নিকোলাস জাৰেৰ রাশিয়া আক্রমণ করেছিল সেই পথরেখা ধরেই এগিয়ে এসেছিল হিটলারেৰ অজেয় পানজার বাহিনী। কিন্তু রাশিয়ান সেনাপতিরা এবাৰ নিয়েছে অন্যজাতের রণনীতি :

ওরা যখন এগিয়ে আসবে তখন তোমরা পিছিয়ে যাবে। ওরা যখন পিছিয়ে যাবে তখন ওদের পিছন থেকে গেরিলা আক্রমণ করবে। যাতে ওরা মুখ ঘুরিয়ে আবার পুৰ্বমুখো ফিরে আসে। মনে রেখ, এ খণ্ডযুদ্ধে হিটলারও জিতবে না, জিতবে না রেড-আৰ্মিও। বিজয়ী হবে রাশিয়ান শীত। আশায় আশায় ওদের আটকে রাখ শীত শুরু হওয়া পর্যন্ত।

হিটলার লেনিনগ্ৰাড পর্যন্ত পৌছাতেই পারল না। শতকরা আশি-নব্বইভাগ সৈন্য ও সমরাস্ত্র হারিয়ে নাৎসি বাহিনী ফিরে এল জার্মানিতে।

ক্রোধাক্ষ হিটলার পরাজিত সবকয়টি সেনাপতিকে পদচ্যুত করে নিজেকেই ঘোষণা করল বাহিনীর সুপ্রীম কমান্ডার রূপে।

ঠিক একই সময়ে পৃথিবীর অপর প্রান্তে ঘটছিল আর একটি যুগান্তকারী ঘটনা, যাতে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে হিটলার। সাতই ডিসেম্বর, ৪১ সালে বিনা যুদ্ধঘোষণায় জাপানেৰ বিমানবাহিনী হাওয়াই দ্বীপে অবস্থিত পার্ল হারবার বন্দর আক্রমণ করে বসে। মাত্র দু-ঘণ্টার ভিতর আটটি মার্কিন নৌযুদ্ধের ব্যাটলশিপ, তিনটি ডেস্ট্রয়ার, তিনটি ক্রুজারকে জলমগ্ন করে। এয়ারফিল্ডে যতগুলি যুদ্ধবিমান ছিল, অতর্কিত আক্রমণে সবগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। নৌবন্দরে মার্কিন সৈনিক যারা বিনাৱণে প্রাণ দেয় তার সংখ্যা ২৩২৩। [প্রসঙ্গত এগারই সেপ্টেম্বর, ২০০১-এ সন্তাসবাদীদের নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটনে অতর্কিত আক্রমণে নিহতের সংখ্যা ২৮০১]।

পরদিন, ৮.১২.১৯৪১-এ প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট জাপানেৰ বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং তার তিনদিন পরে এগারো তারিখে জার্মানি ও ইতালি যুদ্ধ ঘোষণা করে আমেরিকার বিরুদ্ধে।

প্রায় এক বছর পরে—৮.১১.১৯৪২-এ ব্রিটিশ এবং আমেরিকার বাহিনী উত্তর আফ্রিকার আলজেরিয়া আর মরক্কোতে অবতরণ করতে সক্ষম হলো। প্রথমবার্থায় ফিল্ড

মার্শাল রোমেলের বাহিনীর কাছে জেনারেল আইসেনহাওয়ার-বাহিনীর পরাজয় ঘটে। দুর্ধর্ষ রোমেলকে বলা হতো ‘ডেজার্ট ফক্স’। নাৎসি বাহিনীর তিনি সবচেয়ে প্রিয় সর্বকনিষ্ঠ তরুণ যুদ্ধবিশারদ। লিবিয়ার কাছে কামেরাইন গিরিবর্ষের যুদ্ধে রোমেলের হাতে চূড়ান্তভাবে পরাজিত হন আইসেনহাওয়ার। কিন্তু তারপরই নতুন বাহিনী নিয়ে অপর দিক থেকে মিত্রশক্তির জেনারেল প্যাটন রোমেলের অগ্রগতি রুখে দিতে সক্ষম হন। এ সংবাদে ক্ষিপ্ত হয়ে হিটলার তলব করে ফিল্ড মার্শাল রোমেলকে। তাঁকে বদলি করে দেওয়া হয় ফ্রান্সের উত্তর-উপকূলে—নর্ম্যাণ্ডিতে। তার ফলে প্যাটন ও ফিল্ড মার্শাল মন্টগোমারি উত্তর আফ্রিকায় একের পর এক যুদ্ধ জয় করে চলেন।

মে ১৯৪৩-এর পর উত্তর আফ্রিকায় নাৎসি বাহিনীর কোনও অস্তিত্ব ছিল না।

ফিল্ড মার্শাল রোমেলের পরিণতিটি বড় করুণ। মিত্রশক্তির হাতে একটি যুদ্ধে রোমেল পরাজিত হওয়ায় হিটলার তাঁকে বদলি করে দিল নর্ম্যাণ্ডিতে। তার ফলে ঘটল দু-দুটি দুর্ঘটনা। প্রথমটির কথা আগেই বলেছি। ‘ডেজার্ট ফক্সের’ অনুপস্থিতিতে আফ্রিকা রণাঙ্গন অচিরেই চলে গেল মিত্রবাহিনীর হাতে। দ্বিতীয় ঘটনাটি করুণতর। বিশ্বযুদ্ধের অবসানে ন্যুরেনবার্গ বিচারকালে এ তথ্যটি উদ্ঘাটিত হয়। ফিল্ড মার্শাল রোমেল নূতন রণাঙ্গনে এসে তার রক্ষণব্যবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরিদর্শন করেন। তারপর সর্বাধিনায়কের কাছে একটি অত্যন্ত গোপন ও জরুরি রিপোর্ট পাঠিয়ে দেন। তাতে বলা হয়েছিল, নর্ম্যাণ্ডি উপকূলের রক্ষণব্যবস্থা পর্যাপ্ত নয়। আশঙ্কা করা হয়েছিল ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে এই পথেই মিত্রশক্তির প্রতি-আক্রমণ হতে পারে। ফ্যুরার এই রিপোর্টটি পাঠ করে রীতিমতো ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। অনতিবিলম্বে একটি শো-কজ নোটিস পান রোমেল। তাতে অভিযোগ করা হয়েছিল : সর্বাধিনায়কের পদলাভের স্বপ্ন দেখে রোমেল নাকি ইতিপূর্বে-সংঘটিত হিটলার হত্যার একটি ব্যর্থ অভিযানের নিয়ামক। রোমেলের প্রতি ফ্যুরারের আদেশ এসে গেল অচিরেই : হয় গোপন কোর্ট মার্শালে আত্মপক্ষ সমর্থন করে ফিল্ড-মার্শাল রোমেলকে প্রমাণ করতে হবে তিনি নির্দোষ অথবা এ বিচার এড়িয়ে যেতে বিষপানে তিনি আত্মহত্যা করতে পারেন। রোমেল জানতেন, তিনি নির্দোষ—ওই ষড়যন্ত্রের ধারে কাছে তিনি ছিলেন না। তাই সেই মর্মে চিঠি লিখলেন, কিন্তু পত্রটি তিনি হিটলারকে পাঠাতে পারেননি। কারণ উপরমহলের তাঁর এক বিশ্বস্ত বন্ধু জানিয়েছে, হিটলারের গোপন নির্দেশ ছিল : রোমেল বিষপানে আত্মহত্যা অস্বীকৃত হলে তাঁর স্ত্রী ও পুত্রকে গেস্টাপো বাহিনী গোপনে অপহরণ ও হত্যা করবে।

বিষপানে রোমেল আত্মহত্যা করেন ১৯৪৪-এর ফেব্রুয়ারিতে। আর নর্ম্যাণ্ডি উপকূলে ব্রিটিশ ও মার্কিন সেনাদল অবতরণ করল চারমাস পরে, ৬.৬.১৯৪৪-এ যাকে বলা হয় ডি-ডে।

এদিকে হিটলারের সহকর্মী ও বন্ধু মুসোলিনী নিজরাজ্যে অত্যন্ত অপ্রিয় হয়ে উঠেছেন। ইতালির মানুষ বুঝতে শুরু করেছে মুসোলিনী গোটা দেশটাকে অনিবার্য মৃত্যুর দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছেন। হিটলার ছিল জার্মানির সর্বময় কর্তা, ইতালিতে কিন্তু মুসোলিনী ছিলেন রাজা ইম্যানুয়েল দ্য থার্ডের অধীনে এক ডিকটের। অবস্থা বেগতিক বুঝে রাজা ইম্যানুয়েল মুসোলিনীকে গ্রেপ্তারের আদেশ দিলেন। মুসোলিনীর ধারণা ছিল সৈন্যদলে তাঁর অসীম প্রভাব—প্রত্যেকটি সেনাপতি তাঁর অঙ্গুলিহেলনে চলে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল মুসোলিনীকে যখন গ্রেপ্তার করে কারাগারে নিক্ষেপ করা হলো তখন সৈন্যদলে কোনো প্রতিবাদ জাগল না। ইতালির রাজা এই সময়ে জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে বসেন। অর্থাৎ মিত্রশক্তির প্রিয়পাত্র হতে চাইলেন। ইতিমধ্যে সিসিলি দ্বীপ চলে এসেছে মিত্রপক্ষের দখলে। রোমের পতন আসন্ন। হিটলারের প্যারিট্রুপার্স বাহিনী এই সময় রোমের কারাগার থেকে মুসোলিনীকে উদ্ধার করে। কিন্তু রোমের পতন ঠেকানো গেল না। রোমের পতন হলো চোঁঠা জুন, 1944—অর্থাৎ নর্ম্যান্ডি উপকূলে মিত্রশক্তির অবতরণের মাত্র আটচল্লিশ ঘণ্টা আগে।

ইতালির সাধারণ মানুষ সদ্য-উদ্ধারপ্রাপ্ত মুসোলিনীকে নাৎসি প্যারিট্রুপার্স বাহিনীর কবল থেকে ছিনিয়ে নিল। প্রকাশ্য মাঠের মাঝখানে একটি ওক গাছের ডাল থেকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিল ইতালির এতদিনের ভাগ্যবিধাতাকে।

এবার শুরু হলো মিত্রশক্তির সংযুক্ত অভিযান—বার্লিন-মুখো। জার্মানির পূর্বদিক থেকে রাশিয়ার লালফৌজ আর পশ্চিম দিকে নর্ম্যান্ডি উপকূল থেকে মার্কিন ও ব্রিটিশের মিলিত আক্রমণ। হিটলার, তার বান্ধবী তথ্য জীবনসঙ্গিনী এফা ব্রন এবং কয়েকজন উচ্চ পর্যায়ের জেনারেল আশ্রয় নিলেন বার্লিন-বুঙ্কারে। যে থার্ড রাইশ্ সহস্র বৎসরাধিককাল সগর্বে টিকে থাকার ঘোষণা করেছিল তা দশ বৎসরও টিকল না। বিষপানে হিটলার বান্ধবের ভিতর আত্মহত্যা করল ত্রিশে এপ্রিল, 1945।

হিটলারের চরিত্রের এক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে : সে কাউকে বিশ্বাস করত না। নিজে অবৈধভাবে ক্ষমতালাভ করায় সে সবাইকে সন্দেহের চোখে দেখত। তাকে সর্বক্ষণ ঘিরে থাকত ‘জো-হুজুর’ জেনারেল-মোসায়েবরা। যেমন উইলহেম কিটেল, ফন রিবেনট্রপ, আলফ্রেড যোডল, বোরম্যান। গোয়েরিঙ, রোমেল প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর সেনাপতিদেরও হিটলার অন্তর থেকে বিশ্বাস করত না। নাৎসি শাসনের স্বর্ণযুগে 1941 সালের গ্রীষ্মকালে হিটলারের বাহিনীতে ছিলেন সতেরজন ফিল্ড-মার্শাল। তার ভিতর যোলোজনকে হিটলারের আদেশে পদচ্যুত, হত্যা অথবা আত্মহত্যা বাধ্য করা হয়। যুদ্ধান্তে নাৎসি বাহিনীতে টিকে ছিলেন মাত্র একজন ফিল্ড-মার্শাল। তার ফাঁসি হয় ন্যুরেমবার্গ বিচারে।

পৃথিবীর ইতিহাসে অসহায় মানুষের উপর প্রবলের অত্যাচারের নানান বীভৎস নজির আছে। আদি যুগে মিশরীয় অসভ্যতা থেকে মধ্যযুগে আমেরিকার টমকাকার কুটিরে।

কিন্তু হিটলার জমানায় নাৎসি অত্যাচারের বীভৎসতা এবং অমানবিকতা তিনটি হেতুতে নাজিরবিহীন। এক : ব্যাপকতায়, সংখ্যাধিক্যে। দুই : বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিবিদ্যার রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থাপনায়। তিন : উদ্দেশ্যে।

মিশরে ক্রীতদাসদের উপর অমানুষিক অত্যাচার হয়েছে, হয়েছে আদিম যুগে নিগ্রো-ক্রীতদাসদের উপর উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায়—কিন্তু তারা অত্যাচারিতদের জাতিগতভাবে ধ্বংস করার কোনো পরিকল্পনা করেনি। তাদের দিয়ে নিষ্ঠুরভাবে কাজ করিয়ে নিয়েছে অমানুষিক অত্যাচারের মাধ্যমে।

অপরপক্ষে হিটলার চেয়েছিল : যাবজ্জীবন ইহুদিরা জার্মানির সমর প্রচেষ্টায় মদৎ দেবে—তারপর দেহ অশক্ত হয়ে পড়লে জাতিগতভাবে প্রাণদান করবে। রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণে নাৎসি ব্যবস্থাপনায় যেভাবে গ্যাস-চেম্বার বা ইনসিনিরেটর নির্মিত হয়েছে তেমনটি কোনো যুগে, কোনো কালে হয়েছে বলে জানি না। অন্যত্রও বিচারের বাণী নীরবে, নিভৃতে কেঁদেছে, জালিয়ানওয়ালাবাগে, হিজলি জেল -এ। তরুণ বালক মরেছে পাথরে নিষ্পল মাথা কুটে—কিন্তু তার হেতু শাসকের দৃষ্টিতে তারা ছিল প্রতিবাদী শক্তি। নির্বিরোধী আবালবৃদ্ধবনিতার এমন সুপরিকল্পিত গণহত্যা নয়। হিটলার যেভাবে বিশ্বযুদ্ধের উদ্যোগপর্বে ইহুদিনিধন যজ্ঞের পরিকল্পনা করেছিল—তার দ্বাদশজন অত্যন্ত বিশ্বস্ত অনুগামীদের সঙ্গে মিটিং করে—ঘেটো নির্মাণ, বাধ্যতামূলক শ্রমজীবী ইহুদি ক্রীতদাস সৃজন, কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প, গ্যাস-চেম্বার এবং ইনসিনিরেটরের সুপরিকল্পিত প্রোগ্রাম করে রাষ্ট্রের উদ্যোগ ও নিয়ন্ত্রণে যেভাবে গণহত্যা চালিয়ে যায় তা—আবার বলি—মানবেতিহাসে নাজিরবিহীন।

*

*

*

নাৎসি অধিকৃত ইয়োরোপ ছিল এক বিশাল ক্রীতদাস-সাম্রাজ্য। ক্ষেতে-খামারে, কারখানায়, নানা প্রতিষ্ঠানে কাজ করত ক্রীতদাসের দল। বিনা পারিশ্রমিকে। উদয়াস্ত খাটতে হতো তাদের। দিনান্তে এক কাপ জলবৎ-তরল নিরামিষ সুপ আর একটুকরো পাঁউরুটি। প্রাণটি রাখার প্রয়োজনে। যেন দিনান্তে বলদ-জোড়ার প্রাপ্য জাবনা। আগেই বলেছি, ক্ষমতায় এসেই হিটলার কী ভাবে ওদের ভাতে মেরেছিল। ইহুদিদের সামনে নাৎসি সরকার তুলে ধরল দুই জাতের বিকল্প। হয় জার্মান-অধিকৃত ভূখণ্ডের বাইরে পালিয়ে যাও, অথবা স্বীকার করে নাও আমৃত্যু ক্রীতদাসের জীবন। কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে এসে নাম লেখাও। প্রথম সড়কে যদি যেতে চাও, তাহলে সাত পুরুষের সঞ্চয়ের মায়া ত্যাগ করে যেতে হবে। তাই গিয়েছিলেন কয়েক লক্ষ মানুষ—অ্যালবার্ট আইনস্টাইন থেকে আনা ফ্রাঙ্কের বাবা, অটো ফ্রাঙ্ক। নিজে হাতে যে বাক্সটা বইতে পারবে অথবা ঠেলায় বসিয়ে ঠেলে নিয়ে যেতে পারবে তাই শুধু নিয়ে যেতে পার। তবে হ্যাঁ, বাক্সে যেন ভুল

করে হীরে-মণি-মুক্তো বা সোনাদানা না থাকে। তা থাকলে সেগুলো সীমান্তে কেড়ে নেওয়া হবে। সেগুলো তো নাৎসি জার্মানির সম্পত্তি। অবশ্য পাসপোর্ট যোগাড় করতে হলে নাৎসি হর্তাকর্তাদের খুশি করে যাওয়ার কথা। তা সর্বস্ব খুইয়ে যারা দেশত্যাগী হচ্ছে তাদের কাছে ওটা তো বোঝার উপর শাকের আঁটি।

যারা সাত পুরুষের ভিটের মায়া কাটাতে পারল না তাদের মহল্লায় বারে বারে হানা দিল গেস্টাপো বাহিনী। নাৎসি অভিধানে সে অভিযানের নাম Aktion! বেয়নেট উঁচিয়ে, হিংস্র পুলিশ-কুকুর লেলিয়ে বন্দুকের গুঁতো ডানেবাঁয়ে চালাতে চালাতে। মানুষকে মুহূর্ত মধ্যে রাস্তায় নামানো হতো। চিরজীবনের মতো বাস্তবত্যাগ করে যাবার আগে একটুও সময় পেত না। সারি সারি ট্রাকে গাদাবন্দি হতভাগ্যদের এনে ফেলা হলো ‘জুইশ ঘেটো’য়। কাঁটা-তারে ঘেরা এক-একটা মুহল্লা। কিছু বশংবদ ইহুদি-নেতাকে একত্র করে গঠিত হলো এক-একটি জুডেনরাট (Judenrat = ঘেটো কাউন্সেল)। ঘেটোর কোনো বাসিন্দা যদি সাময়িকভাবে পুণ্য আর্থভূমিতে আসতে চায়—সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্তকালে—তাহলে ওই জুডেনরাট তাদের সাময়িক পারমিট দিতে পারবে। অবশ্য সূর্যাস্তের আগেই তাদের বন্দিশালা—অর্থাৎ খাঁচায় ফিরে আসতে হবে।

এ ছাড়া প্রত্যেকের বাঁ হাতে ধারণ করতে হবে একটি বিশেষ সনাক্তিকরণচিহ্ন। হলুদ রঙের চওড়া ফেট্রি, তার মাঝখানে কালো কালিতে আঁকা আদি পুরুষ ডেভিডের ঢাল। দুটি সমবাহু ত্রিভুজ, একে অপরের গায়ে চাপানো। পুরুষ-স্ত্রী, বুড়োবাচ্চা সববাইকে। যাতে দূর থেকে উচ্চবর্ণের নাৎসি আর্থরা সমঝে নিতে পারে—ওটা মানুষ নয়—জু।

কয়েকদিন পরে ঘেটোতে ঘটে দু-নশ্বর Aktion; অতর্কিতে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে দু-পাঁচশ নরনারীকে ধরে ট্রাকে করে কোথায় যেন নিয়ে যায়। জুডেনরাটের কর্তব্যাক্তিরা বুঝিয়ে বলেন : পোল্যান্ডের পূর্বপ্রান্তে হিটলার সৃষ্টি করেছেন ইহুদিদের খাস-তালুক। সেই যার সন্ধানে কয়েক হাজার বছর আগে আফ্রিকা থেকে সিনাই পর্বতের দিকে রওনা দিয়েছিলেন আব্রাহাম, মোজেস : ইহুদিদের প্রমিস্‌ড ল্যান্ড!

শুনে কেউ কেউ আশ্বস্ত হয়। বলে, ভাল, ভাল, অ্যাডমিনে তাহলে এই হতভাগাদের একটা হিল্লো হতে চলেছে। কেউ বলে, বেশ তো, সে কথা বুঝিয়ে বললেই হয়। ‘প্রমিস্‌ড ল্যান্ড’-এ যেতে তো আমাদের আপত্তি নেই। তাহলে এমন কুকুর লেলিয়ে দেবার মানেকী কী?

কিন্তু একটা কথা! যারা যায় তাদের কেউ আর ফিরে আসে না। তারা চিঠিপত্রও লেখে না। তাদের কোনো খবরই আর পাওয়া যায় না। কেন গো?

ডাকহরকরার বৃত্তিতে কলম ধরেছি। কোরচখ-ডাকঘরের অনেক চিঠি বিলি করতে হবে। লেফাফার উপর বিচিত্র সব নাম। সবাই বাস্তব। রক্ত-মাংসের সত্যিকারের মানুষ। দু-একটি ক্ষেত্রে নাম পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছি, কখনো বা দু-তিনজনের অভিজ্ঞতা

একজনের চরিত্রে আরোপিত। কিন্তু সত্যের লক্ষণগণ্ডি আমি কোথাও সজ্ঞানে অতিক্রম করিনি। একটা ব্যাপারে ক্ষমা চেয়ে নিতে চাই। কথাসাহিত্যের প্রচলিত রীতি উপন্যাসবর্ণিত চরিত্রের পরিণতিতে রকমফের হওয়া চাই। কেউ শেষমেশ হবে আমীর, কেউ ফকির। আমার ক্ষেত্রে তা হবার জো নেই। আমার হাত-পা বাঁধা। এ পৌনঃপুনিকতা দোষের জন্য আমার কলমের দোষ নেই। এ অপরাধ নাৎসি দর্শনের, হিটলারের, হয়তো বা মহাকালের।

জানুস কোরচখ, তাঁর হুদ্দিনীশক্তি স্টেফানিয়া, তাঁর সহকর্মীর দল—ব্লচ, বালরিখ, নাটালিয়া, ডেভিডস, রোজা, আব্রাসা সকলেরই সেই একই অস্তিম পরিণতি। নোবেল-লরিয়েট এলি উইজেল-এর বাবা, মা, ছোটবোন এজিপারা; আনা ফ্রাঙ্ক, তার দিদি মার্গিট, তার মা এডিৎ, তাকে যে ছেলেটি সারাজীবনে একবার মাত্র চুষনের স্বাদ উপহার দিয়েছিল সেই পিটার, সবাই সবাই গডালিকাপ্রবাহে শেষ হয়েছে : গ্যাস-চেম্বারে!

না! ভুল হলো। প্রায় এক কোটি মানুষকে হত্যা করেও হিটলার জুডাইসমকে শেষ করতে পারেনি। অনেক-অনেক মানুষ ফিরে এসেছিল গ্যাস-চেম্বার থেকে। অ্যালিসিয়া, রেবেকা, উইজেনহুল, এলি উইজেল। যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে। ১৯৪৬ সালে উইজেল শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। নিতান্ত আশ্চর্যের কথা : এই রচনা শুরু করার পরবর্তীকালে, মাত্র গত সপ্তাহে জানতে পারলাম আর একজন লেখকের নাম : ইমরে কার্তেজ। তিনি এ বছর—হ্যাঁ, এই ২০০২ সালে—তাঁর ভাগ্যহীন গ্রন্থের জন্য সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। তিনি সাহিত্যে প্রথম নোবেলজয়ী হাঙ্গেরিয়ান সাহিত্যিক। কৈশোরে যেটো থেকে যেতে হয়েছিল গ্যাস-চেম্বারে। ‘ভাগ্যহীন’ না হওয়ায় মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসে এতদিনে নোবেল লরিয়েট হলেন! এঁদের বিষয়ে নানান তথ্য সংগ্রহ করেছি। আপনাদের সঙ্গে ভাগ্যভাগি করব বলে। রেবেকা রথচাইল্ড-এর সাক্ষাৎকার পর্যন্ত নিয়ে এসেছি। মিস রথচাইল্ডও গ্যাস-চেম্বারে যমের দক্ষিণদুয়ার দেখে এসেছেন। নিতান্ত ঘটনাচক্রে সাক্ষাৎ পেলাম তাঁর।

আমার নাতনি নীনাকে তার সহপাঠী বরিস জিজ্ঞেস করেছিল, তোমার ‘দিয়াদুস্কা’ সারাদিন কী এত লেখেন?

নীনা তাকে বুঝিয়ে বলেছিল—তার দিয়াদুস্কা একজন লেখক। বর্তমানে নাৎসি জার্মানির ইহুদিনিধন মহাযজ্ঞের উপর কী যেন লিখছেন।

—রিয়ালি? তাহলে তো তাঁকে একদিন আমাদের সিনাগগে নিয়ে যেতে হয়।

সে কথা শুনে নীনার দিয়াদুস্কা তো একপায়ে খাড়া। বরিস ধর্মে ইহুদি। সে আমাদের দুজনকে সানফ্রান্সিস্কো সিনাগগে নিয়ে গেছিল—এক শনিবারে, সাবাথ সার্ভিসে। খ্রিস্টানদের সাবাথ রবিবারে। ইহুদিদের সাবাথ শুরু হয় শুক্রবারের সূর্যাস্তকালে, শেষ হয় শনিবার সূর্যাস্তে। রবিবারে নয়।

ইহুদি ধর্ম বা Judaism আজকের পৃথিবীতে প্রায় দেড়কোটি মানুষের ধর্ম। পশ্চিম গোলার্ধের প্রাচীনতম ধর্ম। এই ধর্মই পশ্চিম গোলার্ধকে সর্বপ্রথম শিখিয়েছিল : ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়। পার্থক্য যতই থাক, খ্রিস্টধর্ম ও ইসলামের একেশ্বরবাদিতার মূল উৎস এই Judaism.

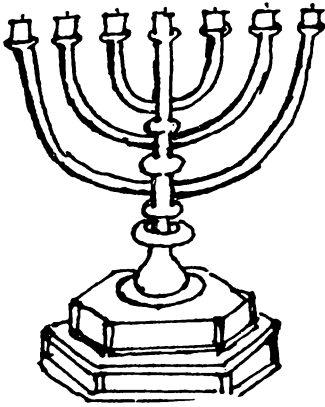
ইহুদি ধর্মে যারা দীক্ষিত নয়, তারাও সাবাথ প্রার্থনায় যোগ দিতে পারে। আমি আর নীনা হিন্দু হওয়া সত্ত্বেও ওঁদের সাবাথ-সার্ভিসে উপস্থিত হতে পারলাম। শুধু পুরুষ হবার জন্য আমার মাথায় একটি আচ্ছাদন দিতে হলো। ছোট্ট ‘স্কাল-ক্যাপ’। তাকে বলে ‘কীপা’।

ভূমি-নকশার স্থাপত্য বিচারে সিনাগগ রোমান ব্যাসিলিকা অথবা মধ্যযুগের গীর্জার অনুরণে। না, ভুল হলো। বরং বলা উচিত : রোমান ব্যাসিলিকা অথবা চার্চের ভূমি-নকশা গড়ে উঠেছে পূর্ববর্তী ধর্ম ইহুদিদের সিনাগগ অনুরণে। মোট কথা মাঝখানে চওড়া ‘নেইভ’, তার দু-পাশে চার-চার ভর্ত্তির উপবেশনের উপযুক্ত ‘পিউ’। তার ওপাশে ‘আইল’। সামনে অলটার। যেখানে দণ্ডায়মান হয়ে মন্দির পুরোহিত (ক্যান্টর = Cantor) প্রার্থনা পরিচালনা করেন। বস্ত্রত সানফ্রান্সিস্কো সিনাগগে আছে দু-পাশে দুটি লেকটার্ন (দণ্ডায়মান স্ট্যান্ড ও মাইক্রোফোন)। একপাশে একজন পুরুষ ক্যান্টর, অপরপাশে একজন মহিলা পুরোহিত মস্ত্রোচ্চারণ করছিলেন। ‘তালমুদ’ (Talmud) গ্রন্থ থেকে বিভিন্ন ‘তোরা’ (Torah) বা প্রার্থনা গাথা। বিভিন্ন ‘পিউ’তে উপবিষ্ট ইহুদি ভক্ত তাঁদের হস্তধৃত তোরা-সংকলন গ্রন্থ দেখে দেখে ক্যান্টরের সঙ্গে প্রার্থনামন্ত্রে গলা মেলাচ্ছিলেন। গ্রন্থটি বিরাট—সুমুদ্রিত। সিনাগগের প্রবেশপথে স্তূপীকৃত রাখা আছে। এক একটি নিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করা যায়, প্রত্যাবর্তনের সময় সেখানে ফেরত দিয়ে আসার কথা। গ্রন্থটি রয়্যালসাইজ, প্রায় সাতশ পৃষ্ঠার। ডান দিকে হিব্রু হরফে তোরা-মন্ত্র মুদ্রিত, বাঁ দিকের পৃষ্ঠায় দুটি স্তম্ভ। একটিতে ইংরাজি হরফে উচ্চারণ-অনুসারে (ফোনেটিকালি) প্রার্থনা মন্ত্রগুলি মুদ্রিত, অপর স্তম্ভে তার আক্ষরিক অনুবাদ ইংরাজিতে :

“Yisgaddal, Veyiskaddash, Shemay Rabbah.”

সামনের অলটারে দু’পাশে দুজন ক্যান্টর পর্যায়ক্রমে মন্ত্রগুলি পাঠ করে যাচ্ছেন, এবং সমবেত ভক্তবৃন্দ ঈশ্বরের সেই মহিমাগাথা উচ্চারণ করছেন—পুরুষ-স্ত্রী, সমবেতভাবে। দুই ক্যান্টরের মাঝখানে প্রকাণ্ড একটি ‘মেনোরা’ (The Menorah)। কারবাইড গ্যাসের সাতমুখো বাতির মতো।

এ যেন পঞ্চপ্রদীপের অনুরূপ একটি সপ্তপ্রদীপ। না, পঞ্চপ্রদীপ নয়, সেটা তো হিন্দুধর্মের পূজারতির এক উপকরণ মাত্র। মেনোরা পূর্ণ পবিত্রতার প্রতীক। আমাদের কাছে যেমন শালগ্রাম শিলা বা শিবলিঙ্গ, মুসলমানের কাছ যেমন কিবলা চিহ্ন। এ প্রতীকের ঐতিহ্য শিবলিঙ্গের সমান—অন্তত পাঁচ হাজার বছরের।



মেনোরা

বরিস নীনার সহপাঠী—নীনার সঙ্গে স্কুলের গ্র্যাজুয়েশন শেষ করে দুজনেই স্কলারশিপ পেয়েছে। লস্ এঞ্জেলস যাচ্ছে। ওখানে U.C.L.A.-তে দুজনে একসঙ্গে কলেজে পড়বে। বরিস ওর মার্কিনমূলুকের নাম। পিতৃদত্ত নাম : বারোখ। হিব্রুভাষায় তার মানে ‘আশীর্বাদ’। যেমন বাংলায় নাম রাখা হয় : ‘আশিস’! ওর জন্ম সানফ্রান্সিস্কোতে—কিন্তু ওরা এসেছে রাশিয়ার দক্ষিণে ইউক্রেন অঞ্চল থেকে। ধর্মমতে ওরা জুইশ—জুড়াইজম্-এ বিশ্বাসী।

বরিসের কাছেই প্রথম শুনি মিড (Ms) রেবেকা রথচাইল্ডের কথা।

নীনাকে সে গল্পচ্ছলে বলেছিল, রেবেকা-আন্টি আমার বাবুস্কার (দিদার) বান্ধবী। তোমার দিয়াদুস্কার প্রায় সমবয়সী। তাঁর কাছে আমি হিব্রু শিখতে যেতাম। আমরা দু-তিনজন জুইশ-আমেরিকান ছাত্রছাত্রী। বিশ্বযুদ্ধ যখন শুরু হয় তখন রেবেকা-আন্টি ছিলেন ওয়ারসতে, পোল্যান্ডে। তখন তাঁর বয়স বারো-তেরো। হিটলারের বাহিনী পোল্যান্ড দখল করে প্রথমে তৈরি করে ওয়ারস ঘেটো। ওঁদের সপরিবারে আটক করে সেখানে। কিছুদিনের মধ্যে ঘেটো থেকে ওঁদের ধরে নিয়ে যায় কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে। শুনেছি সেখানে ‘এস. এস. সিলেকশনে’ রেবেকা-আন্টি আর তাঁর মা পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। দুজনকেই এস. এস. ডাক্তার নির্বাচন করেছিল : ‘অ্যানহিলিয়েশন গ্রুপে’! মা-মেয়ে দুজনকেই গ্যাস-চেম্বারে পাঠিয়ে দেয়। তারপর কি জানি কেমন করে তিনি জীবিতা ফিরে আসেন! ওঁরা ছিলেন রীতিমতো ধনী পরিবারের—বিখ্যাত রথচাইল্ড বংশের শরিক। বিশ্বযুদ্ধকালে ওঁর পরিবারের সবাইকে মৃত্যু বর্বরেরা হত্যা করে। বাবা, মা, দুই দাদা, এক ছোট ভাই! অথচ উনি জীবিতাবস্থায় বিশ্বযুদ্ধ পাড়ি দেন। প্রথমে যান ইজরেইল। পরে আসেন আমেরিকায়।

নীনা জানতে চেয়েছিল, উনি বিয়ে-থা করেননি?

—না। একেবারে একলা থাকেন। সানফ্রান্সিস্কোর একান্তে, প্রশান্ত মহাসাগরের ধারে। প্যাসিফিকা অ্যাপার্টমেন্ট হাউসে।

—কী করেন? সংসার চালান কী করে?

—যতদূর জানি, পৈত্রিক সম্পত্তি কিছু পাননি। তবে উনি অনেকগুলি ভাষা জানেন। অ্যাকাডেমিক ডিগ্রি না থাকলেও মার্কিনমূলুকে দো-ভাষীর জীবিকায় জীবনটা কাটিয়ে

গেলেন। বাবুস্কার কাছে শুনেছি, উনি আটটি ভাষায় কথা বলতে পারেন : পোলিশ, জার্মান, ফ্রেঞ্চ, ইংরেজি, রাশিয়ান, ইউক্রেনিয়ান, হিব্রু আর ইডিস।

বরিস ফোন করে জানল উনি দিন-সাতকের জন্য ওয়াশিংটনে গেছেন। কী একটা ইন্টারন্যাশনাল সেমিনারে দোভাষী হিসাবে কাজ করতে। সপ্তাহখানেক পরে উনি ফিরে এলে আবার চেষ্টা করা যাবে। ওঁর একটা ইন্টারভিউ নিতে পারলে আমার খুব সুবিধা। আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞানে তাহলে উনিই হবেন প্রথম এবং অদ্বিতীয় অত্যাচারিত মানুষ, যিনি হিটলার আয়োজিত মৃত্যুপুরী ‘গ্যাস-চেম্বারে’ পদার্পণ করা সত্ত্বেও এই যুদ্ধান্তর পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করতে পেরেছেন। হয়তো আমার আগে অনেকেই তাঁর ইন্টারভিউ নিয়েছে। হয়তো সেই মরণাস্তিক যন্ত্রণার ইতিকথা বলতে বলতে তিনি ক্লান্ত। হয়তো সে জীবনটা উনি ভুলে থাকতেই চান। উপায় নেই—তবু তাঁকে বিরক্ত করতে হবে!

ইতিমধ্যে আর এক কাণ্ড হলো। বে-এরিয়ার প্রবাসী বাঙালিরা আমাকে আমন্ত্রণ করে বসল একটি বক্তৃতা দিতে। কলকাতা থেকে আমি কিছু রঙিন স্বচ্ছ স্লাইড সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলাম;—‘তাজমহল’ ও ‘অজন্তা’ বিষয়ে। একদিন রবিবারের দুপুরে সেই স্লাইড দেখিয়ে তাঁদের কিছু বলতে হলো। যদিও সভায় উপস্থিত অধিকাংশই বাঙালি, তবু অনেকের জীবনসঙ্গী বা সঙ্গিনী আমেরিকান। তাছাড়া দ্বিতীয় প্রজন্মের প্রবাসী বাঙালির পুত্রকন্যারা আ-মরি বাংলাভাষায় জুং পায় না। অনেকে বোঝেই না। তাই ‘বক্তিমেন্টা’ দিতে হলো ইঞ্জিরিতে, যাতে আবার আমি জুং পাই না।

সেখানে মিজ রেবেকা রথচাইল্ডের প্রসঙ্গ উঠল। অনেকেই তাঁকে চেনেন। অনেকের পুত্রকন্যাকে তিনি বিভিন্ন ভাষা শিখিয়েছেন। অটল ঘোষ বলল, তার একমাত্র পুত্র প্রণব ওঁর কাছেই জার্মান ভাষা শিখেছে। অটলের সঙ্গে ওখানেই প্রথম আলাপ। বি. ই. কলেজ সূত্রে জুনিয়ার হওয়ায় আমার ছোটভাই। ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করার পরেও অটল আইন পাস করেছে। কোন এক খানদানি ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মের আইন পরামর্শদাতা। প্রসঙ্গক্রমে সে রেবেকার বিষয়ে এক বিচিত্র কাহিনী শোনা। না, গল্প নয়, সত্যি ঘটনা : মিজ রেবেকা রথচাইল্ডকে একবার ট্রাফিক পুলিশ টিকিট ধরিয়ে দিয়েছিল। অটল ছিল সে মামলায় মিজ রথচাইল্ডের লীগ্যাল কাউন্সেল।

রেবেকাকে টিকিট ধরানো হয়েছিল কারণ তিনি ধীর গতিতে গাড়ি চালাচ্ছিলেন। মসৃণ কংক্রিট সড়কের সেই লেনে নির্দেশ ছিল : *নিম্নতম গতিবেগ 35 মাইল/ঘণ্টা রাখিতে হইবেক।* উনি যাচ্ছিলেন 25 মাইলে। ওঁয়া-ওঁয়া করতে করতে ট্রাফিক পুলিশ এসে হাজির। সেখানে আরক্ষাপুংগবের সঙ্গে তাঁর কিছু বাগবিতণ্ডা হয়। ক্রোধাধ্বিত পুলিশ ওঁকে টিকিট ধরিয়ে দেয়। শুধু তাই নয়, একটা রসিদ ধরিয়ে দিয়ে ওঁর লাইসেন্স বাজেয়াপ্ত করে। নির্দেশ দেয়, চব্বিশ ঘণ্টার ভিতর তাঁকে গাড়ি গ্যারেজ করতে হবে। তারপর উনি আর গাড়ি চালাতে পারবেন না যতদিন না আদালত থেকে তাঁকে অনুমতি দেওয়া হচ্ছে।

এটা যে কতবড় শাস্তি তা বুঝতে পারবেন না যাঁরা আমেরিকার জীবনযাত্রা সম্বন্ধে অনবহিত। সেখানে ট্রাম-বাস-রিকশা নেই। বাড়ি থেকে দোকানপাট-বাজার, বাস-স্টেশন হয়তো পাঁচ সাত দশ মাইল দূরে। টেলিফোনে বন্ধুবান্ধবদের অনুরোধ করে ওঁকে বাজারহাট করতে হতো। গাড়ি না থাকায় উপার্জনও বন্ধ। যাই হোক দু-সপ্তাহ পরে আসামীরূপে কাঠগড়ায় উঠে দাঁড়াবার সৌভাগ্য হলো।

ওঁর এক ছাত্র মামলার দিনটিতে ছুটি নিয়ে ওঁকে আদালতে পৌঁছে দিয়েছে। একটু পরে বিচারক আদালতকক্ষে প্রবেশ করলেন। সকলে উঠে দাঁড়াল। নকিব হয়তো ওঁর বয়সের কথা বিবেচনা করে দিনের প্রথম কাজ হিসাবে রেখেছিল বৃদ্ধার কেসটা।

জজ-সাহেব হাঁকলেন, ক্যালিফোর্নিয়ান স্টেট ভার্সেস মিজ রেবেকা রথচাইল্ড!

রেবেকা এগিয়ে গেলেন। লাঠি ঠুক ঠুক করতে করতে। ধর্মগ্রন্থ স্পর্শ করে যথারীতি শপথবাক্য পাঠ করলেন।

জজ জানতে চাইলেন, ইজ দ্য প্রসিকিউশন রেডি?

পাবলিক প্রসিকিউটার বব জনসন হাত তুলে বললেন, ইয়েস, ইয়ের অনার।

—ইজ দ্য ডিফেন্স রেডি অ্যাজ ওয়েল?

প্রতিবাদীর तरফে Herr Otto Gosh হাত তুলে বললেন, ইয়েস, ইয়ের অনার।

—অ্যান্ড দ্য জুরি?

হেড-ম্যান আব দ্য জুরি সকলের হয়ে জানালেন যে, তাঁরাও প্রস্তুত এবং তাঁদের সবাইকে ইতিপূর্বেই শপথবাক্য পাঠ করানো হয়েছে।

এই সময় প্রতিবাদী तरফের আইনজীবী—কাউন্সেল অটো গস জানালেন যে, তিনি প্রতিবাদীর ওকালতনামা দাখিল করেছেন বটে কিন্তু মিজ রথচাইল্ড নিজেই তাঁর ডিফেন্স আর্গ করবেন। উনি শুধু তাঁর লীগ্যাল অ্যাডভাইসার হিসাবে আদালতে সাহায্যকারী অফিসার।

জজ-সাহেব একটু বিস্মিতভাবে আসামীর কাছে জানতে চাইলেন, তিনি কি স্বয়ং নিজের কেস কনডাক্ট করতে ইচ্ছুক?

বৃদ্ধা উঠে দাঁড়িয়ে সবিনয়ে বললেন : উইথ ইয়ের কাইল্ড পারমিশন, ইয়ের অনার, ইয়েস!

জজ-সাহেব পি-পিকে বললেন : চার্জ শোনান—

পি. পি. চার্জ শোনার আগে সামান্য প্রিলিমিনারি বিশ্লেষণ করলেন : নির্দিষ্ট তারিখে নির্দিষ্ট সময়ে আসামী মিজ রেবেকা রথচাইল্ড তাঁর 'নিশান' গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিলেন ফ্রি-ওয়ের 24 নর্থের ডানদিকের লেন ধরে। ওরিন্ডার এক্সিট পয়েন্টের কাছাকাছি। যদিও ওখানে গাড়ির নিম্নতম গতিবেগ 35 মাইল প্রতিঘণ্টায় হবার কথা, তবু উনি যাচ্ছিলেন পঁচিশ মাইল বেগে। পেট্রোল-পুলিস ইগার স্টিভেন্স সেটা লক্ষ্য করে ওঁকে গাড়ি থামাতে

বলে। মিজ রেবেকা ডান পাশের এমার্জেন্সি পার্কিং লটে গাড়ি থামালেন। সার্জেন্ট ইগর স্টিভেন্স ওঁকে জানায় যে, ফ্রি-ওয়ের দক্ষিণতম লেনে পঁচিশ মাইল বেগে গাড়ি চালালে সমস্ত ট্রাফিক ধীরগতি হয়ে যাবে। সেটা অবাঞ্ছনীয়। উনি যেন এরপর গতিবেগ বৃদ্ধি করে চলেন। প্রতিবাদী পুলিশের এই আদেশ মেনে নিতে অস্বীকার করেন। তখন ইগর স্টিভেন্স বাধ্য হয়ে ওঁর ড্রাইভিং লাইসেন্স কেড়ে নেয়। এইটুকু প্রিলিমিনারি শুনিয়ে পি. পি. ট্রাফিক রুলস্-এর লঙ্ঘিত ধারার আইনমোতাবেক বয়ানটা শুনিয়ে দেন।

বিচারক মিজ রথচাইল্ডকে প্রশ্ন করেন, এবার আপনি বলুন, মিজ রথচাইল্ড, আপনার ‘প্লী’ কী? আর ইউ গিলটি অর নট গিলটি?

—আমি নির্দোষ, ইয়োর অনার।

—অলরাইট! পি. পি. আপনি আপনার প্রথম সাক্ষীকে ডাকতে পারেন।

প্রথম সাক্ষী ইন্সপেক্টর ইগর স্টিভেন্স। পি. পি. কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে সেইতিপূর্বে বর্ণিত ঘটনা পুনরায় পেশ করল। পি. পি. প্রশ্ন করেন, ইন্সপেক্টর স্টিভেন্স, আপনি কি প্রথমেই তাঁকে টিকিট ধরিয়ে দেন, না কি ওয়ার্নিং দেন?

—আমি প্রথমে ওঁকে সাবধানবাণী শোনাই। বুঝিয়ে বলি, ফ্রি-ওয়ে দিয়ে চলতে হলে পথের নিয়ম মেনে চলতে হবে। তিনি যেন ভবিষ্যতে ফ্রি-ওয়ে দিয়ে যাবার সময় দক্ষিণতম লেনে গতিবেগ ৩৫ রাখবার চেষ্টা করেন।

—উনি সে-কথা শুনে কী বললেন?

—উনি বললেন, উর্ধ্বতম গতিবেগটা ট্রাফিক পুলিশ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, কিন্তু নিম্নতম গতিবেগ হওয়া উচিত চালকের নিরাপত্তাবোধ মোতাবেক।

—আপনি তখন তাঁকে কী বলেছিলেন?

—আমি তখন তাঁকে বলেছিলাম—আইন কী হওয়া উচিত তা স্থির করেন আইনকর্তারা, আপনার-আমার কাজ হচ্ছে সেটা রক্ষা করে চলা। আপনি দয়া করে নিম্নতম গতিবেগ ৩৫ মাইলের কাছাকাছি রেখে চলবেন—বট্রিশ থেকে সাঁইট্রিশ!

—তখন উনি কী বললেন?

—উনি বললেন, ‘সরি অফিসার! সকলের নিরাপত্তার প্রয়োজনে আমি বিশ থেকে পঁচিশ মাইল বেগে চালাতে বাধ্য হতে পারি।’ তখন আমি তাঁকে বললাম, ‘তাহলে আপনি, নেক্সট এক্সিটে ফ্রি-ওয়ে ছেড়ে দিয়ে শহরের পথে ড্রাইভ করুন।’ উনি তাতে রাজী হলেন না।

পি. পি. এবার হের অটো গস-এর দিকে ফিরে বললেন, ইয়োর উইটনেস!

অটো গস প্রতিবাদীর দিকে তাকালেন। মিজ রেবেকা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, ইন্সপেক্টর! আপনার সঙ্গে আসামীর আর কোনো কথাবার্তা হয়েছিল কি?

—হ্যাঁ হয়েছিল। আপনি অনেক অবাস্তুর কথা বলেছিলেন। আমাদের কিছু তর্কাতর্কিও হয়েছিল। সে সব ইররেলিভেন্ট এবং ইম্মেটরিয়াল কথাবার্তা। আমি নোট করে রাখিনি, আমার মনেও নেই।

—আপনি তো জানতেন, আদালতে এসব প্রশ্ন উঠবে। আপনার স্মৃতিশক্তি যখন এতই দুর্বল তখন আপনি তা আপনার নোটবইতে লিখে রাখেননি কেন ?

—সে কথা আগেই বলেছি। আমার স্মৃতিশক্তি মোটেই দুর্বল নয়, কিন্তু আমার মতে সে-সব তর্কাতর্কি ইররেলিভেন্ট। অপ্রাসঙ্গিক। তাই তা লিখে রাখিনি।

—অলরাইট! আমি বরং আপনাকে কিছু সাহায্য করি। দেখুন, আপনার দুর্বল স্মৃতিশক্তি জাগ্রত হয় কি না। আমি আপনাকে প্রশ্ন করেছিলাম, বাঁ-হাতে স্টিয়ারিং আর ডান-হাতে সেলফোন ধরে কথা বলতে বলতে ফ্রি-ওয়েতে লেন চেঞ্জ করা কি আইনসম্মত ? তাই না ?

—হ্যাঁ, ওই জাতীয় কী একটা অবাস্তুর প্রশ্ন আপনি করেছিলেন বটে।

—জবাবে আপনি কী বলেছিলেন সেটা কি মনে আছে ?

—না, নেই!

—অথচ আপনার মতে আপনার স্মৃতিশক্তি দুর্বল নয়। অলরাইট ! আমি মনে করিয়ে দিচ্ছি। আপনি বলেছিলেন, ‘অন্য লোকে কী ভাবে গাড়ি চালাচ্ছে না দেখে বরং রোড-সাইনগুলো পড়বার চেষ্টা করুন।’ কী ? মনে পড়ছে ?

পি. পি. এই সময় আপত্তি দাখিল করেন, অবজেকশন, ইয়োর অনার ! ইররেলিভেন্ট অ্যান্ড ইম্মেটরিয়াল !

বিচারক বলেন, সাসটেইন্ড! আপনি অন্য প্রশ্ন করুন, মিজ রেবেকা !

—অলরাইট ইয়োর অনার।

তারপর সাক্ষীর দিকে ফিরে রেবেকা বলেন, এরপর আমি আপনাকে প্রশ্ন করেছিলাম, ‘কোলের উপর গার্লফ্রেন্ডকে বসিয়ে এক হাতে স্টিয়ারিং এবং অপর হাতে বান্ধবীকে ‘পঙ্গ’ করতে করতে ফ্রি-ওয়েতে গাড়ি চালালে কোনও ট্রাফিক রুল্‌স্‌ ভায়োলেট হয় কি ?’ আর আপনি তার জবাবে বলেছিলেন—’

পি. পি. তড়াক করে উঠে দাঁড়ান : অবজেকশন! অন দ্য সেম গ্রাউন্ডস! শী ইজ এক্সটেন্ডিং দ্য ক্রস-একজামিনেশন টু এ ফ্রিভলাস লিমিট !

জজ একটু সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বলেন, মিজ রথচাইল্ড! এসব প্রশ্ন আপনি কেন করছেন তা আদালতকে একটু বুঝিয়ে বলবেন কি ?

রেবেকা বিচারকের দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে বলেন, ইয়েস ইয়োর অনার। বলব। সেদিন আমি যখন পঁয়ত্রিশ মাইল স্পীডে যাচ্ছিলাম, তখন আমার পাশ দিয়ে পরপর দুটি গাড়ি আমাকে অতিক্রম করে গেল। দুজনেই টিন-এজার। প্রথমটি অ্যাডোলেসেন্ট মেয়ে,

সেলফোনে কার সঙ্গে কথা বলতে বলতে লাইন ট্রাস করল। দ্বিতীয়জন একটি টিন-এজার বয়। তার গার্লফ্রেন্ডকে কোলে বসিয়ে ড্রাইভ করছিল। আমি বাধ্য হয়ে আমার স্পীড কমিয়ে দিলাম। আমি ইন্সপেক্টর ইগর স্টিভেন্সের কাছে জানতে চেয়েছিলাম.....

জজসাহেব তাঁকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বলেন, এনাফ! দ্য অবজেকশন ইজ ওভারক্লন্ড। ইউ মে আনসার দ্য কোশ্চেন ইন্সপেক্টর ইগর স্টিভেন্স!

সার্জেন্টের ব্রিক-রেড মুখটা ক্রিমসন-রেড হয়ে উঠেছে। কিন্তু তাকে জবাব দিতে হলো না, কারণ তার আগেই মিজ রেবেকা বলে ওঠেন, উইথ ইয়োর কাইন্ড পারমিশন, ইয়োর অনার, আয়াম উইথড্রইং মাই কোয়েশ্চন। কারণ এই অবকাশে আমি আপনাকে জানাতে চাই,—আপনি অনুমতি করলে আমি ‘প্লী’-টা পরিবর্তন করতে ইচ্ছুক। না, ‘নট গিলটি’ নয়, আমি স্বীকার করছি, ‘আমি গিলটি’।

বিচারক বিস্মিত হয়ে বলেন, মামলার এই পর্যায়ে আপনি নিজেকে অপরাধী বলে মেনে নিচ্ছেন?

—ইয়েস! ইয়োর অনার।

বিচারক একটু ইতস্তত করে ডিফেন্স কাউন্সেলর হের অটো গসকে বলেন, আপনার এতে কোনো আপত্তি নেই?

—নান, হোয়াট সো এভার! ইটস হার প্রিভিলেজ! সম্ভবত মিজ রথচাইল্ড মিটিগেশনের জন্য কেসটা এই ‘ডক’ থেকে ‘আগু’ করতে চান—উইথ ইয়োর কাইন্ড পারমিশন অফ কোর্স!

মনে আছে, এখানে অটল ঘোষকে থামিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করেছিলাম ‘মিটিগেশন’ মানে কী?

অটল বললে, কী আপদ! ইদানীং বড় তাড়াতাড়ি লাইন চেঞ্জ করছেন, নারান্দা! বহুদিন ‘কাঁটা-সিরিজ’ বন্ধ আছে, তাই ভুলে গেছেন ‘মিটিগেশন’ কাকে বলে। মান মানে কচু-তে আপনার গল্পের নায়ক অশোক আর্কিটেক্ট কী করেছিল? মনে নেই?

আমার মনে পড়ে গেল। অপরাধ স্বীকার করে আসামী ‘মিটিগেট’ করতে পারে—অর্থাৎ যুক্তিতর্কে বিচারককে বোঝাবার চেষ্টা করতে পারে, কীভাবে ঘটনা-পরম্পরায় সে অনিচ্ছাকৃতভাবে আইন লঙ্ঘন করে বসেছে। তাই বলি, বুঝলাম। কিন্তু তুমি এত বিস্তারিতভাবে জানলে কেমন করে? তুমি কি সেদিন আদালতে উপস্থিত ছিলে?

অটল তার কলেজী-দাদাকে অ্যাডমনিশ করে বলে ওঠে, লে হালুয়া! আপনি ভুলে বসে আছেন? আমিই তো ছিলাম সে মামলায় ডিফেন্স কাউন্সেল!

তাই তো! সে কথাটাও ভুলে বসে আছি! শ্রীমান অটল ঘোষ আমার এক জার্মান ভাদ্দরবউকে ‘বে’ করে হয়ে গেছেন ‘হের অটো গস’! এস্তাই তো হোন্দাই রহুতা। এমনটা তো হয়েই থাকে। বারোখ্ যেমন স্টেটস্-এ এসে হয়েছে বরিস, আমার অনিন্দিতা কন্যাটি হয়েছে : ডিটা বাসু। অটল ঘোষ—বি. ই. কলেজের পাণ্ডিয়া-হস্টেলে হয়তো যে ছিল

‘বিচ্ছু’, ‘বোকচন্দ্র’, ‘বড়খোকা’ অথবা ‘পোলাপান’ ম্যারিকায় এসে সে হয়েছে : হের অটো গস্!

বলি, গল্পটা শেষ কর।

গুনলাম উপসংহারটাও।

—ইয়োর অনার! এটি একটি ট্রাফিক-ফ্লন্স ভায়োলেশনের কেস। মামলা চলাকালে আমি দেখিয়েছি একজন ল-অ্যাবাইডিং সাবধানী বয়স্কা ড্রাইভার কীভাবে দুর্ঘটনা এড়াতে চায় এবং অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরা কী বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালায়। আমি দেখিয়েছি, কী ভাবে ট্রাফিক পুলিশ সেই সাবধানী বৃদ্ধাকে হ্যারাস করে। তার লাইসেন্স কেড়ে নেয়। সে বাজার করতে পারছে না। তার উপার্জন বন্ধ, অসুস্থ হলে সে মেডিকেল এইড নিতে পারছে না—যদিও তার হেলথ ইন্সিওরেন্স করা আছে! পুলিশের কী বক্তব্য? দেশের যাঁরা শাসক তাঁরা যা আইন করেছেন, ওরা তা রোবোটের মতো কিংবা অন্ধছঁচোর মতো পালন করবে। আমার মতো বয়স্কা ল-অ্যাবাইডিং সিটিজেনকে দুর্ঘটনা এড়িয়ে যেতে সাহায্য করবে না।ইয়োর অনার! আমি নিজে যখন টিন-এজার ছিলাম, তখন আমি বাস করতাম ‘ওয়ারস-ঘেটোতে’। তখন নাৎসি এস. এস. পুলিশগুলোও ওই একই যুক্তি শোনাতো। বলত : থার্ড রাইব্ নির্ধারিত আইনে পুলিশ ইচ্ছামতো কুকুর অথবা জু-দের যখন-তখন হত্যা করতে পারে। তাই করত ওরা। আমি কোনোক্রমে বেঁচে ফিরে এসেছি।

পি. পি. আবার বলে ওঠেন : অবজেকশন, ইয়োর অনার! নাৎসি জার্মানির থার্ড রাইয়ের সঙ্গে এ মামলা সম্পর্কবর্জিত।

জজ-সাহেব সে কথায় কর্ণপাত না করে হঠাৎ বলে ওঠেন, জাস্ট অ! মিনিট! মিড রথচাইল্ড! আপনি কি মাস-তিনেক আগে বার্কলের ইন্টারন্যাশনাল অডিটোরিয়ামে একজনের ওভেশন-সভায় ইন্টারপ্রেটারের কাজ করেছিলেন—হিব্রু আর ইংলিশ ভাষায়?

ম্যাডাম রথচাইল্ড একটি বাও করে বলেন, ইয়েস, ইয়োর অনার। নোবেল-লরিয়েট এলি উইজেলকে সে সভায় বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. লিট দেওয়া হয়।

জজ-সাহেব পি. পি.র দিকে ফিরে বললেন, অবজেকশন ওভারব্লন্ড!

মোটকথা : বিচারক মিড রথচাইল্ডকে দোষী সাব্যস্ত করে মাত্র এক ডলার ফাইন করেন। ট্রাফিক পুলিশকে নির্দেশ দেন আসামীর লাইসেন্সটা প্রত্যাপণ করতে। সেখানেই থামলেন না তিনি। আরক্ষা বিভাগকে তিনি তীব্রভাষায় ‘অ্যাডমনিশ’ও করলেন তাঁর রায়ে!

*

*

*

গাড়ি পার্ক করে বরিস বললে, এই অ্যাপার্টমেন্ট-হাউসের দোতলায়।

সিট-বেঞ্চে আলিঙ্গনমুক্ত হয়ে তিনজনে দিতলে উঠে আসি। বরিস, নীনা আর আমি। হাতঘড়ি-মোতাবেক পৌনে ছয়টা। ম্যাডাম রেবেকার সঙ্গে অ্যাপার্টমেন্ট ছয়টায়। সূর্যদেবের দিগন্তচুম্বনের এখনো ঘণ্টা দুই বাকি। তিনি অবশ্য মেঘের আড়ালে।

অথবা কুয়াশার। প্যাসিফিকের বদনাম আছে : দিবারাত্র কুয়াশায় কন্ডল মুড়ি দিয়ে ঘুম যায়। মাঝে মাঝে নিজের হাত-পাগুলোও অদৃশ্য হতে চায়। কনকনে হিমেল হাওয়া— অথচ আগস্টের মাঝামাঝি। আমি উইন্ডচিটার চাপিয়েছি। নীনা-বরিস কোনো শীতবস্ত্রের প্রয়োজন বোধ করছে না।

দোতলায় উঠে কলবেল বাজাতে হাত বাড়ানো মাত্র নীনা বারণ করল। এটা নাকি এটিকেট-বিরুদ্ধ। গাড়িতে হনটা যেমন ফালতু; বাড়িতে কলবেলও তেমনি। গাড়িতে হর্ন বাজিয়ে পথচারীকে সাবধান করা অভদ্রতা। বাড়ির দোরগোড়ায় কলবেলও তাই। গাড়িতে হর্ন আর বাড়িতে কলবেল শুধু শোভা বর্ধনের জন্য। বরিস তার হিপপকেট থেকে একটা সেলফোন বার করে বার-কতক প্রিং প্রিং করল। রুদ্ধদ্বারের ওপ্রান্তবাসীর সঙ্গে কী যেন আলাপচারী হলো। হিরু না মার্কিনী ইঞ্জিরি মালুম হলো না। কিন্তু অবিলম্বে সদর দরজা গেল খুলে।

খোলা দরজার ফ্রেমে অনবদ্য একটি প্রৌঢ়ার পোর্ট্রেট। মনে পড়ে গেল পালামো-এর বর্ণনা : ‘শত ব্যক্তি পরিবেষ্টিত হইলেও হয়তো আমার দৃষ্টি ওঁর উপরেই প্রথম পড়িত।’ মাথায় ছোট-ছোট কৌকড়ানো স্নো-হোয়াইট কুন্তল। দুটি ঘননীল চোখে অতলান্তের গভীরতা। গায়ের রঙ পাকা পেয়ারাফুলি আমটির মতো। দুর্বল। যষ্টিনির্ভর। কিন্তু অন্তর্গূঢ় একটা চারিত্রিক ঋজুতার অভিব্যক্তি। বরিস বা তার বান্ধবীকে উপেক্ষা করে সরাসরি আমাকে বললেন, ‘মিস্টার সায়নাল, আই প্রিজুম?’

নিয়ে গিয়ে বসালেন ওঁর ছোট ড্রইংরুমে। বরিস আর নীনার কাছে জানতে চাইলেন তারা কবে লস্ এঞ্জেলসে U. C. L. A. বিশ্ববিদ্যালয়ে যাচ্ছে। বরিসের বাবুস্কার (দিদা) বাতের ব্যথা কেমন আছে। দিয়াদুস্কা (দাদু) মর্নিং ওয়াকটা চালিয়ে যেতে পারছেন কি না। আমি ততক্ষণে বৈঠকখানা ঘরটি খুঁটিয়ে দেখে নিয়েছি। কাঠের সেন্টার-টেবিল ঘিরে তিনদিকে সোফা। একদিকে বুকর্যাকে ঠাশবুনোট বই আর বই। নানান ভাষায়। তার বিপরীতে একটা রঙিন টি. ভি।

দেওয়ালের একপ্রান্তে একটা ওয়াল-ক্লক, পেডুলাম-ওয়ালা পুরানো কেতার ‘দিয়াদুস্কা-ঘড়ি’। তার দু-পাশের দেওয়ালে দুটি বড় ছবি। একটি বৃদ্ধের—মনে হলো, সিগমন্ড ফ্রয়েডের। তার বিপরীতে এক হাস্যময়ী কিশোরী। চতুর্থ প্রাচীরে একটি অনবদ্য শিল্পকর্ম। কালো মখমলের পশ্চাদপটে সোনালী আখরে সূচিশিল্পের একটি নিদর্শন। অর্থ বোধগম্য হলো না। হরফগুলি ইংরেজি—ভাষাটা কী, জানি না। ওল্ড-ইংলিশ হরফে সোনালী সুতোয় সূচিমুখে লেখা আছে :

"Powiedz Amalze Sudha nizdy go nie zapomni"

বরিস-নীনার সঙ্গে কুশল-আলোচনার পর উনি আমার দিকে ফিরতেই প্রশ্ন করি :

সিগমন্ড ফ্রয়েডের এই ছবিখানাকে আপনি এত গুরুত্ব দিয়েছেন কেন? আপনি কি মনোবিজ্ঞানের ছাত্রী?

উনি হেসে বললেন, ওটা ফ্রয়েডের ছবি নয়, মিস্টার সায়নাল; ছবিটা JANUSZ KORCZAK-এর। তিনি ছিলেন.....

আমি ওঁকে বাধা দিয়ে বলি, আমি জানি। বস্তুত জানুস কোরচখ-এর জীবনী আমার মাতৃভাষায় লিখব বলেই—

উনি আমাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বলেন, আপনার মাতৃভাষা? মানে বেঙ্গলি? যাতে পোয়েট টেগোর ‘ডাকঘর’ লিখেছিলেন?

—একজ্যাক্টলি! জানুস কোরচখের কোনও আলোকচিত্র আমি ইতিপূর্বে দেখিনি। তাই অনুমান করেছিলাম—ওটা ফ্রয়েডের ছবি।

—ওই ছবিটার ছোট প্রিন্ট আমার কাছে আছে। আপনি চান?

—মোস্ট সার্টেনলি, ম্যাডাম! আ’ল বি ডিলাইটেড!

—অলরাইট! এবার বলুন—আপনারা কী পান করবেন? হট অর কোল্ড? আইসক্রীম, কফি, টি অর ওয়াইন?

নীনা বা বরিস ঠাণ্ডা কোনো পানীয়ের নাম করার আগেই আমি তড়িঘড়ি করে বলি, এনিথিং হট!

উনি ভিতরে চলে গেলেন। আমি বরিসকে জিজ্ঞেস করি—দেওয়ালের সেই কিশোরীর ছবিটি দেখিয়ে—এটা কার ছবি, জান?

বরিস বলে, অবভিয়াসলি আন্টি রেবেকার! বছর পঞ্চাশ আগেকার।

আমারও তাই মনে হলো।

একটু পরে ফিরে এলেন তিনি। ট্রে নিয়ে। তিনটি প্লেটে তিনটি ড্যানিশ পেস্তি। আমার জন্য বড় কাপে গরম কফি। কিন্তু ওদের দুজনের জন্য আইসক্রীম।

অতি বুদ্ধিমতী মহিলা। আমি আগ বাড়িয়ে থামিয়ে দিলেও উনি বুঝে নিয়েছেন এই জমাটি ঠাণ্ডায় ওই কিশোর-কিশোরী গরম কফির চেয়ে ঠাণ্ডা আইসক্রীমই পছন্দ করবে। নিজের জন্যও এনেছেন এক কাপ গরম কফি।

ওঁর বেদনাময় জীবনীর প্রসঙ্গ আমাকে উত্থাপন করতেই হবে। সেই উদ্দেশ্যেই আমি এসেছি। কিন্তু কেমন যেন সঙ্কোচ হচ্ছে। বার বার মনে হচ্ছে সেই নরকবাসের দিনগুলোকে উনি বিস্মৃতির অন্ধকারে ঠেলে দিতে চান। তাই প্রথমে অন্য একটি প্রসঙ্গের অবতারণা করে বলি, কিশোরী বয়সে আপনি তো খুব সুন্দর ছিলেন দেখতে—

উনি কফি কাপে একটা চুমুক দিয়ে নীনার দিকে ফেরেন। বলেন, তোমার গ্র্যান্ড-পা আমাকে কী চমৎকার কমপ্লিমেন্টস দিচ্ছেন দেখেছ নীনা? আমি নাকি তোমার বয়সে খুব সুন্দরী ছিলাম। অর্থাৎ এখন আর তা নেই। বটেই তো! বুড়ি হয়ে গেছি যে!

আমি হাঁ-হাঁ করে প্রতিবাদ করতে যাই—আই নেভার মেন্ট দ্যাট।

উনিও হাসতে হাসতে বলেন, কিন্তু ওই তথ্যটাই বা পেলেন কোথায় ?
টিন-এজার হিসাবে আমি সুন্দরী ছিলাম ?

বলি, আপনার ওই এনলার্জড ছবিখানাতেই তার প্রমাণ।

ওঁর মুখের হাসিটা হঠাৎ মিলিয়ে গেল। স্নানমুখে বললেন, এ থেকেই বোঝা যায়, আজকের দুনিয়া ধারণাই করতে পারে না—নাৎসি জার্মানিতে আমাদের জীবন কীভাবে কেটেছে। আপনারা বিশ্বাস করতে পারেন না যে, হলোকস্টের ইনফার্নো থেকে যারা ফিরে এসেছে তারা একেবারে নিঃশ্ব হয়ে যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে প্রবেশ করেছে। তাদের কারও কাছে বাবা-মা, ভাইবোন বা নিজের বাল্যকালের ছবি থাকতে পারে না। নাৎসি জার্মানি সীমান্ত যখন এক বরফ পড়া রাতে অতিক্রম করি তখন করুণাময় ঈশ্বরের কৃপায় আমার গায়ে একটা সুতির ফ্রক ছিল শুধু। আর একটা প্যাটি! মাথায় টুপি ছিল না, পায়ে মোজা জুতো ছিল না, শীতবস্ত্র কিছু ছিল না, দু-হাতে—হাঁ, ছিল, গ্লাভস নয়, নেকডের মতো বড় বড় নখ! নেল-কাটার পাব কোথায় ?

আমি মাথা নিচু করে বলি, আয়াম সরি!

কথাটা ওঁর কানে গেল কি না ~~বোঝা~~ গেল না। বললেন, ওই এনলার্জড ছবিটা আনা ফ্রাঙ্কের। প্রায় আমার সমবয়সী। ওকে দেখলেই আমার মনে পড়ে যায় সেই ইংরেজি কবিতাটা : বিরাট ওক গাছ বুড়ো হতে হতে একদিন ‘বিএলজিবাব’-এর মতো (ঘটোৎকচের মতো) ধরাশায়ী হয়—But the lily of a day/Is fairer far in May! তাই নয় মিস্টার সায়নাল ? বিশ্বব্যাপী দ্বিতীয় যুদ্ধে হিটলারের পানজার বাহিনীর হাজার হাজার ট্যাঙ্ক টুকরো-টুকরো হতে হতে গুঁড়ো হয়ে, ধুলো হয়ে, ‘না’-হয়ে হারিয়ে গেল। অথচ আমস্টার্ডামে প্রিন্সেনগ্রাট খালের ধারে সেই চারতলা বাড়ির অ্যাটিক ঘরে সগর্বে টিকে রইল আনা ফ্রাঙ্কের দিনপঞ্জিকা। আমি জীবিত ফিরে এসেও দুনিয়াকে সেই ইহুদিনধন মারণযজ্ঞের কথা শোনাতে পারিনি; কিন্তু আনার ডায়েরি যুদ্ধোত্তর দুনিয়ার এক কোটি পাঠক পড়েছে, যাটটি ভাষায় তা অনুবাদ করা হয়েছে। ইতালির এক পণ্ডিত *—তিনি নিজেও হলোকস্ট থেকে জীবিত ফিরে এসেছেন—কী বলেছিলেন জানেন ?

“One single Anne Frank moves us more than countless others who suffered just as she did, but whose faces have remained in the shadows.”

“একটিমাত্র আনা ফ্রাঙ্ক আমাদের অন্তর স্পর্শ করতে পেরেছে। অথচ সংখ্যাতিত মানুষ—যারা একই ভাবে নির্যাতিত—হারিয়ে গেছে বিস্মৃতির ঘনান্ধকারে।”

ধীরে ধীরে বলি, প্রশ্ন করতে আমার সঙ্কোচ হচ্ছে—

* Dr. Primoleui - Vide *Smitsonium*. Magazine, Oct 2001, P. 72

উনি আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলেন, কিন্তু উত্তর দিতে আমি উৎগ্রীব। আমি বলতে চাই। আমি শোনাতে চাই—কিন্তু কেউ শুনতে চায় না, মিস্টার সায়নাল। সময় কোথায়? তোমার ইনিয়ুবিনিয় লেখা বই পড়ব কখন? লাইফ ইজ সো ফাস্ট, ইউ নো!

—আপনি চেষ্টা করে দেখেছেন?

—দেখিনি? আমার দুঃখের স্মৃতিকথা প্রথম লিখেছিলাম হিব্রু ভাষায়। সেটা ইজরেইলে Yad Vashem† -এর সাপ্তাহিক মুখপাত্রে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। পরে তার একটি ইংরেজি অনুবাদ করি। তিন-চারটি ফটো-কপি বানাই। কিন্তু কোনো এজেন্টই তা প্রকাশযোগ্য মনে করলেন না। সবাই বললেন, ‘ম্যাদাম, ইউ হ্যাভ মিস্‌ড দ্য বাস! আজকের দুনিয়া আপনাদের ওই ঘেটোর ক্লাস্তিকর গপ্পো শুনতে চায় না।’ ‘এজেন্ট’ বোঝেন তো? যারা আমেরিকার সাহিত্য জগতে সর্বদা পাহারা দেয়। ‘স্টিজিয়ান শোরে চারানে’র (বৃহদ্বারে জয়দ্রথের) মতো।

জিজ্ঞেস করি, আমাকে আপনার ইংরেজি রচনার এক কপি দিতে পারেন? ইচ্ছে মতো উদ্ধৃতি বা অনুবাদ করার অধিকার সমেত?

—বাই অল মীনস্। আপনি পোয়েট টেগোরের ভাষায় যদি আমাদের যন্ত্রণার কথা লেখেন, আমি কৃতার্থ হয়ে যাব। আপনি যদি চান, তাহলে আমি আপনাকে অনেক ফটোও দিতে পারি। যা আমি ওয়ারস থেকে নিয়ে এসেছিলাম—না, না, আপনি যা ভাবছেন তা নয়। প্রথমবারেই এগুলি আনতে পারিনি। এনেছি অনেক পরে।

—আপনি আবার ওয়ারস গিয়েছিলেন? নিজের খরচে?

—না, মিস্টার সায়নাল। নিমন্ত্রিত হয়ে। ইউনেসকো যে বৎসরকে ‘শিশুবর্ষ’ ঘোষণা করে (1978-79) সে বছর সাড়ম্বরে ওয়ারসতে পালিত হয় কোরচখের জন্মশতবার্ষিকী। সারা দুনিয়ায় যে সব হালোকস্ট-নির্যাতিত জীবিত আছেন, তাঁদের অনেকে নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। আমাকেও ওঁরা আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। আমি আবার দেখে আসি ওয়ারস ঘেটোর ধ্বংসাবশেষ, ডক্টর কোরচখের অনাথ-আশ্রমের স্মৃতিফলক আর ট্রেব্লিকা গ্যাস-চেম্বরের কবরখানা। তখনই অনেক ফটো তুলেছিলাম আমি।

সশ্রদ্ধচিত্তে মাদাম রেবেকার দেওয়া উপহারগুলি গ্রহণ করলাম। তাঁকে বললাম, কথা দিচ্ছি মিজ রথচাইল্ড, পোয়েট টেগোরের ভাষায় আপনার যন্ত্রণাদায়ক জীবন বৃত্তান্ত আমি লিখব। কিন্তু বাঙালি পাঠক তা পড়বেন কিনা বলতে পারছি না। আমার বই প্রকাশিত হলে তাঁকে এক কপি পাঠিয়ে দেব, উনি পড়তে পারুন আর না পারুন। তাঁকে

†. Yad Vashem : যাদ্ ভাশেম : হলোকস্ট শহিদ এবং বীরযোদ্ধাদের স্মারক সমিতি। ইসরাইল সরকার কর্তৃক 1962-তে এই প্রতিষ্ঠান জেরুসালেমে প্রতিষ্ঠিত হয়।

এক কপি Lyrics to Love কবিতা গ্রন্থ উপহার দিলাম। এটি নীনার বাবা অমিতাভ বাসু লিখেছে। নিজ ব্যয়ে এই আমেরিকায় বসেই প্রকাশ করেছে। রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশটি গানের ইংরেজি অনুবাদ, মূল গানসহ। উনি খুশি হলেন। বললেন, রবীন্দ্রনাথের কোনো গান উনি শোনেননি। আমাকে অনুরোধ করলেন যে-কোন একটি গান ও অনুবাদ পড়ে শোনাতে।

ইতিমধ্যে প্যাসিফিকার কুয়াশা রূপান্তরিত হয়েছে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টিতে। কাচের সার্সিতে টিপি টিপি শব্দ। ক্রমে তা রিমঝিম হয়ে উঠতে চায়। আমার মনে পড়ে গেল, প্যাসিফিকায় ওটা আগস্ট মাস হলেও বাঙলায় সেটা ‘মাহ ভাদর’! সেখানে হয়তো এতক্ষণে ‘তিমির দিকভরি ঘোর যামিনী, অথির বিজুরিয়া পাঁতিয়া ...’। আমি রবীন্দ্রনাথের একটি বর্ষণমুখর বিরহের গান বেছে নিলাম : “আমার যে দিন ভেসে গেছে চোখের জলে/তারি ছায়া পড়েছে শ্রাবণগগন তলে।” তার ইংরেজি অনুবাদটা যখন পড়ছি তখন আড়চোখে নজর হলো বৃদ্ধা একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন তাঁর সেই সোনালী আখরে লেখা সূচিশিল্পটির দিকে :

My day long past, that washed away in tears –
Over the monsoon clouds in the sky, its shadow appears.
The notes of the melody silenced that day, did sink.
Into abysmal sorrow of parting; and at the brink.
Tremors that rose are carried off far, far away.....
By the wailing easter winds – of today.
Intense happiness merged with sweet sorrow that day;
The lyre of life was tuned to both the strings.
Who knows when the strings gave way.
And what cries of lament did bring .
The music to close; the melody got lost.
Moment by moment, in time.

এখানে একটি বেদনাদায়ক স্বীকৃতি জানাই : কথা আমি রেখেছিলাম। ওঁদের সে যন্ত্রণার কথা প্রায় এক বছর ধরে নবকল্লোলে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। আর সেই পত্রিকার নববর্ষ সংখ্যায় জনৈক পত্রলেখক উড়িষ্যার ঢেনকানাল থেকে সম্পাদককে লিখেছিলেন, “নারায়ণবাবুর ধারাবাহিক কাহিনীটি আমার ভালো লাগছে না।” (বৈশাখ ১৪১০)। এর কোনো প্রতিবাদপত্র ওই পত্রিকায় মুদ্রিত হতে দেখিনি।

দূরন্ত কৌতূহল হলো জানতে : কী লেখা আছে ওই হিব্রু মন্ত্বে। যার দিকে তাকিয়ে
নিস্তব্ধে বসে আছেন বৃদ্ধা ? জানতে চাইলাম।

হঠাৎ যেন সম্বিত ফিরে পান। বলেন, নো মিস্টার সায়নাল—ওটা কোনো হিব্রু মন্ত্বে
নয়। ওটা পোলিশ ভাষায় ওই একই কবির রচিত একটি পংক্তি। *Post Office* নাটক
থেকে। ইংরেজি অনুবাদে ওর অর্থ :

Tell Amal that Sudha shall never forget him.

আমার চোখের সামনে থেকে যেন একটা পর্দা সরে গেল।

আহা! অমলকে তো এ কথাটা বলা হয়নি। কিন্তু আমাদের কী দায় ? অমল কি
জানতো না কথাটা ? অথবা সুধা কেন এ কথা তাকে জানাতে চেয়েছিল ? অমলের কথা
থাক, কিন্তু আব্রাসা ? সেই অনাথ বালকটি যখন এক হাতে তার পাতানো ড্যাড, আর
হাতে আশ্রম পতাকা বহন করে মৃত্যুপুরীর দিকে এগিয়ে চলেছিল তখন সেও কি তা
জানত না ? সে কি জানত যে, তার সুধা একদিন বৃদ্ধা হয়ে যাবে, প্যাসিফিকা অ্যাপার্টমেন্টে
বর্ষণমুখর মাহ-ভাদরে মনে মনে জপ করে যাবে :

‘ক্যাসে গোঁঙাইবি হরিবিনে দিনরাতিয়া!’

রেবেকা রথচাইল্ড

আমার জন্ম ১৯৩০ সালে। পোল্যান্ডে। রাজধানী ওয়ারস'-র প্রায় তিনশো মাইল দক্ষিণপূবে। শহরটার নাম Buczacz; বাংলা হরফে কীভাবে লিখব গো? বুক্‌আক্‌জ? তা সে যাই হোক, আমাদের শহরটা বেশ জনবহুল। সে আমলে লোকসংখ্যা ছিল প্রায় চল্লিশ হাজার। তার ভিতর আমরাই, মানে ইহুদিরাই ছিলাম আঠারো-বিশ হাজার। বছর পাঁচেক আগেও ইহুদিরা ছিল মাত্র পনের হাজার। কিন্তু হিটলারের নাৎসিদল জার্মানির দণ্ডমুণ্ডে র বিধাতা হয়ে যাবার পর বহু জার্মান-ইহুদি চলে এসেছে সীমান্তের এপারে। তারা দু-তিন-চার পুরুষ ধরে ছিল জার্মানির বাসিন্দা। তারা নিজেদের মনে করত জার্মান; ধর্মে ইহুদি হলেও। কিন্তু হিটলার যখন গদিতে উঠে ঘোষণা করল যে, ইহুদিরা সাব-হিউমান, তাদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসাবে গণ্য করা হবে, তখন তাদের উৎপীড়ন শুরু হয়ে গেল। এই সময়ে তারা দলে দলে এসে আশ্রয় নিয়েছিল পোল্যান্ডে। আমি তখন শিশুমাত্র। এসব তত্ত্ব পরে জেনেছি।

আমি বরং আমার জীবনী শুরু করি ১৯৩৪ সাল থেকে। তখন আমার বয়স আট। ওই আটত্রিশ সালটাকে পোল্যান্ড কোনোদিন ভুলতে পারবে না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার ঠিক আগের বছরের কথা বলছি। মহামান্য ফ্যুরার পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাট হবার খোয়াব দেখছে। তার দু-পাশে দুই প্রবল শত্রু। পশ্চিমে গ্রেট-ব্রিটেন—কয়েক শতাব্দি ধরে তারা পৃথিবীর নানান প্রান্তে উপনিবেশ স্থাপন করে ভোগ করছে। সুদূর অস্ট্রেলিয়া থেকে কানাডা।



ভারতকে দুশো বছর ধরে শোষণ করছে, আফ্রিকার নানানপ্রান্তে তাদের ঘাঁটি। ইংরেজরা বলত, সূর্য নাকি ব্রিটিশ সাম্রাজ্য থেকে অস্তে যাবার সুযোগই পায় না। আর জার্মানির পূবদিকে নবজাগ্রত সাম্যবাদের দেশ : রাশিয়া। হিটলার ভেবেছিল এই দুই শত্রুর মধ্যে গ্রেট-ব্রিটেনের ক্ষমতাই বেশি। তাই প্রথমে রাশিয়ার সঙ্গে মিতালি করে ব্রিটেনকে কন্ডা করাই বুদ্ধিমানের কাজ। সেই হিসেব মতো হিটলার পূবের শত্রুকে সাময়িক স্যাঙাৎ হিসেবে মেনে নিয়ে ব্রিটেন আর ফ্রান্সের সঙ্গে মোকাবিলা করতে চাইল। মহামতি জেনারালিমো স্তালিন এ প্রস্তাবে একপায়ে খাড়া। ওঁরা দুই স্যাঙাৎ সিদ্ধান্তে এলেন পোল্যান্ড দেশটাকে একযোগে দু-পাশ থেকে আক্রমণ করতে হবে। দু-দিকের দুই শত্রুকে একই সঙ্গে রুখতে পারল না পোল্যান্ড। দুই বীর পোল্যান্ড দেশটাকে করাত চালিয়ে দু-আধখানা করে ফেললেন। রাজ্যটার পশ্চিমাঞ্চল অধিকার করলেন ফ্যারার আর পূবদিকের আধখানা স্তালিন।

আমাদের শহরটা যেহেতু দেশের পূবদিকে তাই সেটা পড়ল স্তালিনের ভাগে। বছর তিনেক আমরা তাদের শাসন সহ্য করেছিলাম। ১৯৩৪ থেকে ১৯৪১ অর্থাৎ যতদিন না ফ্যারার সন্ধিপত্রটা ছিঁড়ে ফেলে তার পানজার বাহিনী নিয়ে মস্কো অধিকার করতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। যুদ্ধের প্রথম কয়েক বছর পোল্যান্ড রাশিয়ার কাছে যে নিপীড়ন সহ্য করেছে তার খবর দুনিয়া জানে না। জানে না তার কারণ যুদ্ধান্তে যাঁরা বিশ্ব-ইতিহাস রচনা করেছিলেন তাঁরা অ্যাংলো-মার্কিন গোষ্ঠির। তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধের শেষাশেষি রাশিয়া হিটলার-নিধনে তার কালো-হাত মিলিয়েছিল। তাছাড়া রাশিয়া ছিল অদ্ভুত এক লৌহযবনিকার আড়ালে। আরও একটি কারণ হলো এই যে, যেহেতু জার্মানি হেরে গেল তাই তারা তাদের অপকীর্তি ধামাচাপা দিতে পারল না। রাশিয়া পারল, যেহেতু সে ছিল বিজয়ীর দলে।

আমরা ছিলাম মধ্যবিন্দু—উচ্চ মধ্যবিন্দুই বলতে পারেন। বাবা জন রথচাইল্ড ছিলেন একটি বড় ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের মালিক। আমাদের এলাকায় তিনি একজন জনপ্রিয় নেতা। স্থানীয় কর্পোরেশনে জোনাল-কাউন্সেলর। সংসারে মানুষ সাতজন—বাবা, মা, বড়দা জাখারি, মেজদা মোশে, সেজদা বুনীও, আমি আর আমার ছোট ভাই হার্ৎসেল।

শুধু পোল্যান্ড দেশটাই নয়, স্তালিন আর হিটলার করাত চালিয়ে আমাদের সংসারটাকেও দু-টুকরো করে দিল। ভাগাভাগি করে আমাদের সংসারের ছয়জনকেই হত্যা করল। পারল না শুধু আমাকে। নিদারুণ দুঃখের বোঝা বহিতে বাকি রইলাম আমি একা। বোধকরি আমার এই ক্লান্তিকর কাহিনী আপনাদের শোনাতে হবে বলে।

যুদ্ধান্তে সারা বিশ্বে যখন গুলি-গোলার শব্দ স্তব্ধ হলো—পরমাণ্বীয় হারানো নরনারীর আত্ম ক্রন্দন ছাড়া যখন আর কোনো শব্দ শোনা যায় না, তখন আমি গিয়েছিলাম

সেই ছোট্ট ভূখণ্ডটিতে—আমাদের সদ্য গড়ে ওঠা ‘প্রমিসড-ল্যান্ড’ : ইজরাইলে। বৃদ্ধ বয়সে নগ্নপদে রাব্বাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে উচ্চারণ করেছিলাম শহিদ স্মৃতিমন্দিরে ওদের প্রত্যেকের উদ্দেশ্যে : খাদিশ। বাবা, মা, বড়দা, মেজদা, সেজদা, আর আমার ছোট্টভাই হার্ৎসেল-এর উদ্দেশ্যে। হয়তো সেজন্যই ‘হলোকস্ট’ থেকে জীবন্ত ফিরে এসেছি!

বুক্‌আক্‌জ একটি শাস্ত জনপদ। প্রতিবেশীদের মধ্যে গলাগলি ভাব। তিন-চারটি হাইস্কুল, ছেলেমেয়ে একসঙ্গেই পড়ত। রোম্যান ক্যাথলিক, প্রটেস্টান্ট, আর জিওনিস্টরা সবাই এক শিক্ষায়তনে। তিনটি গির্জা, একটি তালমুদ-তোরাহ্ সৌধ আর সিনাগগ। গোটা চারেক পিকচার হাউস, একটা ‘থিয়েটার হল’। সিনাগগের ছিল দুটি অংশ। একটি প্রকাণ্ড হল-কামরা, যেখানে সমবেত হত সবাই বড় বড় উৎসবে আর সপ্তাহান্তের সাবাথ প্রার্থনায়। ছোট ঘরখানাতে দৈনন্দিন উপাসনার আয়োজন। দূর থেকে দেখলে মনে হত রাস্তার ধারে বুঝি দাঁড়িয়ে আছে বাপ-বেটায়, হাত ধরাধরি করে।

আমি সিনাগগে প্রায়ই যেতাম। কারণ ছিল। আমার বড়দা জাখারি সাবাথে বেহালা বাজাতো। দারুণ মিষ্টি হাত ছিল তার। আবার সেজদা বুনিওর ছিল সুন্দর গানের গলা। সে কয়ারে (choir) সমবেত সঙ্গীতে অংশ নিত। আমি পিছনের একটি পিউ-এ চুপচাপ বসে বসে শুনতাম। আমাদের রাব্বাই ছিলেন সৌমদর্শন বৃদ্ধ। বিপত্নীক। নিঃসন্তান। শহরের সকলেই তো তাঁর সন্তান।

পোল্যান্ডে যার জন্ম হয় যদি জাতে ইহুদি হয় তাহলে শিশুকাল থেকেই সে বুঝতে শেখে ওই শব্দ কথটার অর্থ : antisemitism ! আপনারা বোধ হয় তার মানে জানেন না। শুনুন বুঝিয়ে বলি : Semite কারা? যারা বাইবেল মতে Sham-এর বংশধর। তার থেকে প্রশ্ন হবে : Sham কে? জবাবে বাইবেল বলছেন : নোয়ার বেয়াড়া বড় ছেলেটা। তাতেও ভাল বোঝা গেল না, তাই না? তাহলে সহজ করে বলি : বাইবেলমতে Sham-এর সন্তান-সন্ততিরা হচ্ছে দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার বাসিন্দা : ইহুদি, আরব, আসিরীয়, ফোনেশিয়ান, প্রভৃতি। বাইবেলমতে সেমাইটদের দু-ভাগে ভাগ করা যায়। একদল হচ্ছে : হিদের। তারা না-খ্রিস্টান, না-জিওনিস্ট, না-মুসলমান। অর্থাৎ হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, লাওংসে বা কনফুশিয়াস পন্থী। অপরদল হিব্রু বা ইহুদি। যারা খ্রিস্টকে ঈশ্বরপুত্র বলে না মানলেও বাইবেলের আদিকাণ্ডকে প্রামাণ্য বলে স্বীকার করে। অর্থাৎ আব্রাহাম, ইশাক, ডেভিড, জ্যাকবের বংশধর। আমরা, ইহুদিরা, হিদের নই বটে তবে Semite : Jew!

হিটলার-জমানার আগে জুডেন (Juden) বা Zhid শব্দটা বিশেষ প্রচলিত ছিল না বটে তবে কটর খ্রিস্টানরা পারতপক্ষে আমাদের সঙ্গে মেলামেশা করত না। কিছুটা অবজ্ঞার ভাবও ছিল তাদের।

আমার জ্ঞান হবার আগেই হিটলার হয়ে গেছে ‘ফ্যুরার’। অর্থাৎ রাইফ্‌স্ট্যাগ দখল করে গোটা জার্মানির একচ্ছত্র হর্তাকর্তাবিধাতা। কিন্তু সে তো জার্মানিতে। ভিনদেশে। আমাদের কী? সে সময়ে নিচু ক্লাসে আমি স্কুলে পড়াশুনা করছি। আমার দাদারাও তাই। তখন সমাজে ছিল দুটি ভাগ: ‘জুইশ’ অথবা ‘জেন্টাইল’। ‘জেন্টাইল’ কথাটা ভদ্রতাসূচক। হিন্দুর কাছে যেমন ‘মুসলমান’ ভদ্রতাসূচক, ‘স্লেচ্ছ’তে একটা বিজাতীয় ঘৃণার ছোঁয়া; মুসলমানের কাছে ‘হিন্দু’ যেমন ভদ্রভাষা, ‘কাফের’ অবমাননাকর।

ধর্মভিত্তিক প্রথম আঘাতটার কথা ভুলতে পারিনি। আমাদের পরিবারে সে ধাক্কাটা সবার আগে এল বড়দা জাখারির উপর। ‘পাসওভার’ উৎসবের ঠিক আগে। তার মানে 1938 সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। কারণ আমাদের ধর্মে সেই উৎসবটা আসে ‘নিশান’-মাসের তৃতীয় সপ্তাহে। অর্থাৎ জর্জিয়ান ক্যালেন্ডার অনুসারে মার্চ মাসে। সেটাই আমাদের সবচেয়ে বড় উৎসব। খ্রিস্টানের যেমন বড়দিন, হিন্দুর যেমন দুর্গাপূজা। ‘পাসওভার’ হচ্ছে মিশর থেকে মোজেস-এর নেতৃত্বে ইহুদিদের ‘বাসভূমি-র সন্ধানে অভিযাত্রার স্মারক’। সাতদিন ধরে চলে। বড়দা সে উৎসবে একটা প্রোগ্রাম পেয়েছে এককভাবে মঞ্চে উঠে বেহালায় একটা ‘সোনাটা’ বাজানোর। তারই মহড়া দিয়ে এক প্রহর রাতে বাড়ি ফিরছে। হঠাৎ পিছন থেকে কে-যেন ডেকে উঠল, “হেই, Zhid! (ইহুদি-বাচ্চা!) অতবড় বেহালা নিয়ে কোথায় যাচ্ছিস-রে? আমাদের একটু বাজনা শোনা না?”

জাখারি কোনো উত্তর না দিয়ে জোরে জোরে পা ফেলে এগিয়ে যায়। পিছন থেকে আবার কে-যেন বলে ওঠে, কথটা কানেই নিচ্ছিস না যে, রে?

তার বন্ধু বলে, ও বোধ হয় কালা!

—শালা কালা হলে ব্যায়ালা বাজায় কী করে? ধরতো শালাকে!

বড়দা এবার ঘুরে দাঁড়ায়। বলে, প্লিজ, আমাকে বাড়ি যেতে দিন। রাস্তার মাঝখানে কি বেহালা বাজানো যায়?

—যায় না বুঝি? তুই বুঝি ব্যায়ালা বাজাস ‘ক্যাবারে-হল’-এ? সেই যখন ডবকা ডবকা Zhid ছুকরিগুলো ‘ইয়ে’ দুলিয়ে দুলিয়ে ধেই ধেই নাচে?

বড়দা দেখল দলে ওরা সাত-আট জন। সে শক্তিশালী, রোজ ব্যায়াম করে। ওদের মধ্যে যে কোনো দুজনকে সে একা পিটিয়ে ঠাণ্ডা করবার ক্ষমতা রাখে। হঠাৎ সবাই মিলে ওকে একযোগে আক্রমণ করে। একজন ছিনিয়ে নিল ওর প্রাণের বেহালাটা। রাস্তায় আছাড় মেরে চুরমার করল সেটাকে। আর একজন জাপটে ধরল পিছন থেকে, যাতে ওর হাত দুটো আটক পড়ল। এরপর বাকি চার-পাঁচজন তাকে ক্রমাগত আঘাত করতে থাকে। মুখে, বুকে, তলপেটে, বিশেষ করে জানুসন্ধির স্পর্শকাতর এলাকায়। ও যখন জ্ঞান হারাল তখন তারা বীর বিক্রমে হেঁ হেঁ করতে করতে চলে গেল নিজেদের আস্তানায়।

পথচারীরা অনেকেই দেখেছে। রাত তখন দশটাও বাজেনি। অনেক লোক জমে গেছে রাস্তার ধারে। প্রতিবাদ করার সাহস পায়নি। তারা সবাই জুড়েন! জাখারিকে অনেকে চেনেও। তবে বীরপুরুষেরা প্রস্থান করার পর জাখারির মৃতপ্রায় অচেতন্য দেহটা তারাই বাড়িতে পৌঁছে দেয়।

দিনদশেক বিছানায় পড়ে থাকল বড়দা। আমরা বাড়িসুদ্ধ সবাই ‘পাসওভারে’ ধর্মীয় বিধিনিষেধ পালন করলাম শুধু। আনন্দ উৎসবের প্রশ্নই ওঠে না। আশ্চর্য প্রাণশক্তি বড়দার। হয়তো ব্যায়ামপুষ্ট শরীর বলেই এতবড় অত্যাচারেও তার কোনো অঙ্গহানি হয়নি। সে কানা-খোঁড়া হয়ে যায়নি। এর পর বড়দা বেঁচে ছিল মাত্র পাঁচ বছর। এই পাঁচ বছরে সে কোনোদিন বেহালা বাজায়নি। হাতে তুলে নিয়েছিল : রিভলভার, শিখেছিল বোমা-বাঁধার ফর্মুলা, হ্যান্ড-গ্রেনেড ছোঁড়ার কায়দা। নাৎসি এস. এস. দলের বিরুদ্ধে গেরিলা-অ্যাকশনে সে প্রাণ দেয়। তবে তার আগে পাঁচ-সাতজন জার্মানকে খতমও করে। সে সব ঘটনা অবশ্য অনেক পরে।

1939 সালটা পোল্যান্ডের ইতিহাসে অবিস্মরণীয়।

হিটলার অস্টিয়া দখল করে আটত্রিশে; পরের বছর মার্চ মাসের মধ্যেই গ্রাস করে চেকোস্লোভাকিয়া। তারপর পয়লা সেপ্টেম্বর নাৎসি প্যারাট্রুপার্স বাহিনী আক্রমণ করে পোল্যান্ড। অনেক পোলিশ যুবক স্বাধীনতা রক্ষায় বীরের মৃত্যু বরণ করে। কিন্তু অপ্রতিরোধ্য নাৎসি বাহিনীকে রোখা গেল না। আধখানা পোল্যান্ড গিলে ফেলল ফ্যুরার, বাকি-আধখানা গ্রাস করলেন মহামতি স্তালিন। দু-দল দু-পাশ থেকে পোল্যান্ডকে শাসন ও শোষণ করতে থাকে।

আমাদের শহরটা পড়ল রাশিয়ার ভাগে। রাশিয়ান রেড-আর্মি রে-রে করে তেড়ে এল। সতেরই সেপ্টেম্বর 1939-এ। দিনসাতক আমরা রুদ্ধদ্বারে অপেক্ষা করলাম। গোলাগুলির কোনও শব্দ শোনা গেল না। লোকজন সাহস করে পথে নামল। রেড আর্মির সৈন্যরা কিন্তু আমাদের বাজার বা দোকানপাট লুটতরাজ করল না। সারাদিন সড়কে টহল দিয়ে ফেরে। দোকান-বাজারে তারা যা কেনাকাটি করে, প্রথম দিকে তার দামও মেটাতে।

দু-চারদিন বাদে স্কুলগুলো খুলে গেল। তবে আমাদের স্কুলে এলেন কিছু রাশিয়ান টিচার। তাঁদের ভাষা শেখাতে। বেশ তো, আসুন—আমাদের আপত্তি হবে কেন, একটা নতুন ভাষা শিখতে? ওমা—ছয় মাসের মধ্যেই আইন জারি হয়ে গেল : শিক্ষার মাধ্যম হবে রাশিয়ান ভাষা। ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক, প্রকৃতি-বিজ্ঞান সব কিছু শিখতে হবে রাশিয়ান ভাষায়! তা ছাত্রছাত্রীরা বুঝুক না বুঝুক!

ইহুদি হবার অপরাধে স্তালিনের আমলে আমাদের ভোগান্তি অবশ্য কিছু বেশি হলো না। সাম্যবাদীদের শোষক দৃষ্টিতে খ্রিস্টান-ইহুদি সমান-সমান। তবে স্কুলে গিয়ে

নজর হলো ‘অ্যাসেমব্রি-হল’-এর দেওয়াল থেকে দুটি অনবদ্য মার্বেলের ভাস্কর্য নিদর্শন অপসারিত হয়েছে। হল-এর দু-প্রান্তে সে দুটি মূর্তি ছিল স্কুলের গর্ব। যীশু-ক্রোড়ে মেরীমাতার মূর্তিটির ঠাই দখল করেছেন লেনিন! আর ত্রুশবিদ্ধ মানবত্বাতার জায়গাটা দখল করেছেন পাইপমুখো মহামতি স্তালিন।

আমি সেদিন কেঁদেছিলাম। আমি খ্রিস্টান নই। তবুও আমার সহপাঠী খ্রিস্টান বন্ধুদের দুঃখে। আচ্ছা, ওই ঝোলা-গোঁফ পাইপমুখো লোকটা কি সত্যিই বিশ্বাস করে মানব সভ্যতায় তার অবদান ওই হাতে-পায়ে পেরেখ গাঁথা ত্রুশবিদ্ধ মানুষটির চেয়ে বেশি? নাহলে সে তার চেলাচামুণ্ডাদের এ জাতীয় ধাষ্ট্যমো করতে নিষেধ করে না কেন?

সপ্তাহ-খানেকের মধ্যেই অদ্ভুত দু-একটা ঘটনা ঘটল। আমাদের ক্লাসের দু-একজন ছাত্রছাত্রী—তারা কিন্তু ইহুদি নয়, খ্রিস্টান—কী জানি কেন, ক্লাসে আসা বন্ধ করল। আমরা কয়েকজন তাদের বাড়িতে খোঁজ নিতে গেলাম। আশ্চর্য! তাদের বাড়ি তালাবন্ধ! কোথায় চলে গেল তারা? প্রতিবেশীরা কেউ কিছু জানে না! এভাবে হারিয়ে যাওয়া দলের মধ্যে ছিল জোসেফ্‌ জানৌস্কি। আমার একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু। তাদের পরিবারের সবাইকেই চিনতাম। জোসেফের বাবা ছিলেন উচুদরের পোলিশ পুলিশ-অফিসার। তাঁর অফিসে গিয়েও কোনো খোঁজ পেলাম না। এরপর হঠাৎ হারিয়ে গেল উইজিয়া, আমার নিকটতম বান্ধবী। তার সঙ্গে কিভারগাটেন ক্লাস থেকে পড়েছি। তার প্রতিটি জন্মদিনে গিয়েছি, সেও আমার প্রতিটি জন্মদিনে এসে গেয়ে গেছে: ‘হ্যাপি বার্থ-ডে টু ইউ!’

তাদের গোটা পরিবারটাই রাতারাতি বেপাত্তা।

সেদিন স্কুল থেকে ফিরে আমি আমার ঘরের দরজা বন্ধ করে অনেক-অনেকক্ষণ কেঁদেছিলাম। মা যখন ডিনার খাবার জন্য ডাকতে এল, বললাম, ক্ষিদে নেই, খাব না।

মা আমাকে তার বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বললে, কী হয়েছে রে, রেবেকা? তুই অমন করছিস কেন?

আমি কান্নায় ভেঙে পড়ে বলি, আমার বড় ভয় করছে মাম্মি! আমার বন্ধুরা এভাবে একে একে হারিয়ে যাচ্ছে কেন? প্রথমে গেল জোসেফ, তারপর আবার উইজিয়া! ওরা কোথায় গেল? কেন গেল? আমাকে কিছু না বলে এভাবে একে একে ওরা কোথায় চলে যাচ্ছে? তার মানে কি আমরাও একদিন---

মা আমার চুলের মধ্যে বিলি কাটতে কাটতে বললে তোকে আজ সব কথাই খুলে বলব রেবা। শোন। রাশিয়ানরা এই শহর থেকে পোলিশদের এক-এক ব্যাচে সাইবেরিয়ায় পাঠিয়ে দিচ্ছে। বিশেষ করে যাঁরা এই শহরের শাসনব্যবস্থায় ছিলেন, যাঁদের সবাই মান্য করে, যাঁদের কথা সবাই শোনে...

—কেন মা? সাইবেরিয়ায় গিয়ে তারা কী করবে?

—সেখানে বন্দিশিবিরে তারা শ্রমিক হিসাবে কাজ করবে। ওখানে ভীষণ শীত। মেহনতি মানুষ যোগাড় করা শক্ত। তাই নিরুপায় লোকদের ধরে ধরে পাঠাচ্ছে।

আমি অবাক হয়ে বলি, অত শীতে জোসেখ্ অথবা উইজিয়্যার মতো বাচ্চা শ্রমিক হিসাবে কতটুকু কাজ করবে?

মা জবাব দিতে পারল না। জানতে চাই, ওরা কি আর কোনদিন ফিরে আসবে না?

—আমি জানি না, রেবা। সেটা আদোনাই-এর ইচ্ছা!

এভাবেই কেটে গেল আরও কয়েকটা মাস। রাশিয়ান-ভাষা ছাড়া আর সব বিষয়ে ভাল মার্ক পেয়ে আমি পাস করে উঁচুক্রাসে উঠে এলাম। মেজদা মোশে দুর্দান্ত রেজাণ্ট করে স্কুলের শেষ ধাপ অতিক্রম করল। এখানেও একটা কলেজ আছে; কিন্তু মোশে বায়না ধরল সে লেনিনগ্রাড কলেজে পড়তে যাবে। ওর স্কুলের রাশিয়ান শিক্ষকের সুপারিশে শহরের নতুন শাসকবৃন্দ মোশেকে একটা স্কলারশিপ জুটিয়ে দিলেন। ড্যাডির খুব একটা ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু মোশের জেদাজেদিতে তাকে রাজি হতে হলো। স্কুল থেকে মাত্র দুজন স্কলারশিপ পেয়েছে। একদিন আমাদের বাড়িতে মেজদার বিদায় ভোজ হলো। মেজদার চার-পাঁচজন সহপাঠী এল সেই বিদায়ভোজে আমন্ত্রিত হয়ে। সবাই খুব আনন্দ করল। শুধু মা আড়ালে চোখের জল ফেলে বলল, এমন আনন্দের দিন জাখারিটা কোথায় আছে কে জানে! ওর দু-বেলা দু-মুঠো খাবার জোটে কি না তাও তো জানি না।

বলতে ভুলেছি, বড়দা সুস্থ হয়ে ওঠার পর একদিন গৃহত্যাগ করে। কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে কিছুই জানায়নি। শুধু তার বালিশের নিচে একটা চিঠি ছিল।

“তোমরা আমার খোঁজ নেবার চেষ্টা কর না। তাতে শুধু তোমাদের নয়, আমারও বিপদ। এ চিঠিখানা পুড়িয়ে ফেল।”

মেজদা যখন লেনিনগ্রাড গেল তখনো বিশ্বযুদ্ধ ঘোরতর হয়নি। মেজদা গেল— অথচ আশ্চর্য—সে কোনো পৌছানো সংবাদ দিল না। বাপি তার ছাত্রাবাসের ঠিকানায় তিন-চারখানা চিঠি দিল। কোনো জবাব নেই। বাপি খোঁজ নিতে যাচ্ছিল মোশের সেই বন্ধুটির বাড়ি, যে ছেলেটিও স্কলারশিপ পেয়ে লেনিনগ্রাড বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্র্যাজুয়েশন করতে গেছে। বাপিকে কষ্ট করে যেতে হলো না। সেই ছেলের বাবা নিজেই এসে জানতে চাইলেন। “মোশের কোনো চিঠিপত্র পেয়েছেন? আমার বাঁদর ছেলেটা তো আমাদের ভুলেই গেছে।”

বাপি ব্যস্ত হয়ে দেখা করল শহরের প্রশাসনিক রাশিয়ান কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে— যাঁরা স্কলারশিপটার বিষয়ে তদ্বির করেছিলেন। তাঁরা বাপিকে আশ্বস্ত করলেন—না, ভয়ের কিছু নেই। হয়তো ডাকের গুণ্ডগোল। ওঁরা কলেজে টেলিগ্রাম পাঠালেন। তার দিনসাতেক পরে মেজদার চিঠি এল। কিন্তু এ কার চিঠি? হাতের লেখা নিঃসন্দেহে মোশের। নিচের সইটাও তারই। কিন্তু এই কয় মাসে এমনভাবে বদলে গেল মেজদা?

“আমি ভালভাবেই পৌঁছেছিলাম। এখানে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা ভালো। কোনো কিছু অসুবিধা নেই। পড়াশুনার খুব চাপ। সামনেই আমার পরীক্ষা। চিঠি দিতে দেরি হলে চিন্তা কর না। আমি ভালো আছি। ইতি”

বাস! কী এমন পড়ার চাপ যে, দু-মাস পরে এই পাঁচ-লাইনের দায়সারা চিঠি! আমাদের কারোর নাম উল্লেখ করেনি। ওর পোষা কুকুর শার্প, যাকে ও প্রাণ দিয়ে ভালবাসতো, যাবার দিন যার গলা জড়িয়ে ধরে এক ভলগা কেঁদেছিল, তার কথাটাও কি হতভাগার মনে পড়েনি? এ পোড়ারমুখির কথা না হয় ছেড়েই দিলাম।

বাপি লেনিনগ্রাড যেতে চাইল, কিন্তু যুদ্ধের পরিস্থিতিতে তাঁকে যেতে দেওয়া হলো না।

তারপর আরও তিনমাস কেটে গেছে। জাখারি তো অনেকদিন খরচের খাতায়, এবার মেজদাও তাই। আমরা তিন-চারখানা চিঠি দিলাম। মোশে জবাব দিল না। ঈশ্বর জানেন তার পরীক্ষা কেমন হলো!

তারপর এক গভীর রাত্রে শার্পের সারমেয় গর্জনে সবার ঘুম ভেঙে গেল। আমি টেরই পাইনি। আমার পাশে শুয়েছিল হার্ৎসেল। সেও অঘোর ঘুমে অচৈতন্য। পরদিন সকালে উঠে শুনলাম সব। শার্পের গর্জনে বাপির ঘুম ভেঙে যায়। দোতলার জানলা একটু ফাঁক করে দেখতে পায়, আমাদের সদর দরজার সামনে কে-যেন গুড়ি মেরে বসে আছে। দেওয়ালে ঠেস দিয়ে। ডোরবেল বাজাতে সাহস পাচ্ছে না। রাত তখন দুটো। শার্প কিন্তু তার গন্ধ ঠিকই পেয়েছে। চিৎকার করে সে চেন ছিঁড়ে ফেলতে চায়। মাও উঠে এসেছে। দুজনে নিচে নেমে এসে সদর দরজা খুলে দেয়। স্তম্ভিত হয়ে যায় তারা : মোশে!

না, মোশে নয়, তার কঞ্চাল! লেনিনগ্রাড ছাত্রাবাস থেকে পাঁচিল উপক্রে সে পালিয়ে এসেছে। রেল-লাইন ধরে হাঁটতে হাঁটতে এগারো দিন পরে এসে পৌঁছেছে আমাদের শহরে। বেচারি শুধু রাতের বেলায় হাঁটতো। তাও রাস্তা দিয়ে নয়, রাস্তার সমান্তরালে জঙ্গল, ব্রন্থাডাঙার মাঠ পাড়ি দিয়ে। রাশিয়ান পুলিশের নজর এড়িয়ে। প্রথমে সে কথাই বলতে পারেনি। দুধ আর ব্র্যান্ডি খাইয়ে মা তাকে কিছুটা চাপ্পা করার পর সে বলতে পারল তার নিদারুণ অভিজ্ঞতার কথা।

লেনিনগ্রাড কলেজে বিভিন্ন শহর থেকে যেসব স্কলারশিপ-পাওয়া ছাত্র ভর্তি হয়েছিল তারা বাস্তবে ছিল ওখানকার একটা কারখানার বন্ডেড-লেবার। সকালে ঘণ্টা দুয়েক নামমাত্র থিওরেটিকাল ক্লাস করার পর, সকাল নয়টা থেকে বিকেল সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত তাদের প্র্যাকটিকাল-ক্লাস করতে হতো কারখানায়। ট্রাকে মাল ঢোলাই করা, পাথর ভেঙে ছোট ছোট টুকরো করা, কেউ কাজ পেল মেশিন রুমে, কেউ বয়লারে বেলচা করে কয়লা দেবার ক্লাস। টানা-আটঘণ্টার শিফটে প্র্যাকটিকাল ক্লাস। মাঝে আধঘণ্টার টিফিন। মোশের সহপাঠী বন্ধুটি এ ধকল সইতে পারেনি। মারা গেছে। মোশে কোনোক্রমে পালিয়ে এসেছে।

বাপি আমাদের সাবধান করে দিল, খবরটা এক্কেবারে গোপন রাখতে হবে। মোশে গিয়ে আশ্রয় নিল অ্যাটিকে। সিঁড়ির চিলেকোঠায়। আমি ওকে খাবার পৌঁছে দিয়ে আসতাম। দিন দশ-পনেরর মধ্যেই সে কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠল। জানা গেল, ছাত্রদের বাড়ি থেকে যে সব চিঠি বা প্যাকেট ছাত্রাবাসে আসত তা রাশিয়ান কর্তাব্যক্তির খুলে পড়ত। ছাত্রদের হাতে তা দেওয়ার কানুন ছিল না। প্রয়োজনে ওদের ডিকটেশন মোতাবেক ছাত্ররা বাড়িতে জবাব পাঠাতে বাধ্য হতো।

আমরা খবরটা গোপন রেখেছিলাম। পাড়া-প্রতিবেশী কেউ জানতেও পারেনি যে, মোশে আবার বাড়ি ফিরে এসেছে। তিনতলার অ্যাটিকঘরে লুকিয়ে আছে। আমিই তার সব ফাই-ফরমাশ খাটতাম, খাবার পৌঁছে দিতাম। হার্ৎসেলকে বারণ করে দেওয়া হয়েছিল যেন বোকার মতো কাউকে না বলে ফেলে আমাদের এই গোপন কথা। মায়ের সেবাযত্নে, মুরগির সুরুয়া আর ব্র্যান্ডি খেয়ে মেজদা দু’দিনেই চাঙ্গা হয়ে উঠল।

কিন্তু তিন-সপ্তাহের মাথাখা বজ্রপাত হলো এ সংসারে। গভীর রাতে রাশিয়ান মিলিটারি পুলিশ একটানা কলবেল বাজাল। অফিসারটি জোর দিয়ে বলল, তারা খবর পেয়েছে যে, মোশে পালিয়ে এসে এখানেই আশ্রয় নিয়েছে।

বাপি মুহূর্ত্ত মধ্যে বুঝে নিল অভিযোগটা অস্বীকার করা হবে চরম মূর্খামি। ওরা বাড়ি তল্লাস করলেই মোশে ধরা পড়ে যাবে। তাই বাপি বললে, হ্যাঁ সে এখানেই আছে। এটা তো তার বাড়ি। সে কিছু অনধিকার প্রবেশ করেনি। ও আর কলেজে পড়বে না স্থির করেছে। তাই বাড়ি ফিরে এসেছে।

রাশিয়ান মিলিটারি পুলিশটি একাই এসেছিল। কথাবার্তায় বেশ ভদ্র। বললে, লুক হিয়ার, হের রথচাইন্ড; আমার নাম ক্যাপ্টেন পিটার কাটানৌস্কি। আমিও সন্তানের বাবা। বুঝতে পারছি, আপনার কথাটা। স্মাশে যদি লেখাপড়া না করতে চায়, আমরা জোর করে তাকে পড়াতে পারি না। কিন্তু সে তাই বলে পালিয়ে এল কেন?

মান্নি আগবাড়িয়ে বললে, ওন্ট ইউ কাইন্ডলি সিট ডাউন ক্যাপ্টেন?

—নিশ্চয়ই! ধন্যবাদ!

মাথা থেকে হেলমেট খুলে টেবিলে রাখল। সোফায় বসে বললে, আসল কথা আমরা জানতে চাই, কলেজ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আপনার পুত্রের কী জাতীয় অভিযোগ আছে। কেন তাকে এভাবে পালিয়ে আসতে হলো। তা যদি আমরা জানতে না পারি তাহলে তো কলেজ হোস্টেলের সংস্কার করা সম্ভবপর হবে না। আপনি ওকে ডেকে নিয়ে আসুন। আমি তাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই।

মা আবার বাধ্য দিয়ে বলে, কিন্তু ও যে এখন ভীষণ অসুস্থ!

—অসুস্থ? কথাবার্তা বলতে পারছে?

বাবা আর মায়ের দৃষ্টি বিনিময় হলো। অফিসারটি বললে, সেক্ষেত্রে আমিই তার সঙ্গে গিয়ে কথা বলতে পারি। তাকে বিছানা ছেড়ে নেমে আসতে হবে না।

বাপি বলে, না, না, তার প্রয়োজন হবে না। মোশে পারবে নিচে নেমে আসতে। একটু অপেক্ষা করুন। আমি নিজেই তাকে নিয়ে আসছি।

বাপি উঠে গেল সিঁড়ি বেয়ে।

অফিসারটি মাকে প্রশ্ন করে, মোশে কি আপনার বড় ছেলে?

—না। ওর একজন দাদাও আছে। সে অবশ্য এখন এখানে থাকে না।

—মোশের দাদা? বয়স কত তার?

—উনিশ!

—বলেন কী! আমি তো ভেবেছিলাম আপনারই বয়স পঁচিশ-ছব্বিশ!

মা একটু লজ্জা পেল যেন। সে জানে, তাকে মোটেই অত কমবয়স মনে হয় না। তবে এটা হয়তো একটা ভদ্রতাসূচক ‘কমপ্লিমেন্ট’। ক্যাপ্টেনের নিজের বয়সও ত্রিশ-বত্রিশ! কথা ঘোরাতে মা জানতে চায়, একটু কফি পান করবেন? অথবা জিন-উইথ লাইম?

ক্যাপ্টেন কাটানৌস্কি মিষ্টি হেসে বললে, ধন্যবাদ ফ্রাউ রথচাইল্ড, আজ আমি ব্যস্ত আছি। আর একদিন অবসর মতো এসে আপনার আতিথেয়তায় ধন্য হব।

ইতিমধ্যে বাপি মেজদাকে নিয়ে নিচে নেমে এসেছে। ক্যাপ্টেন তাকে কিছু প্রশ্ন করল না। তড়াক করে উঠে দাঁড়াল। মান্নির দিকে ফিরে বললে, গুড নাইট মাদাম।

খপ করে চেপে ধরল মেজদার হাতটা। রওনা দিল সদর দরজার দিকে। বাপি চমকে উঠে বলে, একি! আপনি যে বললেন, মোশেকে কী যেন প্রশ্ন করবেন?

ক্যাপ্টেন ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, আমি নিজে করব না। আমাদের অফিসে যাঁরা এ কাজ করেন, তাঁরা করবেন। আমি ওকে হেডকোয়ার্টার্সে নিয়ে যাচ্ছি মাত্র।

—তাহলে আমিও আপনার সঙ্গে যাব। না হলে এত রাতে ও একা-একা ফিরবে কেমন করে? ওর কাছে তো কপর্দকমাত্র নেই।

—ইচ্ছে হলে আপনিও আসতে পারেন।

আমি দরজার আড়াল থেকে সব কিছু দেখেছি, শুনেছি। গুঁরা তিনজনে চলে যেতেই আমি এগিয়ে এসে জানতে চাই, ওরা কখন ফিরে আসবে মান্নি?

মান্নি চমকে ওঠে। বলে, তুই কখন উঠে এসেছিস? যা গুয়ে পড়গে যা!

—আমার বড্ড ভয় করছে মান্নি! ওরা কখন ফিরে আসবে বললে না তো?

—তা কি আমি নিজেই জানি? রাত ভোর হবার আগেই নিশ্চয় ফিরে আসবে। ওরা মোশের কাছে জানতে চায় ও কেন পালিয়ে এসেছে।

আমি ধমকে উঠি, ন্যাকা! তা বুঝি ওরা জানে না? মোশেকে স্কলারশিপ দেবার নাম করে ওরা তাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে লেবার ক্যাম্পে ভর্তি করে দিয়েছিল—এটা কি ওরা জানে না বলতে চাও?

মা চিন্তিত মুখে বললে, তাই তো ভাবছি। মোশে না বেঁফাস কিছু বলে বসে! আয়, তুই আমার বিছানায় এসে শুয়ে পড়।

বাকি রাত আমার ঘুম হলো না। মায়েরও নয়। পরদিন আমরা সমস্ত দিন ওদের পথ চেয়ে বসে রইলাম। কেউ ফিরে এল না। না বাপি, না মোশে। বুনীও খোঁজ নিতে গিয়েছিল। কিছুই জানতে পারেনি। দ্বিতীয় দিন অবশ্য বাপি ফিরে এল। মনে হলো, প্রচণ্ড বিক্ষুব্ধ সমুদ্র পাড়ি দিয়ে একটা অ্যালবাট্রিস ফিরে এসেছে তার পাহাড়-চূড়ার বাসায়। বাপির চোখ দুটো বসে গেছে। চুলগুলো উন্মোখাখুন্মো। কে জানে, এ দুই দিন সে কী খেয়েছে, কতক্ষণ ঘুমিয়েছে!

মা কী নির্ধুর! সেই ক্লান্ত, শোকাহত মানুষটাকে জামাজুতো খুলে বসবার অবকাশও দিল না। তার হাত দুটি ধরে বলল, মোশে?

—ওরা তাকে এখনি ছাড়তে রাজি হলো না। ওর লিখিত স্টেটমেন্ট নেবে। লেনিনগ্রাডে এনকোয়ারি হবে, ওর বন্ধুদের, প্রফেসরদের সাক্ষীসাবুদ নেওয়া হবে। দিনসাতকের আগে মোশে বোধ হয় ফিরতে পারবে না।

কোথায় সাতদিন? একটি একটি দিন যায়, মোশে ফিরে আসে না। এভাবে পুরো তিনমাস কেটে গেল। ওর বিচার হলো না। ওর বিরুদ্ধে চার্জ ফ্রেম করার সময়ই পেল না রাশিয়ান আর্মি। এদিকে যুদ্ধের অবস্থা যে সঙ্গীন হয়ে উঠছে। একটা বাচ্চা ছেলের বিচারের কেসটা আদালতে ওঠার অবকাশই আসে না।

প্রায় চার মাসের মাথায় একটা মিলিটারি জিপ এসে দাঁড়াল আমাদের বাড়ির সামনে। এবার আর ক্যাপ্টেন কাটানৌস্কি আসেনি, এসেছে অন্য একজন মেজর র‍্যাঙ্কের আফিসার। তার হাতে একটা র‍্যাশন ব্যাগ। তাতে মোশের জামা, প্যান্টালুন, টুপি আর জুতো-জোড়া। যার ধন তাকে ফিরিয়ে দিতে এসেছে। সঙ্গে একটি সীলমোহরাঙ্কিত পত্র : হের জন রথচাইল্ডের নামে। রাশিয়ান কমান্ডার অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানিয়েছেন যে, তিনদিন আগে জেল হাসপাতালে মাস্টার মোশে রথচাইল্ড ব্রঙ্কোনিমুনিয়ায় মারা গেছে। চিকিৎসার কোনো ক্রটি হয়নি। অনিবার্য নিয়তি যাকে বলে! মৃতদেহ? সেটা জেল-সংলগ্ন কবরখানায় সমর্যাদায় সমাধিস্থ!

বাপি হাত বাড়িয়ে পুঁটুলিটা নিল। ‘থ্যাঙ্ক ইউ’ যদি মনে মনে বলে থাকে তো অন্য কথা। রাশিয়ান অফিসারটির তা শ্রুতিগোচর হয়নি। বোধকরি সেটা সে প্রত্যাশাও করছিল না।

আমার মা পাষণ হয়ে গেল!

কাঁদে না। তাকে ডাকলেও সাড়া দেয় না। খায় না, ঘুমায় না, দিনরাত শূন্যে দৃষ্টি মেলে বসে থাকে। বাপি নিল রান্নার দায়িত্ব। সেজদা বুনিও তাকে সাধ্যমতো সাহায্য করত। খাবার পরিবেশন করা, আর বাসন ধোওয়ার দায়িত্বটা আমি নিজেই নিলাম। আমার চেয়ে দু-বছরের ছোট ভাই হার্বসেল নিল মাকে খাওয়ানোর দায়িত্ব। আমরা, ধেড়েরা যা পারিনি, ও তাই পারল—মাকে ‘কাগের দলা, বগের দলা’ বানিয়ে খাওয়াতে।

সবচেয়ে মুশকিল হলো শার্পকে নিয়ে। হার্বসেলও হার মানতে বাধ্য হলো।

আরও দিন পনের পরের কথা। ইতিমধ্যে শার্প মারা গেছে। বিকেলবেলা কে যেন ডোরবেল বাজাল। বাপি ছিল দোতলায়। আমি সদর দরজা খুলে দিতে গিয়ে দেখি দম- দেওয়া কলের পুতুলের মতো নিষ্প্রাণ ভঙ্গিতে মা এগিয়ে গিয়ে সদর দরজাটা খুলে দিল। ঘরে এলেন দুজন রাশিয়ান মিলিটারি অফিসার। সেই ক্যাপ্টেন পিটার কাটানৌস্কি আর তাঁর সঙ্গে আর একজন।

ক্যাপ্টেন একটা বাও করে মাকে বললেন, আমি অত্যন্ত দুঃখিত ফ্রাউ রথচাইল্ড। নিদারুণ সংবাদটা আমি মাত্র গতকাল পেয়েছি! এমনভাবে আচমকা ব্রেকেনিমুনিয়ায়

মায়ের কোনো প্রতিক্রিয়া হলো না। ক্যাপ্টেনের দিকে চোখ তুলে চাইল না পর্যন্ত। খোলা দরজা দিয়ে নীল-আকাশের দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকে একদৃষ্টে। ক্যাপ্টেন ইতস্তত করে আমার দিকে ফিরে বলল, তোমার ড্যাডি কোথায়, Klein Madchen?

সম্বোধনটা জার্মান ভাষায়—‘ছোট্ট মেয়েটি’! আমাদের এদিকে যেসব রাশিয়ান সৈন্য এসেছে তারা প্রায় সবাই জার্মান জানে, পোলিশ জানা না হলেও। আমরাও প্রায় সবাই তা জানি। ওঁকে বলি, আপনারা বসুন, আমি ড্যাডকে ডেকে আনছি।

ক্যাপ্টেন আর তাঁর সঙ্গী বসলেন। মা ড্রাফ্বেপও করল না। অন্দরমহলে চলে গেল। সেই কলের পুতুলের মতো গুঁজ-স্টেপে।

বাপির কাছে দুঃখ প্রকাশ করে ক্যাপ্টেন কাজের কথায় এলেন। একটি রেজিস্টার বার করে বললেন, আপনাদের পরিবারের সকলের নাম আর বয়স কাইন্ডলি বলুন। আমরা এ শহরের একটা আদমসুমারি করছি।

বাপি সকলের নাম ও বয়স জানাল। ক্যাপ্টেন বলে, আপনার বড় ছেলের নামটা তো বললেন না?

—সে এ বাড়িতে থাকে না। তার ঠিকানাও আমি জানি না।

—আহা, নামটা তো জানেন! বয়সটা আমিই জানি—উনিশ।

বাপিকে বলতে হলো জাখারির নাম।

ক্যাপ্টেন বললে, লুক হিয়ার হের রথচাইল্ড। আপনাকে কাল নটার সময় আমাদের সদর দপ্তরে একবার আসতে হবে। নাম রেজিস্ট্রি করতে। আপনার বয়স যখন

আটচল্লিশ তখন আপনাকে এটুকু কষ্ট করতে হবে। বুনিও অথবা ফ্রাউ রথচাইল্ডকে আসতে হবে না। আমরা প্রাথমিক যে তালিকাটা তৈরি করছি তা শুধু পুরুষদের। আর যাদের বয়স আঠারা থেকে পঞ্চাশ। জাখারির সঙ্গে যোগাযোগ হলে তাকেও এই নাগরিক কর্তব্যটুকু করতে বলবেন।

এটুকু জানিয়েই ক্যাপ্টেন উঠে দাঁড়ালেন। যাওয়ার আগে ঘুরে দাঁড়িয়ে আবার বললেন, ম্যাডামকে আমার সমবেদনা জানাবেন।

পরদিন ঘড়িতে অ্যালার্ম বেল দিয়ে আমি সকাল করে উঠেছি। বাপিকে নয়টার মধ্যে পুলিশ-হেডকোয়ার্টার্সে হাজিরা দিতে হবে। ফিরতে কত দেরি হবে কে জানে? ওকে ভালমতো ব্রেকফাস্ট খাইয়ে দেওয়া দরকার। ডিম ফ্রিজে আছে। ব্রাউন ব্রেডও। কিছু ফ্রুটসও কেনা আছে। তড়িঘড়ি মুখহাত ধুয়ে নেমে এসে দেখি মান্নি তার আগেই ঢুকে পড়েছে কুকিং-এরিয়ায়। কে বলবে—পনেরো দিন ধরে সে ছিল কলের পুতুল। আমাকে দেখতে পেয়ে স্বাভাবিক গলায় বললে, রেবা, দ্যাখতো দোর গোড়ায় মিল্কম্যান দুধ দিয়ে গেছে কি না। আর ও, হ্যাঁ, কাল রাতের এঁটো বাসনগুলো সিল্কে পড়ে আছে। ধুয়ে আন!

আমি তো তাজ্জব। আমি কিছু বলার আগেই আমার পিছন থেকে বুনিও বলে ওঠে, আমি ধুয়ে দিচ্ছি, মা। তুমি সর, আমরা ব্রেকফাস্ট বানিয়ে নেব।

—না। তুই নিজেও তৈরি হয়ে নে। বাপির সঙ্গে সঙ্গে যা। অবস্থাটা নিজে চোখে দেখে এসে আমাকে বলবি—কত লোক হয়েছে, ঘণ্টায় ক'জন করে নাম লেখাতে পারছে ইত্যাদি। মানে আমি জানতে চাই, লাঞ্চ-টাইমের আগেই কি তোর ড্যাড ফিরে আসতে পারবে? না হলে জেনে আসবি, দুপুরে লাঞ্চ প্যাকেট তোকে নিয়ে যেতে হবে কি না।

আমার ভীষণ কান্না পাচ্ছিল। কেন জানি না। মা স্বাভাবিক হয়ে যাওয়ার আনন্দে? নাকি বাপি একটা বিপদের মুখে পড়তে বাধ্য হচ্ছে, এই আশঙ্কায়? আমার চোখ দিয়ে যে জল ঝরছে তা নিজেও টের পাইনি। সেটা পেলাম সেজদা বুনিও ধমক দেওয়ায়: তুই কাঁদছিস কেন রে বোকা মেয়েটা?

কোথায় লাঞ্চ-আওয়ার্স? দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলো। ক্রমে সন্ধ্যা। মান্নি সারাদিন ঘর-বার করেছে। না ড্যাডি, না বুনিও, কেউই ফিরে এল না। পড়ন্ত বেলায় হার্ৎসেলকে একবার শুধিয়েছিলাম, কি রে, খাবি কিছু? দেব তোকে? ফ্রিডে পায়নি?

হার্ৎসেল উন্টে ধমক দিয়েছিল, তোর কি মাথা খারাপ? আগে বাপি ফিরে আসুক। এক প্রহর রাতে ফিরে এল বুনিও। মা তো তাকে দেখে অগ্নিশর্মা: কোথায় আড্ডা দিয়ে বেড়ালি সারাটা দিন? বাঁদর ছেলে!

বুনিও কোনো জবাব দিল না। দু-হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়ল কার্পেটের উপরেই। মা নিজে থেকেই শান্ত হলো। নরম সুরে বলল, কী বলল তোর ড্যাডি? কখন ফিরবে? কাল সকালে? আরও অনেকে তো ছিল—তাদের ক'জন ফিরেছে?

কান্নায় লাল ডাগর দু-চোখ মেলে বুনিও বলল, ড্যাডির সঙ্গে আমার দেখাই হয়নি। সেই যে নয়টার সময় সে ভিতরে ঢুকে গেল—বাস! তারপর আর কোনও খবর নেই। আমি যতবার বলি, আমার ড্যাড কখন বেরিয়ে আসবে? ওরা ততবারই বলে, দেরি হবে। দেখছ তো প্রায় পাঁচশো লোকের রেজিস্ট্রেশন হবে আজ। সময় তো লাগবেই। আমি বলি, ড্যাড যে লাঞ্চ খেয়ে আসেনি, তার লাঞ্চ প্যাকেট কি নিয়ে আসব? যে লোকটা গেটে পাহারা দিচ্ছে, সে বলল, তোমাদের সাত-নম্বর ওয়ার্ডের কেউই তো লাঞ্চ খায়নি। সকাল নয়টায় এসে হাজিরা দিয়েছে। এখানেই তারা দুপুরে খাবে। তুমি বাড়ি যাও, খোকা। বারে বারে আমাদের বিরক্ত কর না।

শুনে মা যেন সেই আগের মতো হয়ে গেল। চুপচাপ বসে পড়ল একটা টুলে। আবার তার চোখে দৃষ্টিহীন সেই উদাস চাহনি। চোখে জল নেই; কিন্তু সে চোখে কোনোকিছুই বুঝি দেখতে পাচ্ছে না। রাত বাড়তে থাকে। আমি বলি, মাম্মি! বাপি আজ রাত্রে ফিরবে না। চল, আমরা যা হোক কিছু খেয়ে শুয়ে পড়ি।

মা বললে, হ্যাঁ! তোরা খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়।

বুনিও বলে, তুমিও তো সারাদিন কিছু খাওনি। এস, খাবে এস।

—না। আমার খিদে নেই।

—খিদে তো আমাদের সকলেরই নেই। তবে থাক। আমরা কেউই খাব না।

হার্ৎসেল বলে, আমি তোমাকে খাইয়ে দেব মাম্মি? সেই আগের মতো? কাগের দলা, বগের দলা?

মা হঠাৎ ভেঙে পড়ল। হার্ৎসেলকে জড়িয়ে ধরে বললে, না রে! আমি ঠিক আছি। আয় সবাই যা হোক খেয়ে নিই।

পরদিনও বাপি ফিরল না। বুনিও সমস্ত দিন পুলিশ প্রিফেক্টারের দরজার সামনে ঘোরাঘুরি করল। সন্ধ্যাবেলা ফিরে এসে বলল, মাম্মি, তোমার এলি জারমানকে মনে আছে? মোশের বন্ধু? সেই যে লম্বা মতো ছেলেটা? মোশের বিদায়-ভোজে আমাদের বাড়ি এসেছিল?

—হ্যাঁ! মনে আছে। মোশের চেয়ে দু'বছর নিচে পড়ত।

—তাকে ওরা ধরে নিয়ে গেছিল। কাল-পরশুর মধ্যে বোধ হয় ছেড়ে দেবে।

—ছেড়ে দেবে? কেন?

বুনিও আমাদের বুঝিয়ে বলে। সে সারাদিন শহরে ঘুরে নানান তথ্য সংগ্রহ করে এনেছে। ওরা প্রতিটি ওয়ার্ডে একের পর একটা অভিযান চালাচ্ছে। এখন চলছে সাত-নম্বর ওয়ার্ডে। আমাদের এই সাত-নম্বর থেকে প্রায় পৌনে পাঁচশো লোককে ওরা ডেকেছে—যাদের বয়স আঠারো থেকে পঞ্চাশ। এলি জারমানকেও ডেকেছিল; কিন্তু ওর দাদু এলির

বার্থ সার্টিফিকেট নিয়ে দরবার করাতে গিয়েছিল—প্রমাণ করতে যে, এলির বয়স সতের। হয় তো সে জন্য তাকে ওরা ছেড়ে দেবে।

মায়ের একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে। বলে, কী ভাগ্য এলির মায়ের!

—না মা! এলির বয়স আঠারোর বেশি। ওর দাদু বেশ কিছু খরচপাতি করে একটা ‘ফোর্জড-ডকুমেন্ট’ দাখিল করেছে!

—তুই নিশ্চিত জানিস? এলি ফেরত এসেছে?

—এ সব কথা কি নিশ্চিতভাবে জানা যায় মা? গুজব শুনলাম।

মাম্মি অনেকক্ষণ কী জেনে ভাবল। তারপর বলল, বুনিও! তুই একটা কাজ করতে পারবি? কাটানৌস্কিকে মনে আছে? ক্যাপ্টেন পিটার কাটানৌস্কি?

—ওমা, মনে থাকবে না কেন? সেই তো বাপিকে সমন ধরিয়ে দিয়ে গিয়েছিল দিন তিনেক আগে। কেন বল তো?

—আমি তোর হাতে তাকে একটা হাতচিঠি দিয়ে ডেকে পাঠাব। তুই চিঠিখানা পৌছে দিতে পারবি?

দু’দিন পরেই জিপ চালিয়ে এসে হাজির হলেন ক্যাপ্টেন পিটার। কলবেল বাজাতে আমিই দোর খুলে দিলাম। উনি বেরেটটা খুলে মধ্যযুগীয় কায়দায় ‘বাও’ করে বললেন, গুটেন আবেন্ট ক্রেন মাদশান! (শুভ সন্ধ্যা, ছোট্ট মেয়েটি!) তোমার মা কোথায়?

বলি, আপনি বসুন, তাকে ডেকে দিচ্ছি।

উনি হিপ পকেট থেকে একটা চকোলেট প্যাকেট বার করে আমাকে উপহার দিলেন। আমি ফরাসি কায়দায় ফ্রকের দুইপ্রান্ত ধরে, ‘বাও’ করে বলি : ডান্কে (ধন্যবাদ)!

মায়ের সঙ্গে আঙ্কেল পিটারের অনেকক্ষণ কী সব গুজগুজ ফুসফুস হলো। বাইরের ড্রয়িং-রুমে। রুদ্ধদ্বার কক্ষে। প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে পিটার চলে যাবার পর মা আমাদের দু-জনকে ডাকল। আমি আর বুনিও। বললে, তোদের সব কথাই খুলে বলি। তোরা বয়সে ছোট, কিন্তু এসব কথা তো বাইরের কারোর সঙ্গে আলোচনা করা যায় না। যা বলছি, মনে দিয়ে শোন। আমার কী করা উচিত বলে তোদের মনে হয় সে কথা আমাকে খোলা মনে বল। তবে একটা কথা, এ-কথা আমাদের তিনজনের বাইরে যেন না যায়। হার্ৎসেল নেহাৎই বাচ্চা, তাকে জানানোর দরকার নেই।

মা আমাদের সব কথা বুঝিয়ে বলল। ক্যাপ্টেন পিটার লোক ভাল। মস্কোর শহরতলিতে ওর বউ আছে, একটি ছেলে, একটি মেয়েও আছে। বউ একটা কোয়াপারেটিভ ফার্মে কাজ করে। পিটার বলেছে ড্যাডির অরিজিনাল বার্থ-সার্টিফিকেটখানা পেলে তার একটা ‘ফোর্জড’ কপি তৈরি করে দিতে পারবে, বয়সটা আটচল্লিশের বদলে বাহান্ন দেখিয়ে। যাদের বয়স পঞ্চাশের উপর তাদের ‘কনফ্রিশন’ করা যায় না। ফলে যদি কোনোক্রমে প্রমাণ করা যায় যে, হের রথচাইল্ড আজ থেকে বাহান্ন বছর আগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাহলে তাঁকে আর যুদ্ধে যেতে হবে না।

বুনিও জানতে চায়, আঙ্কল পিটারের জানাশোনা তেমন ফোজার আছে?

—আছে। তবে অরিজিনালখানা দিতে হবে, যা দেখে দেখে সে নকল করবে।

আমি জানতে চাই, ড্যাডি আছে কোথায়? ওরা ঠিক মতো খেতে দিচ্ছে?

—পিটার তো বললে দিচ্ছে। রসিকতা করে বললে ‘ফাইভ কোর্স ডিনার’ খাওয়াচ্ছে না বটে, তবে দু-বেলা রুটি-সুপ-চিকেন ঠিকই দিচ্ছে।

বুনিও জানতে চায়, ফোজার কী পারিশ্রমিক নেবে?

—একা ফোজার নয়, তিন-চারজন হাই-র্যাঙ্কিং রাশিয়ান অফিসারকেও সম্বৃত্ত করতে হবে। তারা জেনে-বুঝেই নকল-করা বার্থ-সার্টিফিকেটটা মেনে নেবে। যথাযথ মূল্য ধরে দিলেই। তাছাড়া কর্পোরেশনের খাজাঞ্চিকেও বেশ কিছু নগদ ধরে না দিলে সে বার্থ-রেজিস্ট্রেশন অফিসের সীল আর পাঞ্জাছাপ ব্যবহার করতে দেবে কেন, বল?

বুনিও বলে, বুঝলাম। সব মিলিয়ে কত?

—পিটার বলেছিল পঞ্চাশ-হাজার রুবল্‌স্‌।

—পঞ্চা-শ হা-জা-র?

—তা আমি বলেছি, আমাকে কেটে ফেলেলেও পাঁচিশের বেশি আমি দিতে পারব না।

—তারপর?

মা বুঝিয়ে বলল, পিটার নিজে কিছু নেবে না। কিন্তু অন্তত চল্লিশ হাজার না হলে কার্যসিদ্ধি হবে না। শেষে মা বলেছে নগদ আর নেই। তবে তার কিছু গহনা আছে। তা বেচে দিয়ে দেখা যাক কত হয়। পিটার বলেছে সে নিজেই মাকে স্যাকরার দোকানে নিয়ে যাবে। শহরের এমন ডামাডোল অবস্থা যে, অত দামি গহনা অথবা গহনাবিক্রির টাকা নিয়ে স্ত্রীলোকের পক্ষে পথেঘাটে ঘোরাফেরা করা ঠিক নয়। এখন সব কথাই তাদের খুলে বললাম। এবার বল, আমার কী করা উচিত?

আমি বলি, যেমন করে পারো ড্যাডিকে ফিরিয়ে আনো। বাপি ফিরে এলে, যুদ্ধ মিটে গেলে আমাদের আবার সব হবে। যদি নাই হয়, আমরা সবাই এক ছাদের তলায় থাকতে পারবো তো? বড়দা জাখারিও তখন ফিরে আসবে! তুমি তোমার গহনা বেচে বাপিকে ফিরিয়ে আনো।

মা এবার বুনিওর দিকে ফিরে বললে, তুই কী বলিস?

বুনিও বললে, রেবা যা বলেছে তা খাঁটি কথা। আমি ভাবছি অন্য একটা দিক থেকে : কাটানৌস্কি কতটা বিশ্বাসযোগ্য!

—আমি জানি না, বুনিও। আমার সামনে খোলাখুলি দুটো পথ। হয় আমাকে ‘রিস্ক’টা নিতে হবে, সর্বস্ব খুইয়ে তাদের বাপিকে ফিরিয়ে আনতে হবে, অথবা.....

দ্বিতীয় বিকল্প পথটার কথা মাম্মি উচ্চারণ করল না। আমাদের ভাইবোনের অবশ্য তা বুঝে নিতে অসুবিধা হলো না : মা গহনার পুঁটলি আঁকড়ে ধরে আমাদের নিয়ে বৈধব্যজীবন যাপন কবে যাবে যুদ্ধোত্তর কালে !

আমরা তিনজনে যৌথ সিদ্ধান্ত নিলাম।

যুদ্ধ শুরু হবার আগেই বাপি ব্যাল্‌কভল্ট থেকে মায়ের গহনার বাক্সটা বাড়িতে নিয়ে এসেছিল। দেওয়ালের একটা পাথর সরিয়ে গর্ত করে তার ফোকরে বাক্সটা রেখে সিমেন্ট-বালি দিয়ে মেরামত করে দিয়েছিল। মিস্ত্রি ডেকে নয়। বাপি, জাখারি আর মোশে। তবে মা জানত সেটা কোথায় লুকানো আছে। তার সামনে একটা ছবি টাঙানো থাকত, সিমেন্ট-বালির নতুন পলেস্তারার চিহ্ন যাতে চট করে নজরে না পড়ে।

এখন বাপিও নেই, বড়দা বা মোশেও নেই। আমি, মা আর বুনিও গভীর রাত্রে হাত লাগিয়ে পাথরটাকে সরিয়ে ফেললাম। হার্ৎসেল তখন আঘোরে ঘুমাচ্ছে।

পরদিন বিকালে পিটার-আঙ্কেলের আসার কথা! সকালে ব্রেকফাস্ট খাওয়ার পর আমি বায়না ধরলাম : এস মাম্মি! তোমাকে ওই গহনাগুলো পরিয়ে সাজিয়ে দিই। ওগুলো আর তো কোনোদিন পরতে পারবে না তুমি।

মা লজ্জা পেল। বললে, দূর পাগলি! এই বুড়ি বয়সে আমি কি ওই সব গহনা পরতে পারি? ওগুলো তো আমি জমিয়ে রেখেছিলাম আমার ছেলের বউদের জন্য, তোর জন্য।

বুনিও হাসতে হাসতে বলে, তা কী আর করা যাবে? আমার বউ-এর ভাগ্যে নেই। রেবা-পাগলির কপালেও নেই। না থাক মাম্মি! বাপি ফিরে এলে আবার নতুন সেট গহনা হবে। এগুলো তুমি এখন শেষবারের মতো একবার পর দিকি। আমি একটা ফটো তুলে রাখি। বাপি ফিরে এলে তাকে জিজ্ঞেস করব—বল তো এই সুন্দরী ভদ্রমহিলাটি কে?

মা খিল খিল করে হেসে ওঠে। ছেলেমানুষের মতো। অনেক-অনেকদিন পর এমন মনখোলা হাসি হাসল সে। লজ্জা পেল, তবে আমাদের হাতে হাল ছেড়েও দিল। মায়ের বিয়ের গহনা পরিয়ে বুনিও তার ক্যামেরায় মায়ের একটা লাজুক-লাজুক ফোটো তুলে নিল।

পিটার-আঙ্কেল এল প্রায় সন্ধ্যার ঝাঁকে। মা তাকে ধমক দেয়, এত দেরি করলেন কেন? এসব কাজ দিনে দিনে সারতে হয় জানেন না?

আঙ্কেল পিটার বলে, তোমার ভয়টা কিসের? যাচ্ছ তো আর্মড এসকর্টের সঙ্গে। একাই জিপ চালিয়ে এসেছিল সে। মাম্মি তার গহনার পুঁটলিটা নিয়ে উঠে বসল ড্রাইভারের পাশের সিটে। বুনিও শুধায়, আমিও সঙ্গে আসব?

পিটার আঙ্কেল ধমক দেয়, না! তুমি হোম-ফ্রন্টটা পাহারা দাও!

আমি জানতে চাই, কতক্ষণ দেরি হবে তোমাদের?

—বড় জোর ঘণ্টা-দুই। রাত আটটার মধ্যেই আমরা ফিরে আসব। স্যাকরার দোকান তো কাছেই।—জবাব দেয় আঙ্কল।

মান্নি মুখ বাড়িয়ে বলে, ডিনার তৈরি করাই আছে। আমি এসে গরম করে দেব। তোরা সাবধানে থাকিস।

কোথায় রাত আটটা? সাড়ে আট, নয়, সাড়ে-নয়, দশ!

আমরা তিন ভাইবোন টুমটুম হয়ে বসে আছি ড্রইংরুমে।

এত দেরি হচ্ছে কেন? আঙ্কল-পিটারের কোমরবন্ধে তো রিভলভার আছে! তাহলে? রাত সাড়ে দশটার সময় বাজল কলবেলটা।

আমরা তিন ভাইবোন ছুটে গেলাম—কে আগে দোরটা খুলতে পারে।

খোলা-দরজা দিয়ে প্রথমেই ঢুকল মান্নি। কিন্তু একী! তার মুখটা থমথমে। চোখ দুটো টকটকে লাল। এখন অবশ্য চোখে জল নেই, কিন্তু বোঝা যায় সে বেশ কিছুক্ষণ কেঁদেছে! আমি আকুল ভাবে জানতে চাই, কী হলো মান্নি? গহনা বিক্রি হলো না?

পিছন থেকে আঙ্কল হাসতে-হাসতে বলে, তুমি বুঝবে না, ছোট্ট সোনা-মেয়ে! যখন বড় হবে তখন বুঝবে! গহনা হচ্ছে মেয়েদের প্রাণ! তা খোয়া গেলে মনের কী অবস্থা হয় তুমি কী বুঝবে? তবে দুঃখ করার কী আছে? হের রথচাইল্ড তো দু’দিন পরেই ফিরে আসছেন। তখন আবার নতুন নতুন গহনা হবে।

বুনিও একটা কথাও বলেনি। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আঙ্কেলের দিকে। চিতাবাঘের হিংস্র দৃষ্টি। যেন সুযোগ পেলেই শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে ছিন্ন ভিন্ন করে দেবে!

আঙ্কল পিটার তার হিপ পকেট থেকে বার করে আনল একটা ম্যাগনাম সাইজ ক্যান্ডি-প্যাকেট। মিলিটারি ক্যান্ডিনে কেনা। আমার হাতে গুঁজে দিয়ে বললে, এটা ছোট্ট সোনা রেবেকার জন্য। গুটেন ন্যাট টু ইউ অল!

পিছন ফেরে। খোলা দরজার দিকে চলতে থাকে। আমি যথারীতি ফ্রকের দুপ্রান্ত দু-হাতে ধরে ফরাসি কায়দায় ‘বাও’ করি। বলি, ডাঙ্কে (ধন্যবাদ)।

কিন্তু আঙ্কল তা লক্ষ্য করে না। আমাকে সে চোখ তুলে দেখতেই পায় না। আঙ্কল অত টলছে কেন? ও কি ড্রিংক করেছে? কখন করল? ওরা তো গিয়েছিল সোনা-রূপার দোকানে? এদিকে ফিরে দেখি মান্নি কখন নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে দোতলায় উঠে গেছে। ক্যান্ডির প্যাকেটটা খুলে একটা টুকরো হার্ৎসেলের হাতে দিলাম। সে পরম

তৃপ্তিতে কচমচিয়ে খেতে থাকে দু-চোখ বুঁজে। আর একটা টুকরো দিতে গোলাম বুনীওকে। সে নিল না। বললে, না, আমি খাব না!

দ্বিতীয়বার সাধারণ প্রশ্নই ওঠে না। এমন দারুণ ক্যান্ডি আমাদের খোলা বাজারে আজকাল পাওয়াই যায় না। গেলেও যে দুর্দশার মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি, তাতে ড্যাডি ইদানীং ক্যান্ডি-চকলেট অদৌ কিনে আনে না। তাই বাকি ক্যান্ডির সবটাই মুখে পুরে নিলাম। আঃ! কী দারুণ স্বাদ! ক্রাঞ্জমাঞ্জ করে সব চিবাতে শুরু করছি এমন সময় ঘটে গেল দুর্ঘটনাটা। হঠাৎ দোতলা থেকে সিঁড়ি বেয়ে ঝড়ের বেগে ছুটে এল মাম্মি। কোথাও কিছু নেই ঠাশ করে এক বিরশিসিক্কা থাপ্পড় কষিয়ে দিল আমার গালে। ব্যথা পেলাম যতটা তার চেয়ে অবাক হয়েছি বেশি। মা তখনো ধমকে চলেছে : হতচ্ছাড়ি! জীবনে কখনো চকলেট খাসনি, নারে? হ্যাঙলা-মেয়ে কোথাকার!

হঠাৎ বুনীও ছুটে এসে আমাদের জড়িয়ে ধরে। মায়ের উদ্যত মুষ্টি থেকে আড়াল করে আমাদের। মাকে বলে, ওকে মের না মা। ও তো ছোট্ট মেয়ে। কেন তুমি ওকে মারছ তা বুঝবার বয়স কি ওর হয়েছে? ও কিছু বোঝেনি—

মা আগুনঝরা দৃষ্টিতে বুনীওর চোখে-চোখে তাকিয়ে বললে, তুই বুঝেছিস?

বুনীও জবাব দিতে পারল না। মাথাটা নিচু করল। আর সে মায়ের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারছে না যেন। হঠাৎ অবাক হয়ে দেখি তার চোখ থেকে টপ টপ করে জল ঝরে পড়ছে কার্পেটের উপর।

মায়ের আগুনঝরা চোখের দৃষ্টি হঠাৎ যেন নিষ্প্রভ হয়ে গেল। থপ করে বসে পড়ে কার্পেটের উপর। হঠাৎই পিছন ফিরে দু'হাতে মুখ ঢাকে। মা কাঁদছে! শব্দ হচ্ছে না কিছু। কিন্তু তা আমি বুঝতে পারছি; ওর পিঠটা মাঝে-মাঝে ফুলে ফুলে ওঠায়।

মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারি না। মাম্মি এখন এতটা ভেঙে পড়ল কেন? সে তো জানত—গহনাগুলো খোয়া যাবেই। জেনে বুঝেই তো সে পিটার আঙ্কেলের জিপে চড়ে যেতে রাজি হয়েছিল!

না। নয় বছরের বাচ্চা মেয়েটা সেদিন—সেজদা ঠিকই বলেছিল—সব কিছু বুঝতে পারেনি। আজ বৃদ্ধা বয়সে সেই সব অত্যাচারের ইতিহাস লিখতে বসে বুঝতে পারি, কেন মাম্মি আমাদের থাপ্পড় মেরেছিল, কেন বুনীও মায়ের ও প্রশ্নটার জবাব দিতে পারেনি—‘তুই বুঝেছিস?’ আর কেনই বা মাম্মি দুই হাঁটুর মধ্যে মাথাগুঁজে অমন নিঃশব্দ কান্নায় ফুলে ফুলে উঠেছিল!

এই স্মৃতিচারণ রচনার সময় আমি যে নিষ্ঠুরতম সত্যটা জানতে পেরেছি তা কিন্তু জেনে যেতে পারেনি মাম্মি অথবা সেজদা! আমি কতটুকু জেনেছি; আর কীভাবে জেনেছি সে কথা এবার আপনাদের বলি :

হের সাইমন উইজেস্‌ল একজন প্রখ্যাত ‘হলোকস্ট সার্ভাইভার’। মহাপণ্ডিত ছিলেন তিনি। হিটলারের বিভিন্ন বন্দিশিবিরে তাঁর তিক্ত অভিজ্ঞতা তিনি প্রকাশ করেছিলেন

একটি অনবদ্য স্মৃতিচারণ গ্রন্থে : *The Sunflower* । এই গ্রন্থ রচনার জন্য তিনি পাঁচ পাঁচটি রাষ্ট্র থেকে শ্রেষ্ঠ লেখকের সম্মান পেয়েছেন : আমেরিকা, গ্রেট ব্রিটেন, ইতালি, নেদারল্যান্ডস আর ইজরেইল । পরিবারের সবাইকে হারিয়ে তিনি একা মুক্ত পৃথিবীতে ফিরে এসে ওই গ্রন্থটি রচনা করেন । তাছাড়া তিনি আরও একটি কাজ করেছিলেন : কিছু সমব্যথী ইহুদি পণ্ডিত ও ধনীব্যক্তির সহায়তায় গড়ে তুলেছিলেন একটি প্রতিষ্ঠান : Documentations Zentrum । তাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল একদল মানবতাবিরোধী অপরাধীকে চিহ্নিত করা । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে যারা ইহুদিদের উপর অত্যাচার করেছে তাদের তালিকা প্রস্তুত করা, তাদের অপরাধের সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহ করা । এই প্রতিষ্ঠানের সরবরাহ করা তথ্যের ভিত্তিতে 1,100 জন নাৎসি পলাতক ধর্ষকামীকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয় এবং আন্তর্জাতিক আদালত তাদের যথাবিহিত শাস্তি বিধান করেন [*The Sunflower*, Schocken Books, New York, 1996, Preface p.x.].

এই প্রতিষ্ঠানের সংগৃহীত তথ্য থেকে যুদ্ধান্তে আমি জানতে পেরেছিলাম যে, বৃক্ণ্‌আক্জ শহরের সাত নম্বর ওয়ার্ডের প্রথমধৃত 564 জন পোলিশ নগরবাসীর ভাগ্যে ঠিক কী ঘটেছিল । তাঁদের ভিতর কর্মক্ষম 487 জনকে সাইবেরিয়ার বন্দিশিবিরে ‘বন্ডেড-লেবার’ হিসাবে প্রেরণ করা হয় । বাকি সাতাত্তরজন বয়স্ক ও দুর্বলদেহী পোলিশকে তৎক্ষণাৎ ‘লিকুইডেট’ করা হয় । অর্থাৎ গ্রেপ্তারের দিনেই সাত নম্বর ওয়ার্ডের আটচল্লিশ বছর বয়সের পোলিশ ইহুদি বন্দি হের জন রথচাইল্ডকে ফায়ারিঙ স্কোয়াডের সামনে দাঁড়াতে হয় ।

তার নিগলিতার্থ : ক্যাপ্টেন পিটার কাটানৌস্কি যখন আমার মায়ের সঙ্গে পরামর্শ করে অর্থের বিনিময়ে তার স্বামীর বার্থ সার্টিফিকেট সংগ্রহ করে তখন সে জানত : মহিলাটি মিথ্যা স্বপ্ন দেখছে । যখন সে মিলিটারি ক্যান্টিন থেকে কেনা চকোলেট-বারটা আমার হাতে ধরিয়ে দেয় তখন সে জানতো : আমি সদ্য-পিতৃহীন । আর আমার মা যখন গহনার পুঁটুলি হাতে স্বামীর জীবনের বিনিময়ে তার সর্বস্ব খোয়াতে রাজি হয়ে ওর জিপে উঠে বসে তাঁর নারীধর্ম বিসর্জন দিতে যুপকাঠের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন — তখন মা না জানলেও সেই রেড-আর্মি কমরেড ক্যাপ্টেন জানত মহিলাটি সদ্যবিধবা !

*

*

*

ইতিমধ্যে বিশ্বপরিস্থিতিতে একটা বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেছে । হিটলার দীর্ঘ একবছর ধরে লন্ডন-শহরের উপর বোমাবর্ষণ করেও চার্লিলকে নতজানু করতে পারল না । গোটা লন্ডন শহর রাতের বেলা টিউব-স্টেশনে আশ্রয় নেয় । লন্ডনের আকাশে লাফতায় একচ্ছত্রভাবে অত্যাচার করে চলে; কিন্তু রাত ভোর হলেই চুরুটমুখে চার্লিল

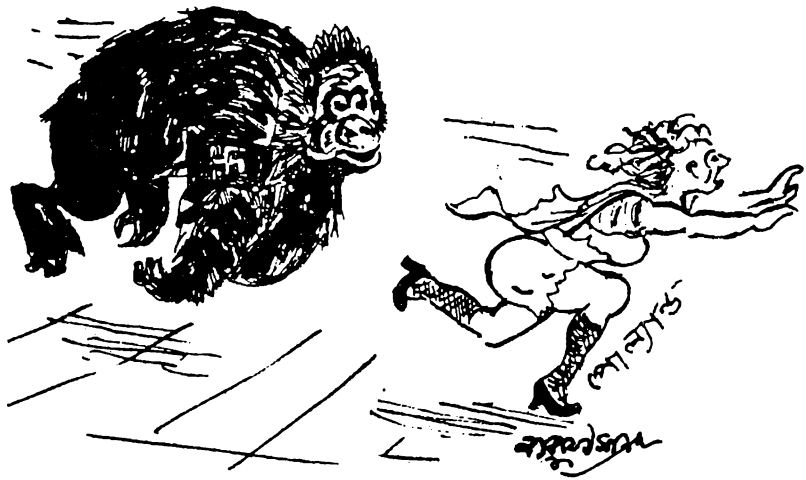
সুড়ঙ্গপথে টিউব স্টেশন থেকে উঠে এসে দু-আঙুলে ভিক্তি-সাইন দেখায়— যেন বুড়ো আঙুল নেড়ে হিটলারকে লবডকা দেখাচ্ছে।

বীতশ্রদ্ধ হিটলার তার মুখ ঘোরাল। তখনো আমেরিকা যুদ্ধে যোগদান করেনি— জাপানিরা পার্ল-হারবার আক্রমণ করেনি। গোটা বিশ্বে ইতালি বাদে হিটলারের একমাত্র বন্ধু রাশিয়া। হিটলার স্থির করল সেই বন্ধুটিকে আগে নতজানু করতে হবে। তাহলেই চার্চিল কুঁই কুঁই করতে করতে বশ্যতা স্বীকার করবে। তাই মহান ফ্যারার রুশো-জার্মান চুক্তিপত্রটা ছিঁড়ে ফেলে সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল রাশিয়ায়। মস্কো, স্ট্যালিনগ্রাড আর লেনিনগ্রাড—তিনটি শহরের পতন ঘটলেই স্তালিন হার মানতে বাধ্য হবে।

বেধে গেল জার্মানি আর রাশিয়ার মধ্যে যুদ্ধ।

পোল্যান্ডে তার প্রতিফলন হতে বাধ্য। একদিন রাশিয়ান সৈন্য যেমন রে-রে করে পোল্যান্ড দখল করতে তেড়ে এসেছিল, ঠিক তেমনি তারা রাতারাতি কুঁই-কুঁই করতে করতে ফিরে গেল নিজের রাষ্ট্রে। সারা দিন মিলিটারি ট্রাক আর ওয়েপন-কেরিয়ার পোল্যান্ড ছেড়ে রওনা হলো পুর্বমুখে। আমাদের শহরে মাত্র আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে রাশিয়ান সৈন্যের চিহ্নমাত্র রইল না। দুর্ভাগ্যবশত তার আগেই ওরা স্থানীয় শাসনব্যবস্থাকে গলা টিপে মেরেছে। ফলে রাশিয়ান সৈন্যদের প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে শহরে নেমে এল ভয়াবহ একটা নৈরাজ্য! অপরাধজীবীরা দল বেঁধে শুরু করল দোকানপাট লুট করা। গোটা শহর আর্গলবদ্ধ ঘরে রুদ্ধ নিশ্বাসে প্রহর গণতে থাকে। কী হয়, কী হয়!

দু-দিন পরে পশ্চিমদিক থেকে এসে গেলেন তাঁরা। নাৎসি প্যারাট্রুপার্স বাহিনী। সে আগমনের কথা জীবনে ভুলব না। রাত তখন দেড়টা-দুটো। আমরা তিন ভাইবোন মাকে আঁকড়ে বসে আছি। এসে গেল ঝাঁকে ঝাঁকে মোটর সাইকেল। তিন-চারশোর কম



নয়। কী প্রচণ্ড তাদের শব্দ। আমরা জানলার পর্দা একটু ফাঁক করে নিচের রাস্তা দেখি। এক-এক সারিতে তিনটে মোটর সাইকেল। সারা সড়ক জুড়ে। দিগন্তের শেষ সীমান্ত পর্যন্ত!

বিশ্বাস করুন—এই বৃদ্ধাবয়সেও সানফ্রান্সিস্কো শহরের উপকণ্ঠে প্যাসিফিকার নিশ্চিত অ্যাপার্টমেন্টে যখন মাঝরাাত্রে মোটর সাইকেলের শব্দে ঘুম ভেঙে যায়, তখন আজও আমার বুক ধড়ফড় করতে থাকে। সেই বালিকা বয়সের বিভীষিকাময় দুঃস্বপ্নটা গাঁক গাঁক করে ফিরে আসে। মনে হয়, বার্লিন চিড়িয়াখানার সেই গোরিলাটা আমাকে তাড়া করেছে। বার্লিন-জু-তে কোনও গোরিলা ছিল কি না আমি জানি না—কিন্তু স্বপ্নে দেখা সেই ছবিটা ভুলতে পারি না। জন্তুটা আমাকে তাড়া করে আসছে। আর আমি প্রাণভয়ে ছুটে পালাচ্ছি।

ইংরিজিতে একটা কথা আছে : ‘ফ্রম ফ্রাইং প্যান টু ফায়ার!’ আমাদের অবস্থাও তাই। রাশিয়ান ভালুকের মরণ-আলিঙ্গন থেকে মুক্তি পাওয়া মাত্র পড়ে গোলাম হিঞ্জ গোৱিলার খপ্পড়ে! রাশিয়ানদের তবু কিছুটা চক্ষুলাজ্জা ছিল—পশ্চাদেশে পদাঘাত করার আগে অনুরোধ করত, ‘দয়া করে একবার পিছন ফিরুন স্যার—আমি একটা লাথি কষাবো!’ এদের সেসব ভদ্রতা জ্ঞান নেই। এতদিন পোলিশ-ইহুদি আর পোলিশ-খ্রিস্টানদের মধ্যে কোনো প্রভেদ ছিল না। এখন হলো। নাৎসি কর্তা ধরে নিল পোলিশ-খ্রিস্টানরা ওদের পদানত বন্ধু, আর পোলিশ-ইহুদিরা উটকো আপদ। তাদের ধীরে ধীরে ‘লিকুইডেট’ করে ফেলতে হবে—অর্থাৎ নিশ্চিহ্ন। তাহলে তাদের বাড়ি-ঘর, গাড়ি-আসবাব, সব, স-ব ওরা অনায়াসে দখল করতে পারবে। রাশিয়ান অফিসারেরা, অন্তত প্রথম প্রথম শহরের বিভিন্ন পরিবারে ‘পেইং-গেস্ট’ হতে রাজি হয়েছিল। এরা তা হলো না।

অচিরেই ওরা বানিয়ে ফেলল : ঘেটো!

ঘেটো? তার মানে? দু’দিনেই বোঝা গেল শব্দটার অর্থ। শহরের যে-যে মহল্লায় ইহুদিদের ঘনবসতি সেখানে ওরা কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘিরে ফেলল। সেটা হলো ঘেটোর চৌহদ্দি। ইহুদি নাগরিকেরা সেই ঘেরাটোপ এলাকায় থাকবে। বশংবদ কিছু ইহুদি জননেতাকে নিয়ে তৈরি হলো : জুডেনরাট—অর্থাৎ ঘেটো-কাউন্সেল। যা কিছু নাৎসি ফরমান সেই কাউন্সেলকে জার্মানরা জানাতো। জুডেনরাটের কর্তব্যাক্তিরা তা গোটা এলাকায় টেঁড়া পিটিয়ে জানিয়ে দিত। আদেশ অনুযায়ী প্রত্যেকের বাঁ হাতে বাঁধতে হলো একটা করে হলদে পট্টি—তাতে ডেভিডের ঢাল-আঁকা। যাতে নাৎসি প্রভুরা দূর থেকেই সমঝে নিতে পারে কে মানুষ আর কে জুডেন! ঘেটো এলাকার মধ্যে কোনও স্কুল বা পিকচার হাউস ছিল না। পার্কও নেই। ফলে পড়াশুনা, খেলাধুলা করা চুলোর দোরের গেল।

সবচেয়ে মুশকিল হলো সেই সব পরিবারের, যাদের বাড়ি পড়ে গেছে ঘেটো-চৌহদ্দির বাইরে। তারা বাড়ি-ঘর ছেড়ে ঘেটোয় গিয়ে ভাড়াবাড়িতে এসে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলো। যেমন আমরা।

আমাদের ফাঁকা-করে দিয়ে যাওয়া বাড়িঘরগুলো, ষাট বালাই—সেগুলো ফাঁকা পড়ে থাকবে কেন? শহরে কয়েক হাজার নাৎসি সৈন্য এসেছে না? তারা থাকবে কোথায়? তারাই দখল করল সেইসব শূন্য ঘর-বাড়ি—কোনো কোনোটা প্রাসাদ।

এভাবে তৈরি হয়ে গেল ইহুদি সমাজের মধ্যে দুটি শ্রেণী—বাড়িওয়ালা ইহুদি, আর ভাড়াটে ইহুদি। ঘেটো-চৌহদ্দির ভিতর যেসব ভাগ্যবানের ভদ্রাসন পড়েছে প্রথম পর্যায়ে তাদের কোনো কষ্ট ভোগ করতে হয়নি। বরং দু-দশটি পরিবারের ভাগ্য খুলে গেল। ভাড়াটের কাছ থেকে মাসান্তে ভাড়া পেয়ে। তাদের স্থাবর সম্পত্তি তখনো নাৎসিরা গ্রাস করেনি।

আমাদের অবস্থা হলো সবচেয়ে চরম! মায়ের নগদ টাকা বা গহনা তো আগেই সব খোয়া গেছে। এখন গেল বাড়ি, গাড়ি, আসবাবপত্র। ঈশ্বর করুণাময়—মায়ের এক বান্ধবী তাঁর নিচের তলার একটি-মাত্র ঘর আর শৌচাগার আমাদের ব্যবহারের জন্য ছেড়ে দিলেন। মা নিঃশ্ব। ফলে ভাড়ার প্রশ্নই ওঠে না। তবে আন্টির ছিল দয়ার শরীর। বিনা ভাড়াতেই ওই একমাত্র ঘর ছেড়ে দিল। শর্ত হল—মা ওদের রান্না করে দেবে, ঘরদোর সাফা করবে, ডাইং-ক্রিনিং-এর খরচটা বন্ধ করবে। অর্থাৎ দু'বছর আগে যে ছিল 'ম্যাডাম ফ্রাউ রথচাইল্ড'—বিরিট ডিপার্টমেন্টাল স্টোরসের মালিকিন, আজ সে 'রাঁধুনী-কাম-ঝি'। ঘর-মোছা, কাপড়-কাচা, রান্না করা, বাসন ধোয়া—সব, স-ব কাজ চাপল তার ঘাড়ে। আমি আর বুনিও তাকে সাহায্য করতাম, যতটা আমাদের ক্ষমতায় কুলায়। কিন্তু পনের বছরের বুনিওকে বের হতে হলো রোজগারের ধান্দায়। মাথার তলায় ছাদ জুটেছে, পায়ের তলায় কার্পেট—কিন্তু পেট তো সে কথা মানবে না। বুনিও সাত সকালে বাজারে বার হয়ে যেত। ব্যাপারিদের মাল বইতে, সওদা-বেচায় সাহায্য করতে।

বিপদ এসে গেল অন্য এক অপ্রত্যাশিত দিক থেকে। আন্টি বিধবা, তার একটি মাত্র সন্তান : ওয়ার্ল্ডজ! বছর ষোল-সতেরর উঠতি জোয়ান। কিন্তু বুদ্ধিতে জড়ভরত। কোনোদিন স্কুলে যায়নি। বুদ্ধিটা না বাড়লেও বেড়েছে গতরে। দৈত্যের মতো চেহারা। কোমর থেকে নিম্নাঙ্গটা শুকনো, কাঠি-কাঠি। ঠ্যাঙদুটো ধনুকের মতো বাঁকা, যাকে ইংরেজিতে বলে 'ব্যান্ডি-লেগস'। নিম্নাঙ্গের খামতিটা পুষিয়ে নিয়েছে ওর উর্ধ্বাঙ্গ। বিরিট চওড়া লোমশ বুক। হাতদুটো গোরিলার মতো। আর মাঝে মাঝেই তার মুখ দিয়ে লালা বারে—ও বাঁ হাতের তালুতে তা ক্রমাগত মুছে ফেলে। ওকে দেখলেই আমার কেমন গা গুলিয়ে ওঠে। অন্তরাঝা খাঁচাছাড়া হয়ে যায়। আমার প্রতি তার বিশেষ নজর। খুঁটিয়ে

খুঁটিয়ে দেখত আমাকে। আমার মুখ, বুক, নিতম্ব। সামনে থেকে পিছন থেকে। লুকিয়ে।
মা সাবধান করে দিয়েছিল, ওয়ার্‌জা ছেলেটা ভাল নয়! সামলে চলবি। ও তোকে
বেড়াতে নিয়ে যেতে চাইলে বা ডাকলে যাবি না।

সাবধানবাণীর প্রয়োজন ছিল না। বনমানুষটার সৃষ্টিকর্তা তার দেহাকৃতিতেই সে
নোটিস টাঙিয়ে রেখেছেন। সে আমার সঙ্গে ভাব জমাতে এসেছিল।

—এ্যাই তোর নামটা কী রে?

আমি জবাব দিইনি। পালিয়ে এসেছিলাম।

এই সময়ে আমার ভিতর ভিতরও একটা দারুণ পরিবর্তন শুরু হয়ে গেছে। সেটা
1943 সাল—আমার বয়স তখন তের। শরীর-মন কী যেন একটা খুঁজছে। ঠিক কী, তা
বুঝতে পারি না। দুপুরবেলা মা ক্লান্ত হয়ে কার্পেটের উপর পড়ে ঘুমাতো। বুনিও যেত
বাজার, রোজগারের ধান্দায়। হার্‌সেল রাস্তায় ‘ডাংগুলি’ খেলছে পাড়ার ছেলেদের
সঙ্গে। আমি চুপচাপ গিয়ে বসে থাকতাম জানলার ধারে। পিছনের বাগানে কাঠবিড়ালী
আর পাখিদের ছোট্টছুটি আর ওড়াউড়ি দেখতাম। ভীষণ তেষ্ঠা পেত—ঢকঢক করে জল
খেতাম, কিন্তু তৃষ্ণা যেত না। কী যেন চাই, কীসের যেন অভাব। মনে পড়ত লিজার কথা।
লিজা ছিল আমার চেয়ে তিন-চার বছরের বড়—কিন্তু নিবিড় বন্ধুত্ব হয়েছিল তার সঙ্গে।
ও বলেছিল, ওর এক কাজিন ব্রাদার নাকি একদিন আচমকা ওর মুখে চুমু খেয়েছিল। সেই
অনুভূতিটা ও বোঝাবার চেষ্টা করত। লিজার সারা শরীর নাকি তখন থরথর করে কঁপে
উঠেছিল। ও কাউকে কথাটা জানায়নি। ওর মা বা দিদিকেও নয়। বর্ণনা করেছিল শুধু
আমার কাছে। সেদিন আমি কিছুই বুঝিনি। আজ, এই তের বছর বয়সে কথাটার অর্থ বুঝি
কিছুটা বুঝতে পারি। কিন্তু লিজা তো হারিয়ে গেছে আমার চেনাজানা দুনিয়া থেকে। কে
জানে সেই কাজিন-ব্রাদার আজও ওর মুখে চুমু খায় কি না। ও আজও থরথর করে কঁপে
কিনা।

আমাদের একতলায় পৃথক স্নানঘরে কপাট ছিল না। আমি বা মা যখন স্নান
করতাম তখন বুনিও আর হার্‌সেল বাড়ির ঝাইরে রাস্তায় পায়চারি করত। ভারি ইচ্ছে
করত তখন নিজেকে নগ্ন-অবস্থায় আয়নার মধ্যে দেখতে। আমার দেহে তিল-তিল করে
যে পরিবর্তন হচ্ছে তা অপরের চোখে কেমন লাগবে তা শুধু একজন জানাতে পারে।
আয়না!

একদিন সন্ধ্যা ঝেড়ে ফেলে আন্টিকে বলেই ফেলি, একতলায় এজমালি ঘরে
ভাল করে স্নান করতে পারি না। আজ তোমার বাথরুমে আমাকে স্নান করতে দেবে
আন্টি?

আন্টি বলে, ওমা, তু কেন দেব না? আধঘণ্টার তো ব্যাপার। এবার থেকে তুই

উপরে এসেই স্নান করিস। সাবান আর তোয়ালে শুধু নিয়ে আসবি। কেমন?

সাবান কোথায় পাব? তোয়ালেটা নিয়ে উপরের স্নানঘরে চলে যাই। মা তখন নিচে রান্না চাপিয়েছে। দোতলায় আন্টি তার লিভিং রুমে রেডিওতে যুদ্ধের নিউজ-বুলেটিন শুনছে। আমি বাথরুমের দরজাটা বন্ধ করে নিরাবরণ হয়ে গেলাম। প্রমাণ-মাপের আয়নাটার দিকে তাকিয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেছি। বিস্মিত আর বিমুগ্ধ! কে ওই মেয়েটা? সে এমন সুন্দর হয়ে উঠল কবে? ইচ্ছে করছিল...না, সে সব কথা থাক। সোপ-কেসে আন্টির একটা সুগন্ধি সাবান ছিল। লোভ সামলাতে পারি না। সাবান ঘষে, স্পঞ্জ দিয়ে গারগড়ে দারুণ আরাম করে স্নান করলাম—অনেক অনেক দিন পরে। সাবানটা তোয়ালেতে মুছে, ফুঁ দিয়ে শুকিয়ে যথাস্থানে রেখে দিই এবার। আন্টির চিরুনি দিয়েই চুল আঁচড়ে নিলাম। পাউডার মাখতে সাহস হলো না। জামা-ফ্রক গায়ে দিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে এসে দেখি, আন্টি তখনো বুঁদ হয়ে রেডিও শুনছে।

সিঁড়ি বেয়ে কস্তুরী মৃগের মতো নিজের গন্ধে বিভোর হয়ে লাফাতে লাফাতে নামছি; হঠাৎ ঘটে গেল দুর্ঘটনাটা। দানবটা লুকিয়ে বসে ছিল ল্যান্ডিংয়ে। গুড়ি মেরে। হঠাৎ লাফিয়ে উঠে সবলে জাপটে ধরল আমাকে। আমি চিৎকার করে উঠতে গেলাম, কিন্তু পারলাম না। জানোয়ারটা তার দুই ঠোঁটে আমাকে নিশ্বাস-বন্ধ-করা একটা চুমু খেল। ফ্যাচাঙ করে। একটা হাত দিয়ে সে আমার ব্লাউজের বোতাম খুলতে গেল। আমি বাধা দিই প্রাণপণে। তখন কোথাও কিছু নেই ও হঠাৎ সজোরে কামড়ে দিল আমার নিচের ঠোঁটটা। এবার আমি চিৎকার করে ওঠার সুযোগ পেলাম।

মা কড়াটা স্টোভ থেকে নামিয়ে উঠে এল ছুটে। আন্টিও নেমে এল উপর থেকে। কে বলে ওয়ার্‌জা জড়বুদ্ধি? চট করে ব্যাখ্যা দাখিল করে, রেবেকা পা-পিছলে পড়ে গেছে। ওর ঠোঁটটা কেটে গেছে!

মা আমার হাত ধরে নিচে নামিয়ে আনল। বিবসনা-স্নানের স্বর্গীয় আনন্দটা ধূপের ধোঁয়ার মতো মিলিয়ে গেছে। আমার শরীর তখন থর থর করে কাঁপছে। লিজারও তাই কেঁপেছিল না? কিন্তু আমরা দুজন মানসিক অনুভূতিতে বিপরীত মেরুর বাসিন্দা—যদিও একই ভাবে উত্তেজিত, একই ভাবে কাঁপছি। মা আমার ঠোঁটে কী-একটা মলম লাগিয়ে দিল। আমি কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ি।

বুনিওকে মা সম্ভবত সব কথা খুলে বলেছিল। সে সন্ধ্যাবেলা আমাকে বললে, আর কোনদিন একা একা দোতলায় যাবি না। বুঝেছিস?

ঘাড় নেড়ে সায় দিই। বুনিও মায়ের দিকে ফিরে বলে, জানোয়ারটা আবার যদি কোনোদিন এ রকম অসভ্যতা করে তাহলে ‘বুচার্স-নাইফ’ দিয়ে ওর ভুঁড়িটা ফাঁসিয়ে দেব।

মা বিরক্ত হয়ে বললে, দিলি! তারপর? তুই ফাঁসির দড়ি থেকে বুলবি। আর

আমি ? রেবা আর হার্ৎসেলকে নিয়ে গাছতলায় গিয়ে দাঁড়াব। এই তো ? সহজ সমাধান।

নিরুদ্ধ-আক্রোশে বুনিও ঘরের মধ্যে ক্রমাগত পায়চারি করতে থাকে। খাঁচায় বন্দি বাঘের মতো। ছোট বোনটাকে সে দারুণ ভালবাসে। তাকে জান-কবুল বাঁচাতে চায়। বোনের 'ইজ্জৎ-কা-সওয়াল' ! কিন্তু কী করতে পারে সে ? মা যে যুক্তি দেখিয়েছে সেটাও তো ফেলনা নয়। আমার ঠোটটা বিশ্রীভাবে কেটে গেছে। কিছু মুখে দিতে পারছি না। জ্বালা করছে। কিন্তু তার চেয়েও বেশি জ্বালা করছে মনের ভিতর।

সন্ধ্যার পর মা আমাকে এক বাটি দুধ খেতে দিল। আড়ালে ডেকে নিয়ে গেল। বললে, আজ তোকে কয়েকটা কথা বলব, রেবা। তুই এখন বড় হচ্ছিস। এসব কথা তোর জানা থাকা দরকার। না হলে পুরুষমানুষদের কাছ থেকে আত্মরক্ষা করতে পারবি না। ওয়র্জ্জাটা বর্বর। বোকা। সব পুরুষমানুষ কিন্তু অমন নয়। তারা নানাভাবে তোকে প্রলোভন দেখাবে। নানা মিষ্টি কথায় তোর মনটা জয় করবার চেষ্টা করবে। হয়তো প্রেজেন্টেশন কিনে দেবে। আদর করবে। বলবে, তুমি কী সুন্দর ! তোমার মতো সুন্দরী আমি জীবনে দেখিনি। হয়তো তোকে চকলেটের প্যাকেট উপহার দেবে...

হঠাৎ কথার মাঝেই থমকে থেমে যায়। বলে, সেবার তোকে চকলেট উপহার নেবার জন্যে চড় মেরেছিলাম, নারে ? কিন্তু সে দিন তুই ভুল করিসনি সেটা নিয়ে। ভুল করেছিলাম আমিই...

আমি মায়ের বুকের মধ্যে মুখটা গুঁজে দিয়ে বলি, না মামণি ! তুমিও ভুল করনি কিছু। হয়তো সব জেনেও সেদিন তুমি ওর অত্যাচার সহ্য করতে রাজি হয়েছিলে... বাপিকে ফিরে পাবে এই আশায় ! তাই না ?

মা আমাকে সবলে জড়িয়ে ধরে হু-হু করে কেঁদে ওঠে।

তারপর নিজেই সান্ত্বনা খুঁজে নেয়। চোখ মুছে বলে, সেদিন তুই খুব ছোট ছিলি। সব কথা বুঝিসনি। এখন তো বড় হয়ে যাচ্ছিস—তাই তোকে কয়েকটা কথা বলব...

সে রাত্রে মায়ের বুকে মুখ লুকিয়ে আমি 'জীবন-সত্য'-র গোপন কথাটা প্রথম জানতে পারলাম। সব সঙ্কোচ ঝেড়ে ফেলে মা আমাকে বুঝিয়ে দিল পুরুষ-নারীর সম্পর্ক। মেয়েদের যে একটা মাসিক বিড়ম্বনা সহ্যেতে হয়—আমার তা তখনো হয়নি—সে কথাও। বললে, তোর জীবনেও তেমন দিন আসবে। ভয় পাবি না। সঙ্গে সঙ্গে আমাকে এসে সব কথা খুলে বলবি। আমি শিখিয়ে দেব তখন কী করতে হয়...

আমি অবাক হয়ে যাই। জানতে চাই, তোমারও মাসে মাসে অমন বিড়ম্বনা হয় ?
—হবে না ? আমি যে মেয়ে !

আমার কৌতূহলের শেষ নেই ! আধো-অন্ধকারে সঙ্কোচও কিছু হলো না। বলি, আচ্ছা মা তুমি বলছ পুরুষমানুষ খুব খারাপ ! তাদের অত্যাচারে মেয়েদের পেটে বাচ্চা আসে..

মা আমাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বলেছিল, না রে রেবা! সে কথা আমি বলিনি। আমার পেটেও তো পাঁচ-পাঁচটা বাচ্চা এসেছে। তোরা সবাই এসেছিস আমার কোলে! তার মানে কি তোর বাপি আমার উপর অত্যাচার করেছে? না! সে-কথা কিন্তু আমি বলিনি? পুরুষ দু-জাতের। অত্যাচারী ডাকাত অথবা মনের মানুষ।

আবার সব গুলিয়ে গেল আমার। আকুলভাবে জানতে চাই, তাহলে কেমন করে বুঝব, মামণি—কে অত্যাচারী ডাকাত আর কেই বা মনের মানুষ?

মা বললে, তার কোনো বাঁধাধরা ছক নেই রে রেবা! তা মেয়েরা নিজেই নিজের জীবন দিয়ে বুঝতে পারে। আদোনাই—মানে আমাদের ‘গড’, তা মেয়েদের ঠিক সময়ে চিনিয়ে দেন। তোর জীবনের সেই পরম লগ্ন যখন আসবে, দেখবি তিনি তোর মনের ভিতর এসে তোকে ধাক্কা দিয়ে তুলে দেবেন! বলবেন, আর ঘুমিও না! জাগো রেবা! চোখ চেয়ে দেখ, সে এসে গেছে! তোমার সেই কল্ললোকের রাজপুত্র! তাকে বরণ করে ঘরে তোল। ওই তো তোমার : প্রিন্স চার্মিং!

আমার সমস্ত শরীর থর থর করে কেঁপে উঠল। লিজার যেমন হয়েছিল! আমার কল্ললোকের রাজপুত্র! এতদিন কি তার জন্যই এত মনমরা হয়ে ছিলাম? ‘কি যেন নেই, কে যেন নেই’—মনে হতো? আমার প্রিন্স চার্মিং?

বলি, আর একটা প্রশ্ন মা-মণি ...

—না! আজ এই পর্যন্তই! একদিনেই সব কথা জানলে রাতে ঘুম হবে না! আয় এবার শুয়ে পড়ি। ওই দ্যাখ—ওঘরে বুনিও আর হার্বসেল ঘুমিয়ে কাদা।

আমরা কার্পেটেই শুতাম। খাট-পালং-বিছানা কোথায় পাব? এক একটা মাথার বালিশ জুটেছে, এই যথেষ্ট। আর একটা করে কম্বল। পাশাপাশি চারজন। দরজার কাছে বুনিও, তারপর মা, তারপর আমি। হার্বসেলটা তো চরকিবাজি করে। সারারাত পাক খেত—কার্পেটের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে।

শুয়ে শুয়ে এপাশ-ওপাশ করছি। কিছুতেই ঘুম আসছে না। সারা বছরে স্কুলে যা শিখতাম তার চেয়ে অনেক-অনেক বেশি জেনে ফেলেছি এক সন্ধ্যায়। মা বলেছে—সে আসবে, সে আসছে। আমার প্রিন্স চার্মিং! কল্ললোকের রাজপুত্র! লিজা তাহলে সেদিন কিছু ভুল বলেনি। ওর সেই কাজিন-ব্রাদার—কী যেন নাম—সেই ছিল তার কল্ললোকের রাজপুত্র!

একটু পরে দেখি মাও ঘুমিয়ে কাদা। একটু আবুলি মতো এসেছিল, কে যেন আলতো করে আমার কাঁধে আঙুল ছোঁয়াল। আমি শিউরে উঠেছি : প্রিন্স চার্মিং?

না। হার্বসেল! কিন্তু এতরাত্রে? উঠে বসি। বলি, কীরে? কিছু বলবি?

ও কানে কানে ফিসফিস করে, শোন! তুই একটুও চিন্তা করবি না। ভয় পাবি না। আমি ওই জানোয়ারটাকে রুখব!

আমার ডুগরে হেসে উঠতে ইচ্ছে করছিল। কোনোক্রমে হাসি চেপে বলি, পারবি?
—আলবাৎ! দেখে নিস!

—তুই তো খুব বাহাদুর। তা বুনিওর তো একটা ‘বুচার্স-নাইফ’ দরকার পড়েছিল।
তুই কী দিয়ে লড়বি? স্রেফ ঘুঘির জোরে?

—তা কেন? আমি এখন থেকে সব সময় তোর সঙ্গে আঠার মতো সঁটে থাকব।
তোকে একা ধরতে না পারলে জনোয়ারটা তোকে ছুঁতেই সাহস পাবে না।

অবাক হতে হলো। হার্ৎসেলও তো তাহলে বড় হয়ে গেছে। এটুকু বুঝেছে—
নির্জনতার সুযোগ না পেলে ওয়ার্ৎজা অসভ্যতা করতে সাহস পাবে না।

বাস্তবে কিন্তু তাই হল। হার্ৎসেল দিনরাত আমার ছায়াসঙ্গী হয়ে থাকে।

সে খেলতে যায় না। পাড়া-বেড়াতে যায় না। আমাকে পাহারা দেয়। ওয়ার্ৎজা
ছোঁক ছোঁক করে। কিন্তু হার্ৎসেলের প্রহরায় সে আমাকে একা পায় না। কাছে ভিড়তে
পারে না।

দুর্ভাগ্য যখন আসে তখন তারা সার বেঁধে আসে। মোটর সাইকেল-চড়া নাৎসি
প্যারাট্রুপার্সদের মতো একের পিছে আর।

ওয়ার্ৎজার পাশব আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার তিন-দিন পরেই আমার জীবনে
ঘনিয়ে এল একটা চরম দুর্ঘটনা। জীবনের মোড়ই পালটে গেল। চেনা-জানা দুনিয়া থেকে
ছিটকে পড়লাম ভয়াবহ এক সঙ্কটের আবর্তে।

পরদিনই রোজালিন এল আমাদের বাড়িতে। ফ্রি-টাউন থেকে যেটোয়। রোজা
আমার ক্লাসফ্রেন্ড। মানে ছিল। সেই যে-যুগে আমাদের ক্রিশ্চিয়ান স্কুলে পড়তে দেওয়া
হতো। নাৎসি আক্রমণের আগেকার যুগের কথা বলছি। তার সঙ্গে আমার ছিল ঘনিষ্ঠ
বন্ধুত্ব। ওরা রোমান ক্যাথলিক। নিমন্ত্রণ করতে এসেছিল তার ত্রয়োদশ জন্মদিনে। ওর
বাবা শহরের একজন নামকরা ডাক্তার। তিনি আমাদের যেটোর জুডেনরাট কর্তৃপক্ষের
অনুমতিপত্র তৈরি করিয়ে দিয়েছেন। পরদিন বিকেল চারটে থেকে রাত আটটা পর্যন্ত।
যেটোর বাইরে যাবার ছাড়পত্রটাও রোজা আমার হাতে গুঁজে দিয়ে বলল, নিশ্চিত
আসবি। তোর সাইকেলে চেপে।

সাইকেলটা যে অর্থাভাবে খোয়া গেছে সে কথা বলি না।

এখনো জমিয়ে ঠাণ্ডা পড়েনি। রাত আটটার মধ্যে ফিরে আসতে হবে।
শীতবস্ত্রের দরকার নেই। কিন্তু জন্মদিনের নিমন্ত্রণ রাখতে যাবার মতো পোশাকই কি
একটা আছে, ছাই? ভালো সিল্কের ফ্রক একটাই আছে; কিন্তু এতদিনে গায়ে ছোট হয়ে
গেছে। বুলে না হলেও বুকে। এ দু’বছরে মাথায় তেমন না বাড়লেও—কী লজ্জা!

আমি বলি, থাক, যাব না!

মা বলে, শোন! অনেক দিন ভালমন্দ কিছু মুখে দেবার সুযোগ পাসনি। আজ যা, আনন্দ করে আয় বন্ধুদের নিয়ে। দেখ আমি কী সুন্দর ব্যবস্থা করে দিই।

বুনিওর রোজগারের মার্ক থেকে আমার জন্য একটা ব্রেসিয়ার কিনে আনল। সেই আমি জীবনে প্রথম ব্রা পরলাম। তারপর ব্লাউজের পিছনের বোতামগুলো কেটে ফেলে সিল্কের সুতো দিয়ে পিঠের দিকে দারণ একটা লেসের জালি বানিয়ে দিল। ফাঁস দেওয়া ক্রিস্-ক্রস্ বুনানি। যেন মাপে ছোট হয়ে যাবার জন্য নয়, স্টাইলের জন্যই সেটা বানানো। জামাটা ফিট করল আমার। আমি খুশি হয়ে মা-মণির গালে একটা চুমু খেলাম!

কিন্তু জন্মদিনে একটা প্রেজেন্টেশনও তো নিয়ে যেতে হয়। বুনিও বললে, সে দায়িত্ব আমার। দ্যাখ্ কী চমৎকার একটা প্রেজেন্টেশন বানিয়ে দেব।

দিলও! ওর নিজে-হাতে আঁকা একখানা প্যাস্টেলের নিসর্গচিত্র। তলায় ওল্ড-ইংলিশ হরফে জন্মদিনের একটা শুভেচ্ছাবাণী। পিস বোর্ডের স্ট্যান্ডসমেত—যাতে টেবিলে সাজিয়ে রাখা যায়! আমি তার গালেও একটা চুমু খেলাম আনন্দে।

রোজালিনদের বাড়িটা ফ্রি-টাউনে, মাইল দেড়েক দূরে। কতবার গেছি ওদের বাড়িতে। স্কুলে পড়ার সময়। এবার অনেক-অনেকদিন পরে এলাম।

ড্রইং রুমটা বেলুন আর ফেস্টুনে সাজানো। সাত-আটজন বন্ধুবান্ধবীকে নিমন্ত্রণ করেছিল ও। প্রায় সকলেই আমার পরিচিত। আমাকে ফিরে পেয়ে সবাই হৈ হৈ করে উঠল। মারিয়া বললে, ওমা! তুই কী সুন্দর হয়ে গেছিস রে, রেবা! তোকে চেনাই যায় না আর!

রোজার দাদা ম্যাজিক দেখাল। রোজা পিয়ানোতে কিছু টুংটাং বাজাল আর একটি অচেঁনা ছেলে—বুনিওর বয়সী হবে হয়তো—একটা ব্যাঞ্জো বাজিয়ে সুন্দর গান গাইল। ভাষাটা জার্মান বা পোলিশ নয়। গানের অর্থ তাই বোঝা গেল না। তবে সুরটা ভারি মিষ্টি আর ছেলেটার গলাও দারণ। তার গান শেষ হতেই সবাই হাততালি দিল। আমিও দিলাম। ছেলেটি ব্যাঞ্জো নামিয়ে রেখে আমার কাছে এগিয়ে এসে ঘনিয়ে বসল। একটু ঝুঁকে পড়ে অস্ফুটে বললে, তোমার সঙ্গে আমার আলাপ নেই। তুমি তো রেবা? ফ্রলিন রেবেকা রথচাইল্ড? তাই না?

ছেলেটির উর্ধ্বাঙ্গে একটা টুইলের শাট। প্যান্টালুনটা মাপে বেশ ছোট—হাঁটু আর গোড়ালির মাঝামাঝি পর্যন্ত। পুরানো দিনের প্যান্ট।

মাথার চুল কৌকড়া-কৌকড়া। হাসিটি ভারি মিষ্টি।

আমি বলি, তুমি কী করে আমার নাম জানলে?

—রোজা বলেছিল, ঘোটা থেকে আমার মতো তুমিও আজ আসবে। তোমার নামটা বলেছিল, মনে আছে।

বলি, তুমিও ইহুদি বুঝি ?

—দেখে বুঝতে পারনি ? শুধু তুমি-অমিই তো এ জমায়েতে দলছুট।

—আমি কিন্তু এখনো তোমার নামটা জানি না।

—আমার নাম, আব্রাসা। আব্রাসা অ্যাপ্লম্যান। থাকি ঘেটোর পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডে।

ও জানতে চাইল আমাদের বাড়ির কথা। কে-কে আছেন আমাদের পরিবারে। সে খবর জানিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার ?

স্নান হেসে বললে, কেউ নেই, রেবা! আমি...ইয়ে...অফরান। মানুষ হয়েছি এক আন্টির কাছে। মায়ের দূরসম্পর্কের বোন।

জানতে চাই, তুমি যে গানটা গাইলে ওটা কী ভাষায় ?

—চেক। আমি চেকোস্লোভাকিয়ান। রোজারাও তাই। অনেক দিন পোল্যান্ডে আছি অবশ্য।

—গানটা খুব সুন্দর হয়েছে। কথাগুলোর মানে কী বলবে ?

—কথাগুলোর মানে ? বলব ? তুমি কিছু ভুল বুঝবে না তো ?

—ওমা ! ভুল বুঝব কেন ? গানটা তো তুমি লেখনি! আর আমার জন্যও গীতিকার লেখেননি!

—কিন্তু গাইবার সময় আমি যে শুধু তোমার দিকেই তাকিয়ে ছিলাম ?

—তাতে কী ?

এই সময় বাধা পড়ল। রোজালিনের মা আমাদের বললেন, তোমরা দুজন বরং এবার খেয়ে নাও। তোমাদের তো আটটার আগে ফিরে যেতে হবে। এরা অনেক রাত পর্যন্ত এখন হৈ-ছল্লোড় করবে।

তা বটে! সন্ধ্যা প্রায় সাতটা বাজে। যেতেও আধঘণ্টা-থানেক লাগবে।

রোজালিন বললে, আয়। পাশের ঘরে মা তাদের জন্য টেবিল পেতেছে।

আমরা উঠতে যাব। ঠিক তখনই কে যেন দুম-দুম করে দরজায় ধাক্কা মারল। একই সঙ্গে আর্তনাদ করে উঠল কলবেলটা। রোজার বাবা এগিয়ে এসে খুলে দিলেন দরজাটা।

ঘরে প্রবেশ করল দুজন নাৎসি সার্জেন্ট। মিলিটারি পোশাকে। হাতে স্টেনগান। একজন বললে, গুড ইভনিং ডক্টর! এখানে কি আজ সন্ধ্যায় একটা পার্টি হচ্ছে ?

—না। ঠিক পার্টি নয়। আমার মেয়ের জন্মদিনে...

—আই সী ! বার্থডে পার্টি! এই নিশ্চয় আপনার মেয়ে ?

ঠিকই চিনেছে সৈনিকটি। সাজপোশাকে রোজালিনকে চিনে নেওয়া শক্ত নয়। ডাক্তারবাবুর জবাবের প্রতীক্ষা না করে সৈনিকটি বললে, হ্যাপি বার্থ ডে টু ইউ, ক্লেন মাদশান (ছোট্ট সোনা মেয়েটি)!

রোজা তার ফ্রকের দুই প্রান্ত ধরে ফরাসি কায়দায় বাও করে বললে : আশাঁতে ।

—নাইন (না!)! ‘আশাঁতে’ একটি ফরাসি লজ্জা । ফ্রান্স আমাদের শত্রুপক্ষ । ধন্যবাদ জানানো এবার থেকে বলবে : ‘ডাঙ্কে!’

রোজার বাক্যি হরে গেছে । সৈনিকটি রাইট-টার্ন করে তার বাবার মুখোমুখি হলো । বললে, ডক্! আমাদের খবর দু-দুটো জুডেন এখন এখানে লুকিয়ে আছে । কোন দুজন দয়া করে দেখিয়ে দেবেন ?

রোজার বাবা স্তম্ভিত । বলেন, লুকিয়ে আছে! না-না! লুকিয়ে থাকবে কেন? ওরা আমার মেয়ের বন্ধু । ওঁরা আমন্ত্রিতমাত্র । অতিথি!

—বাট দে আর জুডেন! মানছেন তাহলে?

—কী আশ্চর্য! ওরা দুজন যেটো থেকে রীতিমতো পারমিট নিয়ে এসেছে । রাত আটটার মধ্যে ফিরে যাবে ওরা । ওদের কাছে জুডেনরাটের পারমিট আছে ।

—কই দেখি ?

আমি আর আব্রাসা ভয়ে-ভয়ে আমাদের ছাড়পত্র দুটো বার করে ওর হাতে দিলাম । লোকটা তাকিয়েও দেখল না । কাগজদুটো কুচিকুচি করে ছিঁড়ে ছড়িয়ে দিল কার্পেটের উপর । এক গাল হেসে রোজার বাবার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করে, এখন তো আপনি স্বীকার করবেন যে, ওদের কাছে কোনো পারমিট নেই ?

রোজার বাবা বজ্রাহত । আমতা-আমতা করে বলেন, এসব কী বলছেন আপনি ?

সার্জেন্ট তাঁকে জবাব দিল না । কোমরবন্ধ থেকে রিভলভারটা বার করে আমাদের দুজনকে বললে, ‘ওঁর্জ! ওঁর্জ! ডু জিড্’ (বেরিয়ে আয়! বেরিয়ে আয়! ইহুদির বাচ্চা!)

রোজার বাবা প্রতিবাদ করেন, এ আপনি কী করছেন? আমার বাড়ি থেকে এভাবে বিনা অপরাধে—বৈধ পারমিট থাকা সত্ত্বেও...

লোকটা আবার গৃহকর্তার মুখোমুখি হলো । বললে, আপনি সজ্ঞানে নাৎসি-জার্মানির যুদ্ধ প্রচেষ্টায় বাধা দিচ্ছেন, ডক্টর?

—যুদ্ধ প্রচেষ্টা! এই দুটি নাবালক ছেলেমেয়েকে এভাবে টেনে-হিঁচড়ে ধরে নিয়ে যাওয়া কি জার্মানির যুদ্ধপ্রচেষ্টা?

লোকটা জবাব দিল না । রিভলভারটার লক্ষ্যমুখ বদলে গেল শুধু ।

ডাক্তারবাবু বলেন, ‘লুক হিয়ার সার্জেন্ট! আমি নাৎসি ওয়ার হসপিটালের একজন সিনিয়র ডক্টর’...

লোকটা দাঁতে-দাঁত চেপে হিসহিসিয়ে ওঠে : নাকি? লুক হিয়ার হের সিনিয়র ডক্। আপনি আমাকে বাধা দিলে আমার আঙুলটা ট্রিগার টেনে দেবে! ওই মিলিটারি হসপিটালে আপনি আর কোনোদিন যাবার সুযোগ পাবেন না । সরাসরি চলে যাবেন মর্গে! আর একটা কথা বলে দেখুন!

একটা ক্ষিপ্ৰ চিতাবাঘের মতো আব্রাসা ঝাঁপিয়ে পড়ল বৃদ্ধের উপর। তাঁর মুখে হাত চাপা দিয়ে চেক অথবা স্লোভাক ভাষায় বললে—কী বলল তা তখন বুঝিনি, পরে জিজ্ঞেস করে জেনেছি—কোনো কথা উচ্চারণ করবেন না, আঙ্কল! আমাদের অ্যারেস্ট আপনি ঠেকাতে পারবেন না। ও লোকটার চোখে আমি খুনির দৃষ্টি দেখেছি! অহেতুক রোজা তার জন্মদিনে পিতৃহীন হয়ে যাবে!

সার্জেন্ট বললে, তুই ওকে কী বললি?

—কথা বলতে বারণ করলাম। য্যা (ইয়েস) আমরা রেডি। চল কোথায় নিয়ে যাবে?

আশ্চৰ্য ছেলেটার মনের জোর! আমার দিকে ফিরে স্নান হেসে বললে, কাম অন রেবেকা! উই আর নাউ অন দ্য সেম বোট, সিস্টার!

বুকৎআকজ্ শহরের আলো-ঝলমল বাঁধানো সড়ক। জিপটা এঁকে বেঁকে চলেছে শহরের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে। সার্জেন্ট নিজেই চালাচ্ছে। পাশের সিটে স্টেনগানধারী তার সহযোগী। পিছনের সিটে আমরা দুজন। আব্রাসার ডানহাতের সঙ্গে আমার বাঁ হাতের কজ্জিতে স্টেনলেস স্টিলের হ্যান্ডকাফ! কেউ কোন কথা বলছি না। পিছন দিকে সরে যাচ্ছে আলোয়-আলো দোকানপাট। রেস্টোরাঁ-কাফে-ক্যাবারে হল—পিকচার হাউস। লজ্জাসরমের মাথা খেয়ে বুকৎআকজ্ আজ নাৎসি-নাগরের সঙ্গে ফ্লার্ট করছে। যেমন ক’দিন আগে করত রেড-আর্মির সঙ্গে। ওদিকে নিষ্প্রদীপ ঘেটোয় যে তার আদি বাসিন্দাদের মোমবাতি জ্বালার সংস্থান নেই তা ওর খেয়ালই নেই। আমার অধরোষ্ঠ নিজের অজান্তেই উচ্চারণ করে বসল : নির্লজ্জ!

আব্রাসা আমার দিকে ফিরে ফিসফিস কবে জানতে চায়, কার কথা বলছিস?

—এই শহরটা! আলোর নেকলেস গলায় দিয়ে কী খিলখিলিয়ে হাসছে দ্যাখ!

ও বললে, না রে রেবা! ও আলোয় আলোয় কাঁদছে! বুকৎআকজ্ শহরটাও তো তোর আমার মতোই বন্দিনী! তুই-আর আমিও কি আজ সন্ধ্যায় জন্মদিনের পার্টিতে ফুৰ্তি করতে আসিনি? বল? এই তো জীবন!

সার্জেন্ট গাড়ি চালাতে চালাতেই বলে, অ্যাই! তোরা কথা বলবি না!

—বলব না? অল রাইট!

—ফের যদি বকবক করিস ...

ওর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে আব্রাসা বললে, জেলখানায় যাবার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হব। সরাসরি চলে যাব মর্গে। এই তো? আমার মনে আছে, বস!

‘বস’ সম্বোধনেই জন্যই হোক আথবা ট্রাফিক সিগনালের দিকে চোখ পড়ার জন্যই—
লোকটা আর কথা বাড়াল না।

জিপটা এসে থামল প্রকাণ্ড একটা বাড়ির সামনে। প্রাসাদই বলা চলে। এককালে হয়তো ছিল কোনো ধনী ইহুদির আনন্দঘন নীড়। বর্তমানে নাৎসি হেডকোয়ার্টার্স। মাটির নিচে পাশাপাশি কতকগুলো ছোট ছোট ঘর। হয়তো এককালে ছিল গুদামঘর। এখন প্রিজেন-সেল। আমাদের দুজনকে একটা সেল-এর সামনে নিয়ে এসে সার্জেন্ট বললে, আজ রাতটা তোরা দুজন এখানেই থাকবি। কাল সকাল আটটায় আমি আসব। তখন তোদের বিচার হবে। যা—টোক ভিতরে।

আব্রাসা জানতে চায়, ওপাশের ওই ছোট দরজাটা কিসের?

—ওটা টয়লেট! ঘরে কার্পেট পাতাই আছে। ওই দ্যাখ খান দুই কম্বলও আছে।
এত রাতে আর খাবার মিলবে না। কাল সকালে পাবি।

আব্রাসা বলে, লুক হিয়ার, বস! এ মেয়েটি আমার কাজিন! রাত্রে ও যদি টয়লেটে যেতে চায়...

—যেতে চায়? তো কী? যাবে। দরজাটা তো খোলাই আছে।

—না! মানে ইয়ে...

আব্রাসা আমাদের হ্যান্ডকাফটা দেখায়! সার্জেন্ট অট্টহাস্য করে ওঠে : ও আই সী! আমার মনে ছিল না। কাজিন ব্রাদারের সমুখে মেয়েরা প্যান্টি খোলে—হামেহালই খোলে—তবে সেটা, মানে, ইয়ে correct! ‘হিসি’ করার সময় নয়!

আমার ইচ্ছা করছিল সজোরে ওর গালে একটা থাপ্পড় কশিয়ে দিই! কিন্তু উপায় নেই। আমি আব্রাসার সঙ্গে বাঁধা পড়ে আছি। অসভ্যতা দাঁত বার করে হাসতে হাসতে আমাদের হাতকড়াটা খুলে নিল। আরও রসিকতা করে আব্রাসাকে বললে, তাছাড়া তোর হাতে যদি হ্যান্ডকাফ পরা থাকে তাহলে তুই তোর কাজিন-সিস্টারকে ‘পঈং’ করবি কেমন করে? বল?

অসীম ধৈর্য আব্রাসার। নিরল্জ্জের মতো যোগ দিল ওর হাসিতে! আমি অবাক হয়ে লক্ষ্য করি, সার্জেন্ট আব্রাসার দিকে ফিরে তার ডান চোখটা বন্ধ করল। আব্রাসা দেখাদেখি তার বাঁ-চোখটা বন্ধ করে বললে, ডাঙ্কে!

লোকটা হাসতে হাসতে চলোঁই যাচ্ছিল। হঠাৎ কী মনে করে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আবার এক গাল হেসে বলে : হ নোজ! দিস মে বি ইওর লাস্ট নাইট টুগেদার উইথ ইয়োর সুঈস্ট কাজিন-সিস্টার!

দরজাটা ড্রাম করে বন্ধ হয়ে গেল। ক্লিক করে শব্দ হলো তালাবন্ধের।

লজ্জায়, অভিমানে, হতাশায় আমি থপ করে বসে পড়লাম কার্পেটের উপর। ওর দিকে পিছন ফিরে। হ-হ করে কেঁদে ফেলি।

আব্রাসা অপেক্ষা করল। কেঁদে আমাকে মনটা হালকা করতে দিল। তারপর মমতামাখা নরম গলায় বললে, একটা কথা বলি, মন দিয়ে শোন, রেবা! হয়তো এক মুহূর্ত আগে আমার কর্তব্য ছিল তোর মাথায় হাত বুলানো, কিংবা চোখের জলটা মুছে দেওয়া। কিন্তু তা আমি করিনি—তা আমি পারব না—কারণ আজ সারারাতের মধ্যে তোকে আমি ছাঁব না। তুই আমাকে ভয় পাসনে! আমার কথার নড়চড় হয় না। ঘরে দুটো কন্মল আছে। তুই একটা জড়িয়ে নিয়ে ও পাশে গিয়ে শুয়ে পড়। আমি আর একটা নিয়ে এদিকে শোব। আলোটা জ্বলাই থাক। অন্ধকার হলে তুই ভয় পাবি।

আমি চোখের জল মুছে ওর দিকে তাকাই। বলি, আমার ভূতের ভয় নেই! আলো জ্বললে, তোর-আমার কারও ঘুম হবে না।

—তা হোক! তবু আলোটা জ্বলুক।

—কিন্তু কেন? তোর ভূতের ভয় আছে?

—না নেই। আমার জন্য নয়, তোর জন্য —

—আমি তো বললাম, আমার ভূতের ভয় নেই!

—তা যেমন নেই, তেমনি একটা অজানা পুরুষের সঙ্গে বন্ধ ঘরে একবিছানায় শোবার অভিজ্ঞতাও তো নেই তোর? তাই না?

কথাটা ভাববার। একটু ভেবে নিয়ে বলি, সে ভয়ও আমার নেই! আর তুই তো আমার অচেনা ন'স। তোর যেটুকু পরিচয় ইতিমধ্যে পেয়েছি, আব্রাসা, তাতে আমি নিশ্চিত, তুই অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে...

—তা হোক। আলোটা জ্বলবে!

আমি রুখে উঠি, কেন? তুই তো বললি যে, তোরও ভূতের ভয় নেই...

এরপর জবাব দিতে ওরই একটু দেরি হলো। গুছিয়ে নিয়ে বললে, কিন্তু রেবা! আমারও যে সে অভিজ্ঞতা নেই—

মুখ ফসকে জিজ্ঞেস করি, কিসের অভিজ্ঞতা?

—বুঝিস না কেন? আমিও তো মানুষ! রক্তমাংসে গড়া! নিজের উপর বিশ্বাস... আমিও তো কখনো ...

মাঝপথেই থেমে যায়। আমি দু'হাতে মুখ ঢাকি! আবার ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলি। এবারও ও হাতটা বাড়িয়ে দিল না আমার মাথায়। মুছিয়ে দিল না আমার চোখের জল।

আদোনাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। কথাটা উনি আমার মনের কানেকানে বলেছেন। আব্রাসা শুনতে পায়নি। আমি যে স্পষ্ট শুনতে পেলাম—আদোনাই আমার মনের কানে-কানে ঠিক ওই কথাটাই ফিস ফিস করে বলছেন : রেবেকা! রেবা! এতদিনে সময়

হয়েছে! ওঠ! দেখ! সে এসেছে! তোর কল্পলোকের সেই রাজপুত্র। চিনতে পারছিস না? তোর প্রিন্স চার্মিং।

তারপর যেন কথা ঘোরাতে ও বললে, ওই জগটায় জল আছে। তেষ্ঠা পেয়েছে? জল খাবি?

বলি, না! কিন্তু আলো নিবিয়ে দিতে যখন তোর আপত্তি, তখন আয়, গল্প করই রাতটা কাটিয়ে দিই। প্রথমে বল, যে গানটা রোজাদের বাড়িতে গাইলি তার কথাগুলোর মানে কী?

ও বিচিত্র হাসল। বলল, মানেটা যদি সর্বসমক্ষে তখনই বলে ফেলতাম তাহলে তা সম্ভবপর ছিল, কিন্তু এখন আর —

— কেন এখন কিসের অসুবিধা?

— অলরাইট। বলছি শোন। গীতিকার তাঁর মানসীকে বলছেন, তোমার ওই ডাগর হরিণনয়ন দিয়ে তুমি কি শুধু আমার বাইরেটাই দেখতে পাচ্ছ? আমার অন্তরে তোমার জন্য যে মন্দির গড়েছি তার বেদীটা যে শূন্য পড়ে আছে, তা কি তুমি দেখতে পাও না?

বুঝতে পারি, কথাগুলোর মানে বলে দিতে ও তখন কেন অত সঙ্কোচ করেছিল। আবার কথা ঘোরাতে বলি, রোজার সঙ্গে তোর কতদিনের আলাপ?

— ছেলেবেলা থেকে। চেকোস্লোভাকিয়ায় আমরা পাশাপাশি বাড়িতে থাকতাম।

— তখন থেকেই ও তোর গার্লফ্রেন্ড? কাফ্‌ ল্যভ?

— না রেবা। ও আমার ছোট বোনের মতো। একসঙ্গে বেড়ে উঠলে যেমন হয় আর কি। এবার তুই বরং বল তোর বাবার কথা, বড়দা, মেজদার কথা। তুই তখন বলেছিলি যে, তাঁরা সবাই মারা গেছেন—

— না। জাখারি, মানে বড়দা মারা যায়নি। সে পোল্যান্ডের বিদ্রোহী বাহিনীতে গুপ্তসমিতিতে আছে।

ও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব কথা শুনল।

গল্প করতে করতে রাত নিশুতি হয়ে গেল। আব্রাসা বললে, এবার একটু ঘুমোবার চেষ্টা করা যাক বরং।

শুয়ে পড়ি কঞ্চল মুড়ি দিয়ে। তিনহাত দূরে আব্রাসাও ও পাশ ফিরে কঞ্চল জড়িয়ে শুয়ে পড়ে। কিন্তু ঘুম এল না কিছুতেই। দূরে গির্জার ঘড়িতে এগারোটো বাজল, বারোটো বাজল। কিন্তু ঘুমের চিহ্নমাত্র নেই। বেশ বুঝছি, আব্রাসাও শুধু এপাশ-ওপাশ করছে। হঠাৎ মনে হলো, অনিদ্রার কারণটা বোধ হয় ওই অনভ্যাসের ফাঁটাটা। ব্রেসিয়ারটা। জীবনে আজই প্রথম পরেছি। মাকে দেখেছি, রাতে সেটা খুলে শোয়। তাতেই ঘুম আসছে না। টয়লেটে গেলাম সেটা খুলে আসব বলে। কিন্তু কখনো পরিনি—কেমন করে পিঠে

হাত চালিয়ে ওর হুক খুলতে হয়, জানি না। মিনিট-দশেক ধস্তাধস্তি করে বৃথাই গলদঘর্ম হলাম। টয়লেটের দরজা একটু ফাঁক করে দেখি, আব্রাসাও চুপচাপ উঠে বসে আছে। দরজা খুলতেই ও চোখ তুলে তাকাল। বললে, ফ্লাশটা কাজ করছে না বুঝি? শব্দ হলো না তো?

লজ্জার মাথা খেয়ে বলি, সে জন্য টয়লেটে যাইনি।

ও দুটি জিজ্ঞাসু চোখের দৃষ্টি মেলে ধরল। প্রশ্ন করল না কিছু। চোখটা নিচু করে বলি, হুকটা খুলতে পারছি না—

—হুক ! কিসের হুক ?

—‘ইয়ের’! ...মানে ওটা পরে তো রাতে শুই না। তাই ঘুম আসছে না। মা খুলে দেয় ! ...ব্রার...

ও নিঃশব্দে এগিয়ে এল। আমি পিছন ফিরে দাঁড়াই। ও ইতস্তত করল কিছুক্ষণ। তারপর বললে, হুকটা তো ব্লাউজের ভিতরে। দেখা যাচ্ছে না। এই সিল্কের সুতোর ফাঁস না খুলে...

ধমকে উঠি, তা আমি কি বলেছি সিল্কের সুতোয় হাত না দিতে ?

—ও ! না মানে, ...ইয়ে... আমিও তো কখনো এর আগে কারোও ব্রেশিয়ারের হুক খুলিনি, তাই...

পিছন ফিরে আছি। চক্ষুলজ্জার বালাই নেই। তাই ফস করে বসে বলি, সত্যি বলছিস ? কখনো খুলিসনি আগে ?

আমার গূঢ় রসিকতাটা বৃথাই গেল। ও সরল অর্থটা গ্রহণ করে বললে, তখন বললাম না? মাসি ছাড়া আমাদের বাড়িতে আর কেউ নেই! মাসি কখনো আমাকে বলেনি —

আব্রাসা নির্বোধ নয়। আমার বাকপ্রয়োগের তির্যক-অর্থটা নিশ্চয় বুঝেছে। কিন্তু সেদিক দিয়ে গেল না। নিপুণ আঙুলে সিল্কের ক্রিস-ক্রিস বিনুনিটা আলগা করে ব্রা-র হুক-দুটো খুলে দিল। কিন্তু সে কাজটা সুসম্পন্ন করল চিত্রকরের নিপুণতায়। ক্যানভাসে শুধু তুলির ছোঁয়াই লাগল, আঙুলের নয়। কেন? আঙুলে রঙ লেগে যাবে, এই আশঙ্কায় ? পিঠে সিল্কের সুতোর সুড়সুড়িই শুধু টের পেলাম। অভিমান করে বলি, ধন্যবাদ! এবার ওপাশ ফিরে বস। আমি ব্রা-টা খুলে ব্লাউজটা আবার গায়ে দেব।

ও নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলল, তার জন্য আমাকে ওপাশ ফিরে চোখ বন্ধ করতে হবে কেন? তুই আবার টয়লেটে গিয়েই ঠিকঠাক হয়ে আয় না!

দুম দুম করে তাই উঠে যাই! ছেলোটো নির্বোধ নয়। তবে কি পাষণ? অথবা সেইন্ট!

বাথরুমে বসেই এক ড্যানিয়ুব কাঁদলাম। অভিমানে। অপমানে। এ আমার নারীত্বের অপমান! কী—না প্রতিজ্ঞা করেছি, আজ রাতে তোমাকে ছোঁব না! কে বলেছিল তোমাকে অমন প্রতিজ্ঞা করতে? আমি?

আধঘণ্টা পরে এ ঘরে এসে দেখি—ও ঘুমিয়ে কাদ। আশ্চর্য মানুষ!

আরও আধঘণ্টা পরে। একটু আবুলি মতো এসেছিল। হঠাৎ প্রচণ্ড শীতে আমার তন্দ্রার ভাব ছুটে গেল। ঘরটা মাটির তলায়। ছিল গুদামঘর। স্যাঁৎসেঁতে। নিচে থেকে ঠাণ্ডা উঠছে। বাইরে বোধহয় ঝেঁপে বৃষ্টিও নেমেছে। বোধহয় জাঁকিয়ে শীত আসছে। আমি ম্যালেরিয়া রুগীর মতো থরথর করে কাঁপতে থাকি। রাত্রে নিমন্ত্রণ খাব বলে দিনের বেলাতেও খাওয়াটা বাদ দিয়েছি। যাতে ওরা একটা বেলা ভরপেট খেতে পারে। হয় তো পেটে কিছু নেই বলেই এই কাঁপুনি। কিন্তু কিছু করার নেই। আমার পাশে—তিন হাত দূরে নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছেন সেন্ট জন—‘সালোমের’ কাঁপুনি তিনি অনুভব করতে পারেন না। কাঁদলে আরও দুর্বল হয়ে পড়ব, আরও বেশি শীত করবে। কিন্তু চোখ দুটো কি সে কথা মানছে?

হঠাৎ বাইরে কড়কড় করে বাজ পড়ল। আব্রাসা চমকে উঠে বসে। চোখ খুলে আমাকে দেখে বলে, এ কী। তুই এখনো বসে আছিস?

দুরন্ত অভিমানে আমার ঠোঁট দুটো নড়ে উঠল। কণ্ঠে স্বর ফুটল না।

ও এগিয়ে এল। বলল, তুই এত কাঁপছিস কেন? শীত করছে?

—হঁ।

—তা আমাকে ডাকলি না কেন?

ডাহা মিথ্যের আশ্রয় নিতে হলো, ডেকেছিলাম। তোমার ঘুম ভাঙেনি।

—ধাক্কা দিলি না কেন?

—তোমাকে না ছুঁয়ে কেমন করে ধাক্কা দেব? তুমি যে আমাকে ছোঁবে না বলে প্রতিজ্ঞা করে বসে আছ!

এবার ও এগিয়ে আসে। বলে, কী পাগলি মেয়ে রে তুই! এই নে, এটা গায়ে দে।

নিজের কম্বলটা গা থেকে খুলে নিয়ে আমার গায়ে জড়িয়ে দিল। কিন্তু সেই চিত্রকরের নিপুণতায়। তুলির স্পর্শ লাগল ক্যানভাসে। আঙুলের নয়। কাঁদতে কাঁদতে আর কাঁপতে কাঁপতে আমি সেটা টেনে খুলে ফেলে দিলাম।

—এটা কী হলো? আমার উপর রাগ?

—তোমার ভাগের কম্বল আমি কেন গায়ে দেব? তুমি আমার কে?

—ও! রাগ নয়! অভিমান? শোন রেবা! তুই যদি আমার কম্বলটা না নিস তাহলে দুটো বিকল্প ব্যবস্থা হতে পারে। তুই বেছে নে। এক : আমরা দুজনেই পাশাপাশি বসে শীতে ঠকঠক করে কেঁপে রাতটা জাগতে পারি। দুই : দুজনে জড়াজড়ি করে শুতে পারি,

দু-দুটো কন্মল গায়ে চাপিয়ে। তাহলে একজনের দেহের উত্তাপে অপরজনের শীত কম লাগবে!

আমি নয়ন নত করে কাঁপতে কাঁপতে বলি, তাহলে যে আমাকে ছুঁতে হবে তোমাকে!

আব্রাসা উঠে আসে। কন্মল দিয়ে আমাকে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে। আমরা জড়াজড়ি করে শুয়ে পড়ি। একটার উপর আর একটা কন্মল চাপিয়ে।

ও আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলে, কী পাগলি মেয়ে রে তুই!

আমি মুখটা ওর দিকে বাড়িয়ে ধরি। চোখ দুটি বোঁজা। অধরোষ্ঠ ঈষৎ ফাঁক করা। মুহূর্তের পর মুহূর্ত কেটে গেল। আমার ওষ্ঠাধর প্রত্যাশিত উষ্ণতার স্পর্শ পেল না। ধীরে ধীরে চোখ দুটি খুলে গেল আমার।

দেখি, আমাকে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে, আমার দেহের উত্তাপে, দু-দুটো কন্মলের উষ্ণতায় ও অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছে। আশ্চর্য! চরম আশ্চর্য! ওর বুকের চাপে আমার ব্রেশিয়ার-মুক্ত যৌবনের যুগল জয়স্তুস্ত তখন দলিত, নিষ্পেষিত। আমার যে তখন লিজার মতো থরথর করে কাঁপতে ইচ্ছে করছে। ইচ্ছে করছিল ওর চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকি দিতে দিতে আত্মোদিতের মতো চিৎকার করে উঠি :-

“Flint-hearted boy!

It's but a kiss I want

Why art thou coy ?”

এ কী পাষণ হৃদয়!

একটি চুমু তো শুধু চেয়েছিল ভিখারিণী নারী,

আর কিছু নয়!

কিন্তু বলবটা কাকে? সেন্ট জন তখন সালোমেকে প্রত্যাখ্যান করে ‘মথুরাপুরীর প্রাচীরের তলে’ তাঁর যোগনিদ্রায় সুষুপ্ত।

*

*

*

পরদিন যখন ঘুম ভাঙল তখন বেশ বেলা হয়ে গেছে। উপরের স্কাইলাইট দিয়ে মেঘমুক্ত আকাশের প্রভাতসূর্যের নরম আলো এসে পড়েছে কার্পেটে। আমার গায়ে দু-দুটো কন্মল চাপানো। আমি একা। মাথার তলায় হাত দিয়ে শুয়ে আছি। ধড়মড়িয়ে উঠে বসি। দেখি আব্রাসা কার্পেটের ও প্রান্তে বসে একটা পকেট-চিরুনি দিয়ে তার কৌকড়া চুলগুলো শাসনে আনার চেষ্টা করছে। চুলগুলো মাথার মালিকের মতোই একগুঁয়ে। শাসন মানে না! আমাকে চোখ মেলে জেগে উঠতে দেখেই ও বললে : গুটেন মর্গেন (সুপ্রভাত)।

জবাব দিই না। যেন শুনতেই পাইনি। নিঃশব্দে উঠে গেলাম টয়লেটে।

একটু পরে দরজাটা ফাঁক করে দেখি, সেই যমদূতটা ফিরে এসেছে। যথারীতি মিলিটারি পোশাকে। হাতে দুলছে হ্যান্ডকাফটা। আমাকে দেখে সে হাতকড়াটা দুলিয়ে অভদ্রতাসূচক সুপ্রভাত জানাল। তাকেও প্রত্যাভিবাদনের প্রয়োজন বোধ করলাম না। কথা ছিল—সকালে কিছু খেতে দেওয়া হবে। যমদূত সে প্রসঙ্গ উত্থাপন করল না আদৌ। আব্রাসার ডান হাত আমার বাঁ হাতের সঙ্গে বন্দি হলো। হ্যান্ডকাফ বেঁধে দিল বন্ধনদৃঢ় গ্রন্থী।

সিঁড়ি ভেঙে তিনজনে দোতলায় উঠছি। ল্যান্ডিঙের কাছাকাছি এক বৃদ্ধ জার্মানের সঙ্গে দেখা। ফ্রেঞ্চকট দাড়ি, উস্কোখুস্কো চুল, চোখে মোটা লেন্সের চশমা। সম্ভবত কোনো কেওকেটা। তাঁর কিন্তু মিলিটারি পোশাক নয়—থ্রি পিস সার্জের সুট। সার্জেন্ট টুপি খুলে তাঁকে ‘বাও’ করে বললে, ‘গুটেন মর্গেন, প্রফেসর!’

বৃদ্ধ তাঁর চশমাটা কপালে তুলে দিয়ে হাতকড়াপরা জোড়া-বন্দিকে আপাদমস্তক দেখে নিলেন। জার্মানভাষায় জানতে চাইলেন : ‘জুভেনাইল ডেলিস্কোয়েসি?’ (বয়ঃসন্ধির চ্যাংডামো?)

সার্জেন্ট একগাল হেসে বললে, নাইন প্রফেসর ! জাস্ট জিড্ !

অধ্যাপক মাথা নেড়ে বোঝালেন তিনি বুঝেছেন অর্থাৎ মস্তক সঞ্চালনে বলতে চাইলেন, আমাদের রাষ্ট্রভাষায় : অব সমঝ গ্যয়া !

সে যুগে নর্ডিক-জার্মানের কাছে এর চেয়ে বেশি ব্যাখ্যার প্রয়োজন হতো না। ভদ্রলোক নিঃসন্দেহে বুদ্ধিজীবী, পণ্ডিত, অধ্যাপক। তিনি অনায়াসে বুঝে নিলেন এ ছাগল-জোড়া কারও বাগানে ঢুকে ফুলগাছ তছনছ করেনি। জন্মসূত্রেই ওরা নাৎসিবাদের কাছে বলিপ্রদত্ত। ‘জিড্’ হয়ে জন্মালে কেন? যাও কশাইখানায় !

দ্বিতলে বারান্দার শেষপ্রান্তে এসে আমরা থামলাম। রুদ্ধদ্বারের সামনে বসেছিল আর্দালি। সে উঠে দাঁড়াল। সার্জেন্টকে মিলিটারি স্যালুট দিল। তারপর খবর দিতে গেল ভিতরে। নজর পড়ল নেম প্লেটটায় : ক্যাপ্টেন আর্নস্ট স্নবেল।

একটু পরেই বন্দি দুজনকে নিয়ে সার্জেন্ট ঘরে ঢুকল। অফিসার ভদ্রলোক টেবিলের সামনে বসে কাগজে কী যেন লিখছিলেন। সার্জেন্টের জুতো জোড়ার নালে-নালে খট করে শব্দ হওয়ায় চোখ তুলে চাইলেন। প্রথমেই তাঁর নজর পড়ল আমাদের হাতের দিকে। সার্জেন্টকে প্রশ্ন করেন : এ কী ! হ্যান্ডকাফ কেন?

—ওরা বন্দি, হের ক্যাপ্টেন। জুডেন !

উনি আদেশ দিলেন হ্যান্ডকাফ খুলে দিতে। সার্জেন্ট আদেশ পালন করল। লৌহবলয়কে রাখল ওঁর গ্লাসটপ টেবিলের একান্তে। এবার উনি চোখ তুলে আমার মুখের দিকে তাকালেন। আমার মনে হল খণ্ড মুহূর্তের জন্য উনি যেন চমকে উঠলেন।

পুরো বিশ সেকেন্ড উনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমাকে দেখতে থাকেন। আমার সর্বাসঙ্গে সেই দৃষ্টির উদ্ভাপ আমি স্পষ্ট অনুভব করলাম। গা জ্বালা করতে থাকে। মনে পড়ে গেল মা-মণির সাবধানবাণী : মনে রাখিস রেবা, পৃথিবীতে এক জাতের পুরুষ আছে ডাকাতধর্মী— তারা লুটেরা! মেয়েদের মনটা তারা ছুঁতে চায় না—দেহটাকে শুধু চটকাতে চায়! সম্বিত ফিরে পেলাম ওঁর প্রশ্নে : তোমার নাম কী ?

—ফ্রলিন রেবেকা রথচাইল্ড।

—বয়স কত?

—তের বছর দুই মাস।

—তুমি তো ইহুদি। ঘেটোয় থাক। বাড়িতে আর কে কে আছে?

—মা, সেজদা আর ছোটভাই।

—সেজদা বলছ যখন, তখন বড়দাও তো একজন থাকার কথা? না কি?

—আছে। কিন্তু কোথায় আছে তা আমি জানি না। কয়েক বছর আগে সে গৃহত্যাগ করে গেছে। সে নিরুদ্দেশ।

—কী নাম তার?

—জাখারি রথচাইল্ড :

উনি আবার আমাকে আপাদমস্তক ভালো করে দেখলেন। তারপর সার্জেন্টকে বললেন, তুমি ওই ছেলেটিকে নিয়ে বাইরে অপেক্ষা কর। এর জবানবন্দি নেওয়া হয়ে গেলে তোমাদের দুজনকে ডাকব।

সার্জেন্ট স্যালুট করে অ্যাবাউট টার্ন করল। আব্রাসার হাতটা দৃঢ় মুষ্টিতে ধরে বার হয়ে গেল ঘর ছেড়ে। স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের আকর্ষণে দরজাটা বন্ধ হয়ে যাবার পর উনি বললেন, রেবেকা! তুমি সত্যিই জানো না তোমার বড়দা কোথায় আছে? এই ক'বছরের মধ্যে কোনো যোগাযোগ হয়নি?

—না! দুটো প্রশ্নেরই জবাব : না।

—তার কোনো চিঠিপত্রও আসেনি কখনো? সত্যি কথা বলবে!

—না, আসেনি। বড়দা কোথায় আছে, বেঁচে আছে কি না, আমরা কেউই জানি না।

—অলরাইট। তোমাকে কাল সন্ধ্যায় ফ্রি-টাউনে গ্রেপ্তার করা হয়েছে দেখছি, সন্ধ্যা সাতটা দশে। তুমি ঘেটো ছেড়ে কেন এসেছিলে ফ্রি-টাউনে?

—আমার এক বান্ধবী, রোজালিনের জন্মদিনের পার্টিতে নিমন্ত্রিত হয়ে।

—তুমি জানতে না যে, বিনা-পার্মিটে কোনো ইহুদি মেয়ে ফ্রি-টাউনে আসতে পারে না? সেটা বে-আইনি?

—কেন জানব না? আমি তো ঘেটোর জুডেনরাট থেকে বৈধ পার্মিট নিয়েই এসেছিলাম। আমি আর আব্রাসা দুজনই—

—কই, দেখি সেই পার্মিট?

—সেটা কি আর আমার কাছে আছে? সার্জেন্ট যখন এই প্রশ্ন করে তখন তার হাতেই পার্মিটটা দিয়েছিলাম। সে সেটা সবার সামনে কুচিকুচি করে ছিঁড়ে ফেলে দিল! তারপর আমাদের দুজনকে হ্যাডকাফ পরিয়ে বন্দি করে!

আবার উনি আমাকে আপাদমস্তক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন। ভাবছি এবার বুঝি আমার জন্য একটা চকলেট-বার বের করে আনবেন ওঁর হিপ পকেট থেকে। তা উনি করলেন না। প্রশ্ন করেন, অ্যারেস্ট করে সার্জেন্ট তোমাদের দুজনকে সরাসরি এখানে নিয়ে আসে? আন্ডারগ্রাউন্ড ‘সেল’-এ বন্দি করে? পথে কোথাও তোমরা থামনি?

—ইয়েস, হের ক্যাপ্টেন। সরাসরি এখানে নিয়ে আসে। পথে আমরা কোথাও থামিনি। এই বাড়ির আন্ডারগ্রাউন্ড সেল-এ ঢুকিয়ে দেয়।

—রাত্রে তুমি সেখানেই ছিলে? ফিমেল-ডর্মিটারিতে?

—না। আমাকে বন্দি করা হয়েছিল একটা সলিটারি সেলে-এ। ফিমেল-ডর্মিটারিতে নয়!

—তুমি কাল রাতে একলা ছিলে? ‘সলিটারি সেল’-এ? ভয় করল না?

—নাইন, হের ক্যাপ্টেন। ওই আব্রাসাও ছিল আমার সঙ্গে। আমি একা নই।

উনি চমকে উঠলেন। বলেন, গুড হেভেন্স! ওই আব্রাসাকে তুমি কতদিন ধরে চেন? ওর সঙ্গে এক ঘরে রাত কাটাতে তুমি আপত্তি করলে না?

—আপনি দুটো প্রশ্ন একসঙ্গে করেছেন ক্যাপ্টেন। প্রথমটার জবাব, আব্রাসার সঙ্গে কাল সন্ধ্যাতেই আমার প্রথম আলাপ। ওকে আগে কখনও দেখিনি। আলাপ ছিল না।

—আর আমার দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব? সদ্যপরিচিত ওই বয়সের একটা ছেলের সঙ্গে এক বিছানায় রাত কাটাতে তুমি আপত্তি করলে না কেন? তুমি জান না, তোমার বয়সী মেয়ের পক্ষে সেটা অন্যায়, অসামাজিক?

—আবার স্যার আপনি একসঙ্গে দুটো প্রশ্ন করেছেন। প্রথম প্রশ্ন, ‘আপত্তি করার’ বিষয়ে। বৈধ-পার্মিট ছিঁড়ে ফেলে আপনার সহকারী যখন আমাদের দুজনকে গ্রেপ্তার করল, তখন আমরা দুজনই আপত্তি করেছিলাম। আপনার ‘মোস্ট এফিশিয়েন্ট’ সহকারী তাতে কর্ণপাত করেনি। ফলে আপত্তিটা করব কার কাছে? আর দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব: আমি হিটলার, আমি জুডেন, জিড! একজন নর্ডিক-জার্মান মেয়ের মতো শালীনতা জ্ঞান আপনি আমার কাছে প্রত্যাশা করেন কি করে?

—তার মানে স্বেচ্ছায় ওই ছেলেটির সঙ্গে এক বিছানায় রাত কাটাতে চেয়েছিলে?

—আজ্ঞে না। তার মানে তা নয়! আপনাদের নাৎসি দর্শনে জুডেনরা গরু-ছাগল-ভেড়ার মতো। সেই ধারণা থেকেই আপনার সহকারী আমাদের দুজনকে এক খোঁয়াড়ে ঢুকিয়ে ঘর তালাবন্ধ করেছিল। আমি ওর সঙ্গে রাত কাটাতে চাইনি। আপনারা আমাকে সেই কুকর্ম করতে বাধ্য করেছিলেন!

এরারও বেশ দেরি হলো ওঁর জবাবটা দিতে। তারপর নিম্ন কণ্ঠে বললেন, অ্যান্ড ইয়োর জুডেন-ফিলসফি রেজালটেড ইন দিস হরিবল রেপ? [আর তোমার ইহুদি-দর্শনের পরিণাম হলো একটা জঘন্য বলাৎকার!]

এবার চমকে ওঠার পালাটা আমার। আঁৎকে উঠে বলি: ‘রেপ’ স্যার? ও নো! কী বলছেন আপনি!

—তোমাকে ওই আব্রাসা কাল রাত্রে বলাৎকার করেনি?

—গুড হেভেন্স! এসব কী বলছেন, হের ক্যাপ্টেন! নিশ্চয় নয়!

—তুমি স্বেচ্ছায় আত্মদান করেছিলে?

—আত্মদান? তার মানে?

—তের বছর বয়স হয়েছে তোমার। কচি খুকিটি নও! ‘কপুলেশন’ শব্দটার অর্থ বোঝ না?

আমার বাক্যস্মৃতি হয় না। এ কী জঘন্য প্রশ্ন! এ কী বিশ্রী শব্দ!

—তুমি অস্বীকার করতে চাও?

—নিশ্চয়ই! একবার নয়, একশ বার!

—তাহলে তোমার ‘ব্লিডিং’ হয়েছে কেন?

—ব্লিডিং!

—লুক অ্যাট ইওর ওন লেগস! (তোমার পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখ)

আমার নয়ন নত হলো। আমি বজ্রাহত হয়ে গেলাম। দূরন্ত আতঙ্কে আমি থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়লাম কার্পেটের উপর। এতক্ষণে বুঝতে পেরেছি আমার কী হয়েছে। কেন উনি এমন অশ্রাব্য, জঘন্য প্রশ্ন করে চলেছেন। আমার বাঁ হাঁটু বেয়ে একটা রক্তের ধারা। দু-হাতে মুখ ঢেকে কার্পেটে বসে পড়ি। আমি তখন আতঁকণ্ডে, আপনমনে মা-মণিকে ডেকে চলেছি! “মা রে! মা-মণিরে—তুমি বলেছিলে, এমন বিড়ম্বনায় পড়লে সবার আগে যেন তোমার কাছে ছুটে যাই। তোমার বুকে মুখ লুকাই! তুমি আমাকে বলেছিলে শিথিয়ে দেবে এই মাসিক বিড়ম্বনাটাকে কী-করে লোকচক্ষুর আড়ালে রাখা যায়। আজ এই বিপদের সময় কোথায় তুমি?”

সম্বিত ফিরে পেলাম—কে যেন আমার বাহুমূল ধরে আকর্ষণ করায়।

—গেট আপ, বেবি! ভয় নেই! আমি তোমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছি শুধু।
তুমি অসুস্থ!

তাকিয়ে দেখি ইতিমধ্যে ক্যাপ্টেনের আহুানে একজন মহিলা সৈনিক এসে আমার হাত ধরে আকর্ষণ করছেন। উঠে দাঁড়ালাম।

ক্যাপ্টেন স্নবেল সেই প্রহরীকে বললেন, লুক হিয়ার ফ্রলিন হেলেনা। এ মেয়েটি কাল রাতে ‘রেপড্’ হয়েছে। ও স্বীকার করছে না। ওকে আমাদের ফিমেল ওয়ার্ডে নিয়ে যাও। গাইনোর রিপোর্ট আমাকে একঘণ্টার মধ্যে টেলিফোন করে জানাবে। স্টিচ-মিচ যা দিতে হয় তার ব্যবস্থা কর। ওকে আমার বিশেষ প্রয়োজন! ও যেন পালাতে না পারে, দেখ। নাউ গো!

এর পরে যে ঘটনার কথা সময়ের ক্রম অনুসারে লিখছি, তা জানতে পেরেছিলাম অনেক পরে। আব্রাসার কাছ থেকে।

আমাকে বিদায় করে ক্যাপ্টেন স্নবেল বাকি দুজনকে ডেকে পাঠান। সার্জেন্টের সম্মুখেই আব্রাসাকে জেরা করতে থাকেন। তার নাম, ধাম, বয়স, পরিচয়, তার ঘেটো-সংসারে কে-কে আছে জেনে নিয়ে প্রশ্ন করেন, তুমি বিনা-পার্মিটে ফ্রি-টাউনে এসেছিলে কোন সাহসে?

—আমি বিনা-পার্মিটে আসিনি, হের ক্যাপ্টেন। ঘেটোর জুডেন অথরিটি আমাদের দু-জনকেই বৈধ-পার্মিট ইশ্যু করেছিলেন। আমরা দুজনই তা এই সার্জেন্টকে দেখতে দিয়েছিলাম—ও সেটা কুচিকুচি করে ছিঁড়ে ফেলে আমাদের হ্যান্ডকাফ পরাল!

স্নবেল এবার সার্জেন্টের দিকে ফিরে বলেন : ও যা বলছে তা সত্যি?

—ওরা জুডেন, হের ক্যাপ্টেন! হেড-কোয়ার্টার্সের আদেশ আছে—আপনি তা জানেন স্যার—ঘেটোর বাইরে কোন জুডেনের সন্ধান পেলে তাকে তৎক্ষণাৎ অ্যারেস্ট করতে হবে। ইনফর্মারকে মাথা পিছু দশ ডয়েশমার্ক পুরস্কার দেওয়া হবে। এক্ষেত্রেও আমরা তা দিয়েছি...

—এটা আমার প্রশ্নের জবাব নয়। আমি জানতে চাইছি, ওদের দুজনের বৈধ পার্মিট ছিল। তুমি তা ছিঁড়ে ফেলেছ?

লোকটা অসহায়ভাবে এদিক-ওদিক তাকায়। আব্রাসা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এবার বলে, যাঁর বাড়ি থেকে আমাদের দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়, তিনি এই শহরের একজন বিশিষ্ট নাগরিক। আপনাদের মিলিটারি হাসপাতালের একজন সিনিয়র ফিজিশিয়ান। তিনি জুডেন নন, ক্রিস্টিয়ান—সেমিটিক নন, নর্ডিক! তাঁর বাড়িতে টেলিফোন আছে। আমি যে অভিযোগ করেছি, আর আপনার সার্জেন্ট যা স্বীকার করতে ইতস্তত করছে, তা অনায়াসে টেলিফোনে জেনে নিতে পারেন। ঘটনার দশ বারো জন সাক্ষী আছে। তারাও কেউ জুডেন নয়!

অফিসার তাঁর সহকারীর দিকে তাকিয়ে দেখলেন শুধু। তিনি প্রসঙ্গান্তরে এলেন তৎক্ষণাৎ : তুমি আর রেবেকা কাল রাতে এক ঘরে এক বিছানায় শুয়েছিলে ?

—এক বিছানার প্রশ্ন ওঠে না, হের ক্যাপ্টেন, কার্পেটের উপর। ঘরে বালিশও ছিল না, তবে যীসাস-এর দয়ায় মেজেতে একজোড়া কস্বল ছিল।

—‘যীসাসের দয়ায়’ ?

—ইয়েস হের ক্যাপ্টেন ! যীসাস তো দয়ালুই ছিলেন !

—তুমি যীসাসকে মান ?

—কেন মানব না ? তিনি একজন ঐতিহাসিক মহামানব ! তিনি দয়ালুই তো ছিলেন ? কেন, আপনি তা জানেন না ? নাকি, মানেন না ?

ক্যাপ্টেন গর্জে ওঠেন : শাট আপ ! ইউ সোয়াইন ! তোমাকে জেরায় যা প্রশ্ন করা হচ্ছে তার জবাব দেবে শুধু। অমন বাঁকা-বাঁকা কথা বললে তোমার খুলি উড়িয়ে দেব।

একথার জবাবে আব্রাসা নাকি বলেছিল, কিছু মনে করবেন না হের ক্যাপ্টেন ! আমি বাঁকা কথা বললে আপনি আমার খুলি উড়িয়ে দেবেন। না বললে, আমাকে গ্যাস-চেম্বারে পাঠাবেন। দু-জাতের মৃত্যুর মধ্যে কি তফাৎ আছে কিছু ?

ক্যাপ্টেন ওর সওয়ালের কোনো জবাব দেননি। প্রশ্ন করেন, কাল রাতে তুমি ওই মেয়েটি—রেবেকার—সঙ্গে সহবাস করেছিলে। অস্বীকার কর না। তার কনকুসিড এভিডেন্স আছে। এখন বল, মেয়েটি কি স্বেচ্ছায় তোমাকে দেহদান করেছিল ? নাকি তুমি তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে...

এবার আব্রাসাই কোনো জবাব খুঁজে পায়নি। বজ্রাহত হয়ে তাকিয়ে থাকে।

সার্জেন্ট এই সময়ে হঠাৎ নিজে থেকেই বলে ওঠে, আমি একটা কথা বলব, হের ক্যাপ্টেন ?

—ইয়েস ! বলবে ! কথা নয় ! কৈফিয়ৎ ! তুমি জানো যে, এ বাড়ির আন্ডারগ্রাউন্ড সেল-এ মেয়েদের জন্য পৃথক কারাগার আছে। তাহলে তুমি কেন ওই মেয়েটিকে বাধ্য করেছিলে আব্রাসার সঙ্গে রাত কাটাতে ? বল ?

—বাধ্য করেছিলাম ? না স্যার ! ওরা কেউই তো আপত্তি করেনি।

—আপত্তির প্রশ্ন উঠছে না। তুমি জান যে, এখানে বন্দিীদের জন্য একটা পৃথক ডর্মিটরি আছে। সেক্ষেত্রে তুমি কেন মেয়েটিকে সেখানে পাঠিয়ে দিলে না ? বল ? কী তোমার কৈফিয়ৎ ?

সার্জেন্ট কোনো জবাব খুঁজে পায় না।

এবার ক্যাপ্টেন আব্রাসার দিকে ফিরে বললেন, তুমিই বা এ সুযোগ কেন নিলে আব্রাসা ? তুমি তো জান মেয়েটি ‘টীন-এজার’ ! মাত্র তের বছর বয়স। সাবালিকা নয়। কেন সার্জেন্টকে বলনি—আমাদের আলাদা-আলাদা ঘরে বন্দি করুন ?

আব্রাসা ততক্ষণে সামলেছে। বললে, আপনি কী একটা এভিডেন্সের উল্লেখ করেছেন। সেটা কী, আমি জানি না। আমি একথা বিশ্বাস করি না। কাল সন্ধ্যায় সাতটা দশ থেকে এই এখন পর্যন্ত সে এক মিনিটের জন্যও আমার দৃষ্টির বাইরে যায়নি। এটা অসম্ভব, হের ক্যাপ্টেন...

ক্যাপ্টেন নব্বেল ধমকে উঠেছিলেন, তোমার এটাও আমার প্রশ্নের সরাসরি জবাব নয়। আমি জানতে চেয়েছি—কেন তুমি সার্জেন্টকে বলনি যে, তার সঙ্গে এক ঘরে রাত কাটাতে তুমি রাজি নও। সেটা শালীনতা বিরুদ্ধ!

এবার আব্রাসাও ধমকে ওঠে, লুক হিয়ার, হের ক্যাপ্টেন! আমি আপনার সহকারীকে বৈধ পার্মিট দেখিয়েছিলাম। সে সেটা ছিঁড়ে ফেলে দেয়। আমি তাকে বলেছিলাম, বান্ধবীর জন্মদিনে আমরা নিমন্ত্রিত। তবু সে অভুক্ত অবস্থায় আমাদের দুজনকে হাতকড়া পরিয়ে কারাবন্দি করে। জেলে এসে আমি রাত্রের খাবার চেয়েছিলাম, তাতেও বলেছিল, কাল সকালে পাবে। আজ এখনো পর্যন্ত আপনাদের তরফে আমাদের দুজনকে ‘জেল-ডায়েট’ খেতে দেওয়া হয়নি! আপনাদের নাৎসিদর্শনে জুডেনদের তো মানুষ বলেই ধরা হয় না। বন্দি অবস্থায় তাদের খেতে পর্যন্ত দেওয়া হয় না। এ ক্ষেত্রে আমি কোন ভরসায়...

ক্যাপ্টেন আবার তাঁর সহকারীর দিকে ফিরে জানতে চান : এ যা বলছে তা সত্যি? কাল রাতে এরা খাবার পায়নি? আজ সকালেও নয়?

সার্জেন্ট এবারও নিরুত্তর। ক্যাপ্টেন বেল বাজিয়ে আর্দালিকে ডেকে পাঠালেন। বললেন : লেফটানেন্ট গশকে পাঠিয়ে দাও।

লেঃ গশ্ এসে স্যালুট করে দাঁড়াতেই তাকে বললেন, এই সার্জেন্টটাকে অ্যারেস্ট কর। একে ওই সলিটারি সেল-এ বন্দি করে রাখ। ওর কোর্ট-মার্শাল হবে। ও একাধিক অপরাধ করেছে। মিলিটারি আদেশ লঙ্ঘন করেছে। কৈফিয়ৎ দিতে পারছে না। এই হ্যান্ডকাফটা নাও। এটা ওর হাতে পরিয়ে দাও। যতক্ষণ পর্যন্ত আমার ইনভেস্টিগেশন শেষ না হচ্ছে—যতক্ষণ পর্যন্ত আমি অর্ডার না দিচ্ছি—ওকে খেতে দিও না। ওকে অনুভব করতে দাও অভুক্ত থাকলে কেমন লাগে। নাও লিভ মি অ্যালোন।

সন্ধ্যার সময়ে হাসপাতালের ভিজিটিং আওয়ার্সে ক্যাপ্টেন আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। আমার দুর্লভ সৌভাগ্য। আছি একটা সুন্দর সাজানো কেবিনে, জেনারল-ওয়ার্ড নয়। বুঝতে পারি হেতুটা। ক্যাপ্টেন ফতোয়া জারি করে রেখেছেন :

“মেয়েটিকে আমার বিশেষ প্রয়োজন। দেখ, ও যেন পালাতে না পারে।”

কীসের প্রয়োজন? কেন প্রয়োজন? এই একরকমি মেয়েটার অপরিণত একটা দেহ? শহরে তো একাধিক ‘রেড-লাইট’ মহিলা! মার্কের তো অভাব নেই লোকটার। ফেল কড়ি মাখ তেল! ইচ্ছে করলেই তো নারীদেহ উপভোগ করতে পারে। তাহলে এই আধফোটা

টুলিপ-কুঁড়িটার দিকে অমন খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে কী দেখছিল লোকটা ? এ আমারই পাপের ফল ! আদোনাই-এর অভিশাপ ! কাল রাতে আমি ‘হোর’ হয়ে একজন ‘সেইন্টকে সিডিউস্’ করতে চেয়েছিলাম ! পাপ কাজ করেছিলাম ! এ তারই প্রতিফল ! এবার একটা শয়তান আমার নিম্ন উদরে কঠিনতম আঘাত করবে। সেই ‘প্রমিথিউস্’-এর মতো ওই ঈগলটা আমার যকৃৎ ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে !

না ! সেদিন সেই কেবিনে শুয়ে কিশোরী মেয়েটি ঠিক এ-কথা ভাবেনি। সে তখনো ‘প্রমিথিউস্ আন-বাউন্ড’ পড়েনি। এ-কথা আজ বৃদ্ধা বয়সে লিখবার সময় আমার মনে হচ্ছে। তখন— সেই সময়ে, আমি শুধু ভাবছিলাম, আমার এই অনশনক্লিষ্ট হাড়-ডিগ্‌ডিগ্‌ দেহের প্রতি কেন ওর এত লোভ ! তখনো ‘পিডোফিলিক’ শব্দটার অর্থ জানা ছিল না আমার। বিকৃত স্ফুধার ফাঁদে পড়ে কেউ কেউ পরিণত নারীদেহ উপভোগের পরিবর্তে না-ফোটা ফুলের পাপড়ি ছিঁড়েই সুখানুভূতি লাভ করে—কামতৃপ্তির অবসান ঘটায়। সে তথ্যটা অবশ্য ঘটনাচক্রে পরের সপ্তাহেই জানতে পারি।

সন্ধ্যায় ভিজিটিং-আওয়ার্সে উনি এলেন। এখন মিলিটারি পোশাক নয়। থ্রি-পিস-সুটের ফুল-বাবুটি সেজে। হাতে একটা লাল-গোলাপের তোড়া। সেটা বাড়িয়ে ধরেন আমার নাকের ডগায়। কোনো গন্ধ পেলাম না। পাব কোথেকে ? আমি যে তখন রুদ্ধশ্বাসে কান্না চাপছি !

নার্স ওঁকে একটা টুল টেনে বসতে দিল। ফুলের তোড়াটা নিয়ে একটা জলের গ্লাসে টেবিলে সাজিয়ে রাখল। উনি নিশ্চয় একটা দামী আফটার শেভ লোশন ব্যবহার করেছেন। তার সুমিষ্ট-সৌরভে আমার গা-গুলিয়ে উঠল। বললেন, আয়াম সরি, রেবেকা ! আমার ভুল হয়েছিল। একটা সহজ স্বাভাবিক প্রাকৃতিক ঘটনাকে আমি বিকৃত করে দেখেছিলাম। ভেবেছিলাম...যাক সে কথা ! তুমি যে আমাকে ক্ষমা করতে পেরেছ তার প্রমাণ দিতে এটা ধর !

এতক্ষণে ব্যাগ থেকে বেরিয়ে এল সেই কালো বেড়ালটা। যেটার আবির্ভাব প্রতিমুহূর্তে আশঙ্কা করছিলাম। যেটার কথা মা আগেই বলেছিল। এ লোকটা জার্মান, সেই ক্যাপ্টেন কাটানৌস্কির মতো রাশিয়ান নয়। কিন্তু শয়তানের কি কোনো জাত আছে ? ওর হিপ-পকেট থেকে বার হয়ে এল একটা ম্যাগনাম-সাইজ চকলেট বার !

আমার দিকে বাড়িয়ে ধরতেই আমি সেটা কেড়ে নিয়ে টান মেরে ফেলে দিলাম। ডুগারে কেঁদে উঠলাম আমি।

ছুটে এল নার্স : কী হয়েছে স্যার ?

—কিছু নয় ! ও আমাকে সহ্য করতে পারছে না !

উঠে দাঁড়ালেন টুল ছেড়ে। বললাম, প্লিজ আপনি চলে যান ! আমি আজ অসুস্থ !

—অলরাইট ! অলরাইট ! অ্যালিসিয়া ! আমি চলেই যাচ্ছি।

নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে গেলেন উনি।

কিন্তু! উনি বেমক্কা আমাকে ‘অ্যালিসিয়া’ নামে ডাকলেন কেন? ওঁর কি কোনো বাল্যবান্ধবী ছিল ‘অ্যালিসিয়া’ নামে? কে বলে দেবে আমাকে?

*

*

*

পাঁচ দিন পরে নার্স এসে বলল, শুভ সংবাদ! আজ তোমাকে হাসপাতাল থেকে রিলিজ করে দেওয়া হবে।

জানতে চাই, শুধু হাসপাতাল থেকে? প্রিজন্ থেকে নয়? আমি কি আমার মায়ের কাছে ঘেটোয় ফিরে যেতে পারব না?

নার্স বললে, আমি দুঃখিত, হানি! সে-কথার জবাব আমি জানি না। আজ সন্ধ্যায় তোমাকে নিতে একটা গাড়ি আসবে এটুকুই জানি।

নার্সটি জার্মান। কিন্তু লোক ভাল। আমার চেয়ে পাঁচ-সাত বছরের বড় হবে। সেই আমাকে শিখিয়েছে মেয়েদের মাসিক বিড়ম্বনাকে কী ভাবে গোপন রাখা যায়। এ হিসাবে সে আমার মায়ের বিকল্প। হাসপাতালের ব্যবহার বেশ ভাল। খাবার-দাবারও ভাল। জুডেন বলে আমাকে কোনো অত্যাচার সহিতে হয়নি। সবাই যা খেত, আমিও তাই খেতাম।

সন্ধ্যার সময় নার্স আমার চুল আঁচড়িয়ে দিল। হসপিটালের পোশাক ছাড়িয়ে আমার সেই সাবেকি ফ্রকটা পরিয়ে দিল। ব্রেসিয়ারটাও! সন্ধ্যা নাগাত একটি সুদর্শন সৈনিক এল আমাকে নিতে। ওই নার্সেরই বয়সী। সেই হাসপাতালের রিলিজ-খাতায় স্বাক্ষর করল। আমি আদৌ অসুস্থ নই, তবু নার্স আমাকে নির্গমনদ্বার পর্যন্ত হাত ধরে পৌঁছে দিল। জার্মান সৈনিকটি আমাকে হ্যান্ডকাফ পরাল না। আমার বাহুমূল আলতো করে ধরে নিয়ে এল হাসপাতাল-কম্পাউন্ডে পার্ক করা একটা জিপের কাছে। ড্রাইভারের সিটে বসেছিলেন একজন প্রৌঢ় সৈনিক। কাঁধের শনাক্তিকরণ-চিহ্নে দেখি তিনি লেফটানেন্ট। আমাকে দেখে হেসে বললেন : গুটেন আবেন্ট (শুভ সন্ধ্যা)।

সাহায্য করলেন জিপের ভিতরের সিটে গিয়ে বসতে। আমার bewachen (গার্ড) পিছন দিকে তাকাল। দেখি, নার্সটি হাসপাতালের গ্র্যান্ড-স্টেয়ার্সের মাথায় দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে আমাদের বিদায় জানাচ্ছে। জার্মান সৈনিকটির সঙ্গে চোখাচোখি হতেই হাতের ইঙ্গিতে সে একটা উড়ন্ত-চুম্বন ছুঁড়ে দিল। আমার গার্ডটি হঠাৎ বিচলিত হয়ে ড্রাইভারটিকে বললে, ‘জাস্ট আ মিনিট, বস! আমি এখনি এসে যাব!’

ছুটতে ছুটতে মুহূর্তের মধ্যে সে পৌঁছে গেল নার্স মেয়েটির কাছে। কোনো কথাবার্তা হলো বলে মনে হলো না। বাঁ হাতে তার কোমর জড়িয়ে ধরে, ডান হাতে মুখটা নিজের দিকে টেনে আনল। নিবিড় চুম্বন। পরমুহূর্তেই তাকে ছেড়ে দিয়ে ক্ষিপ্ৰ হরিণের মতো ছুটে আসে জিপের দিকে।

প্রকাশ্যে এমন চুপন মধ্য-ইউরোপের যেকোনো শহরেই অপ্রত্যাশিত কিছু নয়। আমি লক্ষ্য করে দেখলাম, নার্সটির সর্বাঙ্গ আমার সেই কিশোরী বান্ধবীর মতো থরথর করে কেঁপে উঠল না মোটেই। সে ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে আয়না-দেখে লিপস্টিকটায় ঠোট দুটি মেরামত করতে থাকে।

সৈনিকটি—বছর বাইশ-চব্বিশের একজন ফুর্তিবাজ জার্মান—এবার ড্রাইভারকে বললে, ডাঙ্কে, বস! এই এক-মিনিট অপেক্ষা করার জন্য। ড্রাইভার ট্রান্সপোর্ট ডিভিশনের। ক্যাপ্টেন স্নবেলের ইউনিটের নয়। র‍্যাঙ্কে সে সৈনিকটির উপরের ধাপে। সিনিয়ারও।

ড্রাইভার গাড়ি স্টার্ট দিতে দিতে বললে, নার্সের সঙ্গে চুটিয়ে প্রেম করছ মনে হলো।

—আরে না, না, বিগ ব্রাদার! প্রেম-ট্রেন নয়। সৈনিক মাত্রই ক্ষণিকবাদী! আজ চুমু খাচ্ছি, কাল হয়তো বুলেট খাব। মাঝে-সাজে দু-এক পেগ চুমু না খেলে ঝিমিয়ে পড়ব যে।

ওরা কথা বলছিল পোলিশ ভাষায়। মনে হলো ছেলেটি খুবই চঞ্চল, ফুর্তিবাজ। কথাবার্তাতেও তুখোড় : ‘দু-এক পেগ চুমু!’ একবার আমার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে দেখল। তারপর তার ড্রাইভারদাদাকে প্রশ্ন করে—এবার কিন্তু জার্মান ভাষায়—নার্স একটা মিস্টিরিয়াস খবর দিল, বস! আমাদের ক্যাপ্টেন নাকি ওই জুডেন ছুঁড়ির সঙ্গে প্রথম দিনই দেখা করতে আসে। ভিজিটিং আওয়ার্সে। আর একটা ম্যাগনাম-সাইজ চকলেট-বার ওকে উপহার দেয়। এই জুডেন মেয়েটা তা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। প্রেজেন্টটা গ্রহণ করেনি।

শ্রীচ গিয়ার বদলাতে বদলাতে বললে, এর মধ্যে মিস্টিরিয়াস কোনটা দেখলে?

—বাঃ! দুজনের আচরণই তো অস্বাভাবিক। ক্যাপ্টেন-সাহেব ওকে চকলেট-বার উপহার দিতেই বা কেন এলেন, আর এই অদ্যভক্ষ্যধনুর্গণ যেটো-খুকিই বা সেটা ছুঁড়ে ফেলে দেবে কেন?

ট্রাফিকের দিকে নিবন্ধদৃষ্টি লেফটানেন্টটি বললে, ‘পেডোফিলিয়া’ কাকে বলে, জানো? শুনেছ কখনো শব্দটা?

—‘পেডোফিলিয়া’? না। কী?

—ফ্রয়েড, অ্যাডলার, ইয়ুং—এঁদের কারো নাম শুনেছ জীবনে?

—না, কিন্তু ব্যাপারটা কী?

—তুমি ভাই, স্কুল-লিভিং সার্টিফিকেটটা হাতে পেয়েই ‘হিটলার্স-ইয়ুথ’-এ নাম লিখিয়ে ‘লিঙ্গস্-রেশটস্ (লেফট-রাইট)’ শুরু করে দিয়েছ। তোমাকে কেমন করে বোঝাবো বাওয়া?

—আরে বলেই দেখ না। ঠিক বুঝব আমি।

—ওই জুডেন ছুকরি জার্মান-ভাষা বোঝে না তো ?

সৈনিক ঘাড় ঘুরিয়ে আমাকে একনজর দেখে নিয়ে বললে, ও ছুঁড়ি ঘুমুচ্ছে! আর তাছাড়া ও হচ্ছে গ্রাম্য-পোলিশ ‘জিড্’। জার্মান দেবভাষা! শুনলেও বুঝবে না। বল তুমি!

শ্রোত বললে, ‘পিডোফিলিয়া’ একজাতের বিকৃতকাম! এক ধরনের বিচিত্র মানুষ আছে, যাদের টুসটুসে পাকা আঙুরের রস সহ্য হয় না। টক-টক কাঁচা আঙুর কুচমুচিয়ে চিবিয়ে খায়। তোমাদের ক্যাপ্টেন সেই জাতের মানুষ। আর তুমি শব্দটার মানে জান না, ও ছুঁড়িও নিশ্চয় জানে না ‘পিডোফিলিক’ শব্দের অর্থ। কিন্তু হাজার হোক মেয়েমানুষ তো! ঠিক বুঝতে পেরেছে : তোমার বস-এর মতলবখানা কী। ক্যাচরম্যাচর করে কাঁচা আঙুর চিবানোতেই তার তৃপ্তি!

আমার শিরদাঁড়া বেয়ে যেন একটা সাপ হিলহিলিয়ে নেমে গেল!

শহরের শৌখিন অঞ্চলে একটা বহুতলবিশিষ্ট প্রাসাদ। তারই একটা অ্যাপার্টমেন্টে ক্যাপ্টেন ম্বেলের বাস। দু-কামরার ছোট্ট ফ্ল্যাট। দুটোতেই সংলগ্ন টয়লেট। এছাড়া একটা ড্রইংরুম, তার একপাশে ছোট ডাইনিং টেবল। একটা কিচেনেটও আছে। শুনলাম একটি জুইশ মেয়ে ঘর-দোর সাফ রাখে। দিনের বেলা দু’বেলার রান্না করে দিয়ে যায়। রাতে থাকে না।

সৈনিকটি আমার বাহুমূল আলতো করে ধরে ঘরে ঢুকল। স্যালুট করল। ক্যাপ্টেন জিজ্ঞেস করলেন, ওর সঙ্গে ব্যাগ-ট্যাগ কিছু ছিল না?

সৈনিকটি বললে, নাইন, হের-ক্যাপ্টেন। একটা ভ্যানিটি ব্যাগ শুধু ছিল। সেটা তো ওর হাতেই আছে।

—ডাক্কে! তুমি এখন যেতে পার।

—গাড়িটা কি আর লাগবে?

—না। তোমাকে ব্যারাকে পৌঁছে দিলে তুমি ওটা রিলিজ করে দিও।

লোকটা চলে গেল। ক্যাপ্টেন আমাকে বসতে বললেন। বদ্ধ ঘরে আমরা দুজন। এয়ারকন্ডিশনারের শব্দ ছাড়া চারিদিক নিস্তব্ধ। অনেকক্ষণ উনি কথা বললেন না। একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখছিলেন আমাকে। আমি মেদিনীনিবদ্ধ দৃষ্টিতে নিশ্চুপ! ইঠাৎ উনি প্রশ্ন করলেন; আমি তো তোমার সঙ্গে কোনো দুর্ব্যবহার করিনি, রেবেকা। ভুল বোঝাবুঝিতে হয় তো কিছু ধমক দিয়েছিলাম। কিন্তু সেজন্য তো আমি ক্ষমাভিক্ষাও করেছি। ভুল ভুলই!

আমি মুখ তুলে ওঁর চোখে-চোখে তাকাই না। উনি আবার বলেন, তাহলে সেদিন তুমি আমার উপহারটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলে কেন?

—সেদিন আমার মন-মেজাজ ঠিক ছিল না।

—আজ ঠিক আছে?

সেকথার জবাব না দিয়ে প্রশ্ন করি, আব্রাসা কোথায়? জেল-এ?

—বলব। যদি তুমি লক্ষ্মী মেয়ের মতো আমার কথা শোন।

—কী কথা?

—প্রথম কথা, তুমি আমার প্রথম প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে গিয়েছিলে। মন খুলে বলতো রেবেকা, হঠাৎ তুমি আমার উপর ক্ষেপে গেলে কেন?

—আপনি আমাকে চকলেট উপহার দেওয়ায়। আমার মা বলেছিল, এক জাতির পুরুষ মানুষ আছে যারা ভাব জমাতে গাল টিপে দেয়, গালে চুমু খায়। বলে ‘তুমি কী সুন্দর’। অথবা চকলেট উপহার দেয়। এর আগে একজন রাশিয়ান শয়তান আমাদের সর্বনাশ করেছিল। সেও আমাকে চকলেট ঘুষ দিয়েছিল। আমি তখন ছোট ছিলাম। কিছু বুঝিনি।

—তারপর সে তোমার গায়ে হাত দিয়েছিল? কত ছোট ছিলে তুমি তখন?

—তার কথা বাদ দিন, স্যার! আমাকে বলুন, কেন আমাকে ঘেটোয় ফিরে যেতে দিচ্ছেন না। আপনি তো বুঝতে পেরেছেন যে, আমি বৈধ পার্মিট নিয়েই ফ্রি-টাউনে এসেছিলাম।

—ঠিক কথা। সেকথা আমি বুঝতে পেরেছি। কিন্তু তা সত্ত্বেও তোমাকে আমি সেখানে ফিরে যেতে দেব না। দিতে পারি না!

—কেন হের ক্যাপ্টেন?

—আমাকে ‘হের ক্যাপ্টেন’ বলতে হবে না। নাম ধরেই ডেক আমাকে। আর্নস্ট। যেমন ডাক তোমার বড়দা মেজদাকে।

—আপনি কি আমাকে সেই দৃষ্টিতে দেখেন? ছোটবোনের মতো?

—আলবাৎ! তুই তো আমার ছোট বোনই রে!

আমি ফস করে প্রশ্ন করে বসি, ‘অ্যালিসিয়া’ কার নাম?

উনি প্রচণ্ড চমকে ওঠেন। বলেন, তুই কি করে জানলি?

বুঝতে পারি, সেদিন যে অন্যমনস্কভাবে উনি আমাকে ওই নামে ডেকেছেন তা ওঁর খেয়ালই নেই। বলি, সে কথা আমি বলব না। ওটা আমার ট্রাম্প কার্ড। যখন বুঝব আপনি বড়দা-মেজদার মতোই আমাকে ছোট বোন হিসাবে দেখেন, তখন বলব।

—এখন সে-কথা বিশ্বাস হচ্ছে না?

—না হচ্ছে না! আমি শুনেছি, আপনি...আপনি...একজন পিডোফিলিক।

প্রচণ্ড চমকে উঠলেন উনি। ঝুঁকে পড়ে বলেন, কী? কী বললি?

—পিডোফিলিক!

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়েন। তারপর আবার বসে পড়ে বলেন : ও লর্ড!
‘পিডোফিলিক’ শব্দটার অর্থ জানিস তুই?

—কেন জানব না! সেদিন আপনিই না আমাকে ধমকে বলেছিলেন, “তের বছর বয়েস হয়েছে তোমার—কচি খুকিটি নও—‘কপুলেশন’ মানে জান না?”—বলেননি?

—‘কপুলেশন’ একটা প্রচলিত শব্দ রেবা, ‘পিডোফিলিয়া’ তা নয়!

আমি জবাব দিই না। মাথা নিচু করে গাঁজ-হয়ে বসে থাকি। উনি উঠে দাঁড়ালেন। ঘরময় বার-কতক পায়চারি করে এসে থামলেন। বসলেন আবার নিজের চেয়ারে। বললেন, এ তুই কী বললি রেবা! আমার যে এখন সত্যিই ইচ্ছে করছে তোর নরম গম্বলটা টিপে দিতে। তোর মাথায় হাতটা রাখতে। তোর কপালে একটা চুমু খেতে। কিন্তু...তুই তো ক্রমাগত আমাকে ভুল বুঝবি তাহলে।

—ভুল বুঝব কেন? ‘পিডোফিলিক’দের তো এমন ইচ্ছে হয়ই!

—শাট আপ।

আবার দাঁড়িয়ে ওঠেন। বার কতক পায়চারি করে ফিরে এসে আবার বসেন নিজের চেয়ারে। হঠাৎ একটা টানা ড্রয়ার খুলে বার করে আনলেন একটা পোস্টকার্ড-সাইজ ফোটোগ্রাফ।

বললেন, দ্যাখ মুখপুড়ি! তাকিয়ে দ্যাখ! বল এবার—এটা কার ফোটো?

ফোটোটো হাতে নিয়ে দেখলাম। বজ্রাহত হয়ে গেলাম। উনি তাগাদা দেন, কই বললি না? এটা কার ফোটো?

আমতা-আমতা করে বলি, আমার!

—কতদিন আগেকার ফোটো? তোর বয়স তখন কত?

—পাঁচ-সাত বছর আগেকার! আমার বয়সও তখন সাত-আট বছর!

—এবার আমাকে বুঝিয়ে বল, তোর সাত বছর বয়সের তোলা ফোটো আমার ড্রয়ারে এল কী করে?

—আমি জানি না!

—জানি না বললে তো আমি শুনব না, রেবা। তোর তের বছর বয়স হয়েছে। কচি খুকিটি তো আর নস। ‘পিডোফিলিয়া’-র মতো শব্দ কথার মানে জানিস! আর এ সহজ কথার জবাব দিতে পাচ্ছিস না!

আমি কেঁদে ফেলি।

আবার উঠে পড়েন উনি। পায়চারি করতে করতে বলেন, কী মুশকিল! তুই তো আমাকে পাগল করে ছাড়বি, রেবা! কাঁদলে তোকে আদর করতে পারব না। চোখের জল মুছিয়ে দিতে পারব না। তুই সিঁটিয়ে যাবি। ভুল বুঝবি! ঠিক আছে। কথা দিচ্ছি—তোকে ছোঁব না আমি। তুই নিজেই চোখের জলটা মুছে শান্ত হয়ে বস।

আমার রুমাল নেই। ফ্রকটা তুলে চোখটা মুছতে গেলাম। উনি বাধা দিলেন। স্পর্শ না করেই। বার করে দিলেন একটা সুগন্ধি রুমাল। এবার কিন্তু আমার গা গুলিয়ে

উঠল না। রুমাল দিয়ে চোখটা মুছে শান্ত হয়ে বলি, এবার বলুন। আমার ছোটবেলার ফোটো আপনি কোথায় পেলেন।

—বলব! যদি তুই আমার কথা শুনিস।

—কী কথা?

—ওই অ্যাটাচড বাথরুমটায় যা। ঠাণ্ডা-গরম জল আছে। স্নান করে নে। দেখবি, এক সেট পোশাকও আছে। ফ্রক-প্যান্টি-মোজা। আন্দাজে কেনা। গায়ে ছোট বড় হতে পারে। হোক। এই সাতদিনের বাসি পোশাকটা ছেড়ে ফ্রেশ হয়ে আয়। সাবান, তোয়ালে, পাউডার সব পাবি। লিপস্টিক অবশ্য নেই। যা, আমি ফ্রিজ থেকে রাতের খাবারটা বার করে ততক্ষণে গরম করে নিই। তারপর দুজনে ডিনার খেতে খেতে সব কথা তোকে খুলে বলব। কী করে তোর সাত বছর বয়সের ফোটো আমার ড্রয়ারে এসে গেল। ও. কে.?

আমি উঠে দাঁড়াই। মনে হয়, লোকটা সত্যিই আমাকে ছোট বোনের মতো ভালবাসে। ও ‘পিডোফিলিক’ নয়। বাথরুমের দিকে যেতে গিয়েও ঘুরে দাঁড়াই। বলি, তাহলে ওই কথাটাও তো বলবেন : ‘অ্যালিসিয়া’ কার নাম!

—বলব রে পাগলি, বলব। সব কথাই বলব। আগে তুই স্নান করে আয়। খেতে খেতে সব কথাই বলব তোকে! যা ভাগ! পালা!

আমার সব সঙ্কোচ ততক্ষণে চলে গেছে। তবু জেদি মেয়ের মতো বলি, আর আব্রাসার কথা? সে কোথায়, কেমন আছে?

—আর একটি কথা নয় রেবা! গাল টিপে দিইনি। এবার কিন্তু গালে এক থাপ্পড় বসিয়ে দেব!

তারপর আমার মুখখানা দেখে বোধহয় ওঁর করুণা হল। হেসে ফেলে বললেন, আব্রাসা তোর বয়ফ্রেন্ড! তাকে তুই ভালবাসিস! না রে রেবা? একদিনের মধ্যেই এত ভালবাসা?

আমি ফস করে বলে বসি, হতো না। সেও যে সে রাত্রে প্রতিজ্ঞা করে বলেছিল, ‘তোকে আমি ছোঁব না!’ আমি সেরাত্রেও কেঁদে ফেলেছিলাম। ও ঠিক আপনার মতোই বলেছিল, ‘সরি রেবা! আমার খুব ইচ্ছে করছে তোর চোখের জল মুছিয়ে দিতে। কিন্তু তা আমি পারি না, পারব না। কারণ তোকে আমি ছোঁব না!’

ক্যাপ্টেন স্নবেল উঠে দাঁড়ালেন। আমার দিকে এগিয়ে এলেন। আব্রাসা তার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে পারেনি। শীতের কাঁপুনি থেকে রক্ষা করতে আমাকে জড়িয়ে ধরে শুয়েছিল। উনিও পারলেন না। ‘পিডোফিলিয়া’-র কাঁপুনি থেকে আমাকে রক্ষা করতে মাথায় হাতটা রেখে বললেন : ‘লর্ড ব্রেস ইউ মাই চাইল্ড!’

সকাল সাতটায় রওনা হয়েছি জিপে। আমরা তিনজন। চালকের আসনে ক্যাপ্টেন স্নবেল। পাশের সিটটা খালি। পিছনে আব্রাসা আর আমি। ওকে তুলে নেওয়া হয়েছিল বন্দিশালা থেকে। আমরা চলেছি রাজধানীর দিকে—ওয়ারস। শ-তিনেক মাইল। আন্দাজ সন্ধ্যা নাগাদ পৌঁছাব। লাঞ্চ প্যাকেট সঙ্গে নেই। পথে কোথাও খেয়ে নেবার কথা।

জিপে উঠেই আব্রাসা জানতে চেয়েছিল, আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?

ক্যাপ্টেন গম্ভীরভাবে বলেছিলেন, অত কৌতুহল কেন? তোমার হিসেবে তো রিভলভারের গুলির সঙ্গে গ্যাস-চেম্বারের কোনো ফারাক নেই। তাহলে? শোন, ভাগ্যক্রমে মনোমতো যাত্রাসঙ্গিনী পেয়েছ—দু পাশে সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য। যেটুকু পার, জীবনকে উপভোগ করে নাও। অহেতুক বক বক কর না। বুঝলে?

এরপর আধঘণ্টা-খানেক তিনজনেই নিশ্চুপ। শহর এলাকা পার হয়ে এসেছি। দু-পাশে যব, গম বা বাল্লির ক্ষেত। গরু চরছে। দু-একটা উইন্ডমিল। দূরে পাহাড়ের নীল মিশেছে আকাশের নীলিমায়। হাইওয়ে দিয়ে ঝড়ের বেগে ছুটেছে জিপ। কিন্তু আব্রাসার এসব নজরেই পড়ছে না। আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে মাথাটা টেনে নিয়ে কানে-কানে জিজ্ঞেস করে, তোর কী হয়েছিল রে রেবা? কোথায় ছিলি একদিন?

ফিসফিসিয়ে বলি, হাসপাতালে!

—হাসপাতাল! মানে? কেন? কী হয়েছিল তোর?

দুষ্টবুদ্ধি চাপল মাথায়। সে-রাতে তুমি আমাকে ভুগিয়েছ, সোনা। আজ আমি তার শোধ তুলব। বলি : ন্যাকা! ভাজা-মাছটা উলটে খেতে জানি না, না রে? কত বড় বড় কথা : ‘কোনো মেয়ের সঙ্গে এক ঘরে তো রাত কাটাইনি! ব্রা-য়ের হুক কী করে খুলতে হয় জানিই না!

ওর চোখ দুটো নাটা-নাটা হয়ে যায়। ফিস ফিস করে আবার বলে, প্লিজ রেবা! বল, কী হয়েছিল তোর?

—আই ওয়াজ ‘রেপড’!

মনে হলো ও ইলেকট্রিক শক খেল একটা। আমতা-আমতা করে বলে, কবে? কখন? সে কথার জবাব এড়িয়ে বলি, তিন-তিনটে স্টিচ দিতে হয়েছে আমাকে।

ও আকাশ থেকে পড়ে। বলে, তা কেমন করে হবে...

ওকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বলি, তুই কেমন করে জানবি? ওই সার্জেন্টটা আমাকে ফিমেল ডর্মিটারিতে নিয়ে যায়নি। একটা সলিটারি-সেল-এ আটকে রেখেছিল। আসলে সেটা সলিটারি-সেল নয়। ঘরে আরও একজন পুরুষ ছিল...

তারপর একটা ‘শ্রাগ’ করে বলি, দূর! কাকে কী বলছি! মায়ের কাছে মাসির গল্প...

সামনের দিক থেকে আবার ধমক শোনা গেল : আবার তোমরা বকবক শুরু করলে ? ডোন্ট টক ! এঞ্জয় দ্যা কান্ট্রিসাইড !

আমি তা দারুণ উপভোগ করছি। কেমন জন্ম ! এবার তুই ভোগ ! সে রাতে আমার ঘুম ছুটিয়ে দিয়েছিলে, চাঁদু ! আমিই বা ছেড়ে কথা বলব কেন ?

আব্রাসাকে দৃশ্চিন্তার কুস্তীপাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে দিয়ে এই মওকায় কাল রাতে কী হয়েছিল বলে নিই। টয়লেটে বড় আয়না ছিল। আবার আয়নার মধ্যে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলাম নিজে—এপাশ ফিরে, ওপাশ ফিরে, হাত দুটো মাথার উপর তুলে, ব্যালে-নাচের ভঙ্গিতে ! আমাদের বাড়িতে বাথটব ছিল, কিন্তু আকর্ষণ উষ্ণ-জলের অবগাহন-স্নান, এ-আমার জীবনে প্রথম। সাবানের ফেনায় গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে মনে হচ্ছিল, আমি বুঝি ‘কুইন অব সেবা’, অথবা ‘ক্লিয়োপেট্রা’। আবেশে চোখ দুটি বন্ধ হয়ে গেল। বোধ হয় ঘুমিয়েই পড়েছিলাম। চটকা ভেঙে গেল দরজায় নক করার শব্দে : ‘অ্যাঁ ! আর কতক্ষণ স্নান করবি রে পাগলি ? সর্দি লেগে যাবে যে !’

হুড়মুড়িয়ে উঠে পড়ি। সাড়া দিই : এই এক্ষুনি আসছি।

নতুন তোয়ালেতে সর্বাস্থ মুছে নতুন পোশাকটা পরলাম। না, মাপে ছোট হয়নি। বরং একটু বড়ই হয়েছে। তা হোক। পোশাকটা গায়ে পড়বার আগে খুব ভাল করে পাউডার দিলাম সারা শরীরে ! কী আরাম ! ফ্রকটা দারুণ। সিল্কের। ফুলকাটা। রানি কালারের।

বাইরে এসে দেখি, ইতিমধ্যে নৈশ আহারটা গরম করে উনি দুটি প্লেট সাজিয়ে ফেলেছেন টেবিলে। আমাকে দেখেই এক গাল হেসে বললেন, তুই রাগ করিস না রেবা ! ওই কথাটা এবার না বলে পারছি না !

—কোন কথাটা ?

—তাকে এখন দারুণ সুন্দর দেখাচ্ছে।

আমি রঙিয়ে উঠি। বলি, ওমা ! এ-কথায় রাগ করব কেন ? এ তো কমপ্লিমেন্ট !

—হ্যাঁ তাই ! কিন্তু আমি যে পিডোফেলিক !

এবার আমি রাগ করে বলি, ফের ওকথা ! যদি ওসব অসভ্য কথা বল, তাহলে তোমার সঙ্গে কোনো কথাই বলব না। তুমিই তো বলেছিলে, ভুল-ভুলই ! তোমার ভুল হতে পারে, আমার পারে না ?

উনি হেসে বললেন, শোধবোধ ! আমরা দুজনেই ভুল করেছিলাম। আয় এবার খেয়ে নেওয়া যাক !

এত দামি-দামি খাবারও বহু-বহুদিন পেটে পড়েনি। এত সুস্বাদু !

খাবার শুরু করার আগে উনি খ্রিস্টান মতে প্রার্থনা করলেন। আমি দু’চোখ বন্ধ

করে বিনা মস্ত্রে সেই প্রার্থনায় যোগ দিলাম। খেতে খেতে উনি বলেন, এবার বল, কী সব প্রশ্ন ছিল যেন তোর?

—প্রথম কথা, এবার কি আমাকে তুমি যেটায় ফিরে যেতে দেবে?

উনি কাঁটা-চামচ নামিয়ে রেখে সোজা হয়ে বসেন। বলেন, না রে রেবা। দেব না। কেন দেব না, তাও তোকে জানাতে পারব না।। দ্যাটস এ মিলিটারি সিক্রেট! প্লিজ এক্সকিউজ মি!

—তাহলে...তাহলে কোথায় যাব আমি? এখানেই থেকে যাব?

—না! সেটাও সম্ভবপর নয়। সেটাও মিলিটারি আইন-কানুন বিরুদ্ধ! তোকে আমি রেখে আসব একটা নিরাপদ আশ্রয়ে। ওয়ারস-তে। সেখানে একজন অদ্ভুত মানুষ আছেন। এমন মানুষ আজকের দুনিয়ায় নিতান্ত বিরল। তিনি একজন মেডিক্যাল ডক্টর। খ্রিস্টান। সন্ন্যাসী মানুষ। তাঁর নাম : ডক্টর জানুস কোরচখ। তিনি নাৎসিবাদে বিশ্বাস করেন না। ইহুদিরা যে জার্মানির সর্বনাশের কারণ একথা তিনি মানেন না। তিনি একটা ‘অনাথ আশ্রম’ তৈরি করেছেন—তার নাম : Dom Sierot, মানে ‘আওয়ার হোম’। তোকে সেখানে রেখে আসব—কাল সকালেই!

—সেখানে মা, সেজদা, হার্ৎসেল গিয়ে থাকতে পারে না!

—না। হার্ৎসেল হয় তো পারে। বড়রা পারে না। তাছাড়া আমার ক্ষমতাও তো সীমিত। তবে হ্যাঁ, আমি আব্রাসাকেও ওখানে রেখে আসব!

আমার নয়ন নত হলো। চোখে জল। বলি, মায়েদের সঙ্গে আর দেখা হবে না?

—আদোনাই-এর ইচ্ছে! যুদ্ধ যদি তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায় তাহলে আবার দেখা হবে। তোরা তাদের সাবেক বাড়িতে ফিরে আসবি। মন খারাপ করিস না, রেবা।

জীবনে এত দুঃখ পেয়েছি যে, সামলে নিতে খুব বেশি দেরি হলো না। বলি, তুমি সেদিন বড়দা—আই মীন জাখারির কথা—কেন অমন করে জিজ্ঞেস করছিলে? তোকে তুমি চেন?

উনি প্লেটটা সরিয়ে দিয়ে বললেন, তোর এ প্রশ্নের জবাবটাও আমি দিতে পারি না, রেবা। অন্য কথা বল?

—না! তোমার কাছে ওটা মিলিটারি সিক্রেট হতে পারে। আমার কাছে নয়। আমি জানি। জাখারি যে ‘পোলিশ রেজিস্টেন্স আর্মি’-তে নাম লিখিয়েছে এ খবরটা তুমি জান! স্বীকার করতে হবে না। আমি বুঝেছি!

—না! এখন আর অস্বীকার করে লাভ নেই। তুই ঠিকই ধরেছিস। জাখারির নাম গেস্টাপোর ‘ওয়ান্টেড-লিস্ট’-এ প্রথম সারিতেই আছে। তার সঙ্গে সাক্ষাত হলে আমরা দুজনেই গুলি চালাব। কে লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে তা যীশাস জানেন। অথবা আদোনাই!

আমিও প্লেটটা সরিয়ে দিলাম। আমার চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল ঝরে পড়ল।

এবার উনি নিজেই রুমাল দিয়ে আমার চোখটা মুছিয়ে দিয়ে বললেন, আগেই কেন ধরে নিচ্ছি—যুদ্ধ মিটে যাবার আগে তার সঙ্গে আমার দেখা হবেই। হয়তো প্রথম সাক্ষাতটা হবে এই নাৎসিবাদ ধ্বংস হয়ে যাবার পর। যখন খ্রিস্টান আর ইহুদিরা পরস্পরের সঙ্গে করমর্দন করবে। আমাদের খ্রিস্টমাসে তুই হয়তো জাখারিকে নিয়ে আমার নিমন্ত্রণ রাখতে আসবি। অথবা আমিই যাব, তাদের ‘পাস-ওভারে’। এক রুটি থেকে জাখারির মুখে খাবার তুলে দেব, সে আমাকে খাইয়ে দেবে।

আমি ইহুদি। কিন্তু অসতর্কভাবে বলে উঠি—ওঁদের ভাষায় : আমেন !

এরপর আমি জানতে চেয়েছিলাম, আমার ছেলেবেলার ফোটো কেমন করে ওঁর ড্রয়ারে এল। উনি সব কথা বুঝিয়ে বললেন :

ফোটোটা আদৌ আমার নয়। ওঁর বৈমাত্রিক ভগিনী অ্যালিসিয়া স্নবেল-এর। ওঁর নিজের কোনো ভাইবোন নেই। ওঁর গর্ভধারিণী মা প্রয়াত হবার পর ওঁর বাবা একজন ইহুদি মহিলাকে বিবাহ করেন। সেটা হিটলারের অভ্যুত্থানের পূর্বযুগের কথা। তখন এতে কোন বাধা ছিল না। অ্যালিসিয়া সেই বিমাতারই একমাত্র সন্তান। প্রকৃতির কী এক বিচিত্র খামখেয়ালিপনায় তাকে দেখতে নাকি হুবহু আমার মতো। হিটলার যখন ক্ষমতায় আসে উনি তখন বার্লিন-কলেজে দর্শনের ছাত্র। ওঁর বাবাকে নাৎসি সরকার যুদ্ধে যোগদান করতে বাধ্য করে। কনস্ক্রিপশন! র‍্যাঙ্কে তিনি মেজর ছিলেন। হিটলারের রাশিয়া অভিযানের সময় তাঁকে লেনিনগ্রাড অভিযানে যেতে হয়। প্রত্যাবর্তনের সময় হিটলারের যে কয়েকলক্ষ সৈন্য শীতে জমে মারা যায়, তিনি তাদের মধ্যে একজন। আর্নস্ট বার্লিন থেকে ফিরে আসেন বিমাতার কাছে। কিন্তু তাদের সাক্ষাত পাননি। না মা, না ছোট বোন অ্যালিসিয়া। দুজনকেই আগের সপ্তাহে নাৎসি গেস্টাপো ধরে নিয়ে গেছে। ইহুদি হবার অপরাধে। দুজনেই কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে মারা যান। গ্যাস-চেম্বারে!

আমি সঙ্কোভে জিঞ্জেস করেছিলাম, তাহলে তুমি এই বর্বর বাহিনীতে নাম লেখাতে গেলে কেন, আর্নস্ট?

—আমি স্বেচ্ছায় যুদ্ধে যোগ দিইনি রে, রেবা! বাবার মতো আমাকেও কনস্ক্রিপ্ট করা হয়েছিল। আমি অস্বীকার করলে আমাকে ওরা বন্দি করত না—বার্ট্রান্ড রাসেলের মতো—এটা তো গ্রেট ব্রিটেন নয়—সরাসরি দাঁড় করিয়ে দিত ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে।

তারপর একটু চুপ করে থেকে আবার বলেন, না রে রেবা, ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে আমি দাঁড়াতে রাজি হইনি দু-দুটো কারণে। প্রথম কথা : আমি জন্মসূত্রে জার্মান! আজকে তার শাসনভার দখল করেছে একটা ‘মেগালোম্যানিয়াক’—যার চিন্তাধারায় আমার বিশ্বাস নেই, কিন্তু ‘জার্মানি’ কী দোষ করল? গোটের জার্মানি, কার্ল মার্কসের- ম্যাক্সমূলারের জার্মানি? দ্বিতীয় কথা : আমি যুদ্ধে যোগ দিলে হয়তো এইসব অসহায় ইহুদি মানুষগুলোর

কিছু উপকার করতে পারব!...কিন্তু একটা কথা, তুই তখন অ্যালিসিয়ার নাম করেছিলি। তুই তার নাম জানলি কী ভাবে?

—তুমি খেয়াল করনি আর্নস্ট। অসতর্কভাবে তুমি আমাকে একবার ‘অ্যালিসিয়া’ নামে ডেকে বসেছিলে!

—নাকি? আমার একদম মনে পড়ছে না।

বেলা দশটা নাগাদ জিপটা এসে থামল একটা গ্যাস স্টেশনে। পেট্রল নিতে। ক্যাপ্টেন আমাদের বললেন, তোরা দুজন ওই টয়লেটে গিয়ে মুখ-হাত ধুয়ে এসে ওই ক্যাফেটেরিয়ায় বস। আমি পেট্রল ভরে নিয়ে ওখানে এসে যাব। একটু কফি-ব্রেক নেওয়া দরকার। এক নাগাড়ে অনেকটা ড্রাইভ করা গেছে।

ওঁর নাগালের বাইরে এসেই আব্রাসা খপ করে চেপে ধরে আমার হাত। বলে, এবার বল, সত্যি করে বল—কী হয়েছিল তোর!

বাধ্য হয়ে সব কথা খুলে বলতে হলো। আমার যে ‘পিরিয়ড’ হয়েছিল একথাও। স্বীকার করতে বাধ্য হলাম ওর জেরায় জেরবার হয়ে। ও বার বার জানতে চাইছিল, ক্যাপ্টেন কেন বলেছিলেন যে, ‘কনক্লুসিভ’ প্রমাণ আছে?

যাই হোক সারা দিন জিপে জীর্ণ হয়ে আমরা সন্ধ্যা নাগাদ এসে পৌঁছলাম ওয়ারসতে। সরাসরি ক্রোচমালনা স্ট্রিটে একটা প্রকাণ্ড প্রাসাদের সামনে। তোরণে সবুজ-হরফে লেখা Dom Sierot। অর্থাৎ ‘আওয়ার হোম’ : ‘আমাদের বাড়ি’ বা ‘আমাদের আশ্রম’। এই অ্যান্ডবড বাড়ির মালিক ডক্টর কোরচখ? তবে তা তিনি আমীর!

দ্বারপাল নাৎসি ক্যাপ্টেনকে খানদানি স্যালুট করে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল। পিছন পিছন আমরা দুজন। দ্বিতলে একটা প্রকাণ্ড ঘর। তার মাঝখানে বাসে আছেন এক বৃদ্ধ। মাথায় মাত্র কগাছি চুল। অ্যান্টিশাস! তৈলতৃষিত চুলের গুচ্ছ আকাশপানে কি যেন খুঁজছে। ফ্রেঞ্চকোট নূর। গলায় গলবন্ধ কোট—গ্রে রঙের। চোখে ডিম্বাকৃতি লেন্সের চশমা। তাঁকে ঘিরে ছোট ছোট ড্রাম-আকারের কতকগুলি মোড়ায় সাত-আটটি বাচ্চা—মেয়ে এবং ছেলে। কমের দিকে ছয়, বেশির দিকে দশ। আমাদের পদশব্দে চশমাটা কপালে তুলে চাইলেন।

গুটেন আবেস্ট কাপিতান! আবার তুমি একজোড়া খরগোশছানা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছ! তা বেশ করেছ! কিন্তু ওদের গলায় ঝুমঝুমি বেঁধে দাওনি কেন?

ক্যাপ্টেন স্নবেল হাসতে হাসতে বলেন, গুটেন আবেস্ট! আমাদের মিলিটারি ক্যান্টিনে ঝুমঝুমি কিনতে পাওয়া যায় না ওল্ড ডক! আপনিই কিনে ওদের গলায় পরিয়ে দেবেন।

—দেব! নিশ্চয় দেব! কিন্তু দামটা তোমাকে মিটিয়ে দিতে হবে বাপু! তুমি তো

জানই আমার অবস্থা! আমার পকেটে মস্ত ফুটো!

—সেজন্য আমি প্রস্তুত হয়েই এসেছি ডকটর, নিন ধরুন!

উনি পকেট থেকে একটা ক্যাশিয়र्स চেক বার করে টেবিলে রাখলেন।

বুঝতে পারি ইনিই এ বাড়ির মালিক : ডকটর জানুস কোরচখ। কিন্তু উনি তো আমীর আদমি! এতবড় প্রাসাদের মালিক! তাহলে অনায়াসে ভিক্ষা চাইলেন কেন?

হাত বাড়িয়ে চেকটা নিলেন। একটি বাচ্চা ছেলেকে বললেন, তোর মুড়িকে ডাক। চেকটা তুলে রাখবে।

‘মুড়ি’ মানে মা। আন্দাজ করি, তিনিই ফ্রাউ কোরচখ। ওই ছেলেটির মা। ছেলেটি নাচতে নাচতে বেরিয়ে গেল। পরক্ষণেই একটা ছোট্ট মেয়ে—বছর পাঁচেকের, দৌড়াতে দৌড়াতে ঘরে ঢুকল। চিৎকার করে উঠল, ড্যাড! ব্রনো আমার বলটা কেড়ে নিয়েছে।

ব্রনোও এসেছে তার পিছু-পিছু। প্রায় একই বয়সী। হয়তো দু-এক বছরের বড়। পরনে হাফপ্যান্ট। তার হাত দুটি পিছনে। বোধ করি অপহৃত বলটা সেখানে শক্ত মুঠিতে ধরা। বললে, না ড্যাড! কেড়ে নিইনি। খেলতে নিয়েছি!

ওমা! সবাই যে ওঁকে ড্যাড ডাকে! ওঁর এতগুলি সমবয়সী সন্তান!

ওল্ড ডক মেয়েটিকে বললেন, ওই শোন! কেড়ে নেয়নি! খেলতে নিয়েছে। লোফালুফি খেলতে। ব্রনো এবার বলটা আমার দিকে ছুঁড়ে দে দিকিন! কিন্তু এমনভাবে টিপ করে ছুঁড়বি যাতে আমি বসে বসেই সেটা ‘ক্যাচ’ করতে পারি!

ব্রনোর লাল-টুকটুকে জিবের প্রান্তটা বেরিয়ে এল। সে টিপ করে বলটা তাদের ড্যাডের দিকে ছুঁড়ে দিল। বৃদ্ধ সেটা বসে বসেই লুফে নিলেন। তৎক্ষণাৎ সেটা ছুঁড়ে দিলেন মেয়েটির দিকে। সে বলটা লুফতে পারল না। কিন্তু বলের পিছনে ধাওয়া করে সেটা হস্তগত করল!

বৃদ্ধ বললেন, দেখলি তো, পাগলি। বল কেউ নিজের দখলে রাখবার জন্য কেড়ে নেয় না। লোফালুফি খেলবার জন্য নেয়। যা, তোরা মাঠে গিয়ে খেলগে যা!

মেয়েটির নাম ‘পাগলি’, নাকি সেটা ওঁর আদরের সম্বোধন ঠিক ধরতে পারি না। পরক্ষণেই ঘরে এলেন একজন শ্রোতা ভদ্রমহিলা। তাঁর হাতে একটা জলের গ্লাস। বৃদ্ধকে প্রশ্ন করেন, ডেকেছ?

—ডাকছি তো জীবনভোর! তুমি কি শুনতে পাও! শোন, ক্যাপ্টেন আমাদের প্রতিষ্ঠানের জন্য একটা মোটা ডোনেশন এনেছে। চেকটা তুলে রাখ।

—রাখছি। তুমি ওষুধটা এবার খেয়ে নাও। ওষুধ খাবার সময় হয়েছে।

—আবার ওষুধ খাব কেন? জ্বর তো সরেই গেছে। আর জ্বর হচ্ছে না তো?

—তোমাকে আর ডাক্তারি করতে হবে না। ডাক্তারবাবু বলেছেন, আরও দু’দিন কুইনিনটা চলবে।

ডকটর কোরচখ ক্যাপ্টেন ন্নবেলের দিকে ফিরে বলেন, দ্যাখ, দ্যাখ, ক্যাপ্টেন, তোমাদের সেক্রেটারির দাপট! ডাক্তারের ওপর ডাক্তারি করবে! যেন আমি ডাক্তারি ভুলে মেরে দিয়েছি এই চুন্নুমুন্সুলোর সঙ্গে ছেলেমানুষি করতে করতে।

বলেন বটে তবে হাত থেকে কুইনিনের বড়িটাও নিয়ে নেন। মিসেস কোরচখ বলেন, আগে জলের গ্লাসটা ধর—

—কেন?—তোমার ডাক্তার তো আমাকে কুইনিন খেতে বলেছে। তার সঙ্গে জল খেতে হবে এ কথা তো প্রেসক্রিপশনে লেখা নেই।

অস্মান বদনে কুইনিন ট্যাবলেটটা মুখে ফেলে কচড়মচড় করে চিবিয়ে খেয়ে ফেললেন।

—জল খাবে না তুমি?

—না। যতক্ষণ না ডাক্তারবাবু প্রেসক্রিপশনে সে কথা স্পষ্টাক্ষরে লিখে দিচ্ছেন। আব্রাসা অবাক হয়ে বলে, ওটা কি কুইনিন ট্যাবলেট? আপনি চিবিয়ে খেলেন? ডক্টর কোরচখ দু-ইঞ্চি বার করে দেখালেন জিবটা। সেটা সাদা হয়ে গেছে কুইনিনের গুঁড়োয়।

ফ্রাউ কোরচখ, মানে ওঁর স্ত্রী বললেন, ডাক্তারবাবুর প্রেসক্রিপশনে থাক-না-থাক—আমার অনুরোধে একটু জল খাও।

— দ্যাটস আ ডিফারেন্ট ইশ্যু অলটুগেদার। একজন সুন্দরী ভদ্রমহিলার অনুরোধে বিষপানও করা যায়—কি বল ক্যাপ্টেন? দাও!

এবার ঢক ঢক করে জলটা পান করলেন উনি।

ক্যাপ্টেন এতক্ষণে সম্মতি ফিরে পেয়ে ভদ্রমহিলাকে বলেন, গুটেন আবেন্ট, ফ্রলিন স্টেফা! ওল্ড ডকের কি ম্যালেরিয়া হয়েছিল?

ফ্রলিন? ফ্রাউ নয়? উনি কুমারী? ডক্টর কোরচখের স্ত্রী নন? তিনি বলেন, আর বলেন কেন ক্যাপ্টেন—কোন অজ পাড়াগাঁয়ে গেছিলেন রুগী দেখতে। রুগী ভাল হোক-না-হোক, উনি ম্যালেরিয়া নিয়ে ফিরলেন।*

—না, না! রুগী ভাল হয়ে গেছিল! ওল্ড ডকের ওষুধ কথা বলে, হুঁ হুঁ বাবা!

ভদ্রমহিলা বললেন, শুধু কথা বললে তো বাঁচতাম। ক্রমাগত বক বক করে। এ ছেলে-মেয়ে-দুটির পরিচয় নিয়েছ?

—পরিচয়? পরিচয় আবার নেব কী? এর নাম পাগলা, ওর নাম পাগলি! তুমি ওদের নাম-ধামগুলো খাতায় টুকে নাও।

*পোল্যান্ডে ম্যালেরিয়া হয় না। কুইনিনের মতো সুপরিচিত তিভ্র স্বাদের ওষুধের নাম লেখকের জানা থাকায় গল্পের গল্পের এই বৃক্ষারোহণ।

ভদ্রমহিলা আমার দিকে ফিরে বললেন, তোমার নামটা কী মা?

আমি ফ্রকের দুই-প্রান্ত ধরে বাও করি বলি, ফ্রলিন অ্যালিসিয়া স্নবেল!

আত্মসার চোখ নাটা-নাটা! আমাকে ডাহা মিথ্যে কথা বলতে শুনে!

ফ্রলিন স্টেফা এবার ক্যাপ্টেনের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করেন, ‘স্নবেল’? আপনার কোনও আত্মীয়া?

ক্যাপ্টেন তাঁকে জবাব দেন না। কোরচখের দিকে ফিরে বলেন, জবাবটা আপনি দিন, ওল্ড ডক!

বৃদ্ধ আমার কাঁধটা ধরে তাঁর দিকে আকর্ষণ করেন। চিবুকটা তুলে ধরে বলেন, গুড গড! তুই সেই পুঁচকে অ্যালিসিয়া? যার অ্যাপেন্ডিক্সটা ছেঁটে বাদ দিয়েছিলাম একদিন? তুই এত বড় হয়ে গেছিস! তোকে তো চিনতেই পারিনি!

তারপর ফ্রলিন স্টেফার দিকে ফিরে বললেন, ক্যাপ্টেন স্নবেলের সিস্টার! বছর দশেক আগে এর অ্যাপেন্ডিসাইটিস হয়েছিল। আমিই অপারেট করি!

এরপর পুরো একটি বছর ছিলাম সেই আশ্রমে। ছদ্ম পরিচয়ে। ডক্টর কোরচখ জানতেন, অ্যালিসিয়া আর তার মা ধর্মে ইহুদি। ক্যাপ্টেন স্নবেলের সংসারে তারা থাকতে পারে না। নার্সি দর্শন সে অস্বীকার সইবে না। তাতে নর্ডিক বিশুদ্ধতা নষ্ট হবে। সেইজন্যই ক্যাপ্টেন আর্নস্ট স্নবেল তাঁর বৈমাত্রেয় ভগিনীটাকে গুঁর আশ্রমে রেখে যেতে বাধ্য হয়েছে।

অ্যান্টোনি-এর অসীম করুণা : ওই একবছরের মধ্যে আমার দেহপ্রাপ্তিস্থিত অ্যাপেন্ডিক্সটা কোনো বাঁদরামি করেনি। করলে, ডাক্তার ভুল ডায়োগনসিস করতেন। এক রোগিণীর অ্যাপেন্ডিক্স তিনি নিশ্চয় দুবার কেটে বাদ দিতে রাজি হতেন না।

‘আওয়ার হোম’ একটা বিশাল চারতলা প্রাসাদ। মাঝখানের কেন্দ্রীয় অংশে অফিস, মিটিং রুম আর শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আবাস। একদিকের উইণ্ডো মেয়েরা আবার অন্য দিকে ছেলেরা ছাত্রাবাস। বড় বড় ডর্মিটরি। আটটি শয্যাবিশিষ্ট এক এক ঘরে বিভিন্ন বয়সের ছেলেরা অথবা মেয়েরা রাত্রে শোয়। পাশাপাশি দুটি ঘরের ষোলোজন আবাসিকের একজন করে এম. পি.। হ্যাঁ, মনিটর বা ক্যাপ্টেন নয়, সাংসদ। তারা ষোলোজনের ভোটে নির্বাচিত। এই সাংসদরাই ভোট দিয়ে নির্বাচন করে ক্যাবিনেটের মন্ত্রী, উপমন্ত্রীদের। এক এক মন্ত্রকের এক এক পোর্ট ফোলিও—মিনিষ্ট্রি অব গেমস্, অব প্রেয়ার, অব কিচেন, অব মার্কেটিং, অব জাস্টিস্ এবং ‘ল অ্যান্ড অর্ডার’। এ আমার কল্পনা নয়, গল্পকথা নয়।

কোরচখের জীবনীকার স্বয়ং আরন জিৎলিং * লিখেছেন, 'Dom Sierot'-এর অনাথ আশ্রমে সৃষ্টি হয়েছিল পৃথিবীর প্রথম ও শেষ একমাত্র 'পার্লামেন্ট অব চিলড্রেন'!

রান্না খারাপ হলে, বাজারের হিসাবে গরমিল হলে, খেলার মাঠে বিশৃঙ্খলা হলে পার্লামেন্টে বিল আসতো, ডিবেট হতো। ক্ষেত্রবিশেষে মন্ত্রী পদচ্যুত হতেন। কারও বিরুদ্ধে অপর কারও কোনো অভিযোগ থাকলে শিক্ষক-শিক্ষিকারা নির্বিকার। বিচার করত আবাসিক-আদালত। অভিযুক্ত শাস্তি খোলামনে মেনে নিতে না পারলে সুপ্রীমকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে আপীল করতে পারত। ডিভিশন বেঞ্চে ছিলেন : ড্যাডি আর মুট্রি।

তাঁরাও কিন্তু বিচারের আওতার বাইরে নন। মনে আছে, একবার অভিযোগ এল স্বয়ং ডক্টর কোরচখের বিরুদ্ধেই। পুঁচকেদের আঁকা-বাকা হরফে গণ-দরখাস্ত!

বিচার হলো। আসামীকে কাঠাগড়ায় উঠে বসতে হলো। যুগ্ম বিচারক : আব্রাসা আর মার্টিন।

অভিযোগটা ছিল এই রকম : দরখাস্তকারিদের মতে আশ্রমপিতা বাচ্চাদের সঙ্গে খেলার সময়টা দিন দিন কমিয়ে আনছেন। আগে তিনি দু-তিন ঘণ্টা আমাদের সঙ্গে খেলায় যোগ দিতেন। আউটডোর অথবা ইনডোর খেলায়। পুঁচকেদের পুতুল ঘরে, খোকাখুকুর খেলনা ঘরে, অথবা খুকুমণিদের রান্নাঘরে। ইদানীং সময়টা কমতে কমতে আধঘণ্টায় এসে ঠেকেছে।

পাবলিক প্রসিকিউটর ক্রনো বিচারকদ্বয়কে 'বাও' করে অভিযোগটা পড়ে শোনাতে—ওই যাকে বলে 'চার্জ শীট'! এক এক করে বাচ্চাদের সাক্ষীর মধ্যে তুলে প্রতিষ্ঠা করল কথাটা মিছে নয়। ড্যাডি রীতিমতো পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। বেশ কিছুদিন হলো খেলায় তাঁর মন নেই। শুধু কাজ আর কাজ! এ তো ভাল কথা নয়।

নীনা সাক্ষী দিতে উঠে বলল, এমন করলে আমরা ড্যাডির সঙ্গে আড়ি করে দেব।

জাস্টিস আব্রাসা তাকে 'অ্যাডমনিশ' করলেন : এ কথা বলার অধিকার তোমার নেই, নীনা। বিচারকই সেটা স্থির করবেন। তুমি শুধু অভিযোগই জানাতে পার।

আমি ছিলাম সে বিচারসভায় ডিফেন্স কাউন্সেল।

আমি আসামী পক্ষের হয়ে সওয়াল করে বলেছিলাম যে, আসামী এখন নানান কাজের চাপেবাক্সদের সময় দিয়ে উঠতে পারছেন না। তাঁর সময়ভাবের মূল হেতু অর্থাভাব। এই অনাথ-আশ্রমটি পরিচালনে যাঁরা এককালে আর্থিক সাহায্য করতেন তাঁরা অধিকাংশই ইহুদি ছিলেন। সরকারী আদেশে তাঁরা অনেকেই নিঃস্ব হয়ে গেছেন। কেউ কেউ চলে যেতে বাধ্য হয়েছেন কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে। তার ফলে আসামীকে নতুন নতুন

*Ghetto Diary. by Janusz Korczak, edited by Aaron Zeitlajn. Holocaust Library.N.Y.

‘ডোনার’ বা দাতার সন্ধান করতে হচ্ছে। যুদ্ধের আগে যেসব জার্মান পরিবারে তিনি মহিলাদের চিকিৎসা করেছেন, তাঁদের মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছেন—এখন তাঁদের কাছে ওঁকে ভিক্ষা চাইতে যেতে হচ্ছে। সেই সব জার্মান মহিলার স্বামী, ভাই বা সন্তান, কেউ কেউ সাহায্য করেছেনও। কেউ কেউ ইহুদিদের জন্য অর্থব্যয় করা অন্যায্য বা পাপ মনে করেছেন। কেউ বা সাহস পাচ্ছেন না। এজন্যই তাঁর সময় বেশি নষ্ট হচ্ছে। আসামী যদি অপরাধ করে থাকেন তাহলে তিনি তা বাধ্য হয়ে করেছেন। তিনি আমাদের আগের মতোই ভালবাসেন। আমাদের সঙ্গে খেলা করতে তিনি আজও সমান উৎসাহী, সমান আগ্রহী, সমান ইচ্ছুক। কিন্তু বাধ্য হয়ে তা তিনি করতে পারছেন না।

বিচারকদ্বয় এবার আসামীকে প্রশ্ন করে : আপনার ‘প্লী’ কী? আপনি দোষী না নির্দোষ?

ডক্টর কোরচখ বললেন, সে-কথা জানানোর আগে আমি কিছু প্রাথমিক বক্তব্য রাখতে চাইছি—

আব্রাসা বিচারক হিসাবে বলল, আপনি বলতে পারেন হের ডক্টর। কী আপনার সওয়াল?

—আমি চব্বিশ ঘণ্টার ভিতর সাতঘণ্টা ঘুমাই। আধঘণ্টা মর্নিং আর আধঘণ্টা ঈভনিং-ওয়াক করি। তিনঘণ্টা শারীর ধর্মের জন্য ব্যয়িত হয়—খাওয়া, স্নান করা, বাথরুমে যাওয়া, দেহে তৈলমর্দন করা, যোগাসন করা। একুনে ব্যয়িত হয় এগারো ঘণ্টা, চার ঘণ্টা ক্লাস নিই, একঘণ্টা উপাসনা করি। বাকি সাতঘণ্টা নিজের পড়াশুনা করি। বাচ্চাদের জন্য লিখি। শিশুশিক্ষা বিষয়ক গ্রন্থ পাঠ করি, বিদেশী কাহিনীকে পোলিশ ভাষায় নাট্যরূপ দিই। একঘণ্টা বাচ্চাদের সঙ্গে খেলি। এই আমার চব্বিশ ঘণ্টার হিসেব। অন্যান্য কাজের চাপে কখনো কখনো খেলার সময় কমে আধঘণ্টাও হয়ে যায়। সেইটুকু অপরাধের জন্য আমি গিল্টি। আদালত যদি নির্দেশ দেন তাহলে আমি অন্য কোন খাত থেকে সময় সংক্ষেপ করতে পারব না—শুধু ঘুমের সময়টা কমাতে পারি। আমি আদালতের নির্দেশের অপেক্ষায় রইলাম।

আদালতের রায় দেবার আগে প্রতিষ্ঠানের সচিব ফ্রলিন স্টেফানিয়া আদালতের অনুমতি নিয়ে তাঁর একটি সংক্ষিপ্ত নিবেদন দাখিল করেন : চিকিৎসকের পরামর্শ মতো এ বয়সে আসামীর অন্তত আটঘণ্টা নিদ্রার প্রয়োজন। রাতে সাতঘণ্টা, দুপুরে একঘণ্টা। আদালতের নির্দেশ যদি চিকিৎসকদের নির্দেশের বিরুদ্ধে যায়, তাহলে আসামীর আয়ুক্ষয় হতে বাধ্য। তিনি অচিরে প্রয়াত হবেন।

ডিভিশন-বেঞ্চ আসামীকে বেকসুর খালাস করে দেন!

লুইস ক্যারল-বর্ণিত অ্যালিস ইন ওয়াডারল্যান্ডের সেই বিচারসভা ব্যতিরেকে এমন আজব বিচারের কথা আমি কখনো দেখিনি, শুনিনি, পড়িনি।

প্রতি চারমাস অন্তর—বছরে তিনবার আমরা একটা করে নাটক মঞ্চস্থ করতাম। পোলিশ ভাষায় তখন ছোটদের অভিনয়ের উপযুক্ত নাটক প্রায় ছিলই না। আমাদের ড্যাড একটা নাটক অভিনয়ের পরেই বসতেন আর একটি নাটক রচনা করতে। সচরাচর বিশ্বসাহিত্যের শিশুকাহিনী থেকে—হাস অ্যান্ডরসন, লুইস্ ক্যারল, গ্রিম ব্রাদার্স প্রভৃতির শিশুসাহিত্যের জার্মান অনুবাদ থেকে। আমার আশ্রমবাসের মধ্যে আমি তিনটি নাটক অভিনীত হতে দেখেছি। দুটিতে আমি নিজে অভিনয় করি। একটায় করিনি। প্রথমে করেছিলাম ‘স্নো-হোয়াইট আর সাতবামনের’ গল্পে। আমি ছিলাম নামভূমিকায় : তুষারশুভ্রা। আমাদের আশ্রমে সবচেয়ে সুন্দরী ছিল, আমারই বয়সী, একটি মেয়ে : উইনী! সে-কথা সেদিন সহজে স্বীকার করতাম না, আজ সর্বান্তঃকরণে করি। ও ছিল টিপিকাল ব্লন্ড। স্নো-হোয়াইট হিসেবে তাকে নিশ্চিত বেশি মানাতো। কিন্তু আমাদের ‘ড্রামা-কাউন্সেল’-এর মতে ওর চেয়ে আমার অভিনয় প্রতিভা নাকি ছিল বেশি। আমরা দুজনেই একটি দৃশ্য প্রতিযোগিতামূলক অভিনয় করে বিচারকদের দেখিয়েছিলাম। আমিই তুষারশুভ্রা হিসাবে অভিনয়ের অধিকার পাই। উইনীর হিংসে হয়েছিল কিনা জানি না। সে বিচারকদের রায় মেনে নিয়েছিল।

ওয়ারসর বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি অভিনয় দেখতে এসেছিলেন। ডক্টর কোরচখের ছিল বিস্মৃত এলাকায় চিকিৎসাক্ষেত্র। উনিই বস্তুত ওয়ারসর প্রথম প্রখ্যাত গাইনোকলজিস্ট। তার আগে মেয়েদের পৃথক ডাক্তার প্রায় কেউ ছিলেনই না। জেনারেল প্র্যাকটিশনাররাই স্ত্রীরোগের চিকিৎসা করতেন। এ জন্য বহু বহু অভিজাত পরিবারে—গোটা ওয়ারসতে ডক্টর কোরচখের প্রচণ্ড খাতির। অনেক বিশিষ্ট জার্মান ও পোলিশ হোমড়া চোমড়ার মা-বোন-স্ত্রীকে উনি প্রাণে বাঁচিয়েছেন। তাই অভিনয় দেখতে বহু সম্ভ্রান্ত নাগরিকের সমাবেশ ঘটত।

আমার স্পষ্ট মনে আছে—স্নো-হোয়াইট অভিনয়ের শেষে ওয়ারসর পৌরপিতা ড্যাডিকে জনান্তিকে ডেকে বলেছিলেন—আমি একজনকে একটি স্বর্ণপদক উপহার দিতে চাই! শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিসাবে। আপনি স্টেজে উঠে তার নামটা কাইন্ডলি ঘোষণা করে দিন।

ড্যাডি হুমড়ি খেয়ে বাধা দিয়ে বলেছিল : প্লিজ ডোন্ট মেনশন হার অর হিজ নেম, হের সিটি-ফাদার!

পৌরপিতা অবাক হয়ে বলেন, সে কী? আপনি তাহলে ঘোষণা করবেন কী করে?

—করব না। সে-কথাই তো বলছি। আমরা এখানে কাউকে পুরস্কৃত করি না। ক্লাসে কেউ প্রথম-দ্বিতীয় হয় না। আমাদের পুরস্কার বিতরণী উৎসবই হয় না। আপনি

আমাকেও কাইন্ডলি বলবেন না—কার অভিনয় আপনার সবচেয়ে ভাল লেগেছে। ‘ওভার অল’ নাটকটা কেমন লাগল তাই বলুন শুধু।

এমনি ছিল আমাদের আশ্রমের কানুন। আমরা ছিলাম ‘সবাই রাজা এবং সবাই রানি।’

এরপর তিন মাস ধরে আমরা নিজেদের মধ্যে তর্ক করে গেছি : ছপ্পড়ফোড় সোনার মেডেলটা কার কপালে জুটল না : মিজির চরিত্রে মার্টিন, নাকি ডাইনি-চরিত্রে উইনী, অথবা নামভূমিকায় এই হতভাগী। আব্রাসার চরিত্র সেখানে ছিল খুবই ছোট। ও ছিল স্নো-হোয়াইটের মানস-রাজপুত্র। একবারই এসেছিল স্টেজে—শেষদৃশ্যে। সবাই যখন ড্যাডির অনুবাদে গান ধরেছে সমবেতভাবে : অ্যান্ড দে লিভ্‌ড হ্যা—পি—লি এভার আফটার!

তারপর চারমাসের ব্যবধানে ড্যাডির অনূদিত নাটক *সিভেরেলা* মঞ্চস্থ করা হলো। এবার নাট্য পরিষদের বিচারে আব্রাসাকে হটিয়ে মার্টিন হলো রাজপুত্র : *সিভেরেলার* প্রিন্স-চার্মিং!

আর এ হতভাগীর দুর্ভাগ্য—হ্যাঁ দুর্ভাগ্যই—বিচারক দলের নির্দেশে নাম-ভূমিকায় উইনীকে হারিয়ে আবার নির্বাচিত হলো : অ্যালিসিয়া।

আব্রাসা সবার আগে এগিয়ে এসে আমার হাতখানা ধরে বললে : ‘কংগ্র্যাটস্!’

কিন্তু লক্ষ্য করে দেখি তার হাসিটা ম্লান। হবেই তো !

উইনীও এল আমাকে অভিনন্দন জানাতে। তার হাসিটাও ম্লান। বললে, আমি বুঝতে পারছি অ্যালিস্! নামভূমিকায় তোর আসনটা একেবারে ‘মৌরসী পাট্টা’! কৃত্রিম হাসতে হাসতে বললে, ড্যাড যদি এবার বুড়ির বুট জুতো গল্পটার নাট্যরূপ দেন, তবে তোকে সাজতে হবে বুড়ির জুতোটা! অথবা থ্রি-পিগস্ নাটকে তিন-তিনটি শূয়ার ছানার নাচ তোকে একাই নাচতে হবে খেই খেই করে।

আমি জানতাম মার্টিনের সঙ্গে উইনীর ডেটিং চলে। ফলে তার মনোবেদনার কারণটা বোঝা শক্ত নয়! জুড়ি বদলের সম্ভাবনাও অত্যন্ত ক্ষীণ! গোঁয়াড়-শিরোমণি আব্রাসা ওই ফুলের মতো সুন্দরী মেয়েটিকে পাভাই দেয় না।

সেদিনই রাতে আমি আশ্রমমাতাকে জনান্তিকে পাকড়াও করেছিলাম। বলেছিলাম, মুট্টি! আমি ঠিক খুশি হতে পারছি না ‘ড্রামা-কাউন্সিলে’র সিদ্ধান্তে। তুমি ড্যাডকে বলে ‘ভেটো’ প্রয়োগ করে সিভেরেলার চরিত্রটা উইনীকেই দাও বরং।

উনি অবাক হয়ে, অথবা হওয়ার ভান করে বললেন, কেন বলতো?

—দেখ মা, উইনী আমার চেয়ে অনেক বেশি সুন্দরী। সিভেরেলায় ওকে দারুণ মানাবে। ও অভিনয়ও করে ভাল। গতবার ডাইনি-চরিত্রে সে তো দারুণ পার্ট করেছিল!

—তুই তাই বলছিস? মন থেকে বলছিস তো?

—নিশ্চয়ই। শুধু আমিই যে তোমাকে এসে গোপনে অনুরোধ করেছি একথা যেন জানাজানি হয়ে না যায়। তাহলে উইনী মনে দুঃখ পাবে।

উনি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। আমি মুখটা নিচু করি।

তারপর মুড়ি বললেন, ঠিক আছে। তাই হবে। কেউ জানবে না। তবে ওই সঙ্গে আরও একটা কাজ করব। সিভেরেলার বিপরীতে মার্টিন নয়, রাজপুত্রের পার্টটা করবে আব্রাসা। উইনীর সঙ্গে তাকে কী সুন্দর মানাবে, তাই না?

এবার চোখ তুলে ওঁর দিকে তাকিয়ে দেখি। আমার দৃষ্টিটা কি বোকা-বোকা হয়ে গেছিল? হঠাৎ ডুগরে হেসে ওঠেন মা। বলেন, ভারি চালাক হয়ে গেছিস, না রে? আমি কিছু বুঝি না?

ধরা পড়ে গেছি। আবার মুখটা নত করি। উনি আমার চুলটা এলোমেলো করে দিয়ে বলেন, পাগলি! যা পালা!

টিন-এজার ছেলে-মেয়েদের ‘ডেটিং’ একটা প্রচলিত রেওয়াজ। গোটা ইওরোপে। তবে আমাদের তা করতে হতো আশ্রম-চৌহদ্দির ভিতরেই। বাইরে যাবার হুকুম ছিল না। ততদিনে ওয়ারস ‘ঘেটো’ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। শহরের যাবতীয় ইহুদি—বুড়ো বাচ্চা সবাই—বন্দি হয়েছে সেই ঘেটোয়। আমাদের আশ্রমটা একমাত্র ব্যতিক্রম। তার পিছনে একটিমাত্র হেতু: ডক্টর কোরচখের প্রচণ্ড প্রভাব। অনেক-অনেক পোলিশ পরিবারে তিনি অনেকের জীবন দিয়েছেন। এমনকি জার্মান পরিবার—যারা পোল্যান্ড অধিকারের পর সপরিবারে এরায়ে বসবাস করতে শুরু করেছে তাদের মহিলাদের উনি চিকিৎসা করতেন। নাৎসি পরিবারেও। তাই বার্লিনের চাপ সত্ত্বেও এ আশ্রমের উপর কোন আদেশ আসেনি। আমরা মরুভূমির মধ্যে যেন এক মরুদ্যানের বাসিন্দা। কিন্তু আশ্রম-চৌহদ্দির বাইরে যেতাম না। ক্রনো-লিজা, মার্টিন-উইনী এবং আব্রাসার সঙ্গে আমি আশ্রমের পিছনের বাগানে, সবার চোখের সামনেই, জোড়ায় জোড়ায় ডেটিং করতাম। বলা বাহুল্য বাড়াবাড়ি করার উপায় ছিল না। বিকাল বেলা চারদিকে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা খেলা করত। বল খেলা, স্কিপিং, চোর-পুলিস। আমরা জোড়ায়-জোড়ায় গাছের আড়ালে সরে গিয়ে ‘প্রেম-প্রেম’ খেলতাম। দু-তিনবার নজরে পড়েছে লিজাকে ক্রনো চুমু খাচ্ছে, অথবা উইনীকে মার্টিন। একমাত্র আমরাই ব্যতিক্রম। আব্রাসার সঙ্গে আমার শুধু আলটু-পালটু বকবকানি। মাঝে মাঝে হাত ধরে ও টেনেছেও। বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরেছে। কিন্তু চুমু খায়নি কোনোদিন।

ড্যাডির ভেটোয় উইনী সিভেরেলার চরিত্রে মহড়া দিতে শুরু করল, মার্টিন রাজপুত্রের চরিত্রে। আমার কাজ ছিল স্মারকের—প্রম্পটিং-এর। আর আব্রাসা করাত,

বাটালি, ক্যানভাস দিয়ে, আর কয়েকজন সদস্যদেরকে নিয়ে মঞ্চের জন্য সেট-সেটিং বানাতে!

একদিন ও জনান্তিকে আমাকে পাকড়াও করল, একটা কথা সত্যি করে বলবি, রেবা? তুই ড্যাডকে গিয়ে বলেছিলি যে, মার্টিনের বিপরীতে সিভেরেলা সাজতে তোর ইচ্ছে নেই। তাই না? সত্যি করে বল?

আমি জবাব দিইনি। মিটিমিটি হেসেছিলাম। ও বললে, তোকে স্বীকার করতে হবে না। আমি জানি! তুই যদি অনুমতি করিস তাহলে তোকে আমিই একটা মেডেল দেব। সেই ‘তুষারশুভ্রা’ চরিত্রে অভিনয়ের জন্য যে প্রাইজটা তোর পাওনা ছিল। সিটি-ফাদার যেটা দিতে চেয়েছিলেন।

—তিনি যে সেটা আমাকেই দিতে চেয়েছিলেন তার তো কোনো প্রমাণ নেই।

—অলরাইট। স্নো-হোয়াইট চরিত্রে অভিনয়ের জন্য নয়, সিভেরেলার পার্টে অভিনয় না করার জন্যই মেডেলটা দেব!

—কী মেডেল? তুই মেডেল কোথায় পাবি?

—আছে! আমার কাছেই লুকানো আছে। তুই সে রাতে আমার কাছে তা চেয়েও ছিলি। কিন্তু আমি দিইনি। কিন্তু কেন দিইনি জানিস?

—কী চেয়েছিলাম আমি? কী দিসনি?

—ন্যাকামি করিস না রেবা! আমি কি অতই গবেট? আমি কি বুঝতে পারিনি কন্সলের তলায় দুজনে জড়াজড়ি করে শুষে পড়ার পর তুই কী করেছিলি? কী চেয়েছিলি? আমি তো ইচ্ছে করেই ঘুমিয়ে পড়ার ভান করেছিলাম!

আর লুকিয়ে লাভ নেই। জানতে চাই, কেন রে? সে রাতে তুই অত নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছিলি কেন? তাছাড়া তারপর এতদিনের মধ্যে একবারও...

—তুই দু-দুটো প্রশ্ন এক সঙ্গে করেছিস। একে-একে জবাব দিই। প্রথমত, সে রাত্রে কথা! তুই সেদিন বুঝতে পারিসনি। ওই হারামজাদা নাৎসি সার্জেন্টটা ছিল একজন ‘ভয়ার’!

—‘ভয়ার’? তার মানে?

—Voyeur! এক ধরনের কামবিকার। যাদের বলে ‘পীপিং টম’! তারা লুকিয়ে লুকিয়ে নগ্ন নারীদেহ দেখতে চায়। দূর থেকে নরনারীকে কামক্ৰীড়ায় রত অবস্থায় দেখলে যাদের যৌনতৃপ্তি হয়।

জানতে চাই, তুই কী করে বুঝলি?

—ধাপে ধাপে! হারামজাদাটা জানত যে, বেসমেন্ট-এ দুটো ডর্মিটরি-সেল আছে। একটা ছেলের একটা মেয়েদের। তাহলে মিলিটারি-রুলস্ ভায়োলেন্ট করে সে কেন

আমাদের এক ঘরে ঢুকিয়ে দিতে সাহস পায়? আমি লক্ষ্য করে দেখেছিলাম—কী-হোলের ভিতর দিয়ে ঘরটা বেশ ভালই দেখা যায়। তাই বারে-বারে আলোটা নিবিয়ে দিতে আপত্তি করেছিলাম।

—সেটা কেন? আলো নিবিয়ে দিলেই তো ও দেখতে পেত না।

—পেত। স্কাই-লাইট দিয়ে ঘরে প্রচুর আলো আসছিল। আমি চেয়েছিলাম ও সারারাত এই দরজার সম্মুখে কী-হোলে চোখ লাগিয়ে বসে থাকুক—আশায় আশায়! আমরা যদি শীতে কষ্ট পাই, তাহলে ও নিজেও তা পাক। দেখলি না, লোকটা কেমন বারে-বারে অঙ্গীল ইঙ্গিত করে আমাদের তাকিয়ে তোলার চেষ্টা করছিল। হ্যান্ড কাফ খুলে দিয়ে আমাদের ‘পঙ্গ’ করার ইঙ্গিত দিল। টয়লেটের প্রসঙ্গে বললে, সব মেয়েই কাজিন ব্রাদারের সামনে ‘প্যান্টি’ খোলে। তারপর ঘর ছেড়ে যাবার সময় কেমন আমাদের চোখ টিপে ইশারা করল!

আমি অবাক হয়ে যাই। এসব কথা আমার মাথাতেই আসেনি। আব্রাসা আবার বলে, তাই তো তুই যখন বলছি ব্রাটা খুলে ব্লাউজটা পরবি—আমাকে উল্টোদিকে মুখ ফিরিয়ে বসতে বললি—তখন আমি তোকে ধমক দিয়ে টয়লেটে ফেরত পাঠিয়ে দিলাম। নিজে কানে শুনি নি কিন্তু স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম কী-হোলে চোখ লাগিয়ে হারামজাদাটা আমাদের তখন প্রাণ ভরে খিস্তি-খেউড় করছিল!

অনেকক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। আমি গুছিয়ে নিয়ে বলি, সে তো প্রথম দিন। তারপর? এই ছয়সাত মাসেও...

—ছয়সাত মাসেও কী?

—ন্যাকা!

—সত্যি কথা বলব, রেবা? বিশ্বাস করবি?—ভয়ে!

—ভয়! কাকে ভয়? উইনী-মার্টিন বা ক্রনো-লিজা তো...

—ভয়টা তোকে!

আকাশ থেকে পড়ি!

—আমাকে? কেন রে? আমাকে ভয় করার কী আছে? আমি কি তোকে কামড়ে দিতাম?

—না! কিন্তু তুই যে আমাকে বলেছিলি তোর স্কুলের এক বান্ধবী এটা সহ্য করতে পারেনি! সে নাকি থরথর করে কাঁপতে শুরু করে দিয়েছিল!

—না হয় আমিও তাই করতাম! তাতে কী?

—তাহলে সবাই যে ছুটে আসত। আমাকে পিটতে শুরু করত! ভাবত, আমি বুঝি তোকে কামড়ে দিয়েছি!

আমি খিল খিল করে হেসে উঠতে গেলাম। পারলাম না। ও বাধা দিল! কী ভাবে বাধা দিল সে কথা থাক। আমার যেন দম বন্ধ হয়ে গেল!

আমিও থরথর করে কেঁপে উঠেছিলাম কি না? সে সব কথাও থাক। এই বৃদ্ধা বয়সে সে কথা নাই বা লিখলাম! মেডেলটা সত্যিই ঠিক খাঁটি সোনার!

তবে একটা কথা স্বীকার করতে হবে। পরদিন নির্জনে পেয়ে আমি ওকে বলেছিলাম, একটা কথা আব্রাসা! তুই আর কোনোদিন আমাকে অমন করে...

—কেন রে? কী হল তোর? তুই নিজেই তো চেয়েছিলি—

—কপালে চুমু খেতে পারিস। গালেও...কিন্তু...

—সে কী রে! যুদ্ধ শেষ হলে তুই তো আমার বউ হয়ে যাবি! তখনো কি আমি—

আমি এককথায় ওকে থামিয়ে দিয়েছিলাম : ধ্যাৎ।

।। তথ্যসূত্র ও কৃতজ্ঞতা ।।

- ১) *Alicia, My Story*, by Alicia Appleman - Jurman, Bantam Books, New York 1988.
- ২) *Night*, by Elie Wiescl, Bantam Books, New York 1982.
- ৩) *The Sunflower*, by Simon Wiesenthal, Schocken Books, New York 1997.
- ৪) Ms. Basudha Sengupta, Walnut Creek, California.
- ৫) Dr. Sakti Das, Lafayette, California.
- ৬) Mrs. Anindita Bose, Walnut Creek, California.

আনা ফ্রাঙ্কের সন্ধান

হের অটো ফ্রাঙ্ক (Herr Otto Frank) :

আপনারা আমাকে চেনেন না। অথবা হয়তো নামটা শুনেছেন আমার কন্যার কল্যাণে। সেটাই আমার পরিচয়। হ্যাঁ, আমারই মেয়ের নাম : আনা ফ্রাঙ্ক (Anne Frank)। আমার সুদীর্ঘ জীবনে, একানব্বই বছরের দুনিয়াদারীকালে দুটিমাত্র ভাল কাজ আমি করেছিলাম। বাকি সবই ব্যর্থতার জঞ্জাল। প্রথম কীর্তি : বারোই জুন, শুক্রবার, 1942, আমার ছোট মেয়ের ত্রয়োদশ জন্মদিনে তাকে একটা উপহার দিয়েছিলাম : একটা ডায়েরি। তখন স্বপ্নেও ভাবিনি আমার ফুটফুটে মেয়েটা সেই ডায়েরিকে ফুলদানী ভেবে ভরিয়ে তুলবে একগুচ্ছ ফুলে! আর আমার দ্বিতীয় কীর্তি ? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে যখন পোল্যান্ডের বন্দিশিবির থেকে আমস্টার্ডামে ফিরে আসি তখন নির্বোধের মতো সেই ডায়েরিটাকে অবজ্ঞা করিনি। আমার সহকর্মী মিয়েপ আর এলি আমার হাতে তুলে দিয়েছিল ওই ডায়েরিটার ছেঁড়া পাতাগুলো। আমি তাদের বলেছিলাম, ‘এ নিয়ে আমি কী করব?’

এলি বলেছিল, ‘তারিখ মিলিয়ে আমি ডায়েরিটা সাজিয়ে রেখেছি। আপনি একবার শুধু পড়ে দেখুন হের ফ্রাঙ্ক। আমার তো মনে হয়েছে এটি একটি অসাধারণ রচনা।’

পড়ে দেখেছিলাম। ভাল লেগেছিল। খুবই ভাল লেগেছিল—কিন্তু আমার মনে হয়েছিল তার হেতু আমার ব্যক্তিগত বেদনাবোধ, কন্যার প্রতি স্নেহ আর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার স্মৃতিচারণ। ইতিমধ্যে রেড-ক্রস মাধ্যমে জেনেছি আমার স্ত্রী এডিৎ আর দুই কন্যা—মার্গট ও আনা—হিটলারের গ্যাস-চেম্বারে শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছে। বেঁচে থাকাই আমার পক্ষে তখন বিড়ম্বনা। নিকট আত্মীয়স্বজন কেউ নেই—দূরের বন্ধু দু’একজনকে আমাদের ‘গুপ্ত-মহলের’ বিচিত্র উপকথা জানাব বলে আমি আনার দিনপঞ্জিটার কয়েক কপি টাইপ করে ফেলি। ডাকে পাঠিয়ে দিই কয়েকজনকে। তার মধ্যে ঘটনাচক্রে ছিলেন একজন ডাচ অধ্যাপক—ভাষাতত্ত্বের পণ্ডিত। তিনি আমাকে বললেন বইয়ের আকারে এটাকে প্রকাশ করতে। আমার মনে পড়ে গেল আনার কথা—সে আমাকে বলেছিল, তার ইচ্ছে ডায়েরিটা বই হিসাবে ছাপা হবে যুদ্ধান্তে। আমি বলেছিলাম, দূর পাগলি! ডায়েরি কি বই হিসাবে ছাপা যায়? ওতে কত ব্যক্তিগত কথা থাকবে।

—না, থাকবে না। আমি সেসব কথা বাদছাদ দিয়ে ওটাকে নতুন করে লিখব।

আমস্টার্ডামে ঐ বাড়িটার ‘গুপ্ত-মহলে’ আমরা পঁচিশ মাস আত্মগোপন করে ছিলাম। আমরা আটটি প্রাণী। পঁচই জুলাই, 1942 থেকে চৌঠা আগস্ট, 1944; সেই

চৌঠা আগস্ট কোনো একজন সন্ধানদাতার সূত্র ধরে জার্মান গেস্টাপো আমাদের গ্রেপ্তার করে ফিরিয়ে নিয়ে যায় জার্মানিতে। সেখানেই আমার পরিবারের সবাই কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে একে একে মারা যায়। আমি একাই জীবিত ফিরে আসি। এই দীর্ঘ দুটি বছর ধরে আনা আমার উপহার দেওয়া ডায়েরিতে তার মনের কথা লিখে গেছে। তেরো থেকে পনেরোর দিকে এগিয়ে চলা একটি কিশোরীর অবাকস্বপ্নের ইতিকথা। যে মেয়েটিকে খাঁচার ভিতর বন্দি করে রাখা হয়েছিল। সে তার কৃত্রিমতার বাস্তব আগড় ভেঙে মানসিক ভ্রমণ করেছে চিন্তার জগতে। কিশোরীর দৃষ্টিভঙ্গিতে সে বিচার করেছে অনেক দুর্ভাগ্য তত্ত্ব—ঈশ্বর, প্রেম, মনুষ্যচরিত্র, যুদ্ধ ও শান্তি।

অধ্যাপকমশায়ের পীড়াপীড়িতে একজন ডাচ প্রকাশক আনার ডায়েরিটা ছেপে বার করতে স্বীকৃত হলেন। বাচ্চা মেয়ের খামখেয়ালি কে আর গ্যাংটের কড়ি খরচ করে কিনতে যাবে? তাই প্রথম দফায় ছাপা হয়েছিল মাত্র পাঁচশো কপি। যুদ্ধান্তে 1947 সালে। নামকরণটা আমিই করেছিলাম : *Het Achterhuis* (দ্য সিক্রেট অ্যানেক্স, বা ‘গুপ্ত-মহল’)। আজ সে বই নাকি বিশ্বসাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ।

[লেখকের সংযোজন : আমার ব্যক্তিগত সংগ্রহে যে ইংরিজি বইটি আছে, আমার নাতনি অন্তরার উপহার, সেটি 1972 সালে মুদ্রিত। সত্তরতম সংস্করণ। তাতে প্রকাশক জানিয়েছিলেন : প্রথম তিনটি দশকে বত্রিশটি ভাষায় আনা ফ্রাঙ্কের ডায়েরি অনুবাদিত হয়েছে। আনুমানিক দশ লক্ষ কপি বই বিক্রি হয়েছে। প্রথম প্রকাশিত ‘ডাচ’ গ্রন্থটি অচিরেই পুনর্মুদ্রণ করতে হয়। তিন বছর পরে জার্মানির হেইডেলবার্গ পাবলিশার্স এ বইয়ের একটি জার্মান অনুবাদ প্রকাশ করেন। 4,500 কপি। কিন্তু জার্মানির অধিকাংশ বইয়ের দোকানদার সে বইটি তাদের কাউন্টারে রাখতে সাহস পেল না। পরাজিত জার্মানির হিটলার অনুরাগীদের আতঙ্কে। যুদ্ধ শেষ হয়েছে, কিন্তু তার জের মেটেনি। শুরু হলো নতুন সংগ্রাম। একপক্ষে হাজার-হাজার, লক্ষ-লক্ষ ক্ষুব্ধ পরাজিত নাৎসি সৈনিক। যারা তখনো তাদের ফ্যুরারের আনুগত্যের কথা ভুলতে পারেনি, ভুলতে পারেনি বার্লিন শহরে পানজার বাহিনীর আগে-আগে দৃপ্ত পদক্ষেপে ধরণীকে পদাঘাত করা মার্চ-পাস্ট। ‘হেইল হিটলার’ ধ্বনি যাদের কানে তখনো বাজে। যারা অনার্য ইহুদিদের পুড়িয়ে মারা সমর্থন করত। তখনো করে। অপরপক্ষে এক অনুপস্থিত কিশোরীর একমুঠো স্বপ্ন। তিল-তিল করে আনা জয় করেছিল যুদ্ধোত্তর শুভবুদ্ধির জার্মানমানস। নতুন এডিশন ছাপা হলো বইটির। ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে ফরাসি ও ইংরিজি অনুবাদ : *Anne Frank : The Diary of a Young Girl*.

রুজভেল্টের স্ত্রী এলিনর স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে মার্কিন এডিশনের ভূমিকা লিখেছিলেন। অকুণ্ঠ ভাষায় লিখলেন, “This is one of the wisest and most moving

commentaries on War and its impact on human beings that I have ever read.” (যুদ্ধের উপর যতগুলি শ্রেষ্ঠ পর্যালোচনা-গ্রন্থ পাঠ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে তার মধ্যে এটি অন্যতম। বিচক্ষণতায় এবং হৃদয়াবেগের যৌথ উপস্থাপনে মানব-জাতির উপর এর প্রভাবও অতুলনীয়।)

সত্ত্ৰতম সংস্করণে প্ৰকাশক জানাচ্ছেন যে, তিন দশকে দশ লক্ষাধিক কপি বিক্ৰয় হয়েছে। আৰও তিন দশক পৰ *স্মিথসোনিয়ান* মাসিক পত্ৰিকায় মাৰ্কিন সাহিত্যিক ৰিচাৰ্ড



আনা ফ্ৰাঙ্ক

কভিনটন লিখেছেন, “For many Americans, the diary was their literary introduction to the Holocaust. Of the 25 to 30 million copies in 60 languages, at least a quarter was sold in the United States.”

বহু মার্কিন পাঠকের কাছে এই বইটিই প্রথম সংবাদ দিল ইহুদিনিধন যজ্ঞকাণ্ডের বা Holocaust-এর; এ পর্যন্ত ষাটটি ভাষায় অনূদিত হয়ে যে আড়াই থেকে তিন কোটি বই সারা পৃথিবীতে বিক্রয় হয়েছে তার এক চতুর্থাংশের পাঠক আমেরিকান।

আড়াই থেকে তিন কোটি বই! তার পাঠকসংখ্যা তাহলে কত? অ্যাডলফ হিটলার তার বিরাট যুদ্ধসম্ভার এবং জাতিবৈরিতার বিকৃত আদর্শে মাত্র এক কোটি মানুষকে হত্যা করতে সক্ষম হয়েছিল। আনা প্রমাণ করে গেল : Pen is mightier than sword— তার ভালবাসা, তার চাপল্য আর কৈশোরের স্বপ্ন দিয়ে তার ত্রিশ গুণ মানুষের মনকে সে ছুঁতে পেরেছে, যদি ধরে নিই এক একটি কপি দশজন পাঠক পড়েছে। ফ্যারার! শুধু তোমার ভাগনি গেলি একা নয়, যম-জাঙালের মোড়ে দাঁড়িয়ে এই কিশোরী আনা ফ্রাঙ্কও তোমার গালে একটি থাপ্পড় মেরে গেল।

অটো ফ্রাঙ্ক (Otto Frank)

আমরা, ফ্রাঙ্করা, বংশানুক্রমিকভাবে ফ্রাঙ্কফুট শহরের বাসিন্দা। আমি একা নই, আমার সাতপুরুষের ধারণা : আমরা জার্মান। জার্মানি আমাদের মাতৃভূমি, জার্মান আমার মাতৃভাষা, জার্মানির সেবাই আমার দেশসেবা। ধর্মে—হ্যাঁ, আমরা ইহুদি। তাতে কী?



অটো ফ্রাঙ্ক

আমরা অতিবিখ্যাত ইহুদি ব্যাক্সিং ফ্যামিলি—রথচাইল্ড পরিবারের একটি দৌহিত্র শাখা। আমাদের সাতপুরুষের বাস্তু এই শহরের কেন্দ্রস্থলে—গ্যাস্কার স্ট্রাসে। সাত-কামরার দ্বিতল বাড়ি। আমার বড় মেয়ে মার্গটের জন্ম 1927 সালে; আর তার পরের মেয়ে আনার জন্ম বারোই জুন, 1929। বস্তুত ‘ওয়াল স্ট্রিট ক্রাশের’ বছর। সেটা মনে আছে, কারণ পৈত্রিক ব্যবসায়ের সূত্রে আমি নিজেও ছিলাম ব্যবসায়ী।

1932 সালে নাৎসি পার্টি যখন নির্বাচনে এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে উঠল, তখনই আশঙ্কা হলো ওরা অচিরেই রাইখ্‌স্ট্যাগ দখল করবে। নাৎসি-দর্শন সম্বন্ধে দু-তিন বছর ধরেই আমরা—জার্মানির ইহুদিরা—ওয়াকিবহাল। নাৎসি এস. এস. বা গেস্টাপো বাহিনী তখনও গড়ে ওঠেনি। কিন্তু চোদ থেকে আঠারো-বিশ বছরের জার্মান ছেলেরা

দলে দলে ‘হিটলারস্-ইউথ’ গোষ্ঠিতে নাম লেখাচ্ছে। তারা যখন সড়ক জুড়ে মার্চ করে যায়—তখন রাস্তায় গাড়ি-ঘোড়া চলে না; মানুষজন ফুটপাথে নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকে। এই ছেলের দল যখন-তখন ইহুদিপাড়ায় বেলেপ্লাপনা করে, ইহুদি মেয়েদের নানারকম ‘ইভ-টিজিং’ বিনা প্রতিবাদে সহিতে হয়। ওরা ইহুদিদের দোকান থেকে ধারে জিনিস নেয়—ধার শোধের কথা তুললেই রুখে ওঠে: ‘জার্মানির অনেক রক্ত শুয়েছ বাছাধন—বেশি ট্যাগুই-ম্যাগুই কোর না। শালা জুডেন!’

‘জুডেন’ মানে ‘ইহুদির বাচ্চা’!

আত্মীয়-বন্ধুদের অনেকেই দলে দলে জার্মানি ত্যাগ করে চলে যাচ্ছে। আমি মনস্থির করতে পারছি না। সাতপুরুষের ব্যবসা! শহরের নামটা থেকেই আমাদের কৌলিক উপাধি! সেই সাতপুরুষের ফ্রাঙ্কফুর্ট চিরদিনের মতো ছেড়ে দিতে হবে?

তারপর একটা প্রচণ্ড-ধাক্কায় মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিতে হলো। ১৯৩২-র শেষাশেষি। যেদিন নির্বাচনের ফলাফল জানা গেল। বেতারে ঘোষিত হলো যে, নাৎসি পার্টি রাইখ্‌স্ট্যাগে এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজনৈতিক দল! সেদিনই অফিসের শেষে আমরা—আমাদের কারখানার কজন টপ এক্সিকিউটিভকে নিয়ে বসলাম যুক্তি করতে। এঁরা সবাই ইহুদি, সকলেই ফ্রাঙ্কফুর্টের শহরতলির বাসিন্দা। আমি ছিলাম কোম্পানির মালিক এবং ম্যানেজিং ডাইরেক্টর। ওরা সবাই বলল, আপনি স্যার ইমিডিয়েটলি সপরিবারে জার্মানি ত্যাগ করে আমস্টার্ডামে চলে যান। ওখানে প্রিন্সেনগ্রট ক্যানালের ধারে আপনার যে চারতলা বাড়িটা আছে ওখানে গিয়ে উঠুন। ও বাড়ির একতলাটা অফিস। দো-তলা, তিনতলা গুদামঘর। আমরা ফাঁকা করে দিচ্ছি—দু-একটা বাথরুম অবশ্য বানাতে হবে। ততদিন না হয় ফ্রাউ ফ্রাঙ্ক তাঁর মায়ের কাছে বেলজিয়ামে গিয়ে থাকুন মেয়েদের নিয়ে।

আমি বলি, তা কেমন করে হয়? আপনারা সবাই ফ্যামিলি ম্যান। সকলের বিপদই তো এক জাতের!

চীফ প্রোডাকশন ম্যানেজার বললে, না স্যার! ওদের নজর প্রথমেই পড়বে আপনার উপর। আমরা তো চুনোপুঁটি। হিটলারের এখন প্রচুর টাকার দরকার। হয়তো আপনার উপর চাঁদা ধরবে এক মিলিয়ন ডয়েশমার্ক। আপনি ইতস্তত করলেই ফ্রাউ ফ্রাঙ্ক আর মেয়েদের ধরে নিয়ে যাবে হিটলারের এস.এস.।

আমি জানতে চেয়েছিলাম, ‘এস.এস.’! তার মানে?

—আপনি এখনো নামটাই শোনেননি? আশ্চর্য!

রাত নয়টায় আমাদের মিটিং ভাঙল। কোম্পানির ড্রাইভার রোহ্ম আমাকে নিয়ে বাড়ি ফিরছে। হঠাৎ খেয়াল হলো দুপুরে লাঞ্চ খাওয়া হয়নি, কাজের চাপে। রোহ্মকে বলি কোনো একটা খানা-কামরার সামনে গাড়িটা দাঁড় করাতে। একটা বড় রেস্টোরাঁর পার্কিং লটে গাড়িটা রেখে নামলাম। ড্রাইভারকে কিছু অর্থ দিলাম যাহোক কিছু খেয়ে

নিতে। আলোকোজ্জ্বল খানা-কামরায় ঢুকেই থমকে যেতে হলো। মনে হলো, সেখানে একটা মহোৎসব হচ্ছে। হয়তো কারও জন্মদিনের পার্টি। আমি স্বপ্নেও আন্দাজ করিনি যে, এ উৎসব নাৎসি পার্টির একটি স্থানীয় শাখার—নির্বাচন জয়ের আনন্দোৎসব। সামনের দিকে যারা জোড়ায়-জোড়ায় নাচছিল তাদের পাশ কাটিয়ে আমি পিছনদিকের একটা টেবিলে গিয়ে বসি। খাবারের অর্ডার দিয়ে অপেক্ষা করছি হঠাৎ সামনের দিক থেকে ছোকরার দল—যারা একক্ষণ ধেই-ধেই করে নাচছিল—তাদের কয়েকজন ঘনি়ে এসে বসল আমার চারিধারে।

একজন শুধালো, এক্সকিউজ মি, হের জেন্টলম্যান, আপনি ইহুদি! তাই নয়?

আমি একে একে সকলের দিকে তাকিয়ে দেখি। দলে ওরা দশ-বারো জন। সতেরো থেকে চব্বিশ। আমি বলি, এ প্রশ্ন উঠছে কেন?

—তার মানে আপনি জুডেন! স্বীকার করছেন?

—যদি তাই হই, তাতে কী?

ওদের দলপতি কিটেল হঠাৎ একটি ছেলেকে আদেশ করে, ‘কার্ল, এই ইহুদির বাচ্চাটাকে দেখিয়ে নিয়ে আয় সাইনবোর্ডটা।’

কার্ল একটা আঠারো-বিশ বছরের ছোকরা। আমার অর্ধেক বয়স। সে এগিয়ে এসে খপ করে চেপে ধরল আমার গলার টাইটা। বললে, আয় শালাহ্, নিজের চোখে দেখে যা!

আমার হাতব্যাগটা ইতিমধ্যে একজন ছিনিয়ে নিয়েছে। কার্ল আমাকে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে গেল দোকানের বাইরে। উপরে একটা বিজ্ঞপ্তির দিকে আঙুল তুলে বললে, জার্মান ভাষাটা জানিস জুডেন? পড় শালা!

চোখ তুলে দেখি, দোকানদার একটা হাতে-লেখা বিজ্ঞপ্তি টাঙিয়েছে :

NOTICE

Only biped dogs & quadruped
Jews are permitted inside by Order.

[বিজ্ঞপ্তি : শুধু দ্বিপদী কুত্তা আর চতুষ্পদী ইহুদির বাচ্চা ভিতরে যাইতে পারিবেক। —কর্তৃপক্ষের অনুমত্যানুসারে।]

ছেলেটা আমার পশ্চাদ্দেশে একটা লাথি কষিয়ে বলল, তুই শালা, ইহুদির বাচ্চা! কোন আক্কেলে দু-পায়ে হেঁটে দোকানে ঢুকেছিলি? যা—চারপায়ে হামাওড়ি দিয়ে ভিতরে যা! তোর ব্যাগটা উঠিয়ে নিয়ে আয়, শালাহ্!

হঠাৎ আর একটি ছোকরা আমার ঘাড় ধরে নতজানু করে দিল। বললে, চার পায়ে হামাগুড়ি দে শালা জুড়েন!

অনেক জার্মান পুরুষ-স্ত্রী তামাশা দেখতে এগিয়ে এসেছে। তারা খিলখিল করে হাসছে। এ ওর গায়ে লুটিয়ে পড়ে।

একজন মধ্যবয়সী জার্মান মহিলা হাসতে হাসতে নিচু হয়ে আমাকে কানে কানে বললেন, ওন্ট ইউ বার্ক মাই সুইট ডগি? আউ—আউ—আউ!

আমার মাথার মধ্যে তখন প্রচণ্ড যন্ত্রণা! নক-আউট হয়ে ভূতলশায়ী হবার পূর্বমুহূর্তে বন্ধারের যেমন হয়। আলো-বলমল দোকানটা যেন ঘুরছে, চোখে তারা-ফুল ফোটাচ্ছে। হয়তো আমি একটা মারাত্মক সেরিব্রাল আক্রমণের দ্বারে পৌঁছেছি।

ইতিমধ্যে সেই দলপতিটা—কিটেল এগিয়ে এসেছে। আমার দিকে ছুঁড়ে দিল, আমার পোর্ট-ফোলিও ব্যাগটা। বললে, যা, যাবে ইহুদি-বাচ্চা! বউয়ের কোলঘেঁষে শুগে যা। আজ তোকে ছেড়েদিলাম। জানে বেঁচে গেলি! সিনাগগে সিম্নি চড়াস!

কার্ল বললে, সে কি গুরু? ও শালা চারপায়ে হামা দেবে না?

—না! ও হারামজাদা একটা বড় কোম্পানির মালিক। ও পরে আমাদের পার্টিতে মোটা ডোনেশন দেবে। দিবি তো শালাহ? তাহলে তোকে ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরে দু-পায়ে হাঁটতে দেব। না দিলে বাকিজীবন কোয়াড্রুপেডেড! বুঝলি?

লোকটা আমার ফোলিও ব্যাগ খুলে দেখেছে। টাকাকড়ি বার করে নিয়েছে। ভিজিটিং কার্ডও ওর হেপাজতে!

কার্ল আমাকে খাড়া করে দিয়ে বললে, বাঁচ গিয়া শালাহ!

*

*

*

আমাকে দেখে এডিং স্তম্ভিত হয়ে গেল। বললে, এ কী! তুমি এমন করে টলছ কেন? ক-পেগ গিলেছ আজ?

আমি একটা সোফায় বসতে বসতে বাচ্চা ছেলের মতো ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলি। ঈশ্বর করুণাময়! আমার দুটি মেয়ে তার আগেই ঘুমিয়ে পড়েছে। একটি সাড়ে-তিন। একটি সাড়ে-পাঁচ।

এই ঘটনার একমাসের মধ্যেই আমি ফ্রাঙ্কফুর্ট শহর ছেড়ে বেলজিয়ামে চলে যাই। এক কাপড়ে নয়, এক সুটকেস সম্বল করে। আশঙ্কা হয় : আমার জন্মভূমি জার্মানিকে বোধহয় চিরদিনের মতো ত্যাগ করে যাচ্ছি। বেশ বুঝতে পারি : বিশ্বযুদ্ধ আসন্ন। সে যুদ্ধে যদি হিটলার জয়ী হয় তাহলে এ জীবনে আর কোনোদিন ফিরে আসতে পারব না আমার সাতপুরুষের ভিটেতে। আমরা স্বামী-স্ত্রী মিলে অনেক যত্নে আমাদের এই গ্যাঙ্কার স্ট্রাসের

দ্বিতল বাড়িটি মনের মতো করে সাজিয়েছিলাম। বাগানে নানান জাতের গাছ, উইন্ডো-ডিসপ্লেতে বছর-বছর মৌসুমী ফুলের টব, শৌখিন ট্যাপেস্ট্রি, নানান চিত্রকরের ছবি। মায় একখানা অরিজিনাল ড্যুরার! ডাইনিং-হলে কাচের আলমারিতে অক্সানে কেনা এডিং-এর চীনা মাটির শৌখিন ডিনার সেট—সব-সব কিছুই বাজেয়াপ্ত করে নেবে নাৎসি পার্টি!

স্থির হয়েছিল এডিং দুই মেয়েকে নিয়ে চলে যাবে ওর মায়ের কাছে—আচেন-শহরে। সেটা জার্মানি আর বেলজিয়ামের সীমান্তে। ছোট-ছোট শহরে হিটলার্স-ইউথ ক্লাবের চ্যাংড়াগুলোর অত্যাচার কম। আরও স্থির হয়েছিল আমস্টার্ডামে আমাদের খালধারের চারতলা বাড়িতে কিছু টয়লেট তৈরি হলেই আমার স্ত্রী তার দুটি বাচ্চাকে নিয়ে সেখানে চলে যাবে। সেও সম্ভবত এক সুটকেস ভর্তি জিনিসপত্র নিয়ে যাবার অনুমতি পাবে—যদি না তাতে সোনা-দানা-হীরে-জহরৎ বা ‘ড্যুরার’-এর ওই অরিজিনাল অয়েল-পেন্টিংটা থাকে।

বিদায়ের দিনটি অশ্রুসজল। আকাশও সকাল থেকে মুখ ভার করে আছে। যেকোনো সময় বৃষ্টি নামতে পারে। আমার ছোটমেয়ে আনা ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল আমার হাঁটু জোড়া। রোহম—আমার খাশ-ড্রাইভার—সুটকেসটা উঠিয়ে নিয়ে গেল। এডিং নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে আছে ড্রাইংরুমের ওপাশে, মার্গটের হাত ধরে। মার্গটের বয়স তখন সাড়ে পাঁচ, বুদ্ধিমতী মেয়ে—সে কিছুটা আন্দাজ করেছে। কিন্তু আনা কি এসব বোঝে? সে শুধালো, কবে তুমি টুর থেকে ফিরে আসবে ড্যাড?

কোনোরকমে অশ্রুস্রব্দ কণ্ঠে বলি, এবার আমি আর ফিরে আসব না, মামণি। বরং তোমরাই আমার কাছে চলে আসবে।

—সে তো খুব মজার কথা। কিন্তু তারপর? আমরা সবাই মিলে আবার কবে ফিরে আসব বাপি?

আমি অসহায়ভাবে আমার স্ত্রীর দিকে তাকাই।

সে এগিয়ে এসে আনার আলিঙ্গন থেকে আমার হাঁটুজোড়াকে মুক্ত করে। মেয়েকে বোঝায়, তা কি এখনই বলা যায়? সেখানে গিয়ে দেখি, জায়গাটা আমাদের কেমন লাগে। এস তুমি, আমার কাছে।

এডিংকে আড়ালে ডেকে কিছু শেষ সাবধানবাণী শোনাই—গোপনে কিছু হীরে-টিরে নিয়ে যাবার চেষ্টা কর না। ওরা শুনেছি বর্ডারে অশ্লীলভাবে দেহ-তল্লাশি করে।

করণ দুটি নয়নের দৃষ্টি মেলে ও জানতে চায় : ওয়েডিং রিংটা?

বলি, কী দরকার? ওটা রেখেই যেও। ওরা সীমান্তে সেটা কেড়ে নেবেই। আমস্টার্ডামে আমি তোমাকে আর একটা কিনে দেব!

ও দু-হাতে নিজের মুখ ঢাকে!

আনা বলে, শুধু শুধু কাঁদছ কেন মামণি? বাপি তো বলছে আর একটা কিনে দেবে!

আমস্টার্ডামে আমাদের একটা ব্রাঞ্চ-অফিস ছিলই বহুদিন আগে থেকে। আর ছিল প্রিন্সেনগট ক্যানালের ধারে চারতলা একটা বাড়ি। একতলায় অফিস। বাকিটা ওয়্যারহাউস বা গুদাম। আমি প্রথমে উঠলাম অন্য একটা ভাড়া বাড়িতে, আর তিল তিল করে সেই গুদামবাড়িটাকে বাসোপযোগী করে তুলতে থাকি। এই হল্যান্ডেই আমরা লুকিয়ে থাকব আসন্ন যুদ্ধের কটা বছর; অন্তত ইহুদি-বিদ্বেষী হিটলারের পতন পর্যন্ত। হল্যান্ড সেদিক থেকে ইতিহাসে এক অতিথিবৎসল দেশ। ষোড়শ শতাব্দীতে ফরাসি হুগোনটসদের তারা আশ্রয় দিয়েছে, পরবর্তী শতাব্দীতে ইংরেজ গাঁড়া খ্রিস্টানদের। বস্তুত প্রাগহিটলার জমানায় জার্মানি আর মধ্য ইউরোপের বহু-সংখ্যক ইহুদি হল্যান্ডে আশ্রয় লাভ করেছিলেন। ছিলাম আমরাও। বছরখানেকের মধ্যে এডিং তার মায়ের কাছ থেকে চলে এল আমস্টার্ডামে।

এর পরের কয়েকটা বছর—বিশ্বযুদ্ধের বছরখানেক আগে পর্যন্ত আমরা শান্তিতে বাস করেছি হল্যান্ডে। আমাদের দুটি মেয়ে স্থানীয় ডাচ কিশোরীদের মতো স্বচ্ছন্দ জীবন যাপন করেছে। ওরা দুজনই ভর্তি হয়েছিল একটি মন্টেসরি স্কুলে। খ্রিস্টান ডাচ ছেলেমেয়েদের সঙ্গে একই স্কুলে। মার্গট আর আনার অনেক বন্ধুবান্ধবী জুটে গেল—বোঝাই যেত না ওদের মধ্যে কে ডাচ, কে বেলজিয়ান, কে জার্মান। অথবা কে প্রটেস্টান্ট, কে রোমান ক্যাথলিক আর কে ইহুদি।

এই শান্ত সুন্দর সাম্যবাদ নষ্ট হয়ে গেল রাতারাতি। যখন হিটলার আক্রমণ করে বসল হল্যান্ড। 1940-এ। বিশ্বযুদ্ধ বাধার বছর-খানেকের মধ্যে। অমিতবিক্রমে সমগ্র হল্যান্ডকে পদানত করল হিটলারের পানজার বাহিনী। হল্যান্ডের রানি উইলহেলমিনা আর তাঁর মন্ত্রিপরিষদের বিশিষ্ট নেতার দল রাতারাতি পালিয়ে গেলেন ইংল্যান্ডে—চার্চিলের আশ্রয়ে। সেখানে তাঁরা এক অস্থায়ী সরকার গঠন করে মিত্রশক্তির সঙ্গে যোগ দিলেন। খাতাকলমে হল্যান্ড রইল মিত্রশক্তির পক্ষে। বাস্তবে দেশটা শাসনের নামে শোষণ করতে থাকে একজন জার্মান কমিশনার। আর্থার সেস্-ইনকোয়ার্ট। অতি নিষ্ঠুর হাতে সে প্রতিবাদী সব ডাচদের খতম করতে শুরু করল। কঠরোধ করা হলো সমস্ত সংবাদপত্রের। অধিগ্রহণ করা হলো ডাচ-বেতার সংস্থা। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় সব বন্ধ করে দেওয়া হলো। স্বাধীনতা পূজারী লেখক-শিল্পী-নাট্যকারদের হত্যা অথবা বন্দি করা হলো। জার্মান-ভূখণ্ডের দ্বিজাতী-তত্ত্ব বলবৎ করা হলো পদানত হল্যান্ডে : নর্ডিক আর্য আর অনার্যদের পৃথগীকরণ। দলে দলে ইহুদিদের ধরে চালান করে দেওয়া শুরু

হলো। হল্যান্ডের নানা বন্দিশিবির থেকে জার্মানিতে। সেখান থেকে জার্মানির অথবা পোল্যান্ডের কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে। নাৎসি যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় তাদের শ্রমদান করতে হবে।

প্রসঙ্গত বলি, যুদ্ধান্তে ন্যুরেমবার্গ ট্রায়ালে ওই ধর্মকামী নাৎসি শাসক—কমিশনার আর্থার সেস-ইনকোয়ার্টকে ফাঁসিকাঠ থেকে ঝোলানো হয়। জার্মান শাসকের আদেশে আমাদের গতিবিধি সঙ্কুচিত হতে থাকে। সূর্যাস্তের আগেই যে-যার ডেরায় ফিরে আসতে হতো। সন্ধ্যার পর ইহুদি ধর্মাবলম্বীদের ‘পথের দাবি’ কেড়ে নেওয়া হলো। সূর্য ডুবলে তারা গৃহবন্দি হয়ে থাকবে। যখন বাড়ির বাইরে যেতে হবে তখন হাতে একটা হলদে পট্টা লাগাতে হবে। ডেভিডের ঢালের প্রতীক, যাতে নর্ডিক প্রভুরা দূর থেকে সমঝে নিতে পারেন আমরা মনুষ্যতর জীববিশেষ : জু! দুই মেয়েকে বাধ্যতামূলকভাবে তাদের স্কুল থেকে ছাড়িয়ে আনতে হলো। ইহুদি ধর্মাবলম্বী হল্যান্ডবাসী ছেলেমেয়েদের পড়তে হবে ইহুদি স্কুলে। ওরা দুজনও তাই ভর্তি হলো নতুন স্কুলে। কিন্তু প্রাক্তন স্কুলের সহপাঠীরা হিটলারের আদেশ মনে-প্রাণে মানে না। লুকিয়ে দেখা করতে আসে আমার দুই মেয়ের সঙ্গে। সেটা উনিশ শ চল্লিশ-একচল্লিশ। অর্থাৎ ওরা দুজন তখন বারো-চোদ্দ।

এই সময় একটা ঘটনা ঘটে যা অদ্ভুত, মাথামুণ্ডুহীন। আমি তাতে কোনো গুরুত্ব দিইনি—দেবার কথাও নয়। হয়তো ভুলেই যেতাম—কিন্তু পাঁচ-ছয় বছর পরে আর একটি ঘটনা ঘটায় বুঝতে পারি ওই আপাততুচ্ছ ঘটনাটি কী মর্মাস্তিক—কী সংঘাতিক ছিল।

তারিখটা আমার মনে নেই—এখন বুঝতে পারি সেটা জুলাই 1942-এর কাছাকাছি। তার মানে আমরা গুপ্তমহলের অজ্ঞাতবাসে যাবার কয়েক দিন আগেকার কথা। কারণ ওইদিন আনা তার ডায়েরিতে লিখেছিল :

শুক্রবার, তেসরা জুলাই, 1942

ছোট্ট সোনা কিটি,*

হারি কাল এসেছিল আমাদের বাড়িতে। বাবা-মার সঙ্গে দেখা করতে। আমি কিনে এনেছিলাম ক্রিম-কেক, মিষ্টি, আর পছন্দসই বিস্কুট। কিন্তু অনাদিকাল ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসে থাকতে আমরা দুজনের কেউই রাজি নই। তাই আমরা দুজন হাঁটতে বের হলাম। হারি যখন আমাকে বাড়িতে ফিরিয়ে দিয়ে গেল তখন রাত আটটা বেজে দশ। বাপি তো রেগে কাঁই। তার মতে ইহুদিদের রাত আটটার মধ্যে খাঁচায় ফিরে আসার কথা। সেটাই নাকি শিবঠাকুরের আপনদেশের কানুন। দেরি হওয়া বিপদজ্জনক। আমি তাকে কথা দিলাম—এবার থেকে আটটা বেজে নয়, আটটা বাজতে দশের আগেই খাঁচায় ফিরে আসব।

* সঙ্গীহীন আনা তার ডায়েরির সঙ্গে মিতালি পাতিয়েছিল। ডায়েরির নামকরণ করেছিল ‘কিটি’। তার প্রাণের কথা খুলে বলত শুধু কিটিকেই।

হারি আমাকে কাল ওদের বাড়িতে নেমন্তন্ন করেছে। বেড়াতে যাবার নিমন্ত্ৰণ। আমার বান্ধবী যোপি হারির নাম করে অনবরত আমার পিছনে লাগে। না কিটি—বিশ্বাস কর, আমি হারির প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছি না। কিন্তু পুরুষ বন্ধু তো আমার থাকতেই পারে। পারে না?—তা নিয়ে কারও কোনো মাথাব্যথা হবার কথা নয়। তবে কোনো একজন বিশেষ পুরুষ বন্ধু—মানে, মা যাকে বলে ‘প্যার-মহব্বতের পার্টনার’—সেটা ভিন্ন কথা!

ইভা সেদিন বলল, একদিন হারি নাকি তাদের বাড়িতে গেছিল। ইভা তাকে জিজ্ঞেস করেছিল, ‘কাকে তোর বেশি পছন্দ? আনা না ফ্যানি?’ হারি নাকি জবাবে বলে, ‘সে খোঁজে তোর কী দরকার? তবে নেহাৎ যদি জানতে চাস তাহলে কানে কানে বলি—‘কাউকে বলা মানা/সেই মেয়েটি আনা!’

বলেই নাকি হারি সুট করে সরে পড়ে।

বুঝতে অসুবিধা হয় না হারি আমার প্রেমে ডগমগ। আমি বলি, মন্দ কী! এ তো মজাদার ঘটনা! মার্গট শুনলে বলবে, ‘হারি কিন্তু ছেলে ভালো।’ ভালো ছেলে? মানছি। কিন্তু হারি তার চেয়ে কিছু বেশি। মা তো হারির প্রশংসায় পঞ্চমুখ। আমার এটা ভালো লাগে—আমাদের পরিবারের সবাই হারিকে ভালবাসে। সেও আমাদের সবাইকে। তবে ওর মতে আমার বান্ধবীরা এখনো সব হাবাগোবা, খুকি-খুকি! আমি তার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত।

তোমার আনা

হারিকে আমার বেশ মনে আছে। ছেলেটি বেলজিয়ান। আমস্টার্ডামে থাকতো ওর দাদু-দিদার কাছে। সেও জিওনিস্ট—অর্থাৎ ইহুদি। আনার সঙ্গে তার একটা বাছুরে—প্রেম যে হয়েছিল সেটা তখন খেয়াল করিনি। পরে ওর দিনপঞ্জিকা পড়ে বুঝতে পারি। ইউরোপিয়ান সমাজে এটা এমনকিছু নতুন কথা নয়। তবে আনার বয়স তখন খুবই কম—সদ্য-টীনএজার। হারির বয়স তখন পনেরো-ষোলো। আমার জানা ছিল না যে, হারি ওই বয়সেই আমস্টার্ডামের ইহুদি-সংঘের নাম লিখিয়েছে। সেটা জানতে পারি আনার ডায়েরির ত্রিশ জুনের এন্ট্রিতে। আনা তার প্রিয়বান্ধবী কিটিকে গোপনে জানাচ্ছে—হারি বলল, ‘প্রতি বুধবার স্কুল ছুটির পর আমি এক কাঠ-খোদাই শিল্পীর কাছে ‘উড-কার্ভিং’ শিখতে যাই—মানে এটাই আমার দাদু-দিদার ধারণা। বাস্তবে ওঁদের অজান্তে আমি যাই একটা জিওনিস্ট ক্লাবে। দাদু-দিদা ইহুদিধর্মের সমর্থক নন। কিন্তু ওঁদের লুকিয়ে আমি ওই গোপন সমিতিতে যাই—কারণ আমি ওই নাৎসি জার্মানির ‘ইহুদি-নিধন’ কর্মকাণ্ডের ঘোরতর বিরোধী।’

এরই দু-একদিন আগে-পিছের ঘটনা। আমি কোথায় যেন গেছিলাম। সন্ধ্যার সময়। হস্তদন্ত হয়ে বাড়ি ফিরছি। যখন নিজের বাড়ির দোরগোড়ায় এসে পৌঁছলাম তখন হাতঘড়িতে দেখি রাত আটটা বাজতে পাঁচ। কলবেল বাজিয়ে অপেক্ষা করছি, কে যেন

পিছন থেকে ডেকে উঠল, আঙ্কল, একটু এদিকে সরে আসবেন, কাইন্ডলি? দু-একটা কথা ছিল।

ততক্ষণে প্যাসেজের আলোটা জ্বলে উঠেছে। দরজাও খুলে গেছে। খোলা দরজার ফ্রেমে ধরা পড়েছে আমার ফ্রকপরা ছোট্ট মেয়ে, আনা।

আমি পিছন ফিরে ছেলেটিকে দেখি। অত্যন্ত সুদর্শন একটি তরুণ। বলি, এখন নয় বাবা, কাল সকালে এস। আমার বাঁ-হাতের ফেট্রিটা তো দেখতে পাচ্ছ? এখন আটটা বাজতে পাঁচ।

—তাতে ঘাবড়াবার কিছু নেই, আঙ্কল। আপনাকে দূরে কোথাও যেতে হবে না। এখানেই দাঁড়িয়ে দু-একটা কথা শুনে যান। তাতে আপনার মঙ্গলই হবে।

আনা দোড়গোড়া থেকে বললে, ও ঠিক কথাই বলছে ড্যাডি। ও ‘হিটলার্স-ইউথ’ ক্লাবের প্রভাবশালী কেওকেটা। ওর সঙ্গে কথা বলতে বলতে যদি রাত বারোটা বেজে যায়, তাহলেও তোমাকে পুলিশে ধরবে না।

ছেলেটি—বছর উনিশ-কুড়ি বয়স হবে, খাঁটি নর্ডিক জার্মান—আমাকে ডিঙিয়ে আনাকে বললে, তুমি ভিতরে যাও খুকু। এখানে দাঁড়িয়ে আড়ি পেত না। বন্যবাদ!

আনা তাকে তৎক্ষণাৎ বলল, ঠিক আছে জ্যাঠামশাই! আপনারা বিশ্রান্তালাপ চালিয়ে যান।

দ্রাম করে দরজাটা বন্ধ করে সে ভিতরে চলে গেল।

আমি ওই তরুণটিকে জিজ্ঞেস করি, আপনি কে? কী বলছেন?

—আমি কে তা তো আনাই বলে গেল। আপনার দুই মেয়েই আমাকে চেনে। মার্গট যখন নর্ডিক স্কুল থেকে বিতাড়িত হয় তখন আমার চেয়ে দু-ক্লাস নিচে পড়ত। ওরা আমাকে চেনে।



ফ্রলিন মার্গট ফ্রাঙ্ক

বলি, ও! তা কী বলছ বাবা?

—বলছি—কিছু মনে করবেন না হের ফ্রাঙ্ক, আপনি আফটার অল তো জুডেন? আপনার দুই পরমাসুন্দরী কন্যাও তাই। আপনারা আমস্টার্ডামে আছেন—অকুপায়েড আমস্টার্ডাম-এ—তাই নয়? নাৎসি সরকারের বদান্যতায় মুক্তই আছেন। কনসেন্টেশন ক্যাম্পে নয়। তাই না? আপনার বিরুদ্ধে আমাদের কিছুই অভিযোগ নেই। কিন্তু

আপনার কন্যা দুটিকে একটু সমঝে চলতে বলবেন। ওরা দিন দিন ঔদ্ধত্যের সীমারেখা লঙ্ঘন করে চলেছে।

আমি ঠাণ্ডা-মাথায় বলি, কেন বাবা? ওরা কী করেছে?

—আপনার সামনেই ও আমাকে কী বলল শোনেননি? জ্যাঠামশাই! আমি কী স্যার, আপনার চেয়ে বয়েসে বড়? বলুন? আপনিই বলুন? ঔদ্ধত্যের একটা সীমা থাকবে তো?

আমি ব্যাপারটাকে লঘু করতে বলি, আরে ও একটা পাগলি! ছোট্ট মেয়ে! কাকে কী বলতে হয়, ও কী জানে? আমি ওকে খুব ধমকে দেব।

—আজ্ঞে না। আপনার কনিষ্ঠা কন্যাটি আর বড় একটা খুকি নেই! বেশ ডাঁসপাকা, ডাগর হয়েছে। দিন নেই, রাত নেই ওই জুডেন-বাচ্চার সঙ্গে পথে-ঘাটে ঘুর ঘুর করে ফেরে।

—না না, রাত নেই। রাত আটটার মধ্যেই ও তো বাড়ি ফিরে আসে।

—হ্যাঁ তাই যেন আসে। ওই জুডেন-বাচ্চা হ্যারির সঙ্গে নির্লজ্জ ঢলাঢলিটা যেন বন্ধ করে। আর আপনার বড় কন্যাটিও কম বিদ্যেধরী নন। তাঁর ওই ধরাকে সরা জ্ঞান করা ভাবটা নাৎসি এস. এস.রা সহ্য করবে না। বুয়েছেন? আপনার ভালর জন্যই বলছি আঙ্কল! ওদের এই ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে দেবেন। ঠিক আছে। এবার বাড়ি যান। গুড নাইট!

আবার বেল বাজাতে এবার দরজা খুলে দিল আনা নয়, মার্গিট। বললে, ওই ছেলেটার সঙ্গে কী এত আলোচনা করছিলে?

আমি নিঃশব্দে ভিতরে আসি। বৈঠকখানায়। সদর বন্ধ করে জুতোর ফিতে খুলতে খুলতে লক্ষ্য হয়—ওরা তিনজনই ঘনিয়ে এসেছে। আমি সাধারণভাবে প্রশ্নটা ঘরের রুদ্ধ বাতাসে ছুঁড়ে দিই : ছেলেটা কে?

আনা বা মার্গিট জবাব দিল না। এডিং বলল, বাঃ! তুমি কার সঙ্গে এতক্ষণ দোরগোড়ায় বকবক করলে এ-প্রশ্ন তো আমরাই করব।

আমি বলি, তোমার কাছে আমি জানতে চাইনি, এডিং!

মার্গিট বলে, ও একজন কটুর নাৎসি মস্তান। আমার চেয়ে দু'বছর সিনিয়র। মানে আমরা যখন একসঙ্গে স্কুলে পড়তাম।

আমি জানতে চাই, কী নাম ছেলেটির?

মার্গিট বলে, নাম মনে নেই। জার্মান! 'হিটলার্স-ইউথ' ক্লাবের পার্টি ক্যাডার।

আমি আনার দিকে ফিরে জানতে চাই, তুই ওই ছোকরার নাম জানিস?

—না। নামটা মনে নেই। তবে 'স্পেসিস'-টাকে চিনি।

—স্পেসিস? তার মানে?

—স্পেসিস মানে জান না? প্রজাতি। ও হচ্ছে "হ্যাংলাথেরিয়াম"।

—হ্যাংলাথেরিয়াম! তার মানে?

—মার্গটকে জিজ্ঞেস কর—ও বলতে পারবে ছেলেটা কেন ‘হ্যাংলাথেরিয়াম’।

মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারি না। মার্গট তার ছোট বোনের দিকে থক করে ছুঁড়ে দিল এক দলা বিশেষণ—আর তুই নিজে কী? একটা—‘হিংসুটেথেরিয়াম’?

দু’ বোন একের পর এক গটগট করে ভিতরে ঢুকে গেল।

এডিকে শুধাই, এর মানে?

—সে তোমার মাথায় ঢুকবে না। এটা সিম্পলি অ্যাডলেসেন্স ক্রাইসিস। তুমি হাতমুখ ধুয়ে এস বরং। মন থেকে এসব চিন্তা ঝেড়ে ফেল।

তাই ফেলেছিলাম সেদিন। কাজের চাপে। যুদ্ধের পরিস্থিতি দ্রুত বদলে যাচ্ছে। বুঝতে পারছি, ইহুদিদের পক্ষে হল্যান্ডও যথেষ্ট নিরাপদ নয়। আমি তখন ‘আত্মগোপন-ব্যবস্থা’ প্রচণ্ড ব্যস্ত। মেয়েদের ওসব ছেলেমানুষিতে কান দেবার সতিই সময় ছিল না। যুদ্ধান্তের এই কর্মহীন অবসরে স্বৃতি-রোমন্থন করতে বসে আজ অনেক তথ্য, অনেক তত্ত্ব এবং অনেক সত্য বুঝতে পারি।

আনা আর মার্গট ছিল মাত্র দু-বছরের ছোট-বড়। কিন্তু আনা ছিল ‘প্রিকোশিয়াস’। তার জুৎসই বাঙলা প্রতিশব্দ মনে পড়ছে না—সদর্থে ‘অকালপক্ব’ বলা চলে। দেহের তুলনায় তার মস্তিষ্ক এবং মনটা বেশি পরিপক্ব। দেহের পরিণতির দিক থেকে দিদি হ্যাডিক্যাপ পেয়েছে। মানসিক পরিণতির বিচারে আনা তাকে ছুঁয়ে ফেলেছে। আনা ‘কাফ-ল্যাভে’ মগ্নচৈতন্য; অথচ মার্গটের কোনও সূটার কখনো আমাদের বাড়িতে এসেছে বলে মনে করতে পারি না। এডিকেও এ প্রশ্নটা কোনোদিন জিজ্ঞেস করিনি। হয়তো সেও জানত না। প্রশ্ন হচ্ছে ওই অত্যন্ত সুদর্শন ‘হ্যাংলাথেরিয়াম’ দু-বোনের মধ্যে কার দিকে ঝুঁকেছিল? ঘটনাটা ভেবে এখন মনে হয় সে ঝুঁকেছিল মার্গটের দিকেই। মার্গট তখন পঞ্চদশী, আর আনা বিকচোন্মুখ এক পুষ্পকোরক। তখনো সে চোখ মেলে তাকায়নি। অথবা হয়তো সে তাকিয়েছিল—দর্শক তা বুঝতে পারেনি। দুই বোনকে নিয়ে অনঙ্গদেব কি একটা কৌতুক করছিলেন? আনার দৃষ্টিতে ছেলেটা হ্যারির অবাঞ্ছিত প্রতিদ্বন্দ্বী। আর মার্গটের দৃষ্টিতে? হয়তো মার্গটের মনটা ছিল দ্বিধাবিভক্ত। তার মনের একটা অংশ নিশ্চয় ওই নৃশংস ইহুদিবিদ্বেষী নাৎসি মস্তানটাকে ঘৃণা করে। এটা অবধারিত। কিন্তু আর একটা অংশ? যেখানে ছেলেটা নাৎসি নয়, প্রণয়প্রত্যাশী ‘হ্যাংলাথেরিয়াম’? সেখানে হয় তো ওরা দুজন যৌবরাজ্যের সিংদরোজায় দাঁড়ানো তরুণ-তরুণী—নাৎসি-জুডেন নয়! কী জানি, ঠিক বলতে পারব না।

এর কিছুদিন পরে আনা হঠাৎ আমাকে প্রশ্ন করেছিল, আচ্ছা বাপি, জুডাস ইস্কারিয়ট লোকটা কি ইহুদি ছিল?

বলি, একদল কটুর খ্রিস্টান তাই বলতে চান।

—যীসাসের বারোজন প্রধান শিষ্যের মধ্যে এগারোজন ছিলেন খ্রিস্টান আর একজন জিয়নিষ্ট! তাই কি?

ওকে বুঝিয়ে বলি, প্রভু যীসাস যখন তাঁর বারোজন শিষ্যের প্রথম সাক্ষাৎ পান তখন তাঁদের কেউই খ্রিস্টান ছিলেন না, এটা তো মানবি? কারণ ‘খ্রিস্টধর্ম’ তো তখনো জন্মগ্রহণই করেনি। সুতরাং লজিকের হিসাবে দীক্ষা নেবার আগে ওই দ্বাদশ শিষ্য অন্য কোনও ধর্মাবলম্বী ছিলেন নিশ্চয়। ‘জুডাইজম’ খ্রিস্টধর্মের অনেক-অনেক পূর্বকাল থেকে প্রচলিত। বস্তুত জুডিয়াতে, মানে ইজরাইল-প্যালেস্টাইন অঞ্চলে তখন অধিকাংশ মানুষই ছিল জিয়নিষ্ট বা ইহুদি। প্রভু যীসাস-এর বাকি এগারোজন শিষ্য কে কোন ধর্মাবলম্বী ছিলেন সে কথা বাইবেলে লেখা নেই। শুধু ‘জুডাস’—হয়তো নাম-সায়ুজ্যে ‘জুডাইজম’ ধর্মবিশ্বাসী বলে ধরা হয়ে থাকে।

—তুমি যীশুকে ‘প্রভু যীশু’ বললে যে? তুমি নিজে তো জিয়নিষ্ট?

—তাতে কী? ইহুদি ধর্মও যীশুকে মহামানব হিসাবে মানে। যেমন মহামানব ছিলেন : গৌতম বুদ্ধ অথবা হজরৎ মহম্মদ! যেমন মহামানব ছিলেন আব্রাহাম, ডেভিড, মোজেস।

—ইহুদি হোক-না-হোক ‘জুডাস’ লোকটা ভাল ছিল না, তাই না বাপি? মাত্র ত্রিশটি রৌপ্যমুদ্রার লোভে সে তার প্রিয়জনকে ধরিয়ে দিয়েছিল।

—আমি তোর সঙ্গে একমত। জুডাস ছিল ‘বিশ্বাসঘাতক’!

—কারেক্ট। আচ্ছা বাপি, তর্কের খাতিরে যদি ধরা যায় যে, জুডাস ইস্কারিয়টের বিচার হচ্ছে—‘বিশ্বাসঘাতকতা’-র অভিযোগে আর তুমি সে বিচারশালার ‘হেডম্যান অব দ্য জুরি’। স্বয়ং আদোনাই* ন্যায়াধীশ। বিচারক তোমাকে বললেন, “বলুন, হেডম্যান অব দ্য জুরি! আসামী দোষী না নির্দোষ?” তুমি কী বলবে?

—জুরিরা চিন্তাভাবনা করে আমাকে যা বলেছেন—যেটা তাঁদের মেজরিটি-ভার্শান—তাই বলব।

—ধর তা ফিফটি-ফিফটি! তুমি কাস্টিং ভোট দিচ্ছ?

—আমি তাহলে বলতাম : গিলটি!

—কিন্তু আমি বলতাম : নট গিলটি!

অবাক হয়ে প্রশ্ন করেছিলাম, কোন্ যুক্তিতে?

আমার সেই তেরো বছরের বাচ্চা মেয়েটা কী বলল জানেন? বললে, দেখ বাপি, জুরিদের ভার্ভিস্ট যদি গিলটি হয়, তাহলে বিচারককে ফাঁসির আদেশ দিতেই হতো। জুডাস-

* Adonai —ইহুদি ধর্মগ্রন্থ তালমুদ বর্ণিত ঈশ্বরের সংজ্ঞা। বাইবেলে যেমন : ‘গড’, কোরানে তেমন : ‘অল্লাহ’, ইহুদিদের তেমনি : আদোনাই।

এর ফাঁসি হতো। কিন্তু ফাঁসির মধ্যে উঠতে উঠতে সে মনে মনে সব্বাইকে খিন্তি করত। জুরিদের আর বিচারককে ! তাতে শুধু তোমাদের প্রতিশোধস্পৃহাই তৃপ্ত হতো, দোষী মানুষটার চারিত্রিক পরিবর্তন কিছু হতো না। তার মনে কোনো অপরাধবোধ জাগত না। অনুশোচনা হতো না। তাই না ?

আমি রুখে উঠে বলেছিলাম, আর হেডম্যান অব দ্য জুরি যদি বলত লোকটা নির্দোষ, আদোনাই যদি তাকে বেকসুর খালাস করে দিতেন ? তাহলেই লোকটা অনুশোচনায় কেঁদে ভাসাত ?

—একজ্যাস্টলি বাপি ! শুধু কেঁদে ভাসাত নয়, অনুশোচনায় সে আত্মহত্যা করে বসত।

—বটে ! কী করে জানলি ?

—‘স্টুডেন্টস কনসাইজ এনসাইক্লোপিডিয়া’ পড়ে। জুডাস এন্ট্রিতে। এই দেখ। তথ্যটা আমার জানা ছিল না।

JUDAS ISCARIOT was the apostle who betrayed Christ with a kiss. Judas was the treasurer of the Group (John 12 : 6), and accompanied Jesus throughout his life. As a guest with Jesus in the home of Mary and Martha, he criticised Mary for pouring valuable ointment on Jesus' feet instead of selling it and giving the money to the poor.

[জুডাস ইস্কারিয়ট : যীশুখ্রিস্টের এক শিষ্য, যে একটি চুম্বনের মাধ্যমে তাঁকে ধরিয়ে দেয় (জন 12 : 6)। জুডাস সারাজীবন যীশুর সঙ্গে পথে পথে ঘুরেছে। সে ছিল ওই দলের কোষাধ্যক্ষ। প্রভুর সঙ্গে সে মেরী ও মার্থার গৃহে আমন্ত্রিত হয়েছিল; আর মেরী যখন যীশুর পায়ে মহার্য্য তৈলমর্দনে নিরত তখন মেরীকে সমালোচনা করতে তার বাধেনি। সে বলেছিল, ওই দামি তেলটুকু কারও পায়ে ঢেলে নষ্ট না করলে বেশ কিছু অর্থ পাওয়া যেত, যা দিয়ে দরিদ্র-নারায়ণের সেবা করা যেত।]

এটুকু পড়ে শুনিয়ে আনা বলল, দেখ বাপি, একটা লোক যদি জীবনে একবার কোনো মারাত্মক ভুল করে বসে, আর ইতিহাসে সে কথা লেখা হয়ে যায় অমনি আমরা সেটা আন্ডারলাইন করে মুখস্থ করে ফেলি। ব্রুটাস যেন সারাজীবন আর কোনো কাজ করেনি। একমাত্র সীজারকে হত্যা করা ছাড়া। আর এ লোকটা—এই জুডাস, নিশ্চয় অত্যন্ত বিশ্বাসী ছিল। না হলে তাকে দলের ড্রেকারার করা হতো না। সে নিশ্চয় যীসাস-এর প্রতি একনিষ্ঠ ছিল, না হলে সে সারাজীবন যীশুকে ছায়ার মতো অনুসরণ করত না।

তাছাড়া লোকটা প্রাকটিকাল ছিল, স্তাবক ছিল না। প্রভুর পায়ে তেল ঢালাটা তার পছন্দ হয়নি। অন্য সকলের মতো সে চুপ করে থাকেনি। প্রতিবাদ করার হিম্মত তার ছিল—

আমি ওকে থামিয়ে দিয়ে বলি, সেটা কথা নয়, আনা! তুই কেন ধরে নিলি যে, জুডাস যীশুকে ধরিয়ে দিয়ে যে টাকাটা পেয়েছিল তা শুঁড়িখানায় খরচ করে মাতাল হয়নি?

—সে কথাই তো বলছি। বাকিটা পড়ে দেখ :

At the Last Supper, Jesus told Judas that he would be a traitor and told him to do quickly what he intended to do (John 13:21-27).

Judas betrayed Jesus to his enemies for 30 pieces of silver, the price of a slave. He came with the soldiers who arrested Jesus in the garden, and identified Him by kissing Him. Mathew says that Judas later returned the money to the chief priest who had given it to him, and then hanged himself (Math. 27 : 3-8). The *Judas tree* is the kind of tree on which Judas is said to have hanged himself.

[শেষ সায়মাশে যীশু জুডাসকে বললেন, তুমি তো আমাকে ধরিয়ে দেবে; তা সে কাজটা যত শীঘ্র সম্পন্ন করতে পার কর (জন 13:21-27)]।

জুডাস যীশুকে শত্রুপক্ষের হাতে তুলে দিয়েছিল। ত্রিশটি রৌপ্যমুদ্রার বিনিময়ে। ত্রিশ টাকা ছিল একটি ক্রীতদাসের বাজারদর। জুডাস প্রহরীদলের সঙ্গে বাগানে আসে, যেখানে যীশু ছিলেন; আর এগিয়ে গিয়ে তাঁর গালে চুম্বন করে তাঁকে সনাক্ত করে। ম্যাথু বলেছেন, জুডাস পরে মন্দির পুরোহিতদের সঙ্গে দেখা করে। তাঁরা ইতিপূর্বে তাকে যে ত্রিশ টাকার পুরস্কার দিয়েছিলেন তা প্রত্যর্পণ করে। তারপর একটা গাছে ফাঁস লাগিয়ে উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করে। ...যে গাছটি থেকে জুডাস গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করে সেই গাছের নামই হয়ে যায় ‘জুডাস গাছ’ ॥

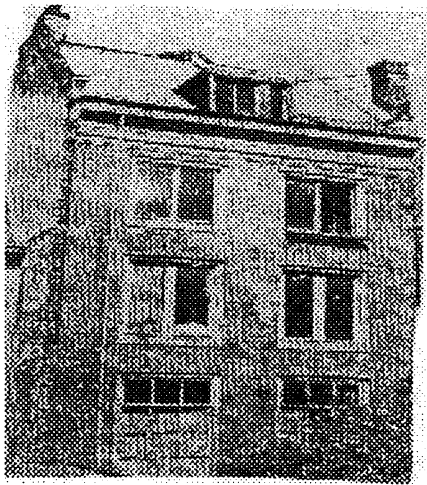
কথাগুলি এত বিস্তারিত লিখছি একটা বিশেষ কারণে। যুদ্ধান্তে আমার জীবনে ঠিক এই ধরনের একটা দায়িত্ব বর্তেছিল—অর্থাৎ নির্ণয় করে বলা : জুডাস ইস্কারিয়টকে কি ফাঁসি দেওয়া হবে? না মুক্তি? সে কথা যথাস্থানে। তার আগে বলি : আমাদের পঁচিশ মাসের গুপ্ত আবাসের জীবন-কথা। হয়তো তা আপনারা জেনেছেন আনার ডায়েরি পড়ে। কিন্তু তা তো একটা বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে জানা।

যেকথা বলছিলাম : আমার আশঙ্কা হয়েছিল যেহেতু হিটলার হল্যান্ড দেশটাকে পদানত করেছে তাই ইহুদি হিসাবে আমাদের জীবন এখানে মোটেই নিরাপদ নয়। 1941 সালের ফেব্রুয়ারিতে আমসটার্ডাম থেকে প্রথম দল ইহুদিকে জার্মানিতে পাঠানো হলো। রাতারাতি গেস্টাপো বাহিনীর লোকেরা এসে ইহুদি মহল্লায় হানা দিল। বেছে বেছে সুস্থ

সবল মানুষকে ধরে নিয়ে গেল ট্রাকে করে। তারা নাকি নাৎসি যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় শ্রমদান করবে। কয়েক শত ট্রাক বোঝাই ইহুদিকে নিয়ে যাওয়া হলো হল্যান্ডের ওয়েস্টারবোর্কে। দু-একদিন তাদের আটক রাখা হলো সেখানকার কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে; তারপর পূর্বদিকে—জার্মানির মূল ভূখণ্ডে। সেখানে কী ঘটল আমরা জানতে পারলাম না। দু-চার-ছয় মাসের মধ্যে কেউ ফিরে এল না। তার চেয়েও বড় কথা কয়েক হাজার মানুষের মধ্যে কেউ একখানা পিকচার-পোস্টকার্ড পাঠিয়েও বাড়িতে জানাল না : তারা কেমন আছে। জার্মানি আর হল্যান্ডের মধ্যে তখন ডাক চলাচলে কোনও অসুবিধা ছিল না। দুটোই নাৎসি থার্ড রাইখ্-এর অধিকারে।

সেই প্রথম দলে কিনা ঠিক জানি না, তবে তারপরেই চলে গিয়েছিল আমাদের পরিবারের জানাশোনা একজন। তার কোনো খোঁজ আর আমরা পাইনি। সেই বেলজিয়ান ছেলেটি যে দাদু-দিদার কাছে থাকত। আনার বয়স্ফেড : হারি।

কিন্তু পালাব কোথায় ? উত্তরে ডেনমার্ক, দক্ষিণে ফ্রান্স, ওদিকে নরওয়ে — কিন্তু সব দেশই সর্বগ্রাসী ফ্যুরারের কজায়। একমাত্র আশ্রয় লাফতায়ের বোমাবর্ষণে বিধ্বস্ত ব্রিটিশ-আইলস্। কিন্তু জার্মান-সাবমেরিনের বেড়া ডিঙিয়ে সেখানে যাওয়া অসম্ভব।



আনা ফ্রাঙ্কের 'গুপ্ত আবাস'

হঠাৎ দারুণ একটা বুদ্ধির যোগান দিল কুগলার (Victor Kugler)। আমার অফিসের এক বিশ্বস্ত কর্মী। সে বলল, প্রিন্সেনগ্রট ক্যানালের ধারে আমাদের যে বাড়িটা আছে তার উপরের দুটি তলায় একটা 'গুপ্ত আবাস' বানিয়ে ফেলা যায়। দোতলা থেকে তিনতলা যাবার পথে সিঁড়ির আগে পড়ে একটা চওড়া বারান্দা। প্রায় সাত ফুট চওড়া। সেটার মাঝামাঝি তৈরি করা হবে একটা 'সিক্রেট বুককেস'। ঠিক মাঝামাঝি থাকবে একটা শব্দ লোহার পিন।

সেই পিনকে কেন্দ্র করে আলমারিটা চক্রাকারে পাক খাওয়ানো যাবে। সেটা যখন দু-পাশের দুই দেওয়ালের সঙ্গে আলস্ভাবে থাকবে তখন মনে হবে ওখানে আছে একটা বুক-কেস। বই দিয়ে ঠাসা। আর আধখানা পাক খাওয়ালে খোলা অবস্থায় প্যাসেজের দু-পাশে থাকবে তিনফুট চওড়া যাতায়াতের রাস্তা। বুককেস দিয়ে আড়াল করা গুপ্ত-আবাস

অংশটা মাত্র ৫৩৪ বর্গফুট। তবে সেদিকে আছে একটি ছোট্ট রান্নাঘর। আর গোটা দুয়েক টয়লেট। বাড়িটা ঘুরে ঘুরে দেখে এলাম একদিন। কুগলার যা বলেছে তা ঠিক। ৫৩৪ বর্গফুট ফ্ল্যাটে চারটি প্রাণীর পক্ষে বাস করা কঠিন—বিশেষ তারা যদি পূর্ববর্তী জীবনে হাত-পা ছড়িয়ে বাস করায় অভ্যস্ত হয়ে থাকে। কিন্তু এডিং বলল, এটা তো আমাদের সারাজীবন বসবাসের স্থান নয়—আপৎকালীন ব্যবস্থা। হয়তো দু-আড়াই বছরেই পতন হবে হিটলারের। মোটকথা, এ ছাড়া যখন গত্যস্তর নেই তখন তাই করা হোক। বেঁধে মারলে সহ্য করতেই হয়।

অত্যন্ত বিশ্বস্ত একটি ইহুদি ছুতোরকে দিয়ে কুগলার সেই বিচিত্র বুককেসটা বানিয়ে ফেলল। সে মাপজোপ নিয়ে গিয়ে নিজের বাড়িতে বসে বানালো ছোট ছোট কাঠের পীস। তারপর এক শনিবার অফিস ছুটির পর নিয়ে এল সেগুলো ওখানে। আর নিয়ে এল দু-দিনের র্যাশন। অফিস ছুটির পর ছত্রিশ ঘণ্টা ক্রমাগত কাজ করে শনি-রবিবারের মধ্যে সে বানিয়ে ফেলল দোতলার প্যাসেজে ওই আজব ঘূর্ণ্যমান বুককেসটা। দোতলা থেকে তেতলায় উঠবার সিঁড়ির মুখে। বাড়িতে তালা দিয়ে সে বেরিয়ে এল। চাবিটা থাকল কুগলারের জিন্মায়। অফিসের আর কেউ জানতে পারল না দোতলা থেকে তিনতলা যাবার পথে একটা বুককেস বানানো হয়েছে।

স্থির হলো তের থেকে পনের তারিখের মধ্যে আমরা এই ভাড়াবাড়ি ছেড়ে ‘গুপ্ত-আবাসে’ গিয়ে আশ্রয় নেব—ধীরে ধীরে, ধাপে-ধাপে। তের তারিখ যাবে এডিং একা, একটা সুটকেস নিয়ে আর দুদিনের মতো রেশন নিয়ে সন্ধ্যা নাগাদ—অফিস ছুটি হবার মুখে। কুগলারের সঙ্গে কথা বলতে বলতে ছুটি হয়ে যাবে। সবাই চলে গেলে এডিং উঠে যাবে তিনতলায়। অফিসে তালা দিয়ে কুগলার বাড়ি যাবে। চোদ্দ তারিখ একইভাবে পাচার করা হবে মার্গিট আর আনাকে। তারপর পনের তারিখে আমি যাব একা, এবাড়ি বাড়িওয়ালাকে বুঝিয়ে দিয়ে। বাড়িওয়ালাকে বলব, আমরা কিছুদিনের মতো হল্যান্ডের বাইরে যাচ্ছি—আবার ফিরে আসব।

স্থির হয়েছিল, আমার চারজন সহকর্মী—তার ভিতর দুজন ডাচ এবং খ্রিস্টান, দুজন ইহুদি—আমাদের গুপ্ত আবাসের গোপন খবরটা জানবেন। তাঁরা পর্যায়ক্রমে আমাদের জীবনযাত্রার যাবতীয় আবশ্যিক উপাদান—খাবার, দুধ, কফি, জামাকাপড়, নিত্যব্যবহার্য তেল-সাবান-টুথপেস্ট, সংবাদপত্র—সম্ভব হলে কিছু বইপত্র গুপ্ত আবাসে পৌঁছে দেবেন। অফিস ছুটির পর। গোপনে। সেই বিশ্বস্ত চারজন সহকর্মী হলেন : হের কুপুস, হের কুগলার, ফ্রাউ সিয়েরা ভাঁ সাঁতে, আর ফ্রাউ এলি ভঁসে। এঁরাই দীর্ঘ দুটি বছর আমাদের জীবনধারণের যাবতীয় উপকরণ সরবরাহ করে গেছেন। পরিকল্পনা মতো আমরা তের থেকে পনের তারিখের মধ্যে না-পান্ডা হয়ে যাব।

কিন্তু নিতান্ত দুর্ভাগ্যক্রমে ঘটে গেল বিনা মেঘে এক প্রচণ্ড বজ্রপাত!

কেন, কী করে এমন ঘটনা ঘটল তা আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারিনি। আমি একা নই, আমরা কেউই। বুঝতে পেরেছিল আমার সেই একফোঁটা মেয়েটা—যে হতভাগী তের বছর বয়সে এমন কেতাব লিখেছে যা বাইবেল ব্যতিরেকে—সারা বিশ্বে সর্বাধিক বিক্রিত! কিন্তু সেসব কথা বলার আগে ঘটনাটা ঠিক কী ঘটল তা জানাই :

পাঁচই জুলাই 1942—অর্থাৎ আমাদের আত্মগোপন-দিবসের এক সপ্তাহ আগে—আমাদের ডেরায় এসে গেল জার্মান কমান্ড্যান্টের কাছ থেকে এক জরুরি ফতোয়া : ষোড়শবর্ষীয়া ফ্রলিন মার্গট ফ্রাঙ্কে পরদিন, ছয় তারিখ, সোমবার বেলা এগারোটায় জার্মান শিবিরে রিপোর্ট করতে হবে। তাকে নির্বাচন করা হয়েছে নাৎসি যুদ্ধায়োজনে স্বেচ্ছায় শ্রমদান শিবিরে যোগদান করার জন্য!

এটা কেমন কথা? মার্গট নাবালিকা। তার ভোটাধিকার পর্যন্ত নেই, তার গাড়ি চালানোর লাইসেন্স পাবার অধিকার নেই, অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত সে কোনো লীগাল-ডকুমেন্টে স্বাক্ষর করতে পারে না। সর্বোপরি তার স্বাস্থ্যও ভাল নয়। নাৎসি শিবিরে বিনা পারিশ্রমিকে শ্রমদানই যদি উদ্দেশ্য হয় তাহলে ফ্রাঙ্ক-পরিবারের কর্তাকেই তো প্রথম নির্বাচন করার কথা। অথবা নিতান্তই যদি স্ত্রীলোকের প্রয়োজন হয় তাহলে ফ্রাউ এডিৎ ফ্রাঙ্কে। এদের দুজনকে ডিঙিয়ে ওই ষোড়শীকে কেন?

এই প্রচণ্ড দুঃসংবাদটা কীভাবে এল তা বোঝাতে আনার ডায়েরির কিছু অংশ এখানে পেশ করি। প্রথম এন্ট্রিটি রবিবার পাঁচই জুলাই সকালের। তখনো জার্মান কমান্ড্যান্টের দপ্তর থেকে আদেশনামাটা আসেনি; কিন্তু সেই রবিবার সকালেই আনা তার ডায়েরিতে প্রথম গুপ্ত-আবাসের কথা লেখে।

ডায়েরিতে প্রথম অংশে আনা তার বান্ধবী কিটিকে (ডায়েরিকে) জানাচ্ছে যে, তার আর তার দিদির স্কুল-রেজাল্ট বার হয়েছে। নিজের রেজাল্ট সে ডায়েরিতে বিস্তারিত লিখেছে। দিদির প্রসঙ্গে লিখেছে—“My sister Margot has her report too, brilliant as usual. She would move up with *Cum laude* if that existed at school, she is so brainy.” [দিদি মার্গটও তার রিপোর্টটা পেয়েছে। যথারীতি দুর্দান্ত রেজাল্ট। আমাদের স্কুলে যদি ‘প্রশংসাপত্র’ দেবার ব্যবস্থা থাকত তাহলে ক্লাস প্রমোশনের সঙ্গে ও সেটাও পেত।]

এর পরেই সে ডায়েরিতে আমার কথা লিখেছে,

“আজকাল বাপি প্রায় সারা দিন বাড়িতেই থাকে। হিটলারের ইহুদিপীড়ন ব্যবস্থাপনায় তার পক্ষে কারবার চালানোর উপায় নেই। আমস্টার্ডামে তার যে দুটো ব্যবসা ছিল তা তার দুই সহকর্মীকে নিবুড সত্ত্বে প্রদান করে দিতে হয়েছে। ব্রাভিয়েস কোম্পানিটা মিস্টার কুফুইসকে আর কোলেন অ্যান্ড কোংটা মিস্টার ক্রালারকে। ক’দিন আগে বাপির সঙ্গে যখন সন্ধ্যাবেলায় বাড়ির সামনে বেড়াতে গিয়েছিলাম তখন বাপি

হঠাৎ আমাকে বলল যে, এ বাড়ি ছেড়ে আমরা শীঘ্রই একটা ‘গুপ্ত-আবাস’-এ যাচ্ছি। গুপ্ত-আবাস! সেটা আবার কী? কেন? কোথায়? সে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতেই বাপি বলল, ‘হ্যাঁ, আনা। তুই তো জানিস প্রায় বছর-খানেক ধরে আমরা অনেক-অনেক ইহুদি-পরিবারকে খাদ্য-পোশাক বা নানান জিনিসপত্র পাঠিয়ে যাচ্ছি—বিশেষ করে যেসব পরিবারের রোজগারে ছেলটাকে নাৎসি গেস্টাপো ধরে নিয়ে গেছে—যারা হঠাৎ অসহায় হয়ে পড়েছে! কিন্তু এখন আমাদের নিজেদের নিরাপত্তার কথা ভাবতে হচ্ছে। ওরা ইতিমধ্যে আমার ব্যবসাতাকে কেড়ে নিয়েছে; কিন্তু আমরা এখনো স্বাধীন আছি। আমি চাই না ওরা আমাদের ওই aktion-এ ধরে নিয়ে যায়। তার আগেই আমরা সপরিবারে আত্মগোপন করব।’

আমি বলি, ‘কিন্তু বাপি, আমরা পালাব কোথায়? কবে?’

বাপি বললে, ‘তুই ঘাবড়াস না। আমরা সব ব্যবস্থা করে ফেলেছি। যে-ক’দিন মুক্ত পৃথিবীতে আছিস সে-কদিন তোর কৈশোর-কালটায় প্রাণভরে নিশ্বাস নিয়ে নে।’

ব্যস! আর কোনো কথা হলো না। কোথায়, কীভাবে, কবে—কিছুই বলল না বাপি।

হে ঈশ্বর! স্বেচ্ছাবন্দিত্বের জীবনের দিনগুলো আসতে যেন অনেক—অনেক দেরি হয়। ইতি তোমার আনা।”



পীটার ভাঁ ভ্যান

পাঁচ তারিখ বিকাল তিনটের সময় আমি আর এডিং দুজনেই বাড়ির বাইরে গেছি। এডিং গেছে মিস্টার ভাঁ ড্যানের বাড়ি। ওঁরা স্বামী-স্ত্রী আর ওঁদের একটি ছেলে—পিটার—আমাদের সঙ্গে গুপ্ত আবাসে আশ্রয় নেবেন, এমন কথা হয়েছে। ভাঁ ড্যান দীর্ঘদিন আমার কারবারে আছেন।

ঠিক তিনটের সময় বাড়িতে কলবেল বাজল। মার্গট সদর দরজা খুলতেই এস. এস. পিয়নটা হাঁকাড় পাড়ে : হেইল হিটলার!

প্রত্যাভিবাদনে কী বলতে হয় মার্গটের জানা নেই। তাই সে শুধু হকচকিয়েই ওঠে না, ভয়ে একেবারে দেয়ালের সঙ্গে সিঁটিয়ে যায়। পিয়নটা ওর নাকের ডগায় বাড়িয়ে ধরে

একটা চিঠি আর পিয়নবুক। চিঠিটা আমার নামে। ও সেই করে নিল ‘ফর’ দিয়ে। খুলে দেখতে গেল—কিন্তু ছোকরা আবার চিকুড় পাড়ে : হেইল হিটলার।

পিয়নটা চলে যাবার পর খামটা খুলে পড়ল। তাতে লেখা আছে স্বেচ্ছায় শ্রমদানের প্রয়োজনে...ডাকা হচ্ছে...সোমবার ছয়ই জুলাই...কমান্ড্যান্টের অফিসে রিপোর্ট করতে হবে...একটা সুটকেসে ব্যক্তিগত জামাকাপড়, টুথব্রাশ ইত্যাদি...

বাকিটা পড়তে পারেনি মার্গিট। দেওয়াল ধরে ধরে বসে পড়ে।

আনা ছিল কিছু দূরে। একটা ইজিচেয়ারে শুয়ে কী একটা বই পড়ছিল। এগিয়ে এসে বলে, কী হয়েছে রে মার্গিট? কার চিঠি?

—বাবাকে আগামীকাল রিপোর্ট করতে বলেছে! ওকে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে পাঠাবে!

আনা বজ্রাহত! চিঠিখানা সে পড়েও দেখেনি। দিদির কথাই মেনে নিয়েছে। খামের উপর আমার নাম লেখা থাকায় মার্গিট স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি যে, আমাকে নয়, তাকেই কাল সকালে রিপোর্ট করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ফলে দুই বোনের বাকি সময়টা শুধু কান্নায় বুকভাসানো ছাড়া আর কোনো কিছু করণীয় ছিল না। এভাবে নোটিস দিয়ে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে যোগদান করতে বলার যে কী অর্থ তা ওরা দু’বোনই জানে।

সন্ধ্যাবেলায় ফিরে এল এডিৎ। সঙ্গে মিস্টার ভাঁ ড্যান। তিনি চিঠিটার পাঠোদ্ধার করে বলেন, তোমরা চিঠিখানা পড়েও দেখনি এতক্ষণ! আশ্চর্য! ওরা কী আদেশ করেছে? হের অটো ফ্রাঙ্ক নন, তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা মার্গিটকে ডেকে পাঠানো হচ্ছে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে।

এডিৎ অস্ফুট আত্ননাদ করে ওঠে, সে তো অসম্ভব কথা! মার্গিট তো নাবালিকা! কোথাও কিছু ভুল হয়েছে নিশ্চয়।

ভাঁ ড্যান বলেন, ‘টাইপিং মিস্টেক’ ক’বার হয়? মার্গিটের নাম, বয়স, ম্যারিটাল স্ট্যাটাস, বাপের নাম সবই ভুল?

একটু পরেই এসে গেলাম আমি। তৎক্ষণাৎ পরিবর্তিত প্রোগ্রাম ছকে ফেলি। ওরা বেমক্লা দাবার ছকে কিং পনটাকে দু-ঘর এগিয়ে দিয়েছে। দিক। আমরাও রাতারাতি কাস্পিংটা সেরে ফেলব। কাল সকালেই আমরা চলে যাব আমাদের গুপ্ত আবাসে। সকাল সাতটায় একটা সুটকেস হাতে এডিৎ যাবে প্রথম স্ট্রিট-কার ধরে। একঘণ্টা মার্জিনে মার্গিট যাবে তার সাইকেলে। একই সঙ্গে রওনা হবে আনা, পদব্রজে। সে পৌঁছাবে আধঘণ্টা পরে। আমি যাব বেলা নয়টায়। যাতে আমরা চারজনই একতলায় অফিস খোলার আগেই একে একে নিরাপদ গুপ্ত-আবাসে আশ্রয় নিতে পারি। একা একা গেলে কারও নজরে পড়বে না। হের ভাঁ ড্যান তার স্ত্রী-পুত্রকে নিয়ে দিনসাতক পরে আসবে। কারণ ওদের একেবারে শিরে সংক্রান্তি অবস্থা হয়নি।

এডিং আর মার্গট দুজনেই ভেঙে পড়েছে। স্নায়বিক দৌর্বল্যে। কিন্তু আনা বুদ্ধিবশীল হয়ে পড়েনি। ভাঁ ড্যান একটি সুটকেস বোঝাই করে তখনই রওনা দিলেন—আমাদের জামাকাপড় এবং কিছু দৈনন্দিন ব্যবহারের জিনিসপত্র নিয়ে। টেলিফোনে ডেকে পাঠানো হলো ফ্রাউ সিয়েরা ভাঁ সাত্তেকে। সঙ্গে এলেন তার স্বামী হেক্স ভাঁ। রাত তখন এগারোটা। ওরা দুজনও গাড়ি করে দু-সুটকেস মাল পাচার করল। রাতে খাওয়া-দাওয়ার প্রশ্নই উঠল না। এডিং আর মার্গট যে যার বিছানায়। আমি আর আনা রাত সাড়ে বারোটা পর্যন্ত গোছগাছ করলাম। আনার একটা পোষা বেড়াল ছিল—মুংজে! তাকে রেখেই যেতে হবে। উপায় নেই। তার জন্য রান্নাঘরে কিছু মাংস রেখে যাওয়া হলো। সব কাজ শেষ হলে আমি একটা চিঠি লিখতে বসি। চিঠিটা যেন আমাকেই লেখা! কে লিখছেন বোঝা যাচ্ছে না। লেখা চিঠিখানা চারটুকরো করে ওয়েস্ট-পেপার বাল্কেটে ফেলে গেলাম কিছু অংশ। বাকিটা পুড়িয়ে ফেলি। সেগুলি জোড়া দিয়ে দিয়ে পাঠোদ্ধার করতে পারলে মনে হবে আমার কোনও শুভানুধ্যায়ী বন্ধু এবং নাৎসি এস. এস.-এর কোনও বিশ্বাসঘাতক ঘুষ নিয়ে আমাদের চারজনকে রাতারাতি বেলজিয়ান বর্ডার দিয়ে সুইৎজারল্যান্ডে পাচার করে দিয়েছে। চিঠি যখন শেষ হলো রাত তখন একটা। আনার চোখ তখন ঢুলুঢুলু। এগিয়ে এসে বললে, কাকে এখন চিঠি লিখছ বাপি?

বলি, একটা ‘জিগ্‌স পাজল’-এর সমাধান কর দেখি। বল, এই কাগজের টুকরোগুলো মিলিয়ে, পত্রলেখক কী বলতে চেয়েছে?

এক লহমায় ওর ঘুম ছুটে গেল। ‘জিগ্‌স’ ধাঁধায় আনা দারুণ দড়। মিনিট দশেকের মধ্যে সে যে সমাধানটা করে ফেলল তা এইরকম:

প্রিয় হের ফ্রাঙ্ক,

“আপনার আবেদন মোতাবেক পত্রবাহক মাথা পিছু পঞ্চাশ হাজার ডয়েশমার্ক মোট কু যে গাড়িতে পাচার করা হবে সেটি মেজরের বেলজিয়ান বর্ডার সীমান্তে। সেখান থেকে সুইৎজার সোনাদানা বা গহনাগাটি যেন সঙ্গে না

সমাধানে পৌঁছেই আনা বলে, একসেলেন্ট! ওরা অনেক মেহনত করে এইটুকুই বুঝতে পারবে। ভাববে আমরা মোটা ঘুষ দিয়ে জার্মান বিশ্বাসঘাতকদের মাধ্যমে আমস্টার্ডাম ছেড়ে পালিয়ে গেছি। চারজনেই!

আমি বলি, রাত প্রায় একটা। এবার শুয়ে পড়। কাল খুব ভোরে উঠতে হবে, কিন্তু।

ও উঠে দাঁড়ায়। চলতে গিয়েও ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে, বাপি?

—কিছু বলবি?

মুখটা নিচু করে দাঁত দিয়ে নখ খুঁটতে খুঁটতে বলে, তুমি বুঝতে পেরেছ, কেন তোমাকে ‘সামন’ না করে মার্গটিকে ওরা ডেকে পাঠিয়েছে?

চমকে উঠে বলি, এতক্ষণ ধরতে পারিনি। তোর কথাতে মনে হচ্ছে...

—হ্যাঁ! তাই! এটা হ্যাংলাথেরিয়ামের কীর্তি। সে প্রতিশোধ নিচ্ছে। মার্গটের উপর।

—প্রতিশোধ! কিসের প্রতিশোধ?

—তুমি সোজা কথা বুঝতে পার না কেন? কাল বরং মার্গটিকেই শুধিয়ে দেখ। সে বলতে রাজি না হলে মাম্মিকে। মাম্মি বুঝতে পারবে হ্যাংলাটা দিদির কাছে কী চেয়েছিল।

বুঝতে পারি ব্যাপারটা! কী সংঘাতিক ছেলে ওই বাস্টার্ড হ্যাংলাথেরিয়াম! হাতের কাছে পেলে ওর নাকটা গুঁড়িয়ে দিতাম।

আমরা যখন গুপ্ত আবাসে অজ্ঞাতবাস শুরু করি তখন হিটলারের সৌভাগ্যসূর্য মধ্যগগনে। ইংলিশ চ্যানেল থেকে মস্কোর দ্বারদেশ, উত্তর মেরু থেকে আফ্রিকার সমস্ত উত্তরাঞ্চল তখন ফ্যুরারের পদানত। লন্ডনে শহরবাসী তখন টিউব-রেলের সুড়ঙ্গের ভিতর রাত কাটায়। ব্রিটিশ-আইলস্-এর জল আর ডাঙা তখনো চার্চিল আঁকড়ে ধরে আছে, কিন্তু সারা আকাশে লাফতায়ের দাপট। হের গোয়েরিঙের একশখানা বম্বারের বিরুদ্ধে আর. এ. এফ. পাঁচখানা বিমানও আকাশে তুলতে পারে না। তখনো আমরা বুঝতে পারিনি, সূর্য মধ্যগগনে কখনো চিরস্থায়ী হয় না। এবার সে অনিবার্যভাবে পশ্চিমে ঢলবে। কষ্ট হতো, তবু হিটলারের ওই কথাটা অবিশ্বাস করতে পারতাম না : নাৎসি জার্মানির থার্ড রাইশ্ হাজার বছর ইয়োরোপে প্রভুত্ব করবে!

ক্ষমতায় এসেই হিটলার তার ইহুদিনিধন-যজ্ঞ শুরু করে দিয়েছিল। না, জাতিবিদ্বেষের কারণে নয়, আর্য-অনার্য থিওরিতে নয়—শুধুমাত্র ইহুদিজাতির বিরাট বৈভব আত্মসাৎ করার অসং উদ্দেশ্যে। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি ডলারের সম্পত্তি ফেলে রেখে আমরা পালিয়ে এসেছি। ফ্যুরার আর তার নাৎসি ডাকাতগুলো তা দখল করেছে। শুধু তাই নয়—যারা পালাতে পারল না তাদের হিটলার করল ক্রীতদাস। শিশু, বালক-বালিকা বা বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের সরাসরি পাঠিয়ে দিল গ্যাস-চেম্বারে। না পাঠাবে কেন? তারা খাবে অথচ খাটতে পারবে না। সুস্থ সবল নর-নারী নানান কারখানায় কাজ করে চলুক—যতক্ষণ তারা অসুস্থ, পঙ্গু বা অকর্মণ্য হয়ে না পড়ে। শ্রমদান শেষ হলে তাদের প্রাণদান করতে হবে।

হিটলারের গ্যাস-চেম্বারের নিদারুণ কাহিনী যুদ্ধকালে অত্যন্ত গোপন রাখা হয়েছিল। যুদ্ধান্তে অনেকে এসব কথা বিশ্বাসই করতে চায়নি। পঞ্চাশ-ষাট লক্ষ ইহুদি অপ্রতিবাদে প্রাণ দিল। কারণ প্রতিবাদ করলে কী হয় তা নাৎসিরা বন্দিদের ভাল করে বুঝিয়ে দিয়েছিল। কখনো কখনো বন্দিশালায় কোনো ইহুদি যুবক ক্ষেপে গিয়ে হয়তো

এস. এস. সোলজারকে দৈহিক আক্রমণ করেছে। আচমকা ঘুষি মেরে বসেছে, অথবা তার কোমর থেকে রিভলভার ছিনিয়ে নিতে গেছে। সেক্ষেত্রে নাৎসি সোলজার কখনো তাকে প্রাণে বধ করত না। তার পায়ে গুলি করত। কারণ প্রতিবাদের শাস্তি ছিল দু-জাতের : ‘স্ট্যাভিং স্যালুট’ অথবা ‘হ্যান্ডিং দ্য টেনথ্ নিগার’।

দণ্ডায়মান মৃত্যুর আদেশ হলে ক্যাম্পের প্রবেশপথে তাকে একটা কাঠের খাঁচায় ঢুকিয়ে দেওয়া হতো। খাড়াই-এ সেটা পাঁচফুট আর লম্বা-চওড়া দু-ফুট করে। লোকটাকে বাগানের ওই মাথাখোলা খাঁচায় দাঁড় করিয়ে দিয়ে খাঁচার তালা বন্ধ করে দেওয়া হতো। তার মাথাটা খাঁচা থেকে বেরিয়ে থাকত—মুখে তুলো গোঁজা, ঠোঁট দুটো প্লাস্টার করে সীল করা—যাতে তার আত্ননাদে ক্যাম্পের কর্মব্যস্ততায় কোনো ব্যাঘাত না ঘটে। লোকটাকে আমৃত্যু কোনো খাদ্যপানীয় দেওয়া হতো না। দণ্ডায়মান মৃত্যু তার অবধারিত নিয়তি। সে বসতে পারত না। শোয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। তার মলমূত্রাদি হোস-পাইপ দিয়ে ধুয়ে দেওয়া হতো যাতে আর্য়-ক্যাম্পের বাতাস পুতিগন্ধময় না হয়ে ওঠে। এই স্ট্যাভিং স্যালুটের ডেথ চেম্বারগুলি সচরাচর খাড়া করা হতো মূল প্রবেশদ্বারের দু’পাশে। যাতে অন্যান্য বন্দিরা প্রতিদিন সার বেঁধে যাতায়াতের পথে দেখতে পায় লোকটার যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু। সচরাচর দু-তিন সপ্তাহ পরে মৃতদেহটা অপসারণ করা হতো। এই ‘স্ট্যাভিং-স্যালুট’-এর বীভৎসতা ভুলবার নয়।

দ্বিতীয় শাস্তির নাম : ‘হ্যান্ডিং দ্য টেনথ্ নিগার’!

এ ক্ষেত্রে অপরাধীকে সাক্ষী রেখে, হাত-পায়ে শিকল দিয়ে, নয়জন ইহুদি বন্দির র‍্যাঙ্কম সিলেকশনে গুলি করে হত্যা করা হতো। অপরাধীকে বলা হতো : এই নয়জনের মৃত্যুর জন্য সে দায়ী! তারপর হাত-পা বাঁধা অবস্থায় অনাহারে তাকে ফেলে রাখা হতো ফাঁসিমঞ্চের উঠানে। সচরাচর তিন দিন। চতুর্থ দিন সমস্ত বন্দির সমবেত করা হতো ফাঁসিমঞ্চের ময়দানে। তাদের রোলকল শেষ হলে তাদের চোখের সামনে ওই অনাহারক্লিষ্ট লোকটাকে ফাঁসি দেওয়া হতো।

তাই প্রায় পৌনে এককোটি জুডেনবাচ্চা বিনাপ্রতিবাদে প্রাণ দিয়েছে! তবে শুনেছি, বিশ্বযুদ্ধের ঠিক আগের বছর একটা উদ্ধত ইহুদি যুবক কী একটা প্রতিবাদ করেছিল। জার্মানিতে নয়, পারীতে। আমরা আমস্টার্ডামে বসে সব খবর পাইনি। গুজবে শুনেছি; সেই ছোকরার অবিম্যাকারিতায় পরের সপ্তাহে গোটা জার্মানিতে নাকি দশ হাজার ইহুদিকে প্রাণ দিতে হয়। সে ঘটনার একটা বিচিত্র নামও আছে। কেন এই নামকরণ তা আমার জানা নেই। তাকে নাকি বলে : ‘স্ফটিক রজনী’—‘ক্রিস্টাল নাইট’! সেই ইহুদি ছোকরা কেন যে ক্ষেপে গিয়ে....

এস্টার বেইল (বের্তা) [Ester Beile (Berta)] :

এক্সকিউজ মি, হের ফ্রাঙ্ক! আপনি বোধহয় আপনার অধিকারের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন। আপনি বিশিষ্ট ধনী ব্যবসায়ী। দীর্ঘ একানব্বই বছর দুনিয়াদারী করেছেন, ফ্রাঙ্কফুর্টের একজন নামকরা নাগরিক এবং কন্যার পরিচয়ে বিশ্ববিখ্যাত! সবই মানছি। তুলনায় আমি হ্যানোভারের এক সামান্য দরজির অনুচা আত্মজ। নুন-আস্তে-পাস্তা-ফুরানো সংসারে দিনগুজরান করেছি জীবনের পঁচিশটা বছর। জীবন শেষ করেছি ঘেটোয়, কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প আর গ্যাস-চেম্বারে। আপনার মতো সৌভাগ্য আমার হয়নি। খাস জার্মানি থেকে নাৎসি অত্যাচারের আগেই পালিয়ে হল্যান্ডে আশ্রয় নেওয়া, অথবা হল্যান্ড থেকে পালিয়ে গুপ্ত-আবাসে। আপনার লক্ষ-লক্ষ ডলারের সম্পত্তি খোয়া গেছে, স্ত্রী ও দুই কন্যাকে হারিয়েছেন। অসীম দুঃখ পেয়েছেন। সেজন্য আমার সহানুভূতি জানাই। কিন্তু ওটা আপনি ঠিক বলেননি—‘ষাট-সত্তর লক্ষ ইহুদি বিনা-প্রতিবাদে প্রাণ দিয়েছে।’ না, আপনি জানেন না ওদের প্রতিবাদী স্বরূপটা।

কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে, ঘেটোয়, ইউরোপের অধিকৃত অঞ্চলে নিরস্ত্র ইহুদিরা বারে বারে বিদ্রোহ করেছে। সশস্ত্র নাৎসি সৈন্যদের আক্রমণ করেছে। সবচেয়ে বড় অভ্যুত্থান হয় ট্রেন্সিলভা মৃত্যুশিবিরে, দোসরা আগস্ট 1943-এ। নিরস্ত্র, অনশনক্লিষ্ট ইহুদি বন্দিরা একযোগে আক্রমণ করে এস. এস. গার্ডদের কজা করে ফেলে। শিবিরের সাতশ বন্দির মধ্যে চারশজন পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ডঃ জুলিয়ান কোরাজস্কি (Dr. Julian Chorazycki)। সবিরর ক্যাম্পের বিদ্রোহে অনাহারক্লিষ্ট নিরস্ত্র বন্দিরা অতর্কিত আক্রমণে একজন এস. এস. গার্ডকে পরাস্ত করে তার আগ্নেয়াস্ত্র কেড়ে নেয়। তারা এগারোজন গার্ডকে হত্যা করে (14. 10. 1943)। আউসউইৎজ-এর ক্রিমটোরিয়াম চুল্লিটা বোমা মেরে উড়িয়ে দেয় (7. 10. 1944)। বিয়ালিস্ক আর ওয়ারসতে ঘেটোর বাইরে থেকে সাধারণ নাগরিক আক্রমণ করে বহু ইহুদিকে মুক্ত করে দেয়। এছাড়াও ইউক্রেন অঞ্চলে তুচিন, মীর, মিনকা শিবিরে, সোবিবর, ত্র্যাকাও ক্যাম্পে সশস্ত্র বিদ্রোহ হয়েছিল।

কৌতূহল থাকলে আপনি পাবলিকেশনস ইন্টারন্যাশনাল কর্তৃক প্রকাশিত হলোকস্ট গ্রন্থের 471 পৃষ্ঠার একটি অধ্যায় পড়ে দেখতে পারেন : Jewish revolts in Ghettos & Camps. 1941-1944।

আপনি যেটাকে ‘স্ফটিক রজনী’ বলেছেন হের ফ্রাঙ্ক—যার কারণে পরবর্তী সপ্তাহে গোটা জার্মানিতে দশ হাজার ইহুদিকে প্রাণ দিতে হয়েছিল, সেটার জন্য আমিই—হ্যাঁ, হ্যানোভারের এই নগণ্য দর্জির কন্যা, বের্তাই একান্তভাবে দায়ী। আপনি যাকে ‘অবিম্ব্যাকারিতা’ বলেছেন সে-জাতের কাজ আমি জীবনে দু-বার করেছিলাম—দশ

বছর আগে-পিছে। আমার শাস্তি তো হয়েই গেছে, ‘তথাকথিত পাপের’ শাস্তি—গ্যাস-চেম্বারে দমবন্ধ হয়ে প্রাণত্যাগ; কিন্তু আজও আমি বিশ্বাস রাখি যে, দুবারই আমি ‘নট-গিলটি’ ছিলাম। জ্ঞানত, ধর্মত আমি কোনো অন্যায় করিনি। একে একে বলি।

আমরা গ্রীনস্প্যানরা (Grynszpan) আট ভাই-বোন। আমি চতুর্থ আর হার্সেল (Herschel) আমার চেয়ে পাঁচ বছরের ছোট। বাকি ছয় ভাই-বোনই অকালে মারা যাওয়ায় আমরা এই দুই-ভাইবোন ছিলাম পরস্পরের মনের খুব কাছাকাছি। বাপির ছিল দর্জির দোকান, মার নানান সংসারের কাজ। মনে কোনো প্রশ্ন জাগলেই ছোটভাই হার্সেল ছুটে আসত তার দিদির কাছে। একদিন—তখন ওর বয়স বছর-সাতেক—স্কুল থেকে ফিরে এসে ও আমাকে শুধালো, বের্তা, (আমরা পাঁচ বছরের বড় দাদা-দিদিকেও নাম ধরেই ডাকি, সেটাই আমাদের রেওয়াজ) আজ ফাদার স্ক্রাফার্স আমাদের ক্লাসে বললেন যে, যীসাস নাকি নির্দেশ দিয়েছেন : ‘কেউ যদি তোমার এক গালে চড় মারে, তাহলে তুমি তার দিকে তোমার অপর গালটি বাড়িয়ে দেবে।’—এ-কথা সত্যি? যীসাস তাই বলেছিলেন?

আমি ওকে বলি, হ্যাঁ, তাই তো শুনেছি। তাই লেখা আছে বাইবেলে!

—কিন্তু আমরা তো যীসাসকে মানি না, আব্রাহাম, ডেভিড অথবা মোজেসকে মানি, তাই না?

যে সময়ের কথা তখনো বাস্টার্ডটা রাইফ্‌স্ট্যাগ দখল করেনি। হ্যানোভারে খ্রিস্টান এবং ইহুদির সম্মান একই স্কুলে পড়াশুনা করত। আমি হার্সেলকে বুঝিয়ে বলি, তা কেন? যীসাসকে আমরা ঈশ্বরপুত্র বলে মানি না, কিন্তু তাঁকে মহামানব বলে নিশ্চয়ই মানি। তাহলে তাঁর উপদেশ মানব না কেন?

—তার মানে; আমাদের ক্লাসের কেউ যদি আমার এক গালে ঠাস করে...

আমি ওকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বলেছিলাম : শোন হার্সেল! প্রতিটি কাজ করতে হবে নিজের বিবেকের নির্দেশে। মহামানবেরা যেসব উপদেশ দিয়েছেন তা আমরা শুনব। বুঝে নেবার চেষ্টা করব। তারপর নিজ বুদ্ধি-বিবেচনা মতো কাজ করব। কেউ হয়তো তোকে রাগের মাথায় একটা চড় মেরে বসেছে। তারপর সে অনুতপ্ত। লজ্জায় তোর কাছে ক্ষমা চাইতে পারছে না। হয়তো সমানে-সমানে লড়ে গেলে তুই তাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিতে পারিস—সেক্ষেত্রে যীসাস-এর উপদেশটা তুই মেনে নিবি। দেখবি, দ্বিতীয় গাল বাড়িয়ে দেওয়ার পর সে তোর সে-গালে চুমু খাবে।

—কিন্তু লোকটা যদি আদৌ অনুতপ্ত না হয়?

—তখন মনে রাখিস : অন্যায় করা আর অন্যায় সহ্য করে যাওয়া একই অপরাধের এপিঠ-ওপিঠ। একটা ঔদ্ধত্যের প্রকাশ, অপরটা ভীরুতার।

বলুন আপনারা? আমি কী অন্যায় শিক্ষা দিয়েছিলাম?

দ্বিতীয় ঘটনাটা এর দশ বছর পর : অক্টোবরের শেষদিন, 1938। বাস্টার্ডটা তার আগেই ফন হিভেনবার্গকে তাড়িয়ে রাইখ্‌স্‌ট্যাগ দখল করেছে। জার্মানির একনায়কতন্ত্রী সর্বেসর্বী ফ্যুরার হয়ে বসেছে। শুরু হয়ে গেছে তার ইহুদি-নিপীড়ন কার্যক্রম। আমি সেদিন আমার ছোটভাইকে একখানা চিঠি লিখি—পোল্যান্ডের জবনসিন্‌ (Zbonszyn) কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প থেকে। চিঠিখানির ছব্ব অনুবাদ করে দিলাম :

প্রিয় হার্সেল,

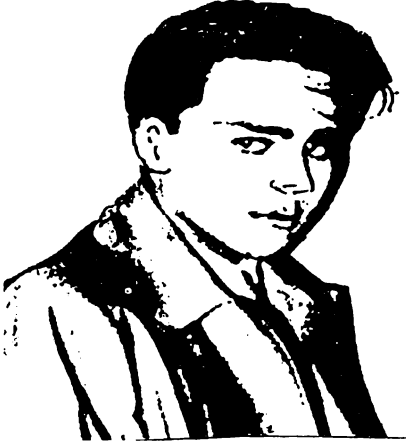
হয়তো খবরের কাগজে হ্যানোভারের এই খবরটা ইতিমধ্যেই জেনেছিস। সংক্ষেপে ব্যাপারটা আবার জানাই। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকেই একটা গুজব শোনা যাচ্ছিল যে, হ্যানোভার থেকে পোলিশ জুদের তাড়িয়ে দেওয়া (expel করা) হবে। আমাদের কারও সেটা বিশ্বাস হয়নি। রাত নটা নাগাদ একজন পুলিশ অফিসার এসে আমাদের জানাল যে, এখনি আমাদের বাড়ির তিনজনকে পাসপোর্টসহ থানায় রিপোর্ট করতে হবে। কেন — কী বৃত্তান্ত কিছুই বলল না। পুলিশ স্টেশনে গিয়ে দেখি লোকে লোকারণ্য—সবাই ইহুদি। আমরা পৌঁছানোমাত্র আমাদের ট্রাকে চাপিয়ে টাউন হলে নিয়ে যাওয়া হগে। কেউ কিছু বলেনি, কিন্তু আন্দাজে বুঝলাম আমাদের জন্মভূমি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। বাপি একজন পুলিশ অফিসারকে প্রশ্ন করায় সে বাপির নাকের ডগায় নাৎসি জার্মানির একটা ছাপানো অর্ডার ধরিয়ে দিল। গোটা হ্যানোভার শহরকে অক্টোবরের উনত্রিশ তারিখের মধ্যে ইহুদিমুক্ত করার নির্দেশ। অনেক কাকুতি-মিনতি করায় ওরা আমাদের তিনজনের মধ্যে একজনকে বাড়ি ফিরতে দিল—পুলিস প্রহরায়। আমি এক সুটকেস বোঝাই জামাকাপড় ইত্যাদি নিয়ে আবার টাউন হলে ফিরে গেলাম। অনেক হাতে-পায়ে ধরায় একজন এস. এস. আমাকে জানাল যে পরদিন আমাদের তিনজনকে লডজ্‌ (Lodz) ঘেটোয় নিয়ে যাওয়া হবে। আমাদের কারও কাছে একটা পয়সা নেই। তুই কি লডজ্‌ ঘেটোর ঠিকানায় আমাদের কিছু পাঠাতে পারবি? আমাদের তিনজনের ভালবাসা নিস।

ইতি বের্তা।*

ওই চিঠিখানা লেখাই নাকি আমার অপরাধ। এরপরে হার্সেল কী করেছে তা আর আমি জানতে পারিনি। তার কোনো অর্থসাহায্য আমরা কেউই পাইনি। লডজ্‌ ঘেটো থেকে এলাম একটা কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে। সেখানে এস. এস. নির্বাচনে বাবা-মার কাছ থেকে পৃথক হয়ে গেলাম। তারপর...থাক সেসব বিস্তারিত বিবরণ...এক বছরের ভিতর গ্যাস-চেম্বার!

[লেখকের সংযোজন : Publications International Ltd কর্তৃক প্রকাশিত *Crystal Night* গ্রন্থপাঠে জানতে পারি বেতার এই জ্বলন্ত দেশলাই কাঠিতে বারুদস্তুপে কী প্রচণ্ড অগ্নিকাণ্ড হয়েছিল।

হার্সেল দিদির চিঠিখানি হাতে পায় চৌঠা নভেম্বর, ১৯৩৪। বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার এক বছর আগে। সে তখন পারীতে। হ্যানোভার কলেজ থেকে দুর্দান্ত রেজাল্ট করে ফরেন স্কলারশিপে সে পারীতে পোস্টগ্র্যাজুয়েশন করতে এসেছে। থাকে হস্টেলে। এই



[হার্সেল — সতেরো বছর বয়সে তার দিদির তোলা আলোকচিত্র অবলম্বনে]

চিঠি পাওয়ার আগেই সে বেতারে শুনেছে জার্মানির অনেক শহর থেকে ইহুদিদের তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। বাড়ির জন্য ওর একটা দুশ্চিন্তা ছিলই। বাবা হাঁপানির রুগী, মা বাতে পঙ্গু। দিদিই একা হাতে সেলাইকল চালিয়ে সংসারটাকে কোনোরকমে খাড়া রেখেছে। সকলেই তার মুখ চেয়ে বসে আছে। কবে হার্সেল ডিগ্রি নিয়ে ফিরবে—ডিগ্রি হোক না হোক একটা চাকরি নিয়ে। কিন্তু আপাতত তাকে কিছু টাকা পাঠাতে হবে লডজ্

ঘেটোয়। দু-তিন শ ফ্রাঁ ওর কাছেই ছিল; বন্ধুর কাছ থেকে কিছু ধারও করল। তারপর গিয়ে দেখা করল পারীর সিনাগগে র্যাববাই-এর সঙ্গে। জ্ঞানবুদ্ধ মহাধার্মিক মানুষ। চিঠিখানা পড়ে তিনি ছেলেমানুষের মতো কেঁদে ফেললেন। হার্সেল তাঁর পরিচিত, স্নেহধন্য। তাকে বললেন, শোন বাবা, লডজ্ যেটো জার্মানিতে নয়, পোল্যান্ডে। তার ঠিকানা আমার জানা। কিন্তু এ তথ্যটাও জানা যে, সেই যেটো কমান্ডান্ট-এর ‘কেয়ার’-এ এ পর্যন্ত কোনও মানি-অর্ডার পৌঁছায়নি। তা কমান্ডান্ট সই করে গ্রহণ করে, প্রাপকের কাছে টাকাটা যায় না। কোনও খামের ভিতর যদি টাকা পাঠাও, ওরা নির্বিচারে খাম খুলে টাকাটা বার করে নেবে—চিঠিখানা প্রাপককে দেবে কিনা সেটা তার মর্জি!

হার্সেল বিহুলের মতো বলেছিল আমি....আমি....এখন তাহলে কী করব?

বৃদ্ধ উর্ধ্ব আকাশের দিকে দশ সেকেন্ড নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকেন। তারপর ওর মাথায় হাত রেখে বললেন, ওঁদের আত্মার জন্য শান্তি কামনা কর বাবা। প্যালেস্টাইনে যাওয়া তো সম্ভবপর নয়, চল আমার সঙ্গে—সিনাগগের ভিতর। সেখানে তোমাকে আমি খাদিশ পড়িয়ে দেব—মৃত-আত্মাত্রয়ীর শান্তিকামনায়।

বজ্রাহত হয়ে গেল হার্সেল। মিনিট পাঁচেক পরে সে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায়। বলে, আগে খবরটা পাই যে, ওরা তিনজনই....

র‍্যাক্সাই বললেন, খবর কোনোদিনই পাবি না, বাবা। তবে একবছর পরে খাদিশটা পাঠ করে যাস! না হলে ওঁদের আত্মা কোনোদিন শান্তি পাবে না।

চারদিন পরে সাত তারিখ সকালে হার্সেল তার সাইকেলে চেপে চলে এল পারী-শহরের রুদো লাইল-এর প্রকাণ্ড একটা বাড়ির সম্মুখে। এটাই পারীতে জার্মান এম্বাসী। সাইকেলটা লক করে সে এগিয়ে গেল বাড়িটার দিকে। তাকে রুখে দিল ফ্রাঁসোয়া অট্রে—দাররক্ষক। বললে, কাকে চাই? কী চাই?

—আমি জার্মান এম্বাসীর কোনো বড় অফিসারকে একটা গোপন এবং জরুরি দলিল হস্তান্তর করতে চাই।

ফ্রাঁসোয়া ওর আইডেন্টিটি কার্ড দেখতে চাইল—বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত। ওর পাসপোর্টও দেখে নিল। বলল, দ্বিতলে হের নাগোর্তার সঙ্গে দেখা করুন।

নাগোর্তা ওর গোপন দলিলটা দেখতে চাইলেন। হার্সেল অস্বীকার করল। বলল, কোনো উচ্চমহলের অফিসার ছাড়া সে খামটা দেখাবে না। নাগোর্তা বললেন, সে-ক্ষেত্রে তোমাকে পাসপোর্টটা জমা রেখে যেতে হবে। আমি অবশ্য রসিদ দেব। দেখা করে যখন ফিরে যাবে তখন পাসপোর্টটা ফেরত পাবে।

—অলরাইট। এই নিন।

হার্সেল দর্শনার্থীর ফর্মে নিজের নাম লিখে ভিতরে পাঠাল। নাম, পরিচয়, পাসপোর্ট নম্বর সবই ঠিক আছে। 'উদ্দেশ্য কী?' যেখানে জানতে চাওয়া হয়েছে সেখানে লিখল : গোপনীয়।

একটু পরেই ওর ডাক পড়ল ভিতরে। হার্সেল নেমপ্রেটে দেখে নিয়েছে এম্বাসীর ইনি থার্ড সেক্রেটারি : এর্নস্ট য়োম রথ (Ernst vom Rath)।

সেক্রেটারি ওকে বসতে বললেন না। আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বললেন, তোমাকে কে পাঠিয়েছেন?

—আমার বাবা। হ্যানোভার থেকে।

—তোমার বাবা! কে তিনি? আমার সঙ্গে তাঁর কী দরকার?

—না, দরকারটা তাঁর নয়। আমার। আমি জানতে এসেছি কোন অপরাধে নাৎসি সরকার আমার বৃদ্ধ বাবা-মা আর দিদিকে হ্যানোভার থেকে তাড়িয়ে পোল্যান্ডের ঘেটোয় পাঠিয়েছে?

থার্ড সেক্রেটারি ত্রিঃ করে উঠে দাঁড়িয়েছেন : তুনি জুডেন?

—জুডেন নয়, ধর্মে আমি জিওনিস্ট। আমি জার্মান।

থার্ড-সেক্রেটারি বিদ্যুৎগতিতে হাত বাড়িয়ে কলবেলটা বাজালেন। তৎক্ষণাৎ সশস্ত্র রক্ষী ঘরে ঢুকল। কিন্তু ওঁরা দুজনেই দেখলেন ততোধিক দ্রুতগতিতে আগন্তকের হাতে এসে গেছে একটা পিস্তল। সে বলল, ‘যে একচুল নড়বে সেই প্রথম গুলিটা খাবে কিন্তু।’

ঘটনাচক্রে থার্ড সেক্রেটারি আর তাঁর দেহরক্ষী ওর একই দিকে। পিস্তলের লক্ষ্য-মুখের দিকে। হার্সেল বলে ওঠে, তিনটে বুলেট আপনার পাওনা। তিনজনই জুড়েন। এই নিন—এটা বাবার, এটা মার, আর এটা দিদির।

তিন-তিন বার গর্জন করে উঠল ওর হাতের পিস্তলটা। তখনও তার গর্ভে আরও তিনটি তাজা বুলেট। কিন্তু হার্সেল তা দিয়ে ওই দেহরক্ষীটাকে মারেনি। তার দিকে পিস্তলটা ছুঁড়ে দিয়ে বলেছিল : নাও হে, এটা লুফে নাও! হারিও না। আদালতে দেখতে চাইবে!

য়োম রথ-এর হত্যাকাণ্ডের খবরটা যখন জার্মানিতে পৌঁছাল তখন তার অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া হলো। জার্মান প্রেসের সব বড় বড় কাগজে প্রথম পাতার আট-কলমে খবরটা ছাপা হলো। বার্লিনের সবচেয়ে নিরামিষ দৈনিক পত্র *Deutsche Allgemeine* সম্পাদকীয়তে লিখলেন, “The Jewish attempt against the German Embassy in Paris will have, as everyone now knows, the most serious repercussions on the Jews in our country.” [পারীর জার্মান এম্বাসীতে ইহুদিদের এই আক্রমণের প্রতিক্রিয়া কী হবে তা সহজেই অনুমেয়। তা ভয়বহ হয়ে উঠতে পারে।] গোয়েবল্‌স্-এর সরকারী মুখপাত্র *Volkischer Beobachter* কোনো কিছু রেখে ঢেকে বলল না। পরিষ্কার ভাষায় এটাকে একটা ব্যাপক রাজনৈতিক রূপ দিয়ে বসল : ‘ইহুদিদের গুপ্ত সংস্থা পেশাদার হত্যাকারীকে নিয়োগ করে জার্মানির বাইরে কর্মরত অবস্থায় আমাদের এক বীর দেশসেবককে হত্যা করেছে। এর জবাব কী ভাবে দিতে হবে, কী ভাবে এর বদলা নিতে হবে তা কি জার্মানির লক্ষ লক্ষ যুবক জানে না? জার্মানির প্রতিটি জু বাহান্তর ঘণ্টার মধ্যে এর জবাব পাবেন। আমরা কথা দিচ্ছি।’

সে দিন রাত এগারোটার সময় জার্মানির প্রত্যেকটি পুলিশ স্টেশনে গোপন নির্দেশ চলে গেল যে, স্থানীয় যুবকেরা যদি ইহুদি মহিলায় এবং বিশেষ করে সিনাগগে লুটতরাজ বা হত্যাকাণ্ড চালায়, তাহলে পুলিশ যেন কোনোভাবেই বাধা না দেয়। এই অর্ডারটি স্বাক্ষর করেছিলেন গোয়েবল্‌স্-এর অনুমত্যানুসারে হের মূলার, গেস্টাপো চীফ।

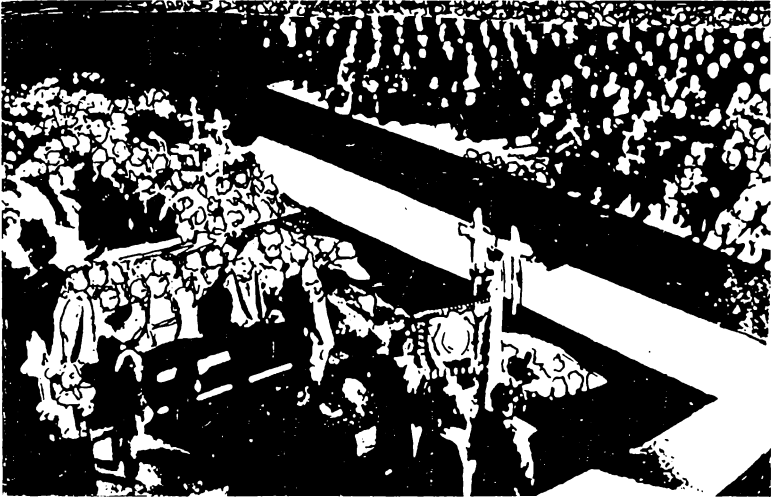
কিন্তু হের অটো ডিয়েট্রিচ (Otto Dietrich) বিশ্বযুদ্ধশেষে তাঁর হিটলার জমানার স্মৃতিচারণে (*Twelve years with Hitler*) স্পষ্টাক্ষরে লিখছেন : “Hitler alone was to blame for the pogrom and ordered Goebbels to organise it and to advice S. S. how to proceed.” [এই নারকীয় কাণ্ডের জন্য হিটলারই

একমাত্র দায়ী। তিনিই গোয়েবল্‌স্-কে নির্দেশ দিয়েছিলেন pogrom -এর (অতর্কিতে ইহুদি মহল্লায় হানা দিয়ে হামলা করার) ব্যবস্থা করতে এবং এস. এস.দের সঠিক নির্দেশ দিতে—ব্যাপকভাবে কী ভাবে ইহুদি-শিকার কার্যকরী করা হবে।]

পরবর্তী এক সপ্তাহে জার্মানির প্রত্যেকটি শহরে নাৎসি যুবসংঘ, হিটলার্স ইউথ ক্লাব, এস. এস. গেস্টাপো প্রভৃতি একযোগে ইহুদিনিধন মহাযজ্ঞ সম্পন্ন করল। সাতদিনে অন্তত দশ হাজার ইহুদি নিহত হয়েছিল।

তার চেয়েও বড় কথা এতদিন হিটলার ইহুদি নির্যাতন চালাচ্ছিল গোপনে। তখনো আউসউইৎজ, ট্রেব্লিন্কাতে গ্যাস-চেম্বার বসেনি। এখন হিটলার তা বসাতে শুরু করল। শুভবুদ্ধিসম্পন্ন জার্মানমানসকে কোণঠাসা করে সাধারণ মানুষকে খেপিয়ে তুলল ইহুদিদের বিরুদ্ধে—জাতিগতভাবে। হের রথ হয়ে গেল শিখণ্ডী—একটা জব্বর অজুহাত।

থার্ড সেক্রেটারির মৃতদেহ একটা চার্টার্ড প্লেনে বার্লিনে উড়িয়ে আনা হলো।



মহামান্য ফ্যুরারের উপস্থিতিতে পারী এম্বাসীর থার্ড সেক্রেটারির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া —
ডুসেলডর্ফ, বারোই অক্টোবর, ১৯৩৮

স্বয়ং ফ্যুরারের উপস্থিতিতে তার যে সাড়ম্বর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হলো তাতে মনে হচ্ছিল যেন রাষ্ট্রপ্রধান-জাতীয় কোনও কেওকেটা প্রয়াত হয়েছেন। সেদিন বার্লিনের বিস্তীর্ণ এলাকায় গাড়ি-ঘোড়া চলেনি। কাতারে কাতারে লরি-বোঝাই মানুষ এসে শোকসভায় সামিল হয়েছে—যেন কলকাতায় ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে ক্ষমতামালা রাজনৈতিক দলের সুচারু পরিকল্পিত মহাসভা। গোয়েবল্‌স্-এর দৈনিকে পরদিন অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার যে

ফোটো ছাপা হয়েছিল সেই দুর্লভ আলোকচিত্রের একটি কপি যোগাড় করতে পেরেছি।

স্ফটিক রজনী বা ক্রিস্টাল নাইট নামকরণের ব্যাখ্যাটা এবার দিই। জার্মানির সব মেগাসিটিতে ইহুদিদের বড় বড় দোকানের প্লেট-গ্লাস ভেঙে নর্ডিক-আর্থ-জার্মানরা নির্বিবাদে লুট করে যায়। পুলিশ বাধা দেয়নি—লুটতরাজে সহায়তা করেছিল। পকেট ভরিয়েছিল। শো-উইন্ডোর প্লেট-গ্লাসের ভাঙা কাচে বার্লিন, ফ্রাঙ্কফুর্ট, নুরেমবার্গ, বন, মুনিক, হ্যানোভার প্রভৃতি শহরে একদিনের জন্য গাড়ি চলাচল বন্ধ হয়ে যায়! কাচ সাফা করে পথঘাট ব্যবহারোপযোগী করতে হয়। লুটের পর দোকানগুলিতে আগুন ধরানো হয়। ধ্বংসস্তূপে প্রকাণ্ড বড় বড় ব্যানার লাগানো হলো : ‘য়োম রথ হত্যার প্রতিশোধ’, ‘জার্মানিতে কোনো ইহুদিবাচ্চা ঠাই নেই’, ‘ইহুদিবাচ্চা নিপাৎ যাক!’]

হের অটো ফ্রাঙ্ক :

আমি দুঃখিত ফ্রলিন বের্তা। না জেনে আপনার মনে আঘাত দিয়েছি। আমি বরং আমার কাহিনীটা শেষ করি। আমাদের পঁচিশ মাসের অজ্ঞাতবাস কাহিনী আমি আপনাদের শোনাব না। সে কথা আপনারা হয়তো আমার মেয়ে আনার জবানীতে শুনেছেন। অন্তত ইচ্ছে করলে আজও গ্রন্থাগার থেকে বইটা এনে আবার পড়তে পারেন। আমি বরং শুরু করব যেখানে আনা শেষ করতে বাধ্য হয়েছে। আনার ডায়েরির শেষ পৃষ্ঠায় সে লিখেছিল পয়লা অগাস্ট 1944; তার তিন দিন পরে চৌঠা অগাস্ট আমস্টার্ডামের গ্রন পলিজাই (Grune Polizei) কোনও সূত্র থেকে খবর পেয়ে আমাদের গুপ্ত আবাসে হানা দেয়। আমরা দলে ছিলাম আটজন। আমার পরিবারের চারজন, ভাঁ ড্যানেরা তিনজন আর একজন বয়স্ক ডেন্টিস্ট। তিনি বরাবর লুকিয়ে ছিলেন আমাদের গুপ্ত আবাসে। আমার পরিচিত বন্ধু। তাঁর চরিত্রগত কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়ে আনা তার ডায়েরিতে কিছু কৌতুক করেছিল। তাই তাঁর প্রকৃত নামটা গোপন করে একটা ছদ্মনাম দিয়েছিল : ডক্টর আলবার্ট ডাসেল। আসলে তাঁর নাম : Fritz Pfeffer। এস. এস. কমান্ডান্ট আমাদের আটজনকেই হাতকড়ি দিয়ে নিয়ে গেল ওদের সদর দপ্তরে। যেন একদল ডাকাতকে ধরেছে। কী কৃতিত্ব!

ওই সঙ্গে গ্রেপ্তার করল আমার অফিসের দুজনকে—তাঁরা ‘জুডেন’ নন, কিন্তু জুডেনদের প্রতি সহানুভূতিশীল। মারাত্মক অপরাধ! মিস্টার কুফুইসকে কয়েক সপ্তাহ পরে ছেড়ে দিতে হয়েছিল ডাক্তারের নির্দেশে; কিন্তু বেচারি কুগলার! ইহুদি নয়, খ্রিস্টান! তাকে আটমাস সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হলো—যেহেতু সে যীসাস-এর ওই নির্দেশটা মেনেছে: Love thy neighbour! কী স্পর্ধা!

আমাদের আটজনকে এস. এস. হেডকোয়ার্টার্সের কাঠের বেষ্টিতে ওরা বসিয়ে রাখল। হঠাৎ দেখতে পেলাম সেই জার্মান ছোকরাকে। যার কথা বলেছিল আনা : ‘হ্যাংলাথেরিয়াম’! তার সঙ্গে চোখাচোখি হলো, কিন্তু সে যেন আমাকে চিনতেই পারল না। আমাকে ডিঙিয়ে এগিয়ে গেল মার্গটের দিকে। এখন তার পরিধানে এস. এস. ইউনিফর্ম।

এ দু'বছরে আরও সুন্দর হয়েছে দেখতে। প্ল্যাটিনাম-ব্লন্ড চুল, নীল চোখ, চওড়া কাঁধ, সরু কোমর আর সরু গোঁফ। মিষ্টি হেসে মাগটিকে বললে, আরে মাগটি যে! কবে ফিরলে সুইৎজারল্যান্ড থেকে?

মাগটের ঠোঁট দুটি নড়ে উঠল। জবাব জোগালো না তার মুখে।

জবাব দিল আনা, আরে! জ্যাঠামশাই না? আপনাকে নতুন ইউনিফর্মে কেমন যেন টিন সোলজারের মতো লাগছে।

সেদিন ওরা আমাদের আটজনকে ট্রাকে চাপিয়ে পাঠিয়ে দিল হল্যান্ডের দক্ষিণপূর্ব শহর ওয়েস্টারবোর্কের বন্দিশিবিরে। মাসখানেক আমাদের থাকতে হলো সেখানে। একই হলকামরায়, পাশাপাশি খাটে। এখান থেকে খেপে খেপে মেহনতি ক্রীতদাসদের পাঠানো হচ্ছে জার্মানির বিভিন্ন কারখানায় নাৎসি যুদ্ধ প্রচেষ্টায় বিনা পারিশ্রমিকে শ্রমদান করতে।

তেসরা সেপ্টেম্বর 1944 আমাদের ডাক এল। পদব্রজে যেতে হলো রেল স্টেশন সংলগ্ন ইয়ার্ডে। সেখানে একটি মালগাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। বহু ইহুদি বন্দি ইতিমধ্যেই সমবেত হয়েছে। অধিকাংশই জার্মান বা পোলিশ—হল্যান্ডে আশ্রয় নিয়েছিল নাৎসি অত্যাচারে। আমাদের ওই ওয়াগনগুলোয় উঠতে বলা হলো। এক-এক ওয়াগনে পঁচাত্তরজন করে। রেল ওয়াগন যেমন হয়—জানালা নেই। তবে এগুলিকে বলে 'ক্যাটিল-রেক'। গরু পাচার করার জন্য। তাই অনেক উঁচুতে একটা ফোকর—এক হাত বাই এক হাত। গরাদ লাগানো। বায়ু চলাচলের জন্য। গোনাগুনতি পঁচাত্তরজন নরনারীকে এক-একটি ওয়াগনে তুলে ওরা দরজা সীল করে দিল। সেই জার্মান ছেলেটিকে আবার দেখলাম। এখন তার হেপাজতে একটা কালো পুলিশ-ডগ। মাগট-আনাকে দেখতে পেয়ে বললে : Gute Reise (have a nice trip)!

নিয়তির কী নিষ্ঠুর পরিহাস! আমরা যেদিন মালগাড়ি চেপে মৃত্যুপুরীর দিকে রওনা হলাম সেই তেসরা সেপ্টেম্বরই পতন হলো ব্রাসেল্‌স্‌ নগরীর। অর্থাৎ নাৎসি কবলমুক্ত হয়ে ঠিক সেই দিনই বেলজিয়াম আবার স্বাধীন হলো মিত্রপক্ষের ছত্রছায়ায়। তার তিনমাস আগে নর্ম্যান্ডিতে 'ডি-ডে' উদ্ঘাপিত হয়েছে। মার্কিন আর ব্রিটিশ সৈন্য ইউরোপের মূল ভূখণ্ডে লড়াই করতে নেমেছে। জার্মানি পশ্চাদপসরণে ব্যস্ত। অফ্রিকায় হিটলারের 'অফ্রিকান কোর' ক্রমশ পিছু হটছে। ডেসার্ট ফক্স ফিল্ড মার্শাল রোমেল ফুরারের গোপন আদেশে আত্মহত্যা করেছেন। মুসোলিনীকে তার স্বদেশবাসীরা ফাঁসিতে ঝুলিয়েছে। মস্কো-দখলে বার্থ ফুরারের অজেয় পানজার বাহিনী নেপোলিয়ানের পদচিহ্ন-রেখায় ফিরে এসেছে। অর্থাৎ জার্মানির হার শুরু হয়ে গেছে নয়—শেষ অঙ্কের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। আর ছয়টা মাস কোনোক্রমে সেই গুপ্ত আবাসে লুকিয়ে থাকতে পারলে আমরা সবাই যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর মুক্ত বাতাসে নিশ্বাস নিতে পারতাম। তা হলো না।

সত্তরটা রুদ্ধদ্বার ওয়াগনে আমরা প্রায় পঁচিশ নর-নারী চলেছি পুর্বমুখে। চলেছি তো চলেছি। একটি ওয়াগনে পঁচাত্তরজন লোক, দাঁড়াতে পারে। কেউ বসতে পারে না।

শোবার তো প্রশ্নই নেই। তিন দিন ধৰে দাঁড়িয়ে ক্রমাগত চলেছি পুৰমুখো। গোটা জার্মানির—আমার মাতৃভূমির—পশ্চিমপ্রান্ত থেকে পূৰ্বপ্রান্ত অতিক্রম করে প্রবেশ করেছি পোল্যান্ডে। এসব কথা পরে জেনেছি। রুদ্ধদ্বার ওয়াগন থেকে কিছুই বোঝা যায়নি। ট্রেন মাঝে মাঝে থেমেছে। শান্তিং করেছে, ইঞ্জিন জল নিয়েছে, কয়লা নিয়েছে। আমাদের সীলকরা দরজা একবারও খোলা হয়নি। বাহান্তর ঘণ্টা নিরন্তর উপবাস। প্রত্যেকে। বুড়ো-বাচ্চা, পুরুষ-স্ত্রী, সুস্থ-অসুস্থ! তার চেয়েও বড় কথা : বৰ্জ্য পদার্থের দুৰ্গন্ধ! বাহান্তর ঘণ্টা না খেয়ে থাকা যায়, কিন্তু...

বেচারি মাৰ্গট! তার আবার সেই সময় মাসান্তের বিড়ম্বনা! আমার তো মনে হয়েছে মানবজাতির কাছে ওই মনুষ্যেতর নাৎসি জানোয়ারগুলো যত অপরাধ করেছে তার মধ্যে এটাই সবচেয়ে জঘন্য, সবচেয়ে বেশি শাস্তিযোগ্য। অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুকে চোখের উপর দেখেছি—গ্যাস-চেম্বারে দমবন্ধ হয়ে মরা, স্ট্যাভিং স্যালুট, হ্যাঙ্গিং দ্য টেব্ছ নিগার, জীবন্তে কবর, ঘরের ভিতর গাদাগাদিভাবে তালাবন্ধ করে আগুন ধরানো—সব, সব নৃশংসতা ছাপিয়ে ওঠে—বাধ্যতামূলকভাবে এই পুতিগন্ধময় পরিবেশে বন্দিদের রুদ্ধশ্বাসে আটকে রাখার নৃশংসতা।

তৃতীয় দিনে ট্রেনটা এসে যেখানে দাঁড়াল তার নাম আসউইৎজ (Auschwitz)।

কালো পোশাক পরা মৃত্যুদূতেরা খুলে দিল মালগাড়ির দরজা।

—ওঁৰ্চ! ওঁৰ্চ! ইউ জুডেন! (বেরিয়ে আয় শুয়োরের বাচ্চা ইহুদি!)

কানে শুনছি আদেশ। শুনতে পাচ্ছি পুলিশ-কুকুরের সারমেয় গৰ্জন। কারও কারও পায়ে বসিয়েও দিল হিংস্র দাঁত! কিন্তু বাহান্তর ঘণ্টা ঘন অন্ধকারে বাস করে এই প্রথর আলোয় আমরা সবাই যে অন্ধ! তবে আমরা কিন্তু হাত ধরে আছি—আমি, এডিৎ, মাৰ্গট আর আনা। বন্দুকের কুঁদো দিয়ে পিটতে পিটতে ওরা আমাদের নামিয়ে দিল প্ল্যাটফর্মে। একজন কাপো* আমাদের এক-এক জনের হাতে একটুকরো ব্রাউন-ব্রেডধরিয়ে দিল, আর এক কাপ করে সবুজ রঙের একটা ঠাণ্ডা পানীয়—শুনলাম সেটার নাম ‘ভেজিটেবল স্যুপ’। তিন-তিনটে দিন পাড়ি দিয়ে তাই আমাদের মুখে অমৃতের স্বাদ এনে দিল। তার চেয়েও বড় কথা আর একজন কাপো একটা হোসপাইপ নিয়ে এসে অত্যন্ত জোরে জল দিয়ে ধুইয়ে দিল আমাদের আপাদমস্তক। ছেলেদের আন্ডারপ্যান্টে, মেয়েদের প্যান্টিতে আটকে-থাকা বৰ্জ্য পদার্থ ধুয়ে যাওয়ায় আরাম পেলাম।

ইতিমধ্যে প্রথর আলোয় চোখটা সয়ে এসেছে। ঘণ্টাখানেক পরে একজন এস। এস. অফিসার সান্সোপাঙ্গ নিয়ে হাজির হলেন। আমরা বসেছিলাম মাটিতে। শশব্যস্তে

* হিটলার ক্ষমতায় এসে জার্মানির বিভিন্ন জেল থেকে দীর্ঘমেয়াদী ক্রিমিনালদের মুক্তি দেয় একশর্তে। যদি তারা ইহুদি-ক্ৰীতদাসদের লেবার-ওভারশিয়ার হতে রাজি হয়। তারা সানন্দে রাজি হয়েছিল। এরা দুৰ্ধৰ্ষ, নৃশংস, দয়ামাহীন : কাপো (kapos)।

উঠে দাঁড়াই। তিনি আমাদের নামধাম জানতে চাইলেন। খাতায় লিখে নিলেন। প্রত্যেকের ডান হাতে একটা নম্বর উদ্ধি করে খোদাই করে দেওয়া হলো। এস. এস. কর্তা বললেন, এরপর থেকে আমৃত্যু ওই নম্বরগুলিই হলো আমাদের জুডেন-পরিচয়। নাম-ধাম-বাবার নাম সব ভুলে যেতে হবে। প্রত্যহ রোলকলের সময় এই নম্বরটা শুনলেই উঠে দাঁড়িয়ে হাত তুলে বলতে হবে : হেইল হিটলার!

এর পরেই লোকটা অর্ডার দিল : ফল ইন!

অর্থাৎ চারজনের সারি করে অ্যাটেনশনে দাঁড়াতে হবে।

কিন্তু আমাদের ফল ইন করানো হলো দু-জায়গায়। পুরুষ ও নারী পৃথকভাবে। তখন বুঝতে পারিনি—এটা কতবড় মর্মান্তিক আঘাত। কারণ এভাবেই আমি পৃথক হয়ে গেলাম আমার পরিবারের কাছ থেকে। এক দিকে আমি, আর অপর দিকে আমার স্ত্রী ও দুই কন্যা।

বাকি জীবনে ওদের আর কখনো দেখিনি। আমি নিজে বদলি হয়েছি নানান কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে। ভাঁ ড্যান অনেকদিন ছিল আমার সঙ্গে। পিটারও। কর্মক্ষমতা হারানোর পর এস. এস. সিলেকশনে ভাঁ ড্যানের মৃত্যুদণ্ড হয় জানুয়ারি 1945-এ। মাসখানেক পরে আউসউইৎজ ক্যাম্প ছেড়ে এস. এস. সৈন্যরা পালাতে শুরু করল— কারণ পূর্বদিক থেকে রাশিয়ার লাল ফৌজ এগিয়ে আসছে অপ্রতিহত গতিতে। ~~মহা~~পোরা সমস্ত বন্দিকে তাড়িয়ে নিয়ে চলল জার্মানির দিকে—বার্লিনের দিকে। প্রচণ্ড শীতে, বিনা গরম জামায়, অনাহারে আর পথশ্রমে প্রায় সবাই মারা গেল। আমার চোখের সামনেই মারা গেল পিটার—তখনও তার বয়স কুড়ি হয়নি!

আশ্চর্য! আমি জীবিত ফিরে এলাম। আমি লুকিয়ে বসেছিলাম ওই আউসউইৎজ ক্যাম্পেই। একটা প্যাকিং বাক্সের আড়ালে। পুরো ছয়দিন—অনাহারে, শুধু বরফ খেয়ে। রাশিয়ান সৈন্যরা যখন আমাকে উদ্ধার করে তখন আমি অচৈতন্য, কিন্তু জীবিত।

স্ত্রী-কন্যাদের মৃত্যুসংবাদ পেয়েছিলাম যুদ্ধের ডামাডোল মিটলে। রেড-ক্রসের মাধ্যমে। কে-কোথায়-কীভাবে মারা গেল এসব কথা জানতে চাইবেন না। আমি জানি না। জানলেও হয়তো বলতাম না।

কার্ল ফর্সনবের্গ (Carl Forsnberg)

আমাকে আপনারা চেনেন না। চেনার কথাও নয়। আমি জার্মান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যখন শেষ হয় আমার বয়স তখন পাঁচ। সবে ভর্তি হয়েছি স্কুলে। আমার বাবা মারা গিয়েছিলেন যুদ্ধে—তিনি র‍্যাঙ্কে ছিলেন মেজর। তাঁর মৃত্যুর হেতু—শৈত্যাধিক্য! মাস্কো থেকে ফেরার পথে তাঁর দেহান্ত হয়। কাকা ছিলেন গেস্টাপো বাহিনীতে। যুদ্ধান্তে জীবিত ছিলেন, কিন্তু ক্রাচনির্ভর প্রতিবন্ধীর জীবন। নাৎসি সরকার তাঁর জন্য একটা ইনভ্যালিড পেনশন স্যাংশন করেছিল বটে, কিন্তু যুদ্ধান্তে যখন সরকারেরই ভ্যালিডিটি

থাকল না, তখন কে তাঁকে দেবে খেসারত ? তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন যুদ্ধের দু-বছর পরে। আমাকে মানুষ করেন আমার দাদু—তিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির হয়ে লড়েছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে—এখন বুঝতে পারি—কিছু ইহুদি সম্পত্তি জবরদখল করেছিলেন।

জার্মানিতে হেইডেনবের্গ প্রকাশনা যখন আনা ফ্রাঙ্কের ডায়েরি প্রথম প্রকাশ করল— 1950 সালে—তখন আমাদের শহরে একটা বইয়ের দোকান লুট হয়ে যায়। আমার বয়স তখন দশ, বইয়ের দোকানটা ছিল স্কুলের পাশেই। শুনলাম দোকানদার একটা বিব্রী অশ্লীল বই বিক্রি করছিল বলে পাড়ার মস্তানরা দোকানটা জ্বালিয়ে দিয়েছে। বই ও ক্যাশ লুট করেছে। আমার ক্লাসের এক বন্ধু আর্নস্ট বললে, ‘দারুণ রগরগে বই! আমস্টার্ডামের ঘটনা। একটা তের বছরের ছুঁড়ির সঙ্গে পিটার নামে সতের বছরের ছোকরার গুপ্ত প্রেমকাহিনী। ওরা নাৎসিদের ভয়ে নাকি একটা ‘গুপ্ত-আবাসে’ লুকিয়েছিল। বাবা-মা-দিদিকে লুকিয়ে মেয়েটা তার নাগরকে চুকচুক চুমু খেত চারতলা সিঁড়ির ঘরে। আরও কী কী করত যীসাস জানেন।’

দারুণ কৌতূহল হলো। লুট হয়ে যাওয়া বইয়ের একটা কপি আর্নস্ট স্নবেল যোগাড় করল। দিল আমাকে পড়তে। বারবার সাবধান করে দিল—খবর্দার কেউ যেন না জানতে পারে।

লুকিয়ে-লুকিয়েই পড়ে ফেললাম বইটা। কোথায় কী? যা খুঁজছিলাম তার বিন্দুবিসর্গ পেলাম না। হ্যাঁ, চুমু খাওয়ার কথা আছে বটে; কিন্তু তা পড়ে আমার কেন জানি কান্না পেল। বাবা-মা নেই, দিদাই আমার বন্ধু। তাকে পড়তে দিলাম বইটা। নজরে পড়ে গেল দাদুর কেড়ে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলে দিলে বইটা। বললে, ‘এইসব অ্যান্টি-নাৎসি প্রোপাগান্ডার বই খবর্দার পড়বি না। ফ্যারারকে মেরেও ওদের তৃপ্তি হয়নি—এখন এইসব গল্প ফাঁদছে! আনা ফ্রাঙ্ক বলে কেউ কোথাও কখনও ছিল না। ভুলে যা ওসব।’

কিন্তু ভুলতে পারিনি। আমি একা নই। আমার সেই বন্ধু আর্নস্টও ভোলেনি। সে স্বীকার করেছিল—আনা ফ্রাঙ্কের বইটা পড়তে পড়তে সেও কেঁদেছে। ‘অশ্লীল’ বলে নয়, দোকানটা যারা লুট করেছিল তারা যুদ্ধকালীন অপরাধের অন্তর্দাহে অমন কাজ করেছিল। এ তথ্যটা বুঝতে পারলাম একটু বয়স বাড়তেই।

আমাদের দুই বন্ধুর বয়স তখন পনের—স্কুল ফাইনাল দেব সে বছর। একটা সাহিত্য পত্রিকায় পড়লাম নিউ ইয়র্কের কোর্ট থিয়েটারে একটা নাটক দেখানো হচ্ছে : ‘দ্য ডায়েরি অফ আনা ফ্রাঙ্ক’। নাটকটা নাকি অসাধারণ সাফল্যলাভ করেছে। একই সঙ্গে সে নাটককে দেওয়া হয়েছে মার্কিন মুলুকের তিন-তিনটি সেরা প্রাইজ : পুলিৎজার প্রাইজ, ক্রিটিক্স সার্কেল প্রাইজ, আর আঁতোনিয়ো পেরী অ্যাওয়ার্ড। ততদিনে জার্মানিতে বইটা আবার নতুন করে ছাপা হয়েছে। আবার কিনে পড়লাম। এখন আমার বয়স পনের। দাদুর

ছকুমে চলি না। অনেক কথা প্রথমবার বুঝতে পারিনি। এবার পারলাম। আর্নস্টও আমার সঙ্গে একমত—এ বইটা অসাধারণ।

সেবছরই পয়লা অক্টোবর—ততদিনে আমাদের ফাইনাল পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে—জার্মানির ছয়টি শহরে একযোগে মঞ্চস্থ হলো ওই নাটকের জার্মান রূপান্তর—বার্লিন, ফ্রাঙ্কফুর্ট, মুনিক, বন, স্টুটগার্ড আর হ্যানোভার।

দর্শকেরা মন্তুমুন্দের মতো তা দেখলেন। রুমালে চোখ মুছলেন। সারা দেশব্যাপী এমন মঞ্চসফল নাটক বহুদিন অভিনীত হয়নি জার্মানিতে। সবচেয়ে বড় কথা—এতদিনে অধোবদন হলো জার্মানি। বার্লিন বুক্ষারে ফুরারের আত্মহত্যা যা হয়নি, ন্যুরেমবার্গ বিচারে যা হয়নি, এবার তাই হলো : একটা তের বছরের ছোট্ট মেয়ের কাছে মনে মনে নতজানু হলো গোটা জার্মানি। ছয়টি শহরেই দীর্ঘদিন ধরে চলেছিল ওই মেয়েটির অন্তরনিগুরানো-আর্তির উপাখ্যান! ফুরারের প্রতিটি চালাচামুণ্ডা—তাঁর মৃত্যুর মাত্র এগারো বছর পরে—তাকে সম্পূর্ণ তাগ করে মনে মনে স্বীকার করে নিল : আমরা অন্যায় করেছিলাম!

দাদু-দিদাকে একদিন নিয়ে গেলাম থিয়েটার দেখাতে। দিদা তো কেঁদে ভাসাল, দাদুও এতদিনে স্বীকার করল ইহুদিনীপীড়নটা নাৎসিবিরোধী মিথ্যা প্রচার নয়। মানবিকতার বিরুদ্ধে নাৎসি দর্শনের চরম অপরাধ।

থিয়েটার হল থেকে বেরিয়ে দাদু ধরা গলায় বললে, হ্যাঁ, সেই তের বছরের বাচ্চা মেয়েটার কাছে আমি ক্ষমা চাইছি। আমরা অন্যায় করেছি।

আমি ছিলাম বিজ্ঞানের ছাত্র—ডাক্তারি পড়তে গেলাম; কিন্তু আর্নস্ট পাস করল সাংবাদিকতা নিয়ে। তার উপর আনা ফ্রাঙ্কের প্রভাব পড়েছিল প্রচণ্ডভাবে। সে তার সাংবাদিক জীবন শুরুই করল আনা ফ্রাঙ্কে নিয়ে।

আর্নস্ট শ্নবেল (Ernst Schnabel) :

হ্যাঁ, ভুল বলেনি কার্ল। আমার সাংবাদিকতার জীবন শুরু হয়েছিল আনা ফ্রাঙ্কে নিয়েই। তার ডায়েরিটা না-হোক বিশবার আদ্যোপান্ত পড়েছি। দুটো ভাষায়। নাটকটার অভিনয়ও দেখেছি, একাধিক রজনী। তারপর এক সিনিয়ারের কাছে শুনলাম আমস্টার্ডামে এই নাটকের ডাচ ভার্শান-এর প্রথম অভিনয় রজনীর বর্ণনা। তিনি প্রত্যক্ষদর্শী। সেটা সাতাশে নভেম্বর 1956-এর ঘটনা। এই নাটকের একটি ডাচ রূপান্তর অভিনীত হয়েছিল আমস্টার্ডামের সবচেয়ে বড় প্রেক্ষাগৃহে। আমার এক সিনিয়ার সাংবাদিক দাদা উপস্থিত ছিলেন উদ্বোধন-রজনীতে। লন্ডন-টাইমস্ পত্রিকার নাট্যসমালোচক। সার্মানের সারিতে পাশাপাশি দুজন বিশিষ্ট অতিথি। একজন বৃদ্ধ, হের অটো ফ্রাঙ্ক—আনার পিতৃদেব; অপরজন আমস্টার্ডামের রানি জুলিয়ানা। যুদ্ধকালে যিনি ছিলেন হল্যান্ডের রানি সেই প্রয়াতা উইলহেল্মিনার কন্যা।

দাদা পরদিন লন্ডন-টাইমস্ পত্রিকায় যা লিখেছিলেন :

নাটকটা ‘পুনরভিনীত’ হলো গতকাল আমস্টার্ডামে। পুনরভিনীত বলছি এজন্য যে এ-নাটক বাস্তবে রূপায়িত হয়ে গেছে, এই শহরেই—এই প্রেক্ষাগৃহ থেকে ইষ্টকক্ষেপণ দূরত্বে, গত দশকে। সেই অভিনয়কালের এক কুশীলব—আনার বাবা—ওই তো বসে আছেন সামনের সারিতে। নিজের দর্শন-প্রতিবন্ধ দেখছেন স্টেজের উপর।....অভিনয়কালে ক্রমাগত শুনতে পাচ্ছিলাম মহিলাদের নিরুদ্ধ কান্নার শব্দ। সচরাচর প্রেক্ষাগৃহে এমন শব্দ হলে বাস্তববাদী দর্শকের মৃদু-ধমক শুনতে পাওয়া যায় : ‘আস্তে!’ কিন্তু এখানে তা একবারও শোনা গেল না। বোধহয় দর্শকদলে এমন অনেক হতভাগ্য আজ উপস্থিত যাঁরা ওদের ওই প্রাণান্তকর অজ্ঞাতবাসকালে নিজেদের অতি প্রিয়জনকে হারিয়েছেন। কে কাকে বলবে: ‘আস্তে’?....একসময় রুদ্ধশ্বাস নাটকটা শেষ হলো। সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্তে যখন গেস্টাপো-পুলিস দুমদাম করে বুকেসটা হাতুড়িপেটা করে ভাঙছে, আর পুলিস-ডগ তীব্রস্বরে চিংকার করছে। এপারে আটজন হতভাগ্য একযোগে আত্ননাদ করে উঠলেন এবং আটজনই ফ্রিজ হয়ে গেলেন।....যেন প্রতিবর্তী প্রেরণায় সমস্ত প্রেক্ষাগৃহ একই রকম স্বরে আত্ননাদ করে উঠল। সমস্ত প্রেক্ষাগৃহ উত্তেজনায় উঠে দাঁড়িয়েছে। ধীরে ধীরে নেমে এল শেষ যবনিকা। ‘কার্টেন-কল’ হলো না। সমস্ত দর্শকমণ্ডলী নিজেদের অজান্তে ‘স্ট্যান্ডিং ওভেশন’ দিল। পুরো পাঁচ মিনিট। নিঃশব্দে। নিঃস্পন্দে! কেউ হাততালি দিল না।....দেখলাম কুইন জুলিয়ানা ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে গেলেন প্রধানপথের দিকে। পিছন-পিছন তাঁর দেহরক্ষী। আশ্চর্য! রানি জুলিয়ানা হের অটো ফ্রাঙ্কে কোনো সম্বোধন করলেন না। নাট্য-প্রযোজক, পরিচালক, হলের মালিক প্রভৃতি কর্মকর্তারা সার দিয়ে দাঁড়িয়ে। রানি কাউকে কিছু বললেন না। মাথা নিচু করে ‘হল’ ছেড়ে চলে গেলেন। আমরা—বিভিন্ন সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরাও চুপি চুপি পালিয়ে এলাম। আমন্ত্রণকর্তাদের অভিনন্দন বা ধন্যবাদ না জানিয়েই। যেন নাৎসিদের ওই অপকর্মের আমরা স্বকাই ভাগীদার। যেন ‘এ আমার, এ তোমার পাপ!’

আমি স্থির করলাম আমার সাংবাদিক জীবন শুরু করব ওই আনাকে দিয়ে। এডিং, মার্গটি আর আনা কীভাবে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে এটাই গবেষণা করে বার করব আমি। এটাই জার্মান হিসাবে আমার প্রায়শ্চিত্ত।

একটি জার্মান পত্রিকার কমিশন পেয়ে শুরু করলাম কাজ।

সবার আগে দেখা করলাম বৃদ্ধ হের অটো ফ্রাঙ্কের সঙ্গে। আমস্টার্ডামে। দুঃখের বিষয় তিনি আদৌ উৎসাহিত হলেন না। বললেন, কী লাভ সে কথা জেনে? আনা আর মার্গটকে ওরা ফাঁসি দিয়েছিল, না গুলি করে মেরেছিল অথবা গ্যাস-চেম্বারে ঢুকিয়ে দিয়েছিল তা জানবার বিন্দুমাত্র আগ্রহ আমার নেই। সরি, সরি স্যার। আমার বিন্দুমাত্র কৌতূহল নেই জানবার যে, হত্যা করার আগে ওই বর্বরগুলো আনা আর মার্গটকে ধবেসরি স্যার! আই মে বি এক্সকিউজড!

জানি না, আমার জার্মান পরিচয়টাতেই তাঁর এই অনীহা জন্মেছিল কি না। তাও হতে পারে। যা হোক তাঁর কাছে কোনো সাহায্য পাইনি।



ফ্রাউ এডিৎ ফ্রাঙ্ক

এরপর আমি খোঁজ নিলাম রেড-ক্রস-এর দপ্তরে। সাংবাদিক হিসাবে জানতে চাওয়ায় ওঁরা আমাকে সাহায্য করলেন। খবর পেলাম, ফ্রাউ এডিৎ ফ্রাঙ্ক মারা গিয়েছিলেন 1945-এর ছয়ই জানুয়ারি। অর্থাৎ হিটলার আত্মহত্যা করার মাস তিনেক আগে। বাস্তবে আগের বছর অক্টোবরে আউসউইৎজ-এ একটি সিলেকশন হয় মহিলাদের মধ্যে। এস. এস. অফিসার পরীক্ষা করে রায় দেন যে আনা, মার্গি আর ফ্রাউ ভাঁ ড্যানের তখনো কর্মক্ষমতা আছে, কিন্তু

মিসেস এডিৎ ফ্রাঙ্কের নেই। তাই দুর্বলদেহী এডিৎকে বিচ্ছিন্ন করা হয়। কিন্তু তাঁকে গ্যাস-চেম্বারে নিয়ে যাবার প্রয়োজন হয়নি। দুই মেয়েকে ওরা যখন কেড়ে নিল তখন উনি অল্পজল ত্যাগ করলেন। কয়েকমাস পরে বস্তুত অনাহারেই তিনি মারা যান।

কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পগুলিতে গিয়ে কিছুই জানতে পারিনি।

মিত্রপক্ষের সৈন্যরা এসে ক্যাম্পগুলো দখল করার আগে এস. এস. গুপ্তারা সব নথিপত্র পুড়িয়ে ফেলেছিল। ইহুদি বন্দিদের ক্যাম্পের বাইরে বার করে এনে হাঁটা-পথে জার্মানির দিকে তাড়িয়ে নিয়ে চলে। বন্দিরা রাস্তাতেই অনাহারে বা শীতে জমে মারা যায়। যেমন মারা গিয়েছিল উনিশ বছরের পিটার ভাঁ ড্যান।

এরপর আমি প্রাক্তন ক্যাম্পবাসী ইহুদি নরনারীর মধ্যে অন্বেষণের কাজ করতে থাকি। আউসউইৎজ আর বেলসেনের প্রায় দেড়শজন অত্যাচারিত ইহুদির সন্ধান পাই। তার ভিতর বেয়াল্লিশজন ওঁদের মা-মেয়েকে চিনতে পারলেন। টুকরো টুকরো নানান খবরও দিতে পারলেন। জানা গেল :

মার্গি মারা যায় জার্মানির বেরগেন-বেলসেন (Bergen-Belsen) কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে। 1945-এর মার্চ মাসে। আনা তখন সেখানেই ছিল। অত্যন্ত অসুস্থ ও দুর্বল। এ খবর জানাল আনার এক সহপাঠিনী লিস্ গুসেন্স (Lies Goosens)। সে জীবিত অবস্থায় যুদ্ধোত্তর দুনিয়ায় ফিরে আসতে পেরেছিল। লিস বলে, “আনাকে তখন চেনা

যেত না। তার মাথার চুলগুলো ছেঁটে ফেলা হয়েছে। গ্যাস-চেম্বারে ঢোকানোর আগে ওরা মাথা কামিয়ে দিত। কঙ্কালসার চেহারা। অত্যধিক পরিশ্রমে, আর অনাহারে সে তখন বস্তুত মৃত্যুপথযাত্রী। তাই আমরা তাকে মার্গটের খবরটা জানাইনি। কিন্তু সে ছিল অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। দু-তিনদিন মার্গটিকে না দেখতে পেয়েই সে বুঝতে পেরেছিল। আমার তো মনে হয়, সেটাই ওর মৃত্যুর কারণ। অসুখ তার ছিলই। ক্যাম্পে ব্যাপক টাইফয়েড। কে সুস্থ, কে অসুস্থ জানা নেই। ও এই মর্মান্তিক দুঃসংবাদটা সহিতে পারল না। তার দেহ বোধহয় ‘মাস-গ্রেভে’ সমাধিস্থ করা হয়, ঠিক জানি না।”

আমার গবেষণা গ্রন্থটি [ইংরিজি অনুবাদে নাম : *Anne Frank : A portrait in Courage*] প্রকাশিত হয় আরও কয়েক বছর পরে। আমি তার একটি কপি হের ফ্রাঙ্কে নিজ হাতে দেব বলে আমস্টার্ডামে চলে আসি। বৃদ্ধ তখন ওঁর স্মৃতিবিজড়িত ‘গুপ্ত-আবাসে’র পাশেই একটা ছোট্ট বাড়িতে থাকেন। একেবারে একা। হের ফ্রাঙ্কের বিপুল সম্পত্তি নাৎসি সরকার কেড়ে নিয়েছিল বটে কিন্তু তাঁর অর্থাভাব হবার কারণ নেই। পঞ্চাশ-ষাটটি ভাষায় অনুবাদিত আনার লক্ষ-লক্ষ বিক্রিত বইয়ের রয়্যালটি তাঁর প্রাপ্য। কিন্তু তিনি তা দান করে গিয়েছিলেন ‘হলোকস্ট সারভাইভার্স ফাণ্ডে’। সে ঢাকাতে আমস্টার্ডামে আনা ফ্রাঙ্কের গুপ্ত-আবাসে সংগ্রহশালা নির্মিত হয়।

[লেখকের সংযোজন : 1972 সালে ইউরোপ-ভ্রমণকালে আমস্টার্ডামে এই বাড়িটি দর্শনের সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। আমার সঙ্গে ছিল অসীম চাটুজ্জ। আমরা টুরিস্ট-বাসে ঘুরছিলাম। আমাদের সঙ্গীসাথীরা সেদিন আমস্টার্ডামে মার্কেটিঙে গেছেন। আমরা দুজন এই তীর্থদর্শন করি। বাড়িটি হুবহু 1941-42 সালে যেমন ছিল তেমনিটি রাখা হয়েছে। আনা যে ঘরে থাকত সে ঘরের দেওয়ালে আঠা দিয়ে সাঁটা আছে সিনেমা পত্রিকার কিছু ছবি—যেমন স্টেটছিল আনা—সেয়ুগের বিখ্যাত চিত্রতারকা গ্রেটা গার্বো, নর্মা শিয়ারার এবং প্রিন্সেস এলিজাবেথ অব ইয়র্ক (যৌবনকালে ইংলন্ডেশ্বরী কুইন এলিজাবেথ)। রদ্যার থিল্ডার এবং দ্যা কিস্ ভাস্কর্যের দুটি ফটোগ্রাফ। সংগ্রহশালার কর্তা একটি বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন : “What we are trying to do is reach people emotionally so that they feel personally involved in what took place on this spot.” দুটি বছর ধরে ওই গুপ্ত আবাসে আটটি প্রাণী গাদাগাদি করে বাস করেছে। দিনের বেলা তারা কথা বলত না, আহালাদি করত না, হাঁটাচলা পারতপক্ষে বন্ধ। এমনকি টয়েলেটে গেলেও কমোডের ফ্লাশ টানত না। পাছে সে শব্দে বাইরের দুনিয়া আন্দাজ করে ওই অংশে কেউ লুকিয়ে আছে।

বাড়ির সামনে আনা ফ্রাঙ্কের একটি আবক্ষ মর্ম্মরমূর্তি। যে ইহুদি স্কুলে আনা পড়ত তার নামকরণ করা হয়েছে ওরই নামে। রাস্তার নামটাও তাই।

প্রসঙ্গত বলি, জার্মানির নিও-নাৎসিবাদীরা আবার প্রচার শুরু করেছে যে, আনা ফ্রাঙ্কের ডায়েরিটা জাল। একটা প্রতারণা। এটা বাস্তবে অটো ফ্রাঙ্কের রচনা—কল্পিত ঘটনা-আশ্রিত। খবর পেয়েছি, ১৯৮১ সালে ডাচ-সরকার একটি তদন্ত কমিশন গঠন করেন। তাঁরা আধুনিক গবেষণাগারে মূল দিনপঞ্জিকার কাগজ, কালি এবং আনার স্কুলে প্রাপ্ত হাতের লেখা বিচার করে রায় দিয়েছেন যে, এটি শতকরা শতভাগ খাঁটি।]

আর্নস্ট স্নবেল

১৯৬৩ সালে ভিয়েনায় একজন ছদ্মবেশী জার্মানকে পুলিশে গ্রেপ্তার করে। দেখা যায়, সে পরিচয় গোপন করে অস্টিয়াতে আছে। বাস্তবে সে একজন গেস্টাপো সার্জেন্ট। নাম: ইন্সপেক্টর কার্ল সিলবারবোর (Karl Silberbauer)। প্রমাণিত হয়, এই লোকটাই উনিশ বছর আগে আমস্টার্ডামের গুপ্ত আবাসে হানা দিয়েছিল। আটজন আত্মগোপনকারী ইহুদিকে গ্রেপ্তার করেছিল। অপরাধ—না অপরাধ নয়, কৃতকর্মটা সে স্বীকার করতে বাধ্য হয়। তার বিরুদ্ধে মামলা ওঠে। সে বলে, সে মিলিটারি আদেশ পালন করেছিল মাত্র—তার কী দোষ?

ভিয়েনার আদালত তাকে মুক্তি দেয়। তবে ছদ্মপরিচয়ে সে যে চাকরিটা করছিল সেই চাকরিটা সে খোয়ায়।

এর পাঁচ বছর পরে, ১৯৬৮ সালে জার্মানির ম্যুনিক শহরে ধরা পড়ে একজন ছদ্মবেশী জাঁদরেল এস. এস. পাণ্ডা : লেফটেনেন্ট জেনারল উইলহেম হার্স্টার (Lt. Gen. Wilhelm Harster)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে ইনি ছিলেন আমস্টার্ডামে এস. এস. বাহিনীর সর্বময়্য কর্তা। ঐরই আদেশে প্রায় এক লক্ষ ইহুদিকে জার্মানি থেকে আউসউইৎজে বন্দিশিবিরে পাঠানো হয়। তাদের অধিকাংশই ডাচ, কিছু ভিনদেশী আশ্রয়প্রার্থী—যেমন ছিলেন ফ্রাঙ্ক পরিবার। লেফটেনেন্ট-জেনারল-এর কাউন্সেল আদালতে পেশ করলেন একই যুক্তি : উইলহেম হার্স্টার নিরপরাধ; কারণ তিনি মিলিটারি আইনে উর্ধ্বতন অফিসারের আদেশ পালন করেছেন মাত্র।

কিন্তু ইতিমধ্যে দুনিয়ায় দু-দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে গেছে। তাই ভিয়েনার আদালত যেভাবে কার্ল সিলবারবোরকে মুক্তি দিয়েছিল, মুনিকের ন্যায়াধীশ সেভাবে উইলহেমকে বেকসুর খালাস দিতে পারলেন না। এক নম্বর : ইতিমধ্যে নুরেমবার্গের ইতিহাসবিখ্যাত বিচারের রায় বেরিয়ে গেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের নিরপেক্ষ আইনজ্ঞ বিচারপতিরা জানিয়েছেন—ওই অজুহাতে অপরাধীকে ক্ষমা করা যায় না। সামরিক আদেশ যদি মানবিকতা-বিরুদ্ধ নির্দেশ হয় তাহলে অধীনস্থ কর্মচারী সে কাজ করতে অস্বীকার করে পদত্যাগ করতে পারত। তা সে করেনি। সে চাকরির লোভে অমানবিক অত্যাচার করেছে। সে দোষী। এই সূত্র অনুসারে হিটলার-কর্তৃক আদিষ্ট তাবড় তাবড় জেনারলদের

মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল নুরেমবার্গ আদালত : গোয়েরিঙ, গোয়েবল্‌স্, কীটেল প্রভৃতি পঁচিশজন আসামীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।

দ্বিতীয়ত, জার্মানির প্রতিটি বড় বড় শহরের প্রধান প্রেক্ষাগৃহে ‘আনা ফ্রাঙ্কের ডায়েরি’ নাট্যকারে দেখানো হয়েছে। যুদ্ধোত্তর নাৎসি জার্মানি মাথা হেঁট করে অপরাধ স্বীকার করেছে।

হয়তো এই দুটি হেতুতেই বিচারক উইলহেমকে কঠিন শাস্তি দেন।

এই বিচারের অংশ হিসাবে ধৃত আসামী এস. এস. মেজর জফ্ট (S. S. Major W. Zopt)-কে প্রসিকিউশন আদালতে তোলে। বাদীপক্ষের সওয়ালে জফ্ট স্বীকার করে যে, একজন ইনফর্মার গোপনে খবর দেওয়ায় সে চোঁঠা আগস্ট 1944 প্রিন্সেনগ্রটের একটি গুপ্ত-আবাস থেকে আটজন পলাতক ইহুদিকে গ্রেপ্তার করে। যে ছেলেরা এই খবর এনে দেয় তাকে বিধিমতো পুরস্কারও দেওয়া হয়।

পাবলিক প্রসিকিউটর জনতে চান, বিধিমতো পুরস্কার মানে কী? কত টাকা?

—কোনো পলাতক ইহুদিকে যদি কেউ ধরিয়ে দিতে পারে তাহলে আমাদের এস. এস. ফান্ড থেকে তাকে পাঁচ গুল্ডেন* পুরস্কার দেওয়া হতো।

আদালত হের অটো ফ্রাঙ্কে ‘সামন’ করেন। কিন্তু ফ্রাঙ্ক কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে Zopt-কে শনাক্ত করতে পারলেন না। বলেন, তখন আমার মানসিক অবস্থা এমন ছিল যে, ভাল করে কিছুই দেখতে পাইনি, ইওর অনার!

তা সত্ত্বেও এস. এস. প্রাক্তন সৈনিকটির অপরাধ প্রমাণিত হয়। আদালত তাকে পনের বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেন।

এই মামলার অনুষঙ্গ হিসাবে এক ইনফর্মারও ধরা পড়ে। বছর পঁচিশ-ছাব্বিশের একটি জার্মান যুবক। সেও এস. এস. বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল। আর. এ. এফ.-এর বোমাবর্ষণে প্রচণ্ডভাবে আহত হয়। সে তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ অস্বীকার করে। বলে, সে ইনফর্মার নয়। তবে জেরার মুখে সে কবুল করতে বাধ্য হয়—হ্যাঁ, ফ্রাঙ্ক পরিবারকে সে চিনত। তাঁরা আত্মগোপন করার আগের যুগে। তদন্ত করতে করতে এটাও জানা যায় যে, ওই জার্মান যুবকটি মাগট ফ্রাঙ্ক-এর সঙ্গে একই স্কুলে পড়ত। দু-তিন বছরের সিনিয়ার ছিল—সেই স্বর্ণময় যুগে, যখন ইহুদি আর আর্যদের একই বিদ্যায়তনে পাঠরত থাকায় কোনো বাধা ছিল না।

ফলে আবার সামন ধরানো হলো হের অটো ফ্রাঙ্কে।

লাঠি ঠুক-ঠুক-বৃদ্ধ আবার কাঠগড়ায় উঠে চেয়ারে বসলেন।

* গুল্ডেন একটি ডাচ মুদ্রা। এক গুল্ডেন দেড় ডলার। বর্তমান বাজার দরে পঁচাত্তর টাকা। অর্থাৎ আটজন প্রাণভয়ে পলাতক ইহুদিকে ধরিয়ে দিয়ে তাদের জীবনের দাম হিসাবে ইনফর্মার পেয়েছিল : নগদ ছয়শত টাকা। সপরিবার ও সবন্ধু আনা ফ্রাঙ্কের জীবনের দাম ছয়শত টাকা!

পাবলিক প্রসিকিউটর বললেন, হের ফ্রাঙ্ক, ওই ছেলেটিকে ভাল করে দেখুন তো একবার। একে চেনেন? দেখেছেন কখনো?

চশমার কাচটা মুছে নিয়ে বৃদ্ধ হের ফ্রাঙ্ক তাকিয়ে দেখলেন আসামীর দিকে। বজ্রাহত হয়ে গেলেন তিনি। হ্যাঁ, তিনি ওকে চেনেন। খুব ভাল করেই চেনেন। সেই গভীর রাত্রে আনা যখন ওঁকে ধমক দিয়ে বলেছিল, ‘তুমি সোজা কথাটা বুঝতে পার না কেন বাপি? কাল বরং মাম্মিকে শুধিও।’ আর উনি আপন মনে বলেছিলেন, ‘ছেলেটাকে হাতের কাছে পেলে ওর নাকটা খেঁতলে দিতাম’—এ সেই ছেলেটি : হ্যাংলাথেরিয়াম। কিন্তু এ তার কী পরিণাম? ওর বাঁ-চোখটা কোটর থেকে বেরিয়ে এসেছে। গালের অনেকটা মাংস যেন বাঘে খাবলে নিয়েছে!—তাই মাড়ির দাঁতগুলো বেরিয়ে আছে। বাঁ-পাটা নেই। ছেলেটি ক্রাচ-নির্ভর। প্রতিবন্ধী!

—প্রিজ টেল দ্য কোর্ট, হের ফ্রাঙ্ক, ছেলেটি আপনার পরিচিত?

—ইয়েস, ইওর অনার!



অটো ফ্রাঙ্ক

শিউরে উঠল যেন আসামী। তার ডান চোখের নীল তারাটায় করুণ মিনতি। যেন বলতে চায়, আমাকে ধরিয়ে দেবেন না আঙ্কল! আমার অবস্থা তো দেখতেই পাচ্ছেন। পঙ্গু। প্রতিবন্ধী! ওরা যদি ফাঁসি না দিয়ে সশ্রম কারাদণ্ড দেয়, তাহলে এই শরীরে কেমন করে....?

—বলুন, হের ফ্রাঙ্ক। কী নাম ছেলেটার?

দীর্ঘ সময় উনি জবাব দেননি। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন আদালতের সিলিঙ-এর দিকে।

—চিনতে পারছেন একে? এ কি মার্গটের স্কুলে পড়ত?

—ইয়েস ইয়োর অনার! একই স্কুলে!

—ওর নামটা মনে আছে?

আবার উনি সিলিঙের দিকে তাকিয়ে কী যেন দেখেন। তারপর তাকিয়ে দেখেন ওই পঙ্গু বীভৎস ছেলেটির দিকে। আবার তিনি আদালতের সিলিঙের দিকে তাকান। পাবলিক প্রসিকিউটর একটু বিরক্ত হয়ে বলেন, ওদিকে কী দেখছেন? ওই ছেলেটির দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখুন। ওকে আপনি চেনেন বলেছেন। কী নাম ওর?

উনি অস্বুটে কী যেন বললেন! নামটা ভুল।

পাবলিক প্রসিকিউটর বিরক্ত হয়ে ডিফেন্স কাউন্সেলকে বলেন, ইয়োর উইটনেস!

—নো কোয়েশেনস্! উনি তো আসামীর নামটাও জানেন না!

ডিফেন্স কাউন্সেলের ছাড়পত্র পেয়ে উনি নেমে এলেন সাক্ষীর মঞ্চ থেকে।

এই ঘটনার মাসকতক পরে আমি আমার বইখানি নিয়ে বৃদ্ধের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। উনি বলেন, ইতিমধ্যেই আমার প্রকাশক তাঁকে এক কপি বই পাঠিয়ে দিয়েছে। আর তিনি রুদ্ধশ্বাসে তা পড়ে শেষ করে ফেলেছেন। আমাকে উনি ধন্যবাদ দিয়ে বললেন, তুমি আমাকে বাঁচালে বাবা, তোমার বই পড়ে জানলাম ওদের উপর ওই নরপশুগুলো কোনও অত্যাচার করেনি, মানে... ‘অত্যাচার’ বলতে আমি—

আমি বাধা দিয়ে বলেছিলাম, আমি বুঝছি, স্যার।

তারপর আমি সুযোগমতো জানতে চেয়েছিলাম, আদালতে আপনি সেদিন বার বার সিলিঙের দিকে কী দেখছিলেন?

বৃদ্ধ কোনো জবাব দিলেন না। আত্মমগ্ন হয়ে কী যেন চিন্তা করতে থাকেন। আবার বলি, তাছাড়া ও ছোকরার নামটা যদি আপনার মনে নাই পড়ে তবে অহেতুক....

উনি হঠাৎ ঝুঁকে পড়ে আমার হাতখানা টেনে নিয়ে বলেন, তোমাকে সব কথা খুলে বলব, বাবা। কোনো একজনকে না বলতে পারলে আমার প্রাণটাও ঠাণ্ডা হচ্ছে না।....তাছাড়া তুমিই তো উপযুক্ত লোক! তুমি ওদের ভালবাস—ওদের জন্য তুমি ক্যাম্পে ক্যাম্পে ঘুরেছ। কত পরিশ্রম করেছ, শোন....

এরপর হের ফ্রাঙ্ক আমাকে যা বললেন, তাতে বুঝতে পারি যে, উনি চিন্তার পারম্পর্য হারিয়ে ফেলেছেন। বার্ষিক্যজনিত মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ; অথবা প্রচণ্ড শোকতাপের প্রতিক্রিয়ায়। আঘাত তো বড় কম পাননি।

একটু ভেবে নিয়ে বললেন, তুমি তখন জানতে চাইছিলে আমি আদালতের সিলিঙ-এর দিকে কী দেখছিলাম — তাই নয়?....তুমি বিশ্বাস করবে না আর্নস্ট, আমি দেখছিলাম, আনাকে!হ্যাঁ, আনা! হতভাগী একটা চটের থলি জড়িয়ে এই অ্যাতদূর এসেছিল! দু-হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে বসেছিল সিলিঙ ফ্যানটার ঠিক পাশে। আকাশে। ঠিক তুমি যেমন বর্ণনা করেছ তোমার বইতে! একেবারে কঙ্কালসার। হাড়-পাঁজরা বেরিয়ে পড়েছে! ওর সেই ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া সোনালী চুলের গোছা নেই—মাথাটা কামানো! আর....আর....উঃ! কী বীভৎস! আনা মা সম্পূর্ণ.... ঐ চটের থলিটা জড়িয়ে লজ্জা-নিবারণ করেছে! আমি কী বলব বাবা! ওর দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারছিলাম না।

যেটা আশঙ্কা করেছিলাম—তাই! নিদারুণ শোকে-তাপে....

উনি আপন মনে বলে চলে, লক্ষ্য করে দেখি আনা তার ঠোঁটে আঙুল ছুঁইয়েছে। মানে কী? ও আমাকে বারণ করছে?....ও কি ওই রাফেলটাকে ক্ষমা করতে বলছে? ওই

যে পিশাচটা মাত্র চল্লিশ গুল্ডেনের লোভে আট-আটটা তাজা প্রাণ....কিন্তু ওকে আমি শনাক্ত করলে ওর কী হবে? ফাঁসি? না, তা হবে না। হবে সশ্রম কারাদণ্ড। কিন্তু কতদিনের? ওই প্রতিবন্ধী মানুষটা কেমন করে সশ্রম কারাদণ্ডভোগ....

আবার তাকিয়ে দেখলাম ছেলেটার দিকে। একটা মাত্র চোখে কী করুণ মিনতি! হচ্ছে হলো জিঙ্কস করি : ওই চেহারা নিয়ে কেন তুই বাঁচতে চাইছিস হতভাগা? আয়নায় ইদানীং তোর মুখটা দেখেছিস? দেখিসনি? কেন? গা গুলিয়ে ওঠে বলে?

এই সময় পাবলিক প্রসিকিউটর আবার তাগাদা দিলেন, কী হলো? বলুন? ওর নামটা কি আপনার মনে আছে?

না নেই! মনে থাকার প্রশ্নই নেই—নামটা কখনো শুনিনি। আনা বা মার্গট বলেনি। আমি শুধু স্পেসিসটাকে চিনি! আমি আদালতকে সব কথা খুলে বলতাম। বলতাম যে, নামটা জানি না, তবে আমি নিশ্চিতভাবে জানি ওই ছেলেটি আমার বড় মেয়ের কাছে কু প্রস্তাব করেছিল! মার্গট ঘৃণাভরে তা প্রত্যাখ্যান করে। তখন ওই রাস্কেলটা ছিল অ্যাপোলোর মতো সুদর্শন। আর সেই রাগে—প্রতিশোধ নিতে ও এস. এস. ক্যাম্প থেকে একটা অদ্ভুত মিলিটারি অর্ডার বার করিয়ে আনে। ফ্রাঙ্ক পরিবার থেকে একজন শ্রমিক চাই—নাহলে নাকি নাৎসি যুদ্ধ প্রচেষ্টা ব্যাহত হচ্ছে! না, কর্তা অটো ফ্রাঙ্ক নয়, গিন্নি এডিৎ ফ্রাঙ্ক নয়—ক্যাম্পে গিয়ে রিপোর্ট করতে হবে উদ্ভিন্ন-যৌবনা একটি নাবালিকাকে! যাতে তাকে কজার মধ্যে পেয়ে—

সিলিঙের দিকে আবার দৃষ্টি পড়ে। আনা তখনো চলে যায়নি। আমায় ইঙ্গিতে কী যেন বলছে! মনে হলো ও বলছে, তোমার প্রতিশোধম্পৃহা চরিতার্থ হলেই কি আমাদের ফেরত পাবে? ও তো চল্লিশ গুল্ডেন নিয়ে শুঁড়িখানায় যায়নি....

আমি রুখে উঠি : তুই জানিস? কী করে জানলি?

আনা জবাব দিতে পারেনি। তার আগেই পাবলিক প্রসিকিউটর আমাকে মৃদু ধমক দিয়ে বলে, সিলিঙের দিকে অমন করে কী দেখছেন? বলতে পারেন ছেলেটার নাম?

এই পর্যন্ত বলে বৃদ্ধ হঠাৎ চুপ করে গেলেন। কেমন যেন আত্মমগ্ন।

আমি প্রশ্ন করি, তারপর?

উনি নতনেত্রে কী যেন ভাবছিলেন। চোখ তুলে বললেন, আমি বাবা সজ্ঞানে কিছু বলিনি। কি জানি কেন, আমার অধরোষ্ঠ উচ্চারণ করে বসল একটা বিব্লিকাল নাম!

—বাইবেলের নাম? কী নাম?

—জুডাস ইস্কারিয়ট!

বুঝতে অসুবিধা হয় না : বৃদ্ধ উন্মাদ হতে বসেছেন!

আনা ফ্রাঙ্কের সন্ধান

1. *Anne Frank : The Diary of a Young Girl*, translated by B.M. Mooyart Doubleday, with an introduction by Elenor Roosevelt.
2. *Anne Frank* : An article by Richard Cavinton, published in the *Journal of Smithsonian Inst.*, Washington, July, 2001.
3. *Crystal Night* : Publications International Ltd. New York.
4. *The Holocaust Chronicle* : Publications International Ltd. New York.
5. *A History of Holocaust* : Baner Yehuda, New York 1982.
6. *Anne Frank : A Portrait of Courage* : Ernst Schnabel, 1958.
7. Mrs. Antara Basu Zych & Shri Amitabha Basu.

তিতিক্ষা

কার্ল ৭জিলার্ড

আমার জন্ম প্রথম বিশ্বযুদ্ধের উষামুহূর্তে—1914 সালে। ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরে। এক হিসাবে আমার জন্মটাই একটা ‘মিরাক্‌ল্’। মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়ে এই রূপরসসঙ্গগন্ধস্পর্শময় ধরণীর স্পর্শ পাওয়ার আগেই আমার মৃত্যু হবার কথা ছিল—মানে, ডাক্তারি শাস্ত্র অনুযায়ী। কিন্তু তা হলো না। আমি সুস্থভাবে মায়ের কোলে জন্ম নিলাম।

আসল ব্যাপারটা কী হয়েছিল জানেন? আমি মায়ের একমাত্র সন্তান। তিনি আমাকে গর্ভে ধারণ করেন অনেক বেশি বয়সে। মায়ের বয়স তখন আটত্রিশ। আমরা থাকতাম রাইন নদীর ধারে একটা দোতলা বাড়িতে। শুধু বাবা-মা, আর এক বিবাহ-বিচ্ছেদপ্রাপ্তা মাসি—মায়ের ছোট কাজিন। ডাক্তারবাবুরা বলেছিলেন মাতৃগর্ভে আমার অবস্থানটা নাকি ছিল অস্বাভাবিক—বেয়াড়া ধরনের। তাঁরা আশঙ্কা করেছিলেন, মায়ের ফর্সেপ-ডেলিভারি করা ছাড়া উপায় নেই—অর্থাৎ মাকে বাঁচাতে আমাকে মাতৃগর্ভেই প্রাণ দিতে হবে। ডাক্তারবাবু জ্রণের দেহ খণ্ড খণ্ড করে মাতৃগর্ভ থেকে কেটেকেটে বার করবেন। কী নৃশংস নয়? পরে শুনেছি, মা সেকথা জানতে পেরে গুমরে গুমরে কাঁদত। ডাক্তারবাবুকে জিপ্সেস করেছিল : সন্তানকে বাঁচাতে মায়ের জীবন দিলে সমস্যাটা এড়ানো যায় কি না। ডাক্তারবাবু রাজি হননি। তাঁর ধারণা সে চেষ্টা করলে মা আর শিশু দুজনেই হয়তো মারা যাবে। তাছাড়া মায়ের তো আবারও সন্তান হতে পারে। অনেক দিন হয়নি, ঠিক কথা,—কিন্তু একবার যখন গর্ভসংস্কার হয়েছে, তখন আবারও হতে পারে। প্রথম সন্তানের মৃত্যুটা তখন তিনি সহ্য করতে পারবেন। ভুলে যাবেন। ড্যাডও বোধকরি এই যুক্তিটা মনে না নিলেও মেনে নিয়েছিল—ঠিক জানি না।

কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য : মায়ের প্রসববেদনা যখন শুরু হল, তখন বিশ্বপ্রকৃতিও যেন আমার সঙ্গে শত্রুতা শুরু করল। সে এক ভয়ঙ্করী ঝড়ের রাত্রি। জানুয়ারির ঠাণ্ডা। মুশকিল এই যে, আমার ড্যাড মাস-দুই আগে কন্সক্রিপশনে যুদ্ধে যোগদান করতে বাধ্য হয়েছেন। বাড়িতে মা আর মাসি। মাসি টেলিফোনে ডাক্তারবাবুকে এমার্জেন্সি কল দিল। তিনি জানালেন—ওঁদের বাড়ির রাস্তায় প্রচণ্ড বরফ জমেছে। গাড়ি চলছে না। স্থানীয় কোনো দাই-টাইয়ের মাধ্যমে যা হোক একটা বিকল্প ব্যবস্থা করতে বললেন।

আমাদের বাড়িটা ছিল অভিজাত পাড়ায় : গ্যাস্কার স্ট্রাসে। পাশের বাড়িতেই থাকতেন এক ধনী ইহুদি পরিবার। ওই বাড়ির একজন ইহুদি মহিলা—এডিৎ ফ্রাঙ্ক ছিলেন মায়ের বান্ধবী। মায়ের প্রসববেদনা উঠেছে শুনে ঝড়জলের মধ্যেও তিনি এসে হাজির

হয়েছিলেন আমাদের বাড়ি। মাসি তাঁকে শুধালো : এ পাড়ায় কোনো ডাক্তার বা অভিজ্ঞ নার্স কি আছেন, যিনি ডেলিভারিটা করিয়ে দিতে পারেন? -

এডিং-আন্টি বলেন, আমার স্বামীকে জিজ্ঞেস করতে পারি, কিন্তু ঘটনাচক্রে কালই আমার এক কাজিন ব্রাদার আমাদের বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করেছেন। আজ সকালেই তাঁর ওয়ারসতে ফিরে যাবার কথা ছিল, দুর্যোগের জন্য যেতে পারেননি। তিনি পোল্যান্ডের একজন খুব নামকরা গাইনোকলজিস্ট। তাঁকে ডাকব?

যন্ত্রণায় কাৎরাতে কাৎরাতে মা নাকি বলেছিল, এ কথা কি জিজ্ঞেস করার? যাও, এখনি তাঁকে ডেকে নিয়ে এস। না হলে আমরা দুজনেই মরব।

শুনেছি, সেই ইহুদি-চিকিৎসকই নাকি সিজারিয়ান করে মাতৃগর্ভ থেকে আমাকে ভূমিষ্ঠ করান। তাঁকে আমি জ্ঞান হবার পর জীবনে কখনো দেখিনি। পোল্যান্ডে কখনো যাইনি আমি। শুনেছিলাম, ওয়ারসতে তাঁর নাকি একটা অফানেজও ছিল। ডাক্তারের নাম : জানুস কোরচখ!

চারবছর পরে ড্যাডি ফিরে এল। তখন সে মেজর হার্বার্ট ওজিলার্ড। সেই চারবছর বয়সেই জীবনে তাকে প্রথম দেখি।

বাপ-মায়ের বেশি বয়সের একমাত্র সন্তান। বেশ আদরে-সোহাগেই মানুষ হবার কথা। কিন্তু আমার ড্যাড ছিলেন কড়া প্রকৃতির জঙ্গী মানুষ—অন্তত আমার তাই মনে হতো বাল্যকালে। বুঝতে পারিনি, তিনি আমাকে মায়ের মতোই ভালবাসতেন।

আমার বাল্যকাল ও কৈশোর কেটেছে জার্মানির চরম দুর্দিনে। যুদ্ধাঞ্চ শেষ করতে করতেই জার্মানির এবং আমাদের সংসারে নুন আনতে পাশ্চাত্য ফুরাতো।

বাপি যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পরের বছর ভর্তি হলাম স্কুলে। সে আমলে ছেলে-মেয়ে ইহুদি-খ্রিস্টানেরা সবাই এক স্কুলেই পড়ত। আমার সঙ্গে বাল্যে-কৈশোরে অনেক ইহুদি ছেলে-মেয়ের বন্ধুত্ব হয়েছিল। তখনো আমি জানতাম না এই ইহুদিরাই হচ্ছে জার্মানির সব যন্ত্রণার মূল কারণ। সেটা জানতে পারলাম কৈশোর থেকে তারুণ্যে উত্তরণকালে, গৃহ ত্যাগ করার পর। তার আগে—বেশ কয়েকটি ইহুদি ছেলেমেয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আলাপ হয়েছিল। তার মধ্যে সব চেয়ে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হয়েছিল ঠিক পাশের বাড়ির একটি মেয়ের সঙ্গে। সে আমার চেয়ে একক্লাস নিচে পড়ত। আমরা দু-জনেই নিজের-নিজের সাইকেলে চেপে স্কুলে যেতাম। স্কুল ছুটির পর একসঙ্গে ফিরে আসতাম। এই সূত্রেই আলাপ রোজেলিনার সঙ্গে। রোজেলিনা হচ্ছে ফ্রাউ এডিং ফ্রাঙ্কের ছোট কাজিন-সিস্টার। এক বাড়িতেই থাকে ওরা। বাড়ি তো নয় : প্রাসাদ!

আমি স্কুল ফাইনাল পাস করলাম 1931-এ। রোজেলিনা পরের বছর পরীক্ষা দেবে। এই সময় একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল। দোষ আমার না রোজেলিনার, অথবা তার ভগ্নিপতির সে প্রশ্নের সমাধান করা যায়নি। হয়তো আসল অপরাধী আমাদের তিনজনের

একজনও নন। আসল অপরাধী সেই অলক্ষ্য দেবতাটি : কিউপিড !

আত্মকথা লিখতে বসেছি। সব কথাই অকপটে স্বীকার করে যাব। সেদিনকার ঘটনাও :

আমার বয়স তখন সতের, লীনার যোল।

ইতিমধ্যে আমাদের দুজনেরই বেশ কিছু পরিবর্তন হয়েছে। দেহে এবং মনে। লীনার মনের সব খবর আমি পাইনি; কিন্তু তার দেহের পরিবর্তনটা দিন-দিন প্রকট হয়ে পড়ছে। বুঝতে পারি, ওর হৃদয়ে যে ফুলটা ফুটতে চাইছে তারই যুগ্মপ্রকাশ বিকশিত হচ্ছে ওর বুকে। বিনা আইলাইনারেই তার চোখ দুটি সর্বদা কাজলকালো। গাল দুটিতে ডালিম ফুলের রঙ ধরেছে। ইদানীং সে আমার চোখে-চোখে তাকিয়ে কথা বলতে সঙ্কোচ করে। বুঝতে পারি, আমি যেমন করে তাকে পেতে চাই সেও হয়তো তেমনি আমার বাহুবন্ধনে ধরা দিতে চায়। বাধাটা কি ওর স্মৃটনোন্মুখ কিশোরীর সংকোচ ? কি জানি ? মাসখানেক ধরে লক্ষ্য করছি স্কুল ছুটির পর সে আমাকে এড়িয়ে বাড়ি ফেরে—যাতে দুজনে পাশাপাশি ফিরতে না হয়। সকালের দিকেও লুকিয়ে কখন যে রওনা দেয় বুঝে উঠতে পারি না। আগেকার দিনে সে এসে আমাদের বাড়ি কলবেল বাজাতো।

লীনারা বড়লোক। ওর ভগ্নিপতি হের অটো ফ্রাঙ্ক শুনেছি কোটিপতি। ফ্রাঙ্কফুর্টের শহরপ্রান্তে একটা কারখানার মালিক। আমস্টার্ডামেও তার একটা ফুড-প্রোডাকশন ফ্যাক্টরি আছে। আমরা মধ্যবিত্ত নয়, বস্ত্ত নিম্নমধ্যবিত্ত। ড্যাডির উপার্জন বলতে আর্মি-পেনশন আর ইনভ্যালিড পেনশন। বলতে ভুলে গেছি, ড্যাডি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে এসেছিল একখানা ঠ্যাঙ বিসর্জন দিয়ে। ক্রাচ-নির্ভর প্রতিবন্ধীর জীবন। জার্মানির অর্থনৈতিক বাজারও প্রতিবন্ধী। এক-ঠ্যাঙে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে। ড্যাডি নতুন চাকরি-বাকরি জোটাতে পারেনি। পুঁজি কিছু নেই যে ব্যবসা করবে। আর সে-কালের জার্মানিতে ব্যবসা করার সুযোগও ছিল না। ড্যাডি তার দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী করেছিল জার্মানির শাসকবৃন্দকে। সারাহেভোতে সার্বিয়ার এক মার্ভারার—কলেজের ছাত্র—বেমক্লা খুন করে বসল অস্ট্রিয়ার আর্চডিউক ফ্রাঞ্জ ফার্ডিনান্ডকে। তার সঙ্গে জার্মানির কী সম্পর্ক ? যদি বা থাকেই—তার জন্য কাইজার আর হিডেনবুর্গ ফ্রাঙ্ক রাজ্যটা আক্রমণ করে বসল কেন ? কেন বাধানো হলো প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ? —যে জন্য গোটা জার্মানির আজ এই চরম দুর্দশা, যেজন্য ড্যাডি একখানা ঠ্যাঙ খুঁয়ে আজ ক্রাচ-নির্ভর করুণার পাত্র! দুর্মনস্যতায় ড্যাডি দুনিয়ার পরে থাপ্পা।

যদিও আমরা পাশের বাড়ির প্রতিবেশী, তবু এই অর্থনৈতিক বৈষম্যের জন্যই আমাদের দু-পরিবারে ঘনিষ্ঠতা হয়নি। শুধু এডিং আন্টি মাঝে মাঝে আমাদের বাড়িতে আসতেন, মায়ের সঙ্গে দেখা করতে। কখনো বা তাঁর দুই মেয়েও আসত সঙ্গে সঙ্গে—মার্গি আর আনা। তারা তখন খুবই বাচ্চা। রোজেলিনা ছেলেবেলায় আসত, আমিও

ওদের বাড়িতে যেতাম। কিন্তু জ্ঞানবৃক্ষের ফল আশ্বাদনের পর—অর্থাৎ অর্থনৈতিক বৈষম্যটা সমঝে নেবার পর রোজেলিনা আর আমাদের বাড়িতে আসত না। আমিও যেতাম না ওদের বাড়ি। দারিদ্র্যের অভিমানে। তবু স্কুল যাতায়াতে দ্বিচক্রযানের ঘূর্ণাবর্তে খেলা আকাশের তলায় আমাদের কাফ-ল্যভটা অটুট ছিল। ইদানীং সেটাও বন্ধ হয়েছে—বোধকরি এবার ওপক্ষের রূপের দেমাকে।

আমাদের পাড়ায় ছিল একটাই খেলার মাঠ। সমবয়সীরা মিলে সেখানে খেলতাম, হৈ-হুল্লোড় করতাম। যৌবনোদ্যমের লক্ষণ দেখা দিতেই ছেলেরা আর মেয়েরা পৃথক দলে হৈ-হুল্লোড় করত। ব্যতিক্রম কি নেই? ছিল। আমাদের দলের কোনো কোনো ভাগ্যবান ও-দলের কোনো ভাগ্যবতীর সঙ্গে নতুন ধরনের বন্ধুত্ব পাতাতে শুরু করল। তারা দু-দল থেকেই দলছুট হয়ে গেল। যাবে না? ডেটিং করেছে যে! সতের বছর বয়সেও আমার তেমন কোনো বান্ধবী জোটেনি। লীনার জুটেছিল কি না খবর পাইনি। তবে জোড়-বেঁধে কারও সঙ্গে তাকে পথে-ঘাটে, ব্যালে নাচের আসরে বা সিনেমাতে যেতে দেখিনি। বেশ কয়েকজন জার্মান কিশোরীর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আমার দিকে ঝুঁকেওছিল। নিজে মুখেই বলতে হচ্ছে, আমি রীতিমতো সুন্দর ছিলাম সে বয়সে। স্কুল টিমের বাইচ দলে আমি ছিলাম বাঁধা ‘কক্সসোয়েন’। রাইন নদীতে বার্ষিক প্রতিযোগিতায় ফ্রাঙ্কফুর্টের স্কুলগুলোর টুর্নামেন্টে আমরা একবার চ্যাম্পিয়ানও হয়েছি। স্কুলের ছাত্রীরা ব্রিজের উপর দাঁড়িয়ে নৌকার উপর পুষ্পবৃষ্টি করেছে। অনেক মেয়ে আমার দিকে ঝুঁকলেও আমি কারও সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করিনি। সবার আগে আমি বুঝে নিতে চাইছিলাম—লীনা আমাকে কী চোখে দেখে। তার প্রতি আমার যে মনোভাব—কাফ-ল্যভ—ক্রমে রূপান্তরিত হচ্ছে অন্য এক জাতের আকর্ষণে, সেটা কি তার তরফেও হচ্ছে? জানার উপায় নেই। লীনা একেবারে অন্তরালে সরে গেছে।

মাসি একদিন আচমকা আমাকে প্রশ্ন করে, হ্যাঁরে কার্ল, লীনার সঙ্গে কি তোর ঝগড়া হয়েছে?

—না তো! হঠাৎ এ-কথা কেন?

—তোরা তো আর একসঙ্গে সাইকেলে চেপে বেড়াস নে?

—ও, এই কথা! তুমি ভুলে গেছ মাসি, তোমার বোনপো স্কুলে যাবার পাট চুকিয়েছে। তখন দুজনে একই সঙ্গে সাইকেলে চেপে স্কুলে যাতায়াত করতাম—

—তা কি আমি জানি না? কথা তা নয়, কিন্তু লীনার কী হয়েছে বলতো? মার্গট বলল, ও নাকি আর স্কুলে যায় না। তারপর কাল দেখলাম ওদের পিছনের বাগানে, আপেল গাছটার তলায় ও একা বসে বসে কাঁদছে!

—কাঁদছে। কেন? কাঁদবে কেন? তুমি কোথা থেকে দেখতে পেল?

—তিনতলার অ্যাটিক ঘর থেকে।

—ভুল দেখেছ। লীনা খামোখা কাঁদতে যাবে কেন ?

মাসি কথাটা মেনে নিতে পারল কি না জানি না। কিন্তু আমার নিজের মন সেটা মেনে নিল না। কী হয়েছে লীনার ? ওর দিদি বা ভগ্নিপতির সঙ্গে ঝগড়া ? তাহলে স্কুলে যাওয়া বন্ধ করবে কেন ? তবে কি কোনো দুরারোগ্য ব্যাধি ? কনজাক্ষশন ? ক্যান্সার ?

নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলাম না। সেদিন বিকেলবেলা—আমার জানা ছিল হের অটো ফ্রাঙ্ক রাত আটটার আগে কারখানা থেকে বাড়ি ফেরেন না—তাই সাহস করে ওদের বাড়ির ডোরবেল বাজাই। একটু পরে সদর খুলে দিল লীনা নিজেই। আমাকে দেখে সে যেন ভূত দেখল। বলল, একি! তুমি ?

বলি, চিনতে পেরেছ তাহলে! হ্যাঁ, আমি তো এই পাশের বাড়িটাতেই থাকি। তা আমাকে দেখে অমন আঁৎকে উঠলে কেন লীনা ?

কোথাও কিছু নেই, ও বারবারিয়ে কেঁদে ফেলে। আমি অপ্রস্তুত। বলি, কী হয়েছে, লীনা ? আমাকে খুলে বল—

—এখানে নয়। এখানে হয়তো দিদি বা আর কেউ এসে যাবে। এস আমার সঙ্গে।

চোখ মুছে ও আমাকে নিয়ে গেল পিছনের বাগানে। এলাকাটা নির্জন। আলো-আঁধারি। দুজনে বসলাম একটা এলুম্ গাছের নিচে সিমেন্ট-বাঁধানো বেদীতে। বলি, এবার বল।

প্রশ্ন করা সহজ। কিন্তু বলা ? পুরুষবন্ধুর কাছে ? যার সঙ্গে দীর্ঘদিনের কাফ-ল্যাভ—অথচ যে কোনোদিন সাহস করে ওই স্ফুটনোন্মুখ ফুলের কুঁড়িটাকে আদর করার সাহস সঞ্চয় করতে পারেনি। ও যে আর স্ফুটনোন্মুখ নয়—ও যে ফুটতে শুরু করেছে, তা যে লক্ষ্যই করল না। আর তাই তো ওর নারীত্বের এই অবমাননা। সেসব কথা কি বাল্যবন্ধুকে বলা যায় ? সব—সব কথা ? কার্ল ওর নিজের ভাই হলেই কি পারত ?

—কই বল ?

তবু ও মুখ নিচু করে কী-যেন ভাবতে থাকে। বোধ হয় মনে মনে ঘটনাগুলো সাজিয়ে নিচ্ছে। আমি ওকে আর তাগদা দিইনি। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করি।

বাস্তবে কয়েকটি জার্মান সহপাঠী ওকে নিয়ে অশ্লীল ইঙ্গিত করে। ইচ্ছে করে ধাক্কা মেরে বলে, ‘সরি!’ গায়ে হাত দেবার চেষ্টা করে। স্কুল ছুটির পর প্রতিদিনই দেখে কে বা কারা ওর সাইকেলের চাকায় হাওয়া বার করে দিয়েছে। ও নিক্কথায় মাথা নিচু করে সাইকেলের চাকায় আবার পাম্প করে। সেদিন হঠাৎ একটা চ্যাঙড়া ছেলে এগিয়ে এসে বললে, এ কী লীনা! আজও তোমার সাইকেলটা লীক হয়ে গেছে! কী কাণ্ড! তুমি সরে দাঁড়াও। আমি পাম্প করে দিচ্ছি। এ কি মেয়েদের কাজ ? আমি এমন জোরে জোরে

পাম্প করতে পারি যাতে পাঁচমিনিটের মধ্যেই চাকাটার ‘অর্গাজম’ হয়ে যাবে।

রোজেলিনা রুখে উঠছিল : কী! কী বললে?

ছেলেটা ন্যাকা সেজে বলে, আয় বাপ! আমি কি বেসামাল কিছু বলে ফেলেছি? আমি তো বলেছি—পাঁচমিনিটের ভিতর চাকাটা ফুলে ফেঁপে উঠবে। রোজেলিনা মুখ তুলে দেখে ওদেরই ক্লাসের দু-তিনটি মেয়ে দূরে দাঁড়িয়ে মুখে রুমাল দিয়ে হাসি চাপছে। আর একটা চ্যাণ্ডা ছেলে হঠাৎ এগিয়ে এসে প্রথমজনকে ধাক্কা মেরে বললে, তুই একটা ক্যাডাভ্যারাস! ভদ্র ভাষায় কথা কইতেও শিখলি না? সাইকেলের চাকার কি ‘অর্গাজম’ হয়? সে হয় ‘ইয়েদের’! তোর দ্বারা হবে না। তুই সরে দাঁড়া, দেখ আমি কেমন ধীরে ধীরে পাম্প করি। পাঁচমিনিটেই ওর চাকাটা বলবে : ‘ওগো আর সইতে পারছি না! এবার আমাকে ছেড়ে দাও!’

এবার আর মেয়েগুলো তাদের হাসি রুমালচাপা দিয়ে রাখতে পারল না। এ ছেলেটার মেয়েলি গলায় অভিনয় শুনে খিলখিলিয়ে হেসে উঠল সমস্বরে।

আর ঠিক তখনি—রাগে, অপমানে, রোজেলিনা ঝরঝরিয়ে কেঁদে ফেলেছিল। ঠিক সেই সময়েই প্রতিবাদ করে বসল একটা নিচু ক্লাসের বাচ্চা জার্মান ছেলে—ক্লাস ফাইভের। এগিয়ে এসে বড় ছেলেগুলোকে বললে, এই! তোমরা দিদিকে কী বলেছ? ও কাঁদছে কেন?

—তুই ভাগ! —রুখে উঠেছিল চ্যাণ্ডার দল—একটা থাপ্পড় মারলে তো উল্টে পড়বি।

ছেলেটার দুর্জয় সাহস! সে চিৎকার করে উঠল, স্যার! শিল্লির আসুন। এরা দিদিকে মারছে।

ও পাশ দিয়ে নিজের মনে স্কুল গেটের দিকে যাচ্ছিলেন ব্রাদার গ্রোভার। ওদের শিক্ষক। তিনি ছুটে এলেন। চ্যাণ্ডাগুলো দুদাড়িয়ে পালালো। লীনার সহপাঠিনীরাও সুটসাঁট সরে পড়ে। ব্রাদার গ্রোভার এগিয়ে এসে বললেন, কী হয়েছে মাই চাইল্ড? ওরা কি তোমার গায়ে হাত দিয়েছিল?

—নাইন, স্যার!

—তাহলে তুমি কাঁদছ কেন? এই বাচ্চা ছেলেটাই বা আমাকে অমন করে ডাকল কেন? বল—বল—সঙ্কোচ কর না। কেন ওরা তোমাকে উত্যক্ত করছিল?

রোজেলিনা আর সামলাতে পারে না নিজে। বলে ফেলে, যেহেতু আমি ‘জুডেন’!

—জুডেন? আই সী! নো মাই চাইল্ড! তুমি ‘জুডেন’ নও, তুমি ‘জিওনিস্ট’—

—‘জুডাইসম’ ধর্মের। তুমি তো হের অটো ফ্রাঙ্কের বাড়িতে থাক। তাই না?

রোজেলিনা গ্রীবা সঞ্চালনে স্বীকার করেছিল।

—অল রাইট। তুমি সরে দাঁড়াও। আমি তোমার সাইকেলটা পাম্প করে দিই।

—থ্যাঙ্কস ব্রাদার। আমি নিজেই সেটা করতে পারব।

—কিন্তু কেন? আমি পাম্পটা করে দিলে তোমার আপত্তি কোথায়?

রোজেলিনা তার অশ্রু-আর্দ্র চোখ দুটি তুলে বলেছিল, বিকজ ব্রাদার, যীশাস সেড : ‘ওয়ান শুড ক্যারি ওয়ান্স ওঁন ক্রস’ [কারণ স্যার, যীশু বলেছিলেন : প্রত্যেককে নিজের নিজের ক্রুশকাঠ বহন করে নিয়ে যেতে হয়।]

ব্রাদার গ্রোভার ওর মাথায় হাত রেখে বলেছিলেন, লর্ড ব্লেস ইউ, মাই চাইল্ড!

কিন্তু এত কথা লীনা বলতে পারল না তার বন্ধুকে। রেখে ঢেকে যেটুকু বলা সম্ভব তাই শুনিয়ে দিল।

আমি জানতে চেয়েছিলাম, ওদের নামগুলো বল তো? আমি নিশ্চয় চিনতে পারব।

—না, কার্ল! ওরা দলে ভারি। ওদের সঙ্গে অসভ্যতা করে পার পাবে না। অহেতুক একটা রক্তারক্তি হবে। তাছাড়া—কী দরকার? আমি তো স্কুল ছেড়েই দিছি—

—সেকি! স্কুল ছেড়ে দিছি? আর পড়বে না? কেন?

—আমাকে দিদি ব্রাসেল্‌স্ পাঠিয়ে দিচ্ছে। আমি আর জার্মানিতে থাকবই না। এডিংকে আমি সব কথা খুলে বলেছি। দিদি বললে, এ আমাদের নিয়তি। আমার বয়সী মেয়েদের জার্মানি ছেড়ে চলে যাওয়াই মঙ্গল। ব্রাসেল্‌স্-এ আমার এক মাসি আছে, তার কাছে থাকব।

জিজ্ঞেস করি, কিন্তু এত মেয়ে থাকতে ওরা তোমাকেই বা বেছে নিল কেন? তোমাদের ক্লাসে তো আরও পাঁচটা মেয়ে আছে?

—আছে। কিন্তু আমিই যে একমাত্র ‘জুডেন’।

বিশ্বাস করুন! আমি ব্যাপারটা সেদিন বুঝে উঠতে পারিনি। জানতে চাই, তুমি ইহুদি। মানছি। তাতে কী?

—তুমি কি অন্তত অ্যাডলফ্ হিটলারের নামটা শুনেছ? নাৎসি পার্টির।

—না শুনিনি। কে সে?

—তার মানে, তুমি খবরের কাগজটাও পড় না?

—না, পড়ি না। তাতে কী হলো?

—সে ক্ষেত্রে তোমাকে সব কথা বোঝাতে আমার রাত কাবার হয়ে যাবে। তার আগেই জামাইবাবু ফিরে আসবে। তুমি বরং অন্য কারও কাছ থেকে জেনে নিও—কেন ওরা শুধু আমার গায়েই হাত দিতে চায়।

—না হয় তাই নেব। কিন্তু তোমার প্রতি যে অন্যায় অসভ্যতাটা হয়েছে, হচ্ছে, তার প্রতিকারের একটা চেষ্টা তো আমাদের করা উচিত। তুমি ঐ বাঁদরগুলোর নাম বল। আমি প্রিন্সিপালকে সব কথা জানাব।

—কোনো লাভ নেই, কার্ল। প্রিন্সিপাল নিজেই একজন খাঁটি নর্ডিক জার্মান।

হান্ডেড পার্সেন্ট আর্থ। হিটলারের একান্ত অনুগামী।

আবার সেই অজানা-অচেনা লোকটার প্রসঙ্গ : হিটলার!

আমার সেদিন অর্থবোধ হয়নি। প্রসঙ্গান্তরে যাবার চেষ্টা করি। জানতে চাই, ওরা কি শুধু দূর থেকে অশ্লীল রসিকতাই করত?

—না! ওদের একটা বীভৎস খেলা ছিল। একজন দ্বিতীয়জনকে হঠাৎ আমার দিকে ঠেলে দিত। সে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাবার অভিনয় করে আমাকে ‘পঈং’ করার চেষ্টা করত। আমি যদি তাকে বলতাম—‘একী! আমার গায়ে হাত দিচ্ছ কেন?’ সে ন্যাকা সেজে বলত, ‘সরি ফ্রলিন, কিন্তু আমার কী দোষ? —ওই বাঁদরটা আমাকে ধাক্কা মারল যে। আমি তো ভারসাম্য রাখতে যা হাতের কাছে পেয়েছি তাই আঁকড়ে ধরেছি।’ আর প্রথম জন কৈফিয়ৎ দিত, ‘আমার বিরুদ্ধে তোমার কোনও অভিযোগ থাকবার কথা নয়, বোজেলিনা। আমি তোমাকে টাচ পর্যন্ত করিনি। বন্ধুকে রসিকতা করে ধাক্কা মেরেছি। ব্যস! সে যদি তোমার গায়ে হাত দিয়ে থাকে...’

আমি সেদিন বোকার মতো প্রশ্ন করেছিলাম, ‘গায়ে হাত দিয়ে থাকে’ মানে কী?

—তুমি কি ন্যাকা, না সেইন্ট? ‘যুবতী মেয়ের গায়ে হাত দেওয়ার’ মানে বোঝ না?

তা বুঝব না কেন? বুঝি। জানতে চেয়েছিলাম, ওরা কি কোনোদিন তোমাকে জোর করে চুমুটু মুখেতে চেয়েছিল?

লীনা একমুহূর্ত আমার দিকে নিশ্চুপ তাকিয়ে থাকল। তারপর বলে, চেয়েছিল কি না জানি না। সাহস পায়নি। তাহলে আমি তাকে একটা থাপ্পড় কষিয়ে দিতাম।

—যেহেতু সে চুপন দু’পক্ষের সম্মতিক্রমে নয়? তাই তো?

—নিশ্চয়! সেটা তো একটা বলাৎকার! আমি নির্ঘাৎ ঠাশ করে তার গালে একটা বিরাশিসিদ্ধা থাপ্পড় মেরে বসতাম।

আমার কী যেন মতিভ্রম হলো। হঠাৎ ওর হাতখানা তুলে নিয়ে বলি, কিন্তু, লি, আমি যদি তোমার সম্মতিক্রমেই আজ সেই চেষ্টা করি? যদি তোমাকে এই মুহূর্তে আমার বুকে টেনে নিয়ে.....

ও আঁৎকে ওঠে। বলে, মানে? কী বলছ তুমি? এখানে? এখন?

—আমি যদি এই মুহূর্তে তোমার মুখে চুমু খাই, তাহলে তুমি কি আমাকেও একটা বিরাশিসিদ্ধা থাপ্পড় কষাবে?

ও চমকে ওঠে। হঠাৎ কেমন যেন বিহ্বল হয়ে পড়ে। জবাব দিতে পারে না। সে যেন তার বোধসীমার শেষপ্রান্তে পৌঁছে গেছে। আমার মনে হলো—এটা বুঝি ওর দীর্ঘ দিনের এক ঝলক হঠাৎ প্রাপ্তি। অবদমিত ইচ্ছার এক জ্যাকপট! অর্থনৈতিক বৈষম্য নয়, রূপের দেমাক নয়, তার বাল্যবন্ধুর শম্বুকবৃত্তিতেই, তার ভীকৃতার বিরুদ্ধেই ছিল

অভিমানিনীর অভিমান। ওর হয়েছে, অথচ ওর বয়-ফ্রেন্ডের হয়নি : কাফল্যভ থেকে যৌবরাজ্যে উত্তরণ! তাই সে এতদিন অন্তরালে মুখ লুকিয়ে কেঁদেছে! প্রত্যাশা কাঁপছে ওর দু'চোখের পাতায়, কিন্তু মুখে সে বলল অন্যকথা : মানে! এ তুমি কী বলছ কার্ল!... তুমি... এমন হঠাৎ...

—হ্যাঁ, জীবনের পরমলগ্ন তো এমন হঠাৎই আসে, লি! দেখ, যেন সেই পরমপ্রাপ্তিটা আমার একার না হয়। একতরফা না হয়...প্রিজ!

নিবিড় আবেষ্টনীতে ওকে বৃকে টেনে নিই। মুখটা নামিয়ে আনি। অন্তসূর্যের প্রত্যাশায় পশ্চিমদিগন্ত যেমন রাঙিয়ে ওঠে তেমনি সে আল্পেষয়নার ভঙ্গিতে লুটিয়ে পড়ে আমার কোলে। চোখ দুটি বুজে যায়। ঠোঁট দুটি একটু ফাঁক করে প্রতীক্ষা করে। কিন্তু আমাদের ওষ্ঠাধর মিলিত হয় না। তার আগেই পিছন থেকে কে যেন গর্জে ওঠে : স্টপ ইট!

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো উঠে দাঁড়াই। লীনা আমার বাহুবন্ধনচ্যুত হয়ে গাছটায় পিঠ দিয়ে লুটিয়ে পড়ে। এপাশ ফিরে দেখি গৃহকর্তা : হের অটো ফ্রাঙ্ক। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই ভর্ৎসনামিশ্রিত কণ্ঠে বলে ওঠেন, গেট আপ ইয়াং ম্যান! অ্যান্ড লীড দিস প্রেমিসেস আট ওয়াস!

আমি ততক্ষণে স্বাভাবিক হয়েছি। সামলে নিয়ে বলি, আপনি আমাকে চিনতে পারেননি আঙ্কল ফ্রাঙ্ক। আমি... আমি... এই ঠিক পাশের বাড়িতেই থাকি। লীনার বন্ধু... কার্ল ওজিলার্ড!

—কে তোমার আঙ্কল? আমি নই! তুমি নর্ডিক এরিয়ান। আমি হিটলর, জুডেন! যে মেয়েটির দুর্বলতার সুযোগ নিতে যাচ্ছিলে সেও জুডেন! জু!

আমি এ পাশে ফিরি। লীনার দিকে। প্রত্যাশা : সে কিছু বলুক। বলুক, যে আমি তাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে... অন্তত এটুকু বলুক যে, আমি তার বয়-ফ্রেন্ড!

কিন্তু আশ্চর্য! রোজেলিনা একটা কথাও বলল না। যেমন ছিল তেমনি বসেই থাকল ঘাড় গুঁজে। আমি হয়তো আরও কিছু বলতাম। কিন্তু তখনি শুনতে পেলাম দ্বিতল থেকে এক ভয়ঙ্কর সারমেয় গর্জন।

ওদের সেই অ্যালসেশিয়ানটা!

—কোনো কথা নয়, সিম্পলি গেট আউট!

মাথা নিচু করে সেই ধনীর প্রাসাদ থেকে বের হয়ে এসেছিলাম।

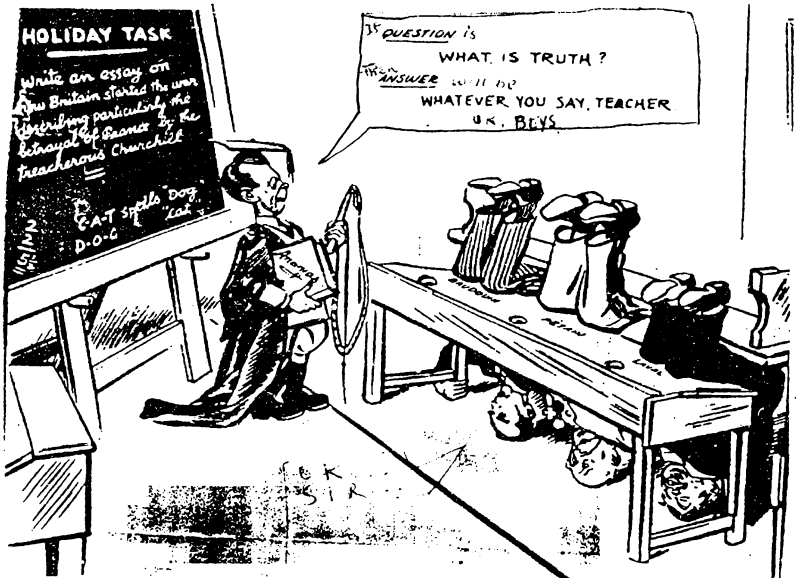
দ্বিতীয়বার সে বাড়িতে প্রবেশ করিনি জীবনে।

বিস্তারিত লেখার কিছু নেই। এই দুর্ঘটনার দু-দিন পরে, তৃতীয় দিন ভোররাতে আমি গৃহত্যাগ করি। একবস্ত্রে। মাকে একখানা চিঠি লিখে রেখে যাই : আমার খোঁজ নেবার চেষ্টা কর না। উপার্জনক্ষম হবার পর আমি নিজেই যোগাযোগ করব। ফিরে আসব। তুমি হয়তো আমার নামে অনেক অভিযোগ শুনবে—আমার বেলেল্লাপনার

কথা—হয়তো অটো ফ্রাঙ্ক তা জানাবেন ড্যাডকে, অথবা ফ্রাউ এডিৎ শোনাবেন তোমাকে। তাঁদের জানিও—‘আমার ছেলে তো বাড়ি ছেড়ে চলেই গেছে, আবার ওকথা কেন?’ শুধু তোমাকে একটা কথা চুপি চুপি বলে যাই, মা, বিশ্বাস রেখ—তোমার ছেলে জীবনে কখনো কোনো অন্যায় করবে না। সে নিজের বিবেকের নির্দেশেই চলবে।

কাজ খুঁজে পাওয়া—উপার্জনশীল হওয়া, সে যুগের জার্মানিতে ছিল নিতান্ত অসম্ভব কথা। জার্মানির সে যুগটাকে আপনারা চেনেন না, ধারণাই করতে পারবেন না। হয়তো রেমার্কের ‘থ্রি কমরেডস্’ বইটাতে তার কিছু কিছু আভাস পেয়েছেন।

আমার কিন্তু ভাগ্য ভাল—দুর্দান্ত ভাল। আমি গিয়ে সরাসরি নাম লিখিয়েছিলাম ‘হিটলার্স ইউথ ক্লাবে’। যুদ্ধবিধ্বস্ত জার্মানিকে প্রাচীন গৌরবের পথে, সমৃদ্ধির পথে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার ব্রত এই ক্লাবের। দু-দিন আগেও যাঁর নাম জানতাম না—সেই অ্যাডলফ হিটলার একসপ্তাহের মধ্যেই হয়ে গেলেন আমার ধ্রুবতারকা। পথপ্রদর্শক, গুরু। তখনো তাঁকে স্বচক্ষে দেখিনি—কিন্তু প্রথমেই রাত জেগে পড়ে ফেলতে হলো নাৎসি জার্মানির নয়া বাইবেল : *মেইন ক্যাম্ফ!* আমরা ক্লাব সংলগ্ন ছাত্রাবাসে থাকতাম। প্রতিদিন সন্ধ্যায় ক্লাবঘরে বসে শুনতে হতো রেকর্ড করা ফ্যুরারের বাণী। কখনো বা তাঁর মন্ত্রশিষ্য গোয়েবলস্-এর। প্রথম প্রথম সব কথা বুঝতে বা বিশ্বাস করতে পারতাম না।



July 11, 1940

NEW PUPILS AT DR. GOBBEL'S ACADEMY

ক্রমে শুনতে শুনতে মনে হলো : এটাই চরম সত্য! জার্মানিকে এই নির্যাতন অস্বীকার করে আবার মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে। ফিরে যেতে হবে আবার সেই আমাদের স্বর্ণযুগে। জার্মানির আদর্শ দিগ্বিজয়ীদের আশীর্বাদ ব্যর্থ হবার নয় : ফ্রাঙ্কো-জার্মান রাষ্ট্রনেতা অটো লিওপোল্ড বিসমার্ক—যিনি ডেনমার্ক থেকে রাশিয়ার আধাআধি পর্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন, তার আগে বার্লিনজাত ফ্রেড্রিক দ্য গ্রেট সমস্ত মধ্য ইউরোপকে এক শাসনছত্রতলে নিয়ে এসেছিলেন। তারও আগে অষ্টম শতাব্দীর চার্লস দ্য গ্রেট অর্থাৎ শার্লমেন—পাশ্চাত্য জগতকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন জার্মানির আর্যদের আকাশচুম্বী ক্ষমতা। সাহিত্যে গ্যোটে, সঙ্গীতে বিতোফেন; ধর্মসংস্কারে মার্টিন লুথার; প্রাচ্যদর্শন-বিজয়ী ম্যাক্সমুলার, সমাজতত্ত্বে কার্ল মার্কস, বিজ্ঞানে আইনস্টাইন, অটো হান, হাইজেনবার্গ! জার্মানির তুলনা কোথায়?

জোসেফ গোয়েবল্‌স তরুণ জার্মানিকে উচ্চাশার সপ্তম স্বর্গে তুলে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন—প্রচারমন্ত্রকের শিরোমণিরূপে। তাঁর কথা আমরা বেদবাক্য বলে মনে করতাম।

[লেখকের প্রতিবেদন : যুদ্ধকালে গোয়েবল্‌-এর প্রচার পারদর্শিতার প্রতি ব্যঙ্গ করে বিশ্বের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ পোলিটিকাল কার্টুনিস্ট স্যার ডেভিড লো একটি ব্যঙ্গচিত্র লন্ডনের ঈভনিং স্ট্যান্ডার্ডে প্রকাশ করেছিলেন। আপনারা তা দেখেননি। আর আমরা তা ভুলতে পারিনি। ব্যঙ্গ চিত্রের ক্যাপশান ছিল : ডক্টর গোয়েবল্‌-এর শিক্ষায়তন।]

ফ্রাঙ্ক ফুর্টের বড় বড় রাস্তায় আমরা মার্চ করতাম। তখন সারা শহরে যানজট হতো। একই পোশাকে, একই ব্যাচ এঁটে আমরা একই তালে শহরের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে মার্চ করে যেতাম। সারা শহর তখন স্তব্ধ। প্রথম প্রথম ওরা বিরক্ত হতো, ক্রমে কৌতূহলী—শেষমেশ আনন্দে উল্লাসধ্বনি দিত। ওরাও বিশ্বাস করতে শুরু করল—এই নয়া-জমানার নর্ডিক-তারুণ্য জার্মানিকে পুনরুদ্ধার করবে। ভার্সাই চুক্তিটাকে এরাই পারবে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলতে!

হস্টেলে আমাদের খাওয়া-থাকা ফ্রি। বেশ ভাল ব্যবস্থা। এমন কি সিগারেট বা বিয়ারও ডয়েশমার্ক দিয়ে কিনতে হতো না। মনে প্রশ্ন জাগল—এই অভাবগ্রস্ত জার্মানিতে পার্টি এত খরচ করছে কী ভাবে? ক্রমে জানতে পারি সে কথাও : এতদিন জার্মানির রক্ত শোষণ করে ওই ইহুদির দল কুবেরির্ষিত ধনসম্পদ সঞ্চয় করেছে। অথচ জার্মানির উন্নতিতে তাদের কোনো অবদান নেই। তা, সেটা তো আমার প্রত্যক্ষ করা সত্য। ড্যাড জার্মানির জন্য একটা ঠ্যাঙ খোয়াল, আর পাশের বাড়ি অটো ফ্রাঙ্ক যুদ্ধের মওকায় একটা নতুন কারবার খুলে বসল। এ সব তো আমার স্বচক্ষে দেখা।

মাসান্তে মাহিনাও পেলাম। মাহিনা! কেন?

আমাদের পাটির স্কোয়াড্রন-লীডার ক্যাপ্টেন হের কিটেল বললেন, ইউথ ক্লাবের প্রত্যেকটি সেবককে মাস-মাহিনা দেওয়া হয়।

আমি ক্যাপ্টেনের কাছে দেড় দিনের ছুটি চাইলাম। প্রথম মাসের মাহিনাটা ড্যাডিকে দিয়ে আসব। সে এককথায় রাজি হয়ে গেল। বললে, পরশু সকালের রোলকলে যেন শ্রীমানকে দেখতে পাই।...তা মাহিনার প্যাকেটটা তো ড্যাড অথবা মমকে দিবি। তোর গার্ল-ফ্রেন্ডের জন্য কী নিয়ে যাচ্ছিস?

জবাব দিতে স্বভাবতই দেরি হয়। ক্যাপ্টেনকে কতটা বলব?

ও নিজে থেকেই বললে, তাকে এই উপহারটা দিস।

টেবিলের ড্রয়ার থেকে একটা জড়োয়া ব্রোচ বার করে দেয়। আমি চমকে উঠি। এত দামী গহনা ও পেল কোথায়? জানতে চাই সে-কথা।

ক্যাপ্টেন বলে, রাজারা মানিক কোথায় পায় রে? জানিস না? নিয়ে যা এটা। সে দারুণ খুশি হবে। নিজে থেকেই তোর বিছানায় শুতে চাইবে।

স্বীকারই করে ফেলি, না ক্যাপ্টেন, আমার কোনো গার্ল-ফ্রেন্ড নেই।

—সেকীরে! এই জন্যেই তোকে ‘বুদ্ধ’ বলে ডাকি। সতের বছর বয়স হলো এখনো একটা ডাঁটো মতন বান্ধবী জোটাতে পারিসনি!

বলি, ছিল। তার সঙ্গে সব সম্পর্ক ছেদ করে চলে এসেছি...

—কেন রে বুদ্ধ? সে তোর বিছানায় শুতে রাজি হলো না বলে?

—মেয়েটা ইহুদি!

—ও লর্ড! তা ভালই করেছিস! জুডেন-মাগীকে নিয়ে দু-এক রাত এক বিছানায় শুয়ে ফুটিফার্তা করা যায়, কিন্তু তাকে বান্ধবী করা চলে না। বিয়ে তো ‘অ্যানাথেমা’।

—এই ব্রোচটা তুমি ফেরত নাও, ক্যাপ্টেন।

—তা হয় না। আমি যাকে যা দিই তা আর ফেরত নিই না। তা জুডেন মাগীটাকে তাড়িয়েছিস মানে তো এ নয় যে, আর কোনো সুন্দরী তোর প্রেমে পড়বে না?

ক্যাপ্টেন কিটেল ছিল এমনই মানুষ। ক্লাব হস্টেলে যখন সে অফ-ডিউটি তখন তার সবার সঙ্গে গলায় গলায় দোস্তি। একটানা কাঁচা খিস্তি চালিয়ে যাবে। ক্যাডারদের নানান নামকরণ করেছিল সে। আমাকে আদর করে ডাকত : বুদ্ধ। আবার প্যারেড গ্রাউন্ডে তার অন্য মূর্তি। সেখানে সে পান থেকে চুন খসতে দেবে না। আমরা যখন অ্যাটেনশনে দাঁড়াই তখন কারও জুতোর পালিশ যদি আয়নার মতো চকচকে না হয়, জামার বোতাম খোলা থাকে, তাহলে ঠাঁই করে বসিয়ে দেবে এক ব্যাটনের বাড়ি। ডিসপ্লিনের বিন্দুমাত্র বিচ্যুতি সে সহিতে পারে না। আবার কিন্তু অপারেশনে তার আর এক মূর্তি। নির্ভীক, দুঃসাহসিক সৈনিক। কমরেডদের আড়াল করে গুলি চালাবে, মৃত্যুভয় তুচ্ছ করে। ওর হাতের টিপও ছিল অসাধারণ।

মনে আছে, আমরা সবাই মিলে একবার পিকনিক গিয়েছিলাম স্টুপেন্ডাস-লেক-এ। ওয়েপন-কেরিয়ারে প্রায় পঞ্চাশজন। হিটলার্স ইয়ুথদের চিত্তবিনোদনের জন্য মাঝে মাঝে পার্টি থেকে অর্থবরাদ্দ করা হতো। জার্মানির সাধারণ জনসাধারণ হয়তো শুধু আলু খেয়ে দিন গুজরান করছে, আর আমরা পিকনিকে গিয়ে চিকেন-রোস্ট দিয়ে বিয়ারের বন্যা বইয়ে দিতাম। কেন দেব না? আমরা তো জার্মানির জন্য মৃত্যুমুঠোয় উৎসর্গীত প্রাণ।

ওই লেক-এ গেম বার্ডস পাওয়া যায়। আমি তাই একটা দোনলা হান্টিং-গান নিয়ে গিয়েছিলাম। ক্যাম্পে চুটিয়ে সবাই বিয়ারের ধারাত্রোত বইয়ে দিচ্ছে, আর আমি বন্দুকটা নিয়ে হ্রদের নিস্তব্ধ এলাকায় গুটি গুটি এগিয়ে যাই। শতখানেক ফুট দূরে এক ঝাঁক হুইসলিং টীল! বন্দুকটা তুলে ডাক করছি, হঠাৎ আমার হাত চেপে ধরল কিটেল। বললে, এ কি রে বন্ধু! তুই ‘সিটিং ডাক’ মারছিস? তোর লজ্জা করে না? ‘সিটিং ডাক’কে কোনও সাক্ষা শিকারী গুলি করে না। ছিঃ! এই দ্যাখ!

আমি তো অবাক। ও আমার হাত থেকে বন্দুকটা কেড়ে নিয়ে শূন্যে একটা ফায়ার করল। অসংখ্য বেলেহাঁস তৎক্ষণাৎ হ্রদের নিস্তব্ধ জল ছেড়ে আকাশে উড়ল। ও বললে, এবার বল, বন্ধু, কোনটাকে নামাবো? V-শেপ ফর্মেশনের প্রথমটা চাস?

আমি ‘গ্যা-নাইন’ (হ্যাঁ-না) জবাব দেবার আগেই ওর হাতের বন্দুকে দ্বিতীয় ব্যারেলটা ফায়ার হলো। অব্যর্থ লক্ষ্য! পাক খেতে খেতে হ্রদের জলে নেমে এল V-শেপ ফর্মেশনের অগ্রদূত। তৎক্ষণাৎ জলে ঝাঁপ খেয়ে পড়ল ওর পয়েন্টার কুকুরটা—মৃত পাখিটাকে জল থেকে উঠিয়ে আনতে। ওর সেই দারুণ টিপ দেখে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম আমি। ক্যাপ্টেন কিটেল বলল, ওদেরও তো বাঁচবার অধিকার আছে। না কী? ‘সিটিং ডাক’ কখনো মারবি না। অলওয়েজ শ্যুট দ্যা ফ্লাইং বার্ড! উড়তে উড়তে উপরে যাচ্ছে, ঘুরতে ঘুরতে নিচে নামবে!

বাড়িতে এসে কলবেল বাজাতে সদর দরজা খুলে দিল মাসি।

—ওমা! তুই?

ভিতরবাড়ির দিকে মুখ করে হাঁকাড় পারে, দিদি শিগিরি এস। দেখ কে এসেছে!

বাইরের ঘরে ড্যাড বসে খবরের কাগজ পড়ছিল। মাসির ডাক শুনে একবার চোখ তুলে দেখল শুধু। নির্বিকারভাবে আবার কাগজ পড়তে থাকে। যেন, একমাত্র পুত্র নয়, ডাকহরকরা এসেছে একটা চিঠি বিলি করতে। রাগারাগি করব না। ড্যাডি ওই রকম। তাই তার দিকে এগিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করি, কেমন আছো?

এবার খবরের কাগজটা নামিয়ে রাখে। বলে, সরকার যেমন রেখেছেন।

বলি, ‘সরকার’ কেন? বল : ঈশ্বর তোমার ভাগ্যে যা লিখেছেন।

—হ্যাঁ, তাই। ঈশ্বর রাইফ্‌স্ট্যাগের ভাগ্যে যা লিখেছেন।

সেই বাঁকা বাঁকা কথা। জার্মানির সব দুর্দশার মূল হেতু তার শাসকবৃন্দ।

কথা ঘোরাই। বলি, আমি একটা ভাল চাকরি পেয়েছি।

—জানি।

—জানো? কী করে জানলে? কে বলেছে?

—বলবে আবার কে? তোমার ইউনিফর্মই সেকথা বলে দিচ্ছে। ওটা তো হিটলার্স যুব সংগঠনের জঙ্গী পোশাক। সকাল-সন্ধ্যায় তো দেখতে পাই তোমাদের যানজট-করা মার্চ পাস্ট।

—ও! যা হোক। এটা ধর।—হিপপকেট থেকে বার করে দিই পে-প্যাকেটটা। আমি জানি, ড্যাডি যা মাসিক পেনশন পায়—ইনভ্যালিড-অ্যালাওয়েন্স সমেত—তার দেড়গুণ ডয়েশমার্ক আছে এই ম্যানিলা-খামটায়।

—কী ওটা?

—আমার এমাসের পে-প্যাকেট।

—অ। তা তোমারও তো হাতখরচ লাগবে—

—না, লাগবে না। আমাদের ইউথ-ক্লাব মেম্বারদের খাওয়া-থাকা সব ফ্রি। মায় ড্রিঙ্কিং এক্সপেন্সেস!

—বুঝলাম। তা ওসব কথা তোমার মম-এর সঙ্গে আলোচনা কর। সংসার-খরচা সেই করে। মাসান্তে আমিও পেনশনটা তাকেই দিই।

প্যাকেটে কত ডয়েশমার্ক আছে, আমি কত মাস-মাহিনা পাই, এসব জানবার কোনো কৌতূহলই নেই। আবার নাকের ডগায় খবরের কাগজখানা তুলে ধরে।

মাসি আমার হাত ধরে টানতে টানতে মায়ের কাছে নিয়ে গেল। সে এক ডাঁই ময়লা কাপড়জামা কাচছিল। আমাকে দেখে হেসে হাতটা মুছে এগিয়ে এল। বললে, আয়। ঘরে গিয়ে বসি।

মা তবু দুটো সুখদুঃখের কথা বলল। কেমন আছি, কোথায় আছি, খাওয়া-দাওয়া কেমন ইত্যাদি। তারপর শঙ্কামিশ্রিত কণ্ঠে জানতে চায়, হাঁরে যুদ্ধ বাধলে ডাক পড়বে নাকি?

—ও মা, তা পড়বে না? এত তোয়াজ করে খাওয়াচ্ছে, দাওয়াচ্ছে—সে কি এমনি এমনি?

মা বিমর্ষ হয়ে গেল। বললে : যুদ্ধ-মুদ্রকে আমি বড় ডরাই। দেখেছি তো তোর বাপের বেলা।

কথা ঘোরাবার জন্য বলি, পাশের বাড়ির খবর কী? ওরা এসেছিল আমার বিরুদ্ধে নালিশ করতে? বড়কর্তা অথবা এডিং আন্টি?

একটু দম ধরে মা বললে, এডিং এসেছিল একবার।

—কী বলল? আমি ওর বোনকে ‘রেপ’ করতে যাচ্ছিলাম।

—না, তা বলেনি। ওসব কথা ওদের ওঠাতেই দিইনি। তুই যা শিখিয়ে দিয়ে গিয়েছিলি তাই বলতেই এডিং থেমে গেল। আমি বললাম, দেখতেই তো পাচ্ছ, আমার ছেলে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। আবার ও কথা কেন?

এবার পকেট থেকে ডয়েশমার্কের প্যাকেট বার করে বলি, এটা ধর। আমার মাইনে।

ইতস্তত করে বললে, তা আমাকে কেন? তোর ড্যাডকে দে!

—তাকেই দিতে গেছিলাম। নিল না। বললে, তোমাকে দিতে।

মা অনেকক্ষণ কী যেন ভাবল। তারপর বললে, ওটা এখন তোর কাছেই থাক, কার্ল। প্রয়োজন হলে চেয়ে নেব। তোর কাছে হাত পাততে তো আমার সঙ্কেচ নেই।

অবাক হয়ে বলি, কিন্তু কেন বল তো? রোজগারে ছেলের উপার্জন বুড়ো বয়সে বাপ-মায় নেয় না?

হঠাৎ আমার হাত দুটো চেপে ধরে বললে, অবুঝ! হসনে, কার্ল। ওই খোঁড়া বুড়ো মানুষটার দিকে একবার তাকিয়ে দেখ! দারিদ্র্যের অভিমান ছাড়া ওর আর কী আছে বল?

—কিন্তু আমি কি সে জন্য দায়ী? তোমাদের অভাবের জন্যে? ড্যাডির পা-ভাঙার জন্য?

—না তুই নয়। কিন্তু যুদ্ধটাই তো দায়ী। যুদ্ধকে ও ঘৃণা করে। মনে প্রাণে। অথচ তুই আমাদের অমতে সেই যুদ্ধেই নাম লেখালি।

আমি জানি—মাম্মি মেইন ক্যাম্প পড়েনি। হিটলারের রেকর্ডেড লেকচার শোনেনি। গোয়েবল্‌স্-এর নামটাই হয়তো জানে না। জার্মানি কে ন যুদ্ধে হারল, জার্মানিকে কারা বুটের তলায় দাবিয়ে রেখেছে এসব সে কিছুই জানে না। কী করে ওকে বোঝাই? শেষমেশ জানতে চাই, তার মানে, আমার রোজগারের টাকা তুমি নেবে না?

হঠাৎ যেন দারুণ একটা বুদ্ধি খুলে গেল। মা বললে, তুই একটা কাজ করবি, কার্ল? দীর্ঘ দীর্ঘ দিন আমার একটা ধার আছে। শোধ করতে পারিনি। ডয়েশমার্ক হাতে জমেই না। কী করে শোধ করব? তুই তাঁকে কিছু পাঠিয়ে দিবি?

—কত?

—যা পারিস। নিজের অসুবিধা না করে।

—কার কাছে ধার করেছিলে? কবে?

মা আমাকে একটি দীর্ঘ কাহিনী শোনালো। সে কাহিনী আমি আপনাদের ইতিপূর্বেই শুনিয়েছি। আমার ‘মির্যাকুলাস’ জন্মবৃত্তান্ত। মায়ের মতে এডিং আন্টি আর তার কাজিন ব্রাদারের জন্যই আমরা দুজন আজ পৃথিবীতে বেঁচে আছি। সেই ডাক্তারবাবু নর্মিক ঝড়জলের মধ্যে ড্রাইভ করে নিজের গাড়িতে মাকে ফ্রাঙ্কফুর্ট জিওনিস্ট হসপিটালে

নিয়ে যান। নিজে হাতে সিজারিয়ান করে আমাদের দুজনকে বাঁচান। ড্যাড তখন ওয়েস্টার্ন ফ্রন্টে যুদ্ধরত। আর মা তখন কপর্দকশূন্য। জিওনিস্ট হসপিটালটা অবশ্য ছিল দাতব্য চিকিৎসালয়। ইহুদিদের দানে চলে। হাসপাতাল খরচ কিছু পড়েনি। কিন্তু ডাক্তারের ‘অপারেশন-ফি’টা দিতে না পারায় মা আজ আঠারো বছর ধরে মনে একটা অপরাধবোধ পুষে রেখেছে। গলার একছড়া মালা—তার বিবাহের গহনা—ডাক্তারবাবুকে দিতে চেয়েছিল—তিনি গ্রহণ করেননি। বলেছিলেন, এ তো এডিং-এর প্রতিবেশীর প্রতি প্রেম। তাছাড়া উনি তো ফ্রাঙ্কফুর্টে রোজগার করতে আসেননি। ঘটনাচক্রে প্রতিবেশিনীর একটা বিপদে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিলেন।

আমি বলি, তাহলে তো লেটা চুকেই গেল। তিনি তো নিজেই প্রত্যাখ্যান করেছেন। তোমার গহনা বিক্রি করে ন্যায্য ফিজটা তো তিনি নিতেই পারতেন।

—না, তাঁকে ঠিক দিচ্ছি না, তিনি নেবেনও না। আমি দান করতে চাই তাঁর অর্ফারনেজকে। তিনি একটা অনাথাশ্রম পরিচালনা করেন, ওয়ারসতে।

—জুডেনদের অনাথ আশ্রম?

মা একদৃষ্টে আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, ওভাবে বলছিস কেন, কার্ল? ‘জুডেন’ নয়, জুইশদের। তুই নিজেই তো জন্মেছিস একটা জুইশ দাতব্য চিকিৎসালয়ে। তোর মা তো মৃত্যুর...

—ঠিক আছে, ঠিক আছে। সেই ডাক্তার ভদ্রলোকের নাম-ঠিকানা বল।

—ঠিকানা তো জানি না। নামটা মনে আছে : ডক্টর জানুস কোরচখ।

—তিনি নিজে নিশ্চয় জুডেন, আই মীন জিওনিস্ট। এডিং আন্টির কাজিন ব্রাদার যখন?

—না। তিনি খ্রিস্টিয়ান। রোমান ক্যাথলিক।

—স্ট্রেঞ্জ! তা ঠিকানা না জানলে ব্যাঙ্কড্রাফটটা পাঠাব কেমন করে?

—একটু চেষ্টা করলেই তুই ঠিকানাটা জোগাড় করতে পারবি। উনি ওয়ারসর একজন অতি বিখ্যাত চিকিৎসক। গাইনো এবং চাইল্ড-স্পেশালিস্ট। তাছাড়া শুনেছি, ওয়ারস রেডিওতে তাঁর একটা প্রোগ্রামও হয় : ‘বদ্যিবুড়োর আসর’। রেডিও-স্টেশন তাঁর ঠিকানা জানে।

বলি, ঠিক আছে। খোঁজ নিয়ে দেখব চেষ্টা করে।

ফিরে আসার আগে মাসি আমাকে আড়ালে টেনে নিয়ে জানতে চাইল, সেদিন কী হয়েছিল রে? এডিংদের বাড়ি?

বলি, ও, তুমি বুঝি এখনো জান না? রোজেলিনাকে ওদের বাগানের মধ্যে একা পেয়ে আমি তাকে ‘রেপ’ করতে গেছিলাম। অটো আঙ্কল টের পেয়ে যায়। তার শালীকে উদ্ধার করে।

মাসি বলে, একটা থাপ্পড় মারব। বাঁদর কোথাকার! মাসির সঙ্গে কী ভাবে কথা বলতে হয় তা জানিস না? আমি সব শুনেছি, সব জানি। লীনা লুকিয়ে এসে আমাকে বলেছে।

—কী বলেছে? তাকে একবার ঝুড়ে নিয়ে আনতে পার? এ বাড়িতে?

—ওমা, তুই জানিস না? সে তো ব্রাসেল্‌স্‌ চলে গেছে!

—ব্রাসেল্‌স্‌ চলে গেছে! ও! তা সে কী বলেছিল তোমাকে? আমি তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে জোর করে চুমু খেতে যাচ্ছিলাম?

—তা কেন? সে সব সত্যি কথাই বলেছে। বলেছে, তোর সঙ্গে আমার দেখা হলে আমি যেন বলি— সে দুঃখিত। তোর কাছে ক্ষমা চেয়ে গেছে!

—ক্ষমা! তিতিক্ষা! তাকে তুমি জিজ্ঞেস করনি অটো ফ্রাঙ্ক যখন আমাকে গলা ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দিচ্ছিল, তখন সে কেন বলতে পারেনি যে, আমি তার বয়ফ্রেন্ড? আমি... আমি তাকে জোর করে চুমু খেতে যাচ্ছিলাম না?

—ওমা! তুই জানিস না? সে তো তখন অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল ওই গাছটার বেদীতে।

—অ! না, সে-কথা জানতে পারিনি আমি।

—লীনা তার ঠিকানা আমার কাছে রেখে গেছে। তুই চাস?

আমার মনে পড়ে গেল ক্যাপ্টেনের সেই অশ্লীল রসিকতাটা—“জুডেন-মাগীকে নিয়ে দু-এক রাত এক বিছানায় শুয়ে ফুর্তিফার্তাই করা যায়, ...তাকে বিয়ে করা অ্যানাথেমা!” না! লীনার বিষয়ে ও ভাবে আমি চিন্তাই করতে পারি না। সে আমার জীবনে প্রথম প্রেম। এখন যা দেশের অবস্থা... সে যদি আমাকে ভুলে যেতে পারে, তাহলেই আমি সুখী। আমি হয়তো তাকে কখনই ভুলে যেতে পারব না। কিন্তু যা হবার নয়, তা হবে না।

—কিরে? কী ভাবছিস? দেব ঠিকানাটা? ওকে চিঠি লিখবি?

—না থাক!

—দেখ কার্ল! তুই অহেতুক তাকে দোষী করছিস! সে যদি অজ্ঞান হয়ে না যেত তাহলে সে নিশ্চয় অটো ফ্রাঙ্ককে সব কথা খুলে বলত। সে কথা সে আমাকে বলেও ছিল।

—জানি। সে না বললেও তা এখন আমি বুঝতে পারি। বিশ্বাস করি। সে জন্য নয়।

—তবে কী জন্যে?

—ওরা জুইশ। আমরা ক্রিশ্চিয়ান! ওরা সেমেটিক, আমরা আর্থ।

—তাতে কী? দুনিয়াভোর কত ইন্টারকাস্ট ম্যারেজ হচ্ছে, ইন্টার রিলিজিয়াস ম্যারেজ হচ্ছে...

—দুনিয়াভোর হতে পারে। জার্মানিতে আর হবে না। হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। সেটা ‘অ্যানাথেমা’।

—কে বলেছে?

—ফ্যুরার।

—ফ্যুরার! কে তিনি?

—আমাদের পার্টিলিডার অ্যাডলফ্ হিটলার। নামটা শুনেছ?

—না। কে তিনি?

—তার মানে খবরের কাগজখানাও পড় না।

মাসি চুপ করে গেল। মনে হলো, অহেতুক মাসির মনে দাগা দিয়ে লাভ নেই। বলি, তাছাড়া ওরা বড়লোক। আমাদের ঘরে এসে সুখী হবে না।

মাসি এবারও জবাব দিল না। আবার বলি, মা তো আমার টাকাটা নিল না। তুমি রাখবে? প্রয়োজনমতো সংসারে খরচ কর। তবে ওদের দুজনকে লুকিয়ে। জানতে চাইলে বল, এ তোমার নিজের টাকা। আমি দিয়ে গেছি বল না। কেমন?

মাসি রাজি হলো। তখন সাহস করে বলি, আর একটা জিনিস তুমি লুকিয়ে রেখে দাও— একটা জড়োয়া ব্রোচ। দামি জিনিস। কিন্তু বিশ্বাস কর, এটা চোরাই মাল নয়।

মাসি অবাক হলো। তবে হাত পেতে নিলও ব্রোচটা। একটু ইতস্তত করে বললে, এটা কি তুই ওর জন্য কিনেছিলি?

—কার জন্য?

মাসি জবাব দিল না। আমি তখন নিজে থেকেই বলি : গহনাটা আমি কিনিনি। একজন আমাকে উপহার দিয়েছে।

মাসি বললে, এটা নিলাম এক শর্তে। এ জিনিস ব্যবহার করার বয়স আমারও নেই, তোর মায়েরও নেই। যার জন্য এটা এনেছিস তাকেই দেব।

আমি প্রতিবাদ করি, না, না, না! এটা আমি লীনার জন্য আনিনি মোটেই!

—আমি কি তাই বলেছি?

—তবে কার কথা বলছ?

—গরিব মাসি আর কী দেবে তোকে, বল? এটা তোর বউ-এর জন্যই তোলা থাকবে। লীনার ভাগ্যে যদি থাকে—তোর ওই ফ্যুরারের স্ক্যাপামি বন্ধ হবার পর—তবে তাকেই দেব।

বছরখানেক পরের কথা। বত্রিশ সালের শেষাশেষি। রাইফ্‌স্ট্যাগে আবার নতুন করে নির্বাচন হচ্ছে। আমাদের পার্টি তখন সংখ্যাগরিষ্ঠ, কিন্তু এককভাবে নয়। ফলে একটা কোয়ালিশন সরকার রাইফ্‌স্ট্যাগের কর্ণধার। এই বত্রিশ সালের নির্বাচনে যদি আমরা

ভালভাবে জিততে পারি তাহলে নাৎসি পার্টি হয়ে যাবে রাইস্‌ট্যাগে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল। তখন ওই ঠেকো-দেওয়া জোড়াতালি-সরকার ভেঙে দিয়ে নাৎসি পার্টির কর্ণধার হয়ে যাবেন জার্মানির নিরঙ্কুশ ভাগ্যবিধাতা : একমেবাদ্বিতীয়ম্। আর এই পথেই ভার্সাই-চুক্তির শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হবে জার্মানি। আবার মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে।

একথাই আমরা—ইউথ ক্লাবের সভারা—বোঝাতাম জনে জনে। পথে-ঘাটে, টিউব-রেলে। ক্লাবে-রেস্তোরাঁয়। লোক মন দিয়ে শুনত। দারিদ্র্যের বেড়াজালে আটকা পড়া গোটা জার্মানি ডুবে যাবার আগে একটা শেষ কুটো খুঁজছে। হিটলার আর গোয়েবল্‌স্-এর বক্তৃতা শুনে ওরা বুঝতে পারল—নাৎসি পার্টি খড়কুটো নয়—একটা প্রকাণ্ড জলযান। পারলে ওরাই পারবে এই নৈরাশ্য-সাগর থেকে পাড়ি দিতে।

আমাদের যুব-সংস্থার দুটি শাখা—তরুণ এবং তরুণী। স্কুল-ফাইনাল পাস করার পর কেউ চাকরি পায় না, কলেজে পড়তে যাওয়া নিরর্থক। সবাই এসে নাম লেখাতে চায় হিটলার্স যুব সংস্থায়। সপ্তাহে ছয় দিন ছেলে আর মেয়ের দল পৃথকভাবে মার্চ করত, নির্বাচন-প্রচারে স্ট্রিট-কর্নার মিটিং করত, বাড়ি-বাড়ি লিফলেট বিলি করত। শুধু শনিবারটা ছিল ব্যতিক্রম। ছেলে-মেয়ে একসঙ্গে এইসব প্রচারে বার হত। বোধকরি নাৎসি বড়কর্তারা ভেবেছিলেন এটুকু ‘সেফটি ভান্স’-এর ব্যবস্থা না রাখলে তরুণ-তরুণীরা দুর্মনস্যতায় ভুগবে। তাদের উদ্ভিন্নযৌবন কৃত্রিমভাবে বাধাপ্রাপ্ত হবে। শনিবার তাই থাকত যৌথ নাচের আসর। তারপর একত্র ডিনার। পার্টির খরচে। সেই সন্ধ্যাটা আমরা আনন্দের ফোয়ারা বইয়ে দিতাম।

যা স্বাভাবিক তাই হলো। দু-দলের সভ্য-সভ্যা মনমতো জোড় বাঁধল। শনিবার সন্ধ্যাটা ছিল ছুটি—ছেলেমেয়েরা ডেটিং করত। আমি কিন্তু কোনো মেয়ের সঙ্গে ভাবসাব করতে পারলাম না। ভালই লাগত না। হয়তো আমার সেই প্রথম প্রেমকে ভুলতে পারিনি বলেই। অনেকেই আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে চাইল, আমার উদাসীনতায় অন্যত্র সরে গেল।

শুধু একটি মেয়ে গেল না। ডোরা। আমার মধ্যে সে কী দেখেছে জানি না, ডোরা আঠার মতো সেন্টে রইল আমার সঙ্গে। মেয়েটি রোজেলিনার ক্লাস মেট, লীনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাও ছিল। স্কুলে থাকতেই আমাকে দেখেছে। মোটামুটি আলাপও ছিল। শনিবার যৌথ নাচের আসরে সে খুঁজেখুঁজে ভিড়ের মধ্যে আমাকে আবিষ্কার করে। ডিনার টেবিলে আমার পাশে বসার সুযোগ খোঁজে।

একদিন সে আমাকে বেমক্লা প্রশ্ন করে বসল, কার্ল! একটা কথা জানতে চাইব। সত্যি জবাব দেবে? যদি না বলতে চাও তো সে কথাই বলবে। কিন্তু যদি জবাব দাও, তবে সেটা যেন সত্যিকথা হয়—নাথিং বাট দ্য ট্রুথ! রাজি?

আমরা দুজন তখন একটা ডিনার টেবিলের একপ্রান্তে বসেছিলাম। নির্জনে। বলি, কী এমন কথা?

—কিন্তু কথা দিচ্ছ তো? জবাবে তুমি হয় বলবে ‘বলব না’, অথবা সত্যি কথাটা! তাইত?

—বেশ, কথা দিলাম। প্রশ্ন কর?

মুখ নিচু করে কিছুটা ভাবল—কী ভাষায় প্রশ্নটা করবে তাই যেন মনে মনে গুছিয়ে নিচ্ছে। আমি তাগাদা দিই : কই বল?

মুখটা না তুলেই বলল, তোমার এই আঠারো বছরের জীবনে তুমি কয়জন ভাগ্যবতীকে নিয়ে এক বিছানায় শুয়েছ?

গম্ভীর হয়ে বলি, এটা কি একটা প্রশ্ন হলো? তোমাকে যদি আমি ওই একই প্রশ্ন করি, তুমি জবাব দিতে পারবে?

এবার মুখটা তুলে বলল : পারব! Niemand! (নান)! আয়াম ইয়েট এ ভার্জিন!

আমি বলি : স্ট্রেঞ্জ!

—কেন? অবাক হবার কী আছে এতে?

—তুমি বাস কর ফ্রাঙ্কফুর্টে। তুমি অত্যন্ত সুন্দরী। তোমার বয়স ষোলো অথচ আজ পর্যন্ত...

ও বললে, ষোলো নয়, আয়াম সেভেনটিন। এবার তোমার পালা। বল? তুমি সারাজীবনে কয়জন মেয়ের সঙ্গে এক বিছানায়...

ওকে কথা শেষ করতে না দিয়ে বলি : মাত্র একজন!

—আমি জানতাম! এবং জানি, মেয়েটি কে!

—জানতেই যদি, তাহলে প্রশ্ন করেছিলে কেন?

—‘জানতাম’ বলাটা ঠিক নয়, বলা উচিত ছিল, ‘আন্দাজ করেছিলাম’।

—আমি একশ মার্ক বাজি রাখতে পারি, ডোরা, তুমি তার নাম বলতে পারবে না। যদিও তুমি তাকে চেন।

—আই অ্যাকসেপ্ট দ্য বেট! বলব নামটা?

—না! বলবে না। আজ সন্ধ্যায় তুমি আমার গেস্ট! তোমার আর্থিক লোকসান ঘটানোটা অভদ্রতা হয়ে যাবে। মহিলাটির সঙ্গে—একদিন নয়, রাতের পর রাত এক বিছানায় শুয়েছি...

ডোরার চোখ দুটো নাটানাটা হয়ে ওঠে। বলে, কী বলছ, কার্ল! রাতের পর রাত?

—হ্যাঁ। যতদিন না আমার জন্য একটা পৃথক ‘বেবিকট’ কেনা হয়। আমার মা।

1933-র ডিসেম্বর মাসে নির্বাচনের ফলাফল জানা গেল। কী-আনন্দ! কী অপারিসীম আনন্দ! রাইস্‌ট্যাগে আজ নাৎসি পার্টি এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল। কোয়ালিশন-সরকার মূর্তাবাদ। ফ্যুরার এখন থেকে জার্মানির কর্ণধার!

সংবাদটা বেতারে প্রচারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে গোটা জার্মানি উত্তাল হয়ে ওঠে। সেই 'টাইডাল-ওয়েভ' এসে ধাক্কা মারল আমাদের ফ্রাঙ্কফুর্টেও!

আমাদের গ্রুপ-কমান্ডার ক্যাপ্টেন কিটেল জানালো আমাদের গ্রুপটা এই আনন্দ সংবাদ উদ্‌যাপন করবে একটা বড় রেষ্টোরাঁয়—মেন স্ট্রিট যেখানে পড়েছে সেন্ট্রাল প্লাজায়, সেই মোড়ে। সারাদিনই পথে-পথে নেচেছি। সন্ধ্যায় হবে ওই সেন্ট্রাল-প্লাজা হোটেলে আমাদের যৌথ-নাচের প্রোগ্রাম। তারপর নৈশভোজ। দলে আমরা প্রায় পঞ্চাশ জন। আধা ছেলে, আধা মেয়ে।

রাত তখন দশটা। আমি বার-পাঁচেক যৌথনাচে নেচে ক্লান্ত। চার পেগ হইস্কি পাকস্থলীতে জমেছে। মাথাটা টলছে। হঠাৎ ক্যাটকিনস্কি বললে, হেই কার্ল, হোটেলে এক শালা জুডেন ঢুকেছে। ওই দ্যাখ, পিছনের দিকে লুকিয়ে লুকিয়ে খাচ্ছে।

চড়াং করে আমার মাথায় রক্ত চড়ে যায়। এই পাশ্চাত্যশালাটি নার্ডিক-জার্মানদের জন্য রিজার্ভ। হোটেলের মালিক খাঁটি আর্য—ফ্যুরারের একান্ত ভক্ত। তাই বাইরে একটা নোটিশও ঝোলানো আছে—জুডেনদের প্রবেশাধিকার নেই, এ কথা বিজ্ঞাপিত করে। তবু শালা ঢুকল কোন্ সাহসে? ক্যাটকে বলি, তুই কী করে বুঝলি, ও জুডেন?

—চেহারা দেখে তাই আন্দাজ করছি। তুই দ্যাখ—ওই যে মোটা লোকটার ডানদিকে ফাঁকা টেবিলে একা বসে আছে। থ্রি-পীস গ্রে রঙের সুট। চোখে রিমলেস চশমা।

আমার মাথার চুল খাড়া হয়ে ওঠে। চিনেছি। শালাকে ঠিক চিনেছি। শালা জুডেন একদিন গলাধাক্কা দিয়ে তার বাড়ি থেকে আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। টলতে টলতে ওর দিকে এগিয়ে যাই।

ক্যাট ওর কাছে এগিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করে, এক্সকিউজ মি, হের জেন্টলম্যান, আপনি ইহুদি। তাই নয়?

লোকটা চমকে ওঠে। লক্ষ্য করে দেখে আমরা দলে দশ-বারোজন। আমি থামের আড়ালে মুখটা লুকাই। লোকটা প্রতিপ্রশ্ন করে, এ প্রশ্ন উঠছে কেন?

—তার মানে আপনি জুডেন। স্বীকার করছেন?

—যদি তাই হই। তাতে কী?

তৎক্ষণাৎ ক্যাপ্টেন কিটেল আমাকে বললে, কার্ল! এই ইহুদিবাচ্চাটাকে বাইরে নিয়ে যা। দেখিয়ে দে সাইনবোর্ডটা।

এই সুযোগটাই চাইছিলাম আমি। চিতাবাঘের মতো ঝাঁপ খেয়ে পড়লাম ওর সামনে। চেপে ধরলাম ওর শৌখিন টাইটা। বলি, আয় শালা। নিজের চোখে দেখে যা!

লোকটা আতর্কণ্ডে বলে ওঠে, কার্ল, কার্ল! আমি... আমি...তোমার আঙ্কল... অটো ফ্রাঙ্ক!

—না। কোনো শালা জুডেন আমার আঙ্কল নয়। আমি জার্মান, আমি নর্ডিক। তুই তো বলেছিলি—তুই হিডেন, তুই জুডেন, জু! বলিসনি?

হিড়হিড় করে অটো ফ্রাঙ্কে বাইরে নিয়ে আসি। উপরের সাইনবোর্ডটা দেখিয়ে বলি, জার্মান ভাষা পড়তে পারিস, শালা জুডেন?

লোকটা পড়ল নোটস বোর্ডটা। ওল্ড-ইংলিশ হরফে লেখা বিজ্ঞপ্তিটা :

NOTICE

Only biped dogs & Quadruped Jews are permitted.

By order

[বিজ্ঞপ্তি : শুধুমাত্র দ্বিপদী কুত্তা আর চতুষ্পদী ইহুদির প্রবেশাধিকার আছে কর্তৃপক্ষের অনুমত্যানুসারে।]

ওর পশ্চাদ্দেশে একটা লাথ কষিয়ে দিয়ে বলি : তুই শালা ইহুদি বাচ্চা! কোন আঙ্কেলে দু-পায়ে হেঁটে ভিতরে ঢুকেছিলি? যা! চারপায়ে হামাগুড়ি দিয়ে ভিতরে যা। তোর ব্রিফকেসটা উঠিয়ে নিয়ে আয়!

অনেক জার্মান পুরুষ-স্ত্রী তামাশা দেখতে এগিয়ে এসেছে। তারা খিলখিল করে হাসছে। এ-ওর গায়ে লুটিয়ে পড়ছে। একজন মধ্যবয়সী জার্মান মহিলা হাসতে হাসতে নিচু হয়ে ওর কানের কাছে মুখ এনে বললে, ওন্ট ইউ বার্ক, মাই সুইট ডগি? —আউ...আউ...আউ!

ক্যাপ্টেন কিটেল ওর দিকে ফোলিও ব্যাগটা ছুঁড়ে দিয়ে বললে, যা, ভাগ!

আমি বলি, সে কি গুরু? ও শালা চারপায়ে হামা দেবে না?

—না! ও হারামজাদা একটা বড় ফ্যাক্টরির মালিক। ও পরে আমাদের পার্টিতে মোটা ডোনেশন দেবে। দিবি তো শালা? তাহলে তোকে ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরে দু-পায়ে হাঁটতে দেব। না দিলে বাকি জীবন : কোয়াড্রুপেডেড। বুঝলি?

ফ্যুরারকে আমি মাত্র একবারই দেখেছিলাম। বহুদূর থেকে। বাইনোকুলার দিয়ে। 1936 সালে। বার্লিন অলিম্পিকে। বেশিক্ষণ অবশ্য দেখতে পাবার সৌভাগ্য হয়নি। কারণ একটা বিশী ঘটনাপরম্পরায় তিনি মঞ্চ থেকে নেমে গেলেন। বিরক্ত হয়ে। বিরক্ত হবার কারণও ছিল। এক শালা কালুয়া—আমেরিকান নিগ্রো, কি জানি কীভাবে ম্যানেজ করে পরপর চারটে স্বর্ণপদক পেয়ে গেল। কোনো মানে হয়? বিচারকদের মধ্যে কজন ‘কালুয়া’ ছিল জানি না। না হলে এটা কখনো সম্ভব? পরপর চারটে গোল্ড-মেডেল? অলিম্পিকে যা কখনো হয়নি! ফ্যুরারের রাগ করার যথেষ্ট কারণ ছিল। একঝাঁক নর্ডিক এরিয়ানের নাকে ঝামা ঘষে দিয়ে, বিচারকদের ম্যানেজ করে এক শালা ‘কালুয়া’...

আমিও তৎক্ষণাৎ রাগ করে বার হয়ে এসেছিলাম অলিম্পিক গ্রাউন্ডস থেকে। টিকিটটা ছিঁড়ে ফেলে। একগাদা ডয়েশমার্ক খরচা হয়ে গেল।

[লেখকের প্রতিবেদন : এখানে কার্ল থজিলার্ডের জবানবন্দি থামিয়ে বরং অন্য এক দৃষ্টিকোণ থেকে সেই অলিম্পিক মাঠে যাওয়া যাক। বিশ্বরেকর্ডধারী ব্ল্যাক আমেরিকান জেসি ওয়েন্সের আত্মজীবনীর অংশবিশেষ আপনাদের অনুবাদ করে শোনাই।]

জেসি ওয়েন্স

১৯৩৬-এর গ্রীষ্মকাল। এবার অলিম্পিক হচ্ছে বার্লিনে। অ্যাডল্ফ হিটলার তার শিশুসুলভ প্রচার মাধ্যমে ক্রমাগত ঘোষণা করে চলেছে : জার্মান প্রতিযোগীদের ধমনীতে আছে ‘আর্য-রক্ত’। তারা উন্নতজাতের মানুষ। সেমেটিক বা নিগ্রয়েড রক্তের চ্যাংড়াগুলো তাদের পাশে দাঁড়াতেই পারবে না। সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবোধের বিষবাস্পে অলিম্পিক গ্রাউন্ড আকীর্ণ। এ নিয়ে আমার অবশ্য কোনো মাথাব্যথা নেই। আমি অনুশীলন করেছি। শিখেছি, ঘাম ঝরিয়েছি—পুরো ছয়-ছয়টা বছর ধরে নিজেকে তৈরি করেছি—এই বার্লিন অলিম্পিকের জন্যে। আমার মনের কোনো কোনায় রাজনীতি বা ধর্মবিদ্বেষের কোনো ঠাঁই নেই। হবে কোথা থেকে? মনটা জুড়েই তো আছে : খেলা! স্পোর্টস!

অতলান্তিক পাড়ি দিয়ে আসার সময় শুধু একটা স্বপ্নই দেখেছি : অন্তত একটা স্বর্ণপদক আমাকে পেতেই হবে। আমার সবচেয়ে বড় আশা : লং জাম্প!

কারণ ছিল। এক বছর আগেই লং জাম্পে আমি বিশ্বরেকর্ড করে বসে আছি— ২৬ ফুট ৪.২৫ ইঞ্চি (৪.১৩ মিটার)। তাই আমার বন্ধুরা, বস্তুত গোটা আমেরিকা আশা করে বসে আছে : আর কিছু পারুক না পারুক, এই জেসি ছোকরা অন্তত ওই একটা স্বর্ণপদক পকেটস্থ করে ফিরবেই।

আমেরিকা অবশ্য আমাকে চার-চারটে ইভেন্টে অংশ নিতে নির্বাচন করেছে— একশো / দুশো মিটার দৌড়, লং জাম্প আর চারশো মিটার রিলে রেস। তার মধ্যে আমার আশা, আর মূল লক্ষ্য : লং জাম্প।

লং জাম্প ট্রায়ালের দিন।

তোমরা নিশ্চয় জানো, মূল প্রতিযোগিতায় তাদেরই অংশ নিতে দেওয়া হয় যারা ট্রায়ালে একটা ন্যূনতম মান উত্তরণে সক্ষম হয়। যারা ফার্স্ট-সেকেন্ড হবে তারা অনায়াসে এই ন্যূনতম মান অতিক্রম করে, অর্থাৎ কোয়ালিফাই করে। মূল প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারার অধিকার। সেই ট্রায়ালের দিনে এক অপ্রত্যাশিত বিশ্বয়ের সম্মুখীন হতে হল। একটি জার্মান প্রতিযোগীর—নাম লাজ লং (Luz Long)—এর নামই কোনোদিন

শুনি নি। খাড়াইয়ে আমার চেয়ে এক ইঞ্চি বেশি। নীল চোখ, টকটকে গয়ের রঙ। খাঁটি আৰ্য। নৰ্ডিক। শুনলাম লাজ লংই জার্মানির আশাভরসা। সবাইকে একটা চমক দেবার জন্য একে তিন-চার বছর ধরে গোপনে তালিম দেওয়া হয়েছে। বাইরের দুনিয়াকে জানতে দেওয়া হয়নি, সে কবে, কোথায়, কতটা লাফাচ্ছে। একেবারে অলিম্পিক-রঙ্গমঞ্চে হবে তার নাটকীয় আবির্ভাব! আমার ট্রেনার কানে কানে বললেন, চিনে রাখ্ জেসি, এই ছোকরাই তোঁর আসল প্রতিদ্বন্দ্বী।

ট্রায়াল লাফে ও ছিল ঠিক আমার আগেই। প্রথমবারেই ছোকরা অতি অনায়াসে ন্যূনতম রেখাটা অতিক্রম করল। শুধু তাই নয়, অনায়াসেই সে লাফালো ছাব্বিশ ফুটের বেশি। বিশ্বরেকর্ড থেকে দু-তিন ইঞ্চি কম। দর্শকদল উল্লাসে ফেটে পড়ে। ট্রায়ালেই যে বিশ্বরেকর্ড ছুঁই-ছুঁই সে নিশ্চয় মূল প্রতিযোগিতায় ওই নিগ্রো দুঃসাহসীটার নাকে ঝামা ঘষে দেবে। হঠাৎ আমার মাথায় রক্ত চড়ে গেল। জার্মান দর্শকদের ওই উল্লাসধ্বনিতে। আমি সংযম হারালাম। মনে মনে বললাম, ফ্যুরার-সাহেব! ট্রায়ালেও এই নিগ্রো বাচ্চাটা ওর চেয়ে বেশি লাফাতে পারে—দেখে নাও!

ট্রায়াল-জাম্পের নিয়ম—তিন-তিনবার লাফাতে দেওয়া হবে। তার মধ্যে অন্তত একবার যদি প্রতিযোগী ওই ন্যূনতম দাগটা অতিক্রম করতে পারে তাহলেই সে ‘কোয়ালিফায়েড’।

আমি প্রথমবার লাফালাম। শুনলাম, দাগে পা দেওয়ায় ডিসকোয়ালিফাই হয়েছে। তৎক্ষণাৎ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের বন্যা বয়ে গেল দর্শকদলে। কান গরম হয়ে উঠল। আরও রেগে গেছি। দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে দ্বিতীয়বার লাফালাম। ও লর্ড! এবারে আমার আঙুল নয়, গোড়ালিটা পড়েছিল দাগে। নিতান্ত নভিস-এর মতো! এবারও খারিজ!

তুমুল হর্ষধ্বনি উঠল আমার ব্যর্থতায়।

ছি-ছি-ছি! এই জন্য সাগর পাড়ি দিয়ে বার্লিনে এসেছি? রাগে-দুঃখে বুনো ঘোড়ার মতো আমি তখন মাটিতে পা ঠুকছি।

হঠাৎ টের পেলাম, কে যেন আমার কাঁধে হাত রেখেছে। ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখি, সেই ছোকরা। লাজ লং। যে ছেলেটা একবারেই কোয়ালিফাই করেছে। ও কি আমাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করার একটা মওকা খুঁজছিল? ছোকরা আমার ডানহাতখানা টেনে নিয়ে ভাঙাভাঙা জার্মান-ইংরিজিতে বললে, জেসি, আমার নাম লাজ লং। মনে হয়, তোমার সঙ্গে কেউ আমার আলাপ করিয়ে দেয়নি।

এ তো বিদ্রূপের সুরে বলা কথা নয়। আমি হেসে বলি, তাতে কী? এই তো আলাপ হয়ে গেল। তোমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হলুম। খবর সব ভাল তো?

এক গাল হেসে ও বলে, আমার খবর তো ভালই। কিন্তু তোমার এ কী হচ্ছে?

চড়াং করে রক্ত চড়ে গেল মাথায়। এ তো বিদ্রূপই। বলি, মানে?

—তোমাকে কী-একটা খোঁচাচ্ছে, ভাই। না হলে চোখ বুঁজে লাফিয়েও তো তোমার কোয়ালিফাই করার কথা। তুমি আমার রেকর্ড জান না, কিন্তু আমি তো জানি, তুমি ইতিমধ্যেই বিশ্বরেকর্ড করে বসে আছ।

না! এ তো ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ নয়! ও আমাকে বন্ধুর মতো ‘ভাই’ বলে ডেকেছে। অকপটে তার কাছে স্বীকার করি, বিশ্বাস কর... সে কথা আমি জানি... কিন্তু।

ইতিমধ্যে অন্যান্য প্রতিযোগীরা লাফাচ্ছে। লাজ লং আমার হাতটা ছাড়েনি। ছোকরা নাথসি ট্রেনিং ক্যাম্পে লাফানো শিখেছে। অথচ আশ্চর্য! ওর মগজ খোলাই করতে পারেনি। এই কয়লাকালো নিগ্রোটোর হাত ও তখনো বজ্রমুষ্টিতে ধরে আছে। খোশমেজাজে গল্প চালিয়ে যাচ্ছে। ক্রমে আমিও স্বাভাবিক হয়ে আসি। না, কানটা আর ঝাঁ-ঝাঁ করছে না। চোখের সামনে তারাফুলগুলোও আর ফুটছে না। ইতিমধ্যে আমার তৃতীয়বার, অর্থাৎ শেষ লাফের সময় ঘুরে এসেছে। সেটা লক্ষ্য করল ছেলেটা। হঠাৎ কথা থামিয়ে ও বলল, শোন, জেসি। ওই যে চকের দাগটা দেখছ, ওর চার ইঞ্চি দূরে একটা বিন্দুতে মনঃসংযোগ কর। তুমি তো ওয়ার্ল্ডরেকর্ড করে বসে আছ হে! তোমার ভয়টা কী? ট্রায়ালে তুমি কতটা লাফিয়েছিলে কেউ সে কথা মনে রাখবে না। এখানে এখন কোয়ালিফাই করাটাই আসল কথা। চার ইঞ্চি দূর থেকে লাফালেও তুমি নিশ্চয় কোয়ালিফাই করবে। যাও! বেস্ট অব লাক!

আশ্চর্য! ওর আন্তরিকতায় আমার মনের মেঘ সম্পূর্ণ কেটে গেল। বলি, ধন্যবাদ! আসল লড়াই তো কাল!

পরে শুনেছি, তৃতীয়বার আমি দাগের একফুট আগে থেকে লাফিয়েছিলাম। অথচ ন্যূনতম দৈর্ঘ্যের একফুট বেশি লাফিয়েছি!

সেরাত্রে অলিম্পিক-গ্রামের ও-প্রান্তে আমি খুঁজেখুঁজে লাজ লঙের ক্যাম্পে এসে হাজির। সে আমাকে হাত ধরে নিয়ে বসাল। দু-জনে পাক্কা দু-ঘণ্টা আড্ডা দিলাম —খেলার কথা, অলিম্পিকের কথা, আমাদের দুজনের বাড়ির লোকজনের কথা, এমনকি আগামী পৃথিবীর সুস্বাস্ছন্দ্যের কথাও।

এক প্রহর রাত্রে যখন বিদায় নিলাম তখন অতলাস্তিকের দু-প্রান্তের দুটি প্রতিযোগীর অতলাস্তিক বন্ধুত্ব।

যদিও আমি জানতাম, লাজ লং কাল সকালে প্রার্থনা করবে সে যেন তার বন্ধুর কজ্জা থেকে একটা স্বর্ণপদক ছিনিয়ে নিতে পারে। তাতে কী? সে তো আমিও করব।

পরদিন অলিম্পিকের মাঠে আবার দু-জনে মুখোমুখি। সমস্ত স্টেডিয়ামে সেদিন লোক আর ধরে না। কেন্দ্রীয় মণ্ডপে স্বয়ং ফ্যুরার বসে আছেন একটা জমকালো সিংহাসনে, সান্দ্রোপাসদের নিয়ে।

এবারও লাজ লং আমার আগে লাফাল। সে তার নিজের রেকর্ড ভেঙেছে। আমার করা বিশ্বরেকর্ডও। সবাই ধরে নিয়েছিল লাজ লঙের সদ্যকৃত ওই বিশ্বরেকর্ড আমি পার হতে পারব না। সত্যিই প্রথম দুবার তা আমি পারিনি। কিন্তু শেষবার যখন লাফ দিলাম তখন মনে হলো দর্শকেরা ঝড়ের বেগে উল্টোদিকে ছুটছে। আমি হুমড়ি খেয়ে পড়লাম বালির স্তূপে। খণ্ডমুহূর্তের জন্য আমি বোধহয় বাহ্যজ্ঞান হারিয়েছিলাম, তারপরই দেখি কে-যেন ছুটে এসে আমার হাতখানা দৃঢ়মুষ্টিতে চেপে ধরেছে। বালির স্তূপ থেকে আমাকে টেনে তুলছে। আমি উঠে দাঁড়াতেই দেখি সে আমাকে বুকে টেনে নিয়ে বলছে : কংগ্যাচুলেশপ!

স্বয়ং ফ্যুরারের রক্তচক্ষুর সম্মুখে। নির্ভীক খেলোয়াড় : লাজ লং!

আদালতে দাঁড়িয়ে হলফ নিয়ে বলতে পারি—সে অভিনন্দনে একবিন্দু কৃত্রিমতা ছিল না। তখনই আমার মনে পড়ে গেল, বর্তমান পৃথিবীতে যিনি অলিম্পিক গেমস্কে ফিরিয়ে আনেন সেই Pierre de Coubertin যা বলেছিলেন তা বর্ণে বর্ণে সত্য। অলিম্পিকের মূল লক্ষ্য : পদকজয় নয়, প্রতিযোগীর হৃদয় জয়।

লাজ লং সেই বাণীর এক প্রাণবন্ত সজীব মনুমেন্ট।

জীবনে অনেক সোনা পেয়েছি—মেডেল, কাপ, শীল্ড—কিন্তু কোনোটাই নিখাদ নয়। লাজ লঙের ভালবাসা : খাঁটি ছাব্বিশ ক্যারট সোনার।

বিদায় মুহূর্তে লাজ লং বলেছিল : চার বছর পর নেস্লেট অলিম্পিকে তোমাকে ঠিক হারিয়ে দেব, দেখে নিও।

আমি বলেছিলাম, আর সেবার আমিই তোমাকে বালির স্তূপ থেকে প্রথম টেনে তুলব, দেখে নিও!

[লেখকের প্রতিবেদন : দুজনের কেউই তাঁদের কথা রাখতে পারেননি। বার্লিন অলিম্পিকের তিন বছর পরে হিটলার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু করে। সে রণাঙ্গনে একপক্ষে লাজ লং অপর পক্ষে জেসি ওয়েন্স : জেসি সেই কালযুদ্ধ পাড়ি দিয়ে অক্ষত ফিরে আসতে পেরেছিলেন। যুদ্ধান্তের পঁয়ত্রিশ বছর পরে সাতষড়ি বছর বয়সে তাঁর বন্ধুর সঙ্গে মিলিত হন স্বর্গে। লাজ লং নিহত হয়েছিলেন যুদ্ধের শেষ বছর সিসিলির রণক্ষেত্রে।]

কার্ল ৎজিলার্ড

অলিম্পিকের তিন বছর পরে শুরু হয়ে গেল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ।

ফ্যুরারের বিজয়-পতাকা ছয় মাসের মধ্যে হল্যান্ড থেকে পোল্যান্ড পর্বত সমস্ত ইউরোপে উড্ডীন হলো। প্রতিদিন বেতারে খবর শুনে আমরা উৎসাহে আনন্দধ্বনি দিয়ে

উঠি। রেসের ঘোড়ার মতো আমরা ছটফট করতে থাকি—কখন আমাদের ডাক আসবে।

অবশেষে আমাদের স্কোয়াড্রনটার ডাক পড়ল। ক্যাপ্টেন কিটেল আমাদের গ্রুপ লিডার। আমাদের উপর আদেশ হলো পোল্যান্ডে যাবার। ওয়ারস আমাদের হেড-কোয়ার্টার্স। সেখানে যুদ্ধ হচ্ছে না। পোল্যান্ড জার্মানির কাছে নতজানু। বশ্যতা মেনে নিয়েছে। আমাদের দায়িত্ব শুধু সেখানে শান্তিরক্ষা করা। পোল্যান্ডে যেন কোনো অভ্যুত্থান মাথাচাড়া দিয়ে না উঠতে পারে। সেটা চল্লিশ সালের জুলাই মাস।

দু-দিনের ছুটি পেল সবাই। বাড়ি থেকে বিদায় নিয়ে আসতে।

এবারও দরজা খুলে দিল মাসি। বললে, এবার তুই অনেকদিন পরে এলি, কার্ল। আয় ভিতরে এসে বস।

ড্যাডি যথারীতি চোখ তুলে তাকাল। বলি, আমার ডাক এসে গেছে, ড্যাড। তুমি গেছিলে ওয়েস্টার্ন ফ্রন্টে। লড়েছিলে ফ্রান্স সীমান্তে। আমি যাচ্ছি পুবমুখো। পোল্যান্ডে।

—পোল্যান্ড! সেখানে তো এখন যুদ্ধ হচ্ছে না।

—না। আমাদের ফিল্ডেই থাকতে হবে। তবে নন-কম্মিট্যান্ট ব্যাটেলিয়ান।

—সেটা সুসংবাদ। মনে হয়, দু-এক বছরেই যুদ্ধ থেমে যাবে। বছর দুয়েক পরে ফিরে আসতে পারবি আশা করছি। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি সুস্থ শরীরে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আয়।

এত কথা ড্যাড সচরাচর বলে না। আজ বোধহয় একটা বিশেষ দিন।

বলি, শুধু সুস্থ শরীরে ফিরে আসার প্রার্থনাই করছ? জরী হয়ে ফিরে আসার নয়?

বললে, প্রার্থনা তো দু-পক্ষই করছে, কার্ল। ভগবান বেচারার কার কথায় কান দেবে, বল?

—তেমনি দু-পক্ষের সব বাবাই তো প্রার্থনা করছে তার ছেলেটা সুস্থ শরীরে ফিরে আসুক। সেটাও তো ভগবানের এক সমস্যা। সবার ছেলেই যদি সুস্থ অবস্থায় ঘরে ফেরে তাহলে যুদ্ধটা হয় কি করে?

—তা বটে। দোষ কোনো পক্ষেরই নয়রে। দোষী এই যুদ্ধটাই! যা, মায়ের সঙ্গে গিয়ে দেখা করে আয়।

মায়ের কাছে যেতে হলো না। আমার গলার স্বর শুনে, সে নিজেই এ ঘরে ছুটে এসেছে। বললে, ক’দিন পরে ফিরে আসতে দেবে?

—তা কেমন করে বলব? সেটা যুদ্ধের পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে।

—তোর ড্যাড যে বলল, দু-বছরেই যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে?

—ড্যাড তো আর গণৎকার নয়! এখনো আমাদের দু-দুটি দুশমন ইউরোপে জিন্দা! চার্চিল আর স্ট্যালিন। দেখা যাক, কী হয়।

মা আমাকে পাশের ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললে, হাঁারে সেই বদ্যিবুড়োর খোঁজ পেয়েছিস?

—না! ‘বদ্যিবুড়োর আসর’ এখন আর ওয়ারস রেডিও স্টেশন থেকে প্রচারিত হয় না। তবে আমি তো ওয়ারসতেই যাচ্ছি। খোঁজ নেব। দেখা পেলো ডাক্তার কোরচখের অনাথ আশ্রমে সাধ্যমতো সাহায্যও করে আসব।

মাসি আমাকে আড়ালে ডেকে বলে, আমার গচ্ছিত ধনটার কী ব্যবস্থা করলি, কার্ল? সেই জড়োয়া ব্রোচটা?

—তুমি যে বললে, সেটা এখন তোমার কাছেই থাকবে। সময়মতো আমার বউকে দেবে?

—তার চেয়ে এক কাজ করি না কেন? লীনার ভাগ্যে যখন ওটা কিছুতেই হবে না তখন সেটা অন্য একজনকে দিয়ে ঝাড়া-হাত-পা হয়ে যাই?

—অন্য একজন! কাকে?

—ডোরাকে।

—ডোরা! ডোরা কে?

—ন্যাকামি করিস না, কার্ল। এই শর্মা সব জানে! তোর সঙ্গে এখন ডোরার ‘স্টেডি’ চলছে। সে তো আর জুডেন নয়, খাঁটি নর্ডিক।

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করি, তুমি এসব খবর কোথা থেকে পাও?

—মার্গট বলেছে।

—মার্গট? সে কে?

—ভুলে গেছিস এর মধ্যেই? মার্গট তো তোর এডিৎ-আন্টির বড় মেয়ে।

মনে পড়ে গেল। এডিৎ-আন্টির দুটি মেয়ে। বড়টি মার্গট, এখন বছর দশেক। পুঁচকেটা আনা, বছর আটেক। বলি, সেই পুঁচকে মেয়েটাই বা এত খবর পায় কোথায়? ... একটা কাণ্ড হয়েছে, মাসি। বছর তিনেক আগে আমি মত্তাবস্থায় অটো-আস্কেলের সঙ্গে কিছু দুর্ব্যবহার করেছিলাম। কি ঘটেছিল ঠিক মনে নেই। তবে তাঁকে অপমান যে করেছিলাম এটুকু মনে আছে।

—সে-কথাও জানি রে, কার্ল! অত মদ খাস কেন? বিনা মার্কে পাস বলে?

—না, সেটা ছিল একটা বিশেষ উৎসবের রাত। কিন্তু ওরা কি এখনো ওবাড়িতেই আছে?

—না, নেই। অনেকদিন আগেই বাড়ি তালাবন্ধ করে কোথায় যেন চলে গেছে। কিন্তু তুই তো আমার কথার জবাব দিলিনি? ব্রোচটা কি ডোরাকেই দেব?

—তাড়াহুড়া করার কী আছে? থাক না ওটা তোমার কাছেই।

আমাদের স্কোয়াড্রনটাকে বিদায় দিতে হোটেল-প্লাজায় একটা ছোটখাটো ডিনার পার্টি হলো। জার্মানি তখনো আক্রমণাত্মক খেলা খেলছে। এক একটা শহরে নাৎসি ফ্ল্যাগ ওড়ে আর বার্লিনে রাইফ্‌স্ট্যাগে এক-একটা উৎসব হয়। প্রাগ, বুদাপেস্ট, ওয়ারস, পারী, ব্রাসেল্‌স্‌, আমস্টার্ডাম। বাকি আছে মাত্র দু-রাউন্ড খেলা। সেমিফাইনালে আমরা মুখোমুখি হব হয় লন্ডনের, নয় লেলিনগ্র্যাডের, আর ফাইনালে লেলিনগ্র্যাড অথবা লন্ডন। কে যে আগে উন্টে পড়বে এখনো বলা যাচ্ছে না। বার্লিনে উৎসব করেন নাৎসি পার্টির তা-বড় তা-বড় পাগুরা। ফ্যুরারও উপস্থিত থাকেন। তবে তিনি তো অনাসক্ত ব্রতধারী! জার্মানির জন্যে সর্বস্বত্যাগ করেছেন। সংসার ধর্ম করেননি। স্ত্রীলোক মাঝেই তাঁর কাছে মাতৃস্থানীয়া। কোনো রকম নেশা করেন না। ড্রিন্‌ক্স তো ছাড়, সিগারেটটা পর্যন্ত খান না। এমনকি মাছ-মাংসও নয়। একেবারে ‘সেইন্ট’ বলতে যা বোঝায়। সন্ন্যাসী।

আমাদের ছোটখাটো বিদায় ভোজেও জনা দশ-বারো উপস্থিত ছিল। ক্যাপ্টেন কিটেল, ক্যাটকিন্স্কি, আর আমরা যেক’জন ওয়ারস যাচ্ছি। সেদিন ডোরা আমাকে নাচের আসর থেকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে গেল। ক্যান্ডেল-লাইট ডিনার। আলো-আঁধারি নির্জনতায় সে আমাকে টেনে এনে বললে, আমাকে ভুলে যাবে না তো, কার্ল?

—ওমা! ভুলব কেন? ফিরে আসি যুদ্ধ থেকে। কিন্তু তুমি কি ততদিন আমার জন্যে অপেক্ষা করবে?

—করব! নিশ্চয় করব। তবে আমাদেরও হয়তো ডাক পড়বে এর পরে।

প্রশ্ন করি, আচ্ছা। তুমি কি মার্গট ফ্রান্সকে চেন? আমাদের পাশের বাড়িতে থাকত?

—চিনতাম। তারা তো জুডেন। ফ্রান্সফুর্ট ছেড়ে পালিয়েছে—আমাদের ভয়ে—

—জুডেন বলছ কেন ডোরা। তারা জুইশ! খ্রিস্টিয়ান নয়। এই মাত্র!

—বুঝেছি! তুমি আজও তোমার সেই বান্ধবীকে ভুলতে পারনি। তাই নয়? তোমার সেই প্রথম প্রেম! পেয়ারের রোজেলিনা—লীনা!

আমি কথা ঘোরাই। বলি, তার কথা আজ এই বিদায় মুহূর্তে আর নাই আলোচনা করলাম। এস, সবাই আমাদের জন্যে ওদিকে অপেক্ষা করছে।

—চল। কিন্তু তার আগে...একটা কিছু দিয়ে যাও...যাতে...

ও হঠাৎ আমাকে জড়িয়ে ধরল। ভদ্রতার খাতিরে আমিও তাকে বাহুবন্ধনে বেঁধুন করে ধরি। কিন্তু...ও নিজের চুম্বনতিয়াসী মুখখানা আমার দিকে বাড়িয়ে ধরে। আধা আঁধারে নজর হলো, ওর চোখ দুটি বুজে গেছে। ঠোঁট দুটি একটু ফাঁক হয়ে গেছে। আমার...আমার মনে পড়ে গেল সেই সন্ধ্যার কথা। সেদিন তারও চোখ দুটি বুজে গেছিল, তার ঠোঁট দুটোও ঠিক এমনি ফাঁক হয়ে গিয়েছিল। একটু আগেই তার কথা না উঠলে

হয়তো সাদৃশ্যটা এভাবে আমার মনে রেখাপাত করত না। আমি... আমি পারলাম না।
কিছুতেই পারলাম না। ওর কপালে একটা চুম্বনচিহ্ন এঁকে দিলাম।

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো আমার বাহুবন্ধ থেকে ও ছিটকে সরে গেল। রুদ্ধ অভিমানে
হঠাৎ বলে উঠল : ইউ নিডন্ট হ্যাভ ইনস্ট্যান্টেড মি!

আমি নিজেকে সামলে নিয়ে বলি, সে কি! আমি তোমাকে অপমান করলাম
কোথায়?

—ইউ নো হোয়াট আই মীন।

একটু অনুতপ্ত সুরে বলি, অলরাইট! লেটস্ ট্রাই এগেন!

—নাইন!

—কেন? আপত্তি কিসের?

—সে তুমি বুঝবে না। কোথায় যেন পড়েছিলাম, কবির নামটা মনে পড়ছে না।
কিন্তু তার উপদেশটা মনে আছে : Better die than kiss without love।

—মানে? তুমি আমাকে ভালবাস না? সে জন্যেই?

—এককথা বারবার বলতে আমার ভাল লাগে না, কার্ল : ইউ নো হোয়াট আই
মীন!

ঠিক তখনি ও-ঘর থেকে কে-যেন আমাদের নাম ধরে ডাকল। আমরা
দুজনেই খানা-কামরায় ফিরে এলাম।

[লেখকের নিবেদন : কার্লের কথা লিখতে বসে আমার এখন মনে হচ্ছে,
বেচারি ডোরা। সে বাঙালি-কবির কবিতা পড়েনি। না হলে হয়তো তার তখন মনে পড়ে
যেত : ‘আমারে যা পারিলে না দিতে / সে কার্পণ্য তোমারেই চিরকাল রহিল বঞ্চিত।’]

এলিজার উইজেনথল

১৭৪।। যুদ্ধের বয়স তখন দুই, আমার বারো। আমাদের বাড়িটা ছিল শিঘেট-এ। আল্ফস্-পাহাড়ের উত্তর ঢালে। ছোট্ট শহর। লোকসংখ্যা হাজার দশ-বারো। তার মধ্যে আমরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ—বাকি হাজার তিনেক খ্রিস্টান। অধিকাংশই মেথডিস্ট চার্চের। তবে আমাদের মধ্যে কোনো ঝগড়া-ঝাঁটি, ধর্মবিদ্বেষ ছিল না। আমাদের ‘পাসওভারে’ ওরা আমন্ত্রিত হতো, ওদের ‘নেটিভেটি’-র গৃহসজ্জা দেখতে আমরা দল বেঁধে যেতাম। দু-তরফেই খানা-পিনায় আমন্ত্রণ হতো।

শিঘেট শহরটা হাঙ্গেরিতে। রাজধানী বুদাপেস্ট-এর দক্ষিণে। আমাদের পরিবারে আমরা ছিলাম ছয়জন : ড্যাড-মম, আমার দুই দিদি—হিল্ডা আর বিয়া। তারপর আমি, আর আমার তিন বছরের ছোট বোন : এজিপোরা। বাবা ছিলেন নিতান্ত সান্ত্বিক মানুষ—স্থানীয় সিনাগগে রাব্বাই-এর ডানহাত। সারাটা দিন কাটত সিনাগগেই। উনি ছিলেন সিনাগগ ম্যানেজমেন্ট কমিটির সচিব। গোটা শহরে সবাই তাঁকে মান্য করত। মা একটা ওষুধের দোকানে ডিসপেন্সিং করত। ঘরের যাবতীয় কাজকর্মের দায়িত্ব আমার দুই দিদির। আমার উপর আদেশ ছিল মন দিয়ে পড়াশুনা করার। আমাকে ভালভাবে পাস করতে হবে, উপার্জনক্ষম হতে হবে, গোটা সংসারের দায়িত্ব নিতে হবে—মা যখন অবসর নেবে। পড়াশুনায় আমি ফাঁকি দিতাম না, খেলাধুলাও বড় একটা করতাম না। এখন বুঝতে পারি, ড্যাডির সান্ত্বিকতা আমার উপর প্রচণ্ড প্রভাব ফেলেছিল। শান্তশিষ্ট ওই রাশভারী পণ্ডিত মানুষটি আমার গোটা মন জুড়ে ছিল। যেমন তার ঈশ্বর ভক্তি তেমনি সত্যনিষ্ঠা। মিথ্যে কথা বলার জন্য যে মানসিক শক্তি সেটা তার ছিলই না। কষ্টও সহ্য করেছে সেজন্য। আমারও ছেলেবেলায় মনে হতো : বাবার মতো আদর্শ মানুষ হয়ে উঠতে হবে।

আমাদের ধর্মে যেসব বরোমাসে তের পার্বণ, তাতে পরিবারের সবাই যোগ দিতাম। তবে দৈনিক প্রার্থনা করতাম শুধু আমরা দুজন : ড্যাড আর আমি। প্রতিদিন সন্ধ্যায় আমি যেতাম সিনাগগে। প্রার্থনা শেষ করে সবাই যে যার বাড়ি চলে যাবার পরে ‘মেনোরা’-র সামনে নতজানু হয়ে একমনে তালমুদ আউড়ে যেতাম—ইহুদি ধর্মের প্রার্থনাগাথার সঙ্কলনমন্ত্র। সিনাগগের কাছে-পিঠে বাস করত ‘বেপ্লি লে জিঙ্গ্’। বুড়ো মানুষ। আধ-পাগলা মতন। তিনকুলে তার কেউ নেই। কাজকর্ম কিছুই করত না, উপার্জন বলতে কিছু নেই, তবে তার প্রয়োজনও অতি সামান্য। একটাই শতচ্ছিন্ন তাপ্লি দেওয়া কোট-প্যান্ট—সাবান কাচার খরচ নেই—দ্বিতীয় আচ্ছাদন না থাকায়। একমাথা পাকা চুল, এক বুক দাড়ি—নাপিতের খরচ নেই। তবে সে নিত্য ত্রিশদিন সিনাগগটা ঝাড়পৌঁচ করত। সেখানেই দু’বেলা দুটি খেতে পেত। ভিক্ষা সে নিত না। তার ধারণা

দু'বেলা পাতপাড়ার অধিকারটা সে অর্জন করেছে মন্দির মার্জনার পারিশ্রমিক হিসাবে। সম্পত্তি বলতে তার ছিল একটা ভায়োলিন—বেহালা। এটা নাকি সে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে। হেঁড়ে গলা—তাই সমবেত প্রার্থনায় বেচারি গলা মেলাতে পারত না। প্রতিদিন প্রার্থনার সময় সে মাটিতে থেবড়ে বসে তার বেহালাটা বাজাতো। শয়নং হট্টমন্দিরে—মানে সিনাগগের সামনে বারান্দাটায়। শীতকালে তাকে ভিতরে ডেকে নিতেন রাব্বাই। কেউ তাকে নজর করত না, কারও সঙ্গে তার বন্ধুত্বও ছিল না। আমার সঙ্গে তার কোনোদিন কথাবার্তা হয়নি। তবে হয়তো সে আমাকে চিনত হের উইজেনথলের একমাত্র পুত্রের পরিচয়ে, যেমন আমিও তাকে চিনতাম ভবঘুরে বেপ্পি পরিচয়ে।

আমি প্রতিদিনই স্কুল ছুটির পর বিকালে এসে সিনাগগ-গ্রন্থাগারে 'তালমুদ' (ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থ) পাঠ করতাম। তারপর 'মেনোরার' (দেবপ্রতীক) সম্মুখে বসে ঈশ্বরের মহিমাগাথা মনে মনে উচ্চারণ করতাম। কি জানি কেন, তখন আমার চোখ দিয়ে জল গড়াত।

একদিন ড্যাডকে বললাম, আমি 'কাব্বালা'র তত্ত্বমতে সাধনা করতে চাই। এ শহরে তেমন পণ্ডিত কে আছেন যাকে গুরুত্ব বরণ করতে পারি? ড্যাডি নীরবে দু-দিকে মাথা নাড়ল—'না'—এর ভঙ্গিতে। বলতে গেলাম, 'তবে, তুমিই আমাকে দীক্ষা দাও না? তুমি তো সে সাধনমার্গের কথা জানো?' কিন্তু বলা হলো না। তার আগেই ড্যাডি বলল, তোমার এখনো সে বয়স হয়নি, এলি। রাব্বাই মায়মনিদেস্—এর নির্দেশ ত্রিশ বছর বয়স না হলে সেই গুপ্তসাধনমার্গে কারও মাথা গলানো উচিত নয়। সে বড় কঠিন সাধনা। সামান্য ভ্রান্ত পদক্ষেপ হলে মানুষ উন্মাদ হয়ে যায়। আপাতত তুই তালমুদের তোহরা-মন্ত্ৰ অনুসরণ করে ঈশ্বরোপাসনা করে যা।

ড্যাডি ছিলেন পণ্ডিত। নিরাসক্ত স্থিতপ্রজ্ঞ মানুষ। কোনো কিছুতেই বিচলিত হতেন না। দুঃখে অনুদ্বিগ্নমন, সুখে বিগতস্পৃহ। বস্ত্রত বাহ্যজগত সম্বন্ধে তিনি ছিলেন নিতান্ত উদাসীন। মনে আছে, মায়ের এক সহপাঠিনী বান্ধবী—রাইজেল আন্টি—বুদাপেস্ট থেকে আমাদের বাড়িতে এসে আতিথ্য নিয়েছিলেন। সপ্তাহ-তিনেক ছুটিতে ছিলেন। আমরা সবাই এক টেবিলে বসে খেয়েছি, গল্পগুজব করেছি। অথচ অষ্টম দিনে ডিনার টেবিলে ড্যাডি তাঁকে প্রথম খেয়াল করলেন। হঠাৎ তাঁর দিকে নজর পড়ায় বেমক্কা বলে বসলেন, আপনাকে খুব চেনা-চেনা লাগছে। কোথায় দেখেছি বলুন তো?

আমরা সবাই অট্টহাস্যে ফেটে পড়ি। ড্যাডি রীতিমতো অপ্রস্তুত!

একদিন সন্ধ্যাবেলা—সবাই যখন প্রার্থনা শেষ করে চলে গেছে—আমি একলা একটা 'পিউ' (ভক্তদের বসার চেয়ার-টেবিল)-এ বসে মনে মনে প্রার্থনা করছি। হঠাৎ অন্ধকার থেকে এগিয়ে এল বেপ্পি। বললে, এই। তুই প্রার্থনা করতে করতে বেহন্দো কাঁদিস কেন রে?

আমি চমকে চোখ মেলে তাকাই। লোকটা এমনভাবে কথা বলল, যেন আমরা দুজনে দুজনের পরিচিত। জবাবে বলি, কী জানি? প্রার্থনা করতে গেলেই আমার চোখে জল এসে যায়!

—তা বেহুন্দো প্রার্থনাই বা করিস কেন?

এ আবার কী প্রশ্ন? কেন প্রার্থনা করি? এ তো সেই জাতের প্রশ্ন : কেন বেঁচে আছি? কেন নিশ্বাস নিই? থতমত খেয়ে বলি, আমি জানি না। আমি ‘আদোনাই’ (ঈশ্বর=God=আল্লাহ্)—এর কাছে কিছু প্রশ্নের জবাব জানতে চাই বলেই বোধহয় প্রার্থনা করি।

—ঠিক কথা! তবে কী জান বাবা? প্রশ্নগুলো যেমন অদোনাই তোমার মনের মধ্যে পাঠিয়ে দিয়েছেন, ঠিক তেমনি উত্তরগুলোও পাঠিয়ে দিয়েছেন। তবে হ্যাঁ, সেগুলো ঠিকমতো খুঁজে নিতে হবে। ঠিক খাঁজে-খাঁজে যখন প্রশ্ন আর উত্তরগুলো মিলে যাবে—জিগ্‌স ধাধাঁর মতো—তখন দেখতে পাবে, প্রশ্ন আর উত্তরে কোনো প্রভেদ নেই। সবই তিনি—‘আদোনাই’! আমার কথাগুলো পাগলের প্রলাপের মতো শোনাচ্ছে, তাই না, এলি?

আমার তা মনে হয়নি আদৌ। বরং মনে হলো : বেপ্তি একজন তত্ত্বজ্ঞানী। কথা যোরাতে বলি, তুমি দেখছি আমাকে চেন। আমি কিন্তু তোমার সবকথা জানি না। তুমি কোন দেশের মানুষ গো?

একগাল নিদস্ত হসি হেসে ও বলল : পিরথিবীর।

—এ কী আমার প্রশ্নের জবাব হলো?

—হলোই তো। প্রশ্ন আর উত্তর যে এক হয়ে গেল।

—না, মানে, আমার মনে হয় তুমি হাস্পেরিয়ান নও! তোমার ‘সারনেম’ তো ‘লে-জিঙ্ক’। তোমার বাবা কোথাকার মানুষ ছিলেন?

—আমার বাবা কে তাই আমি জানি না। তবে আমার গায়ের রঙটা তো দেখ—জলপাইয়ের রঙ—তাই আন্দাজ করি, আমার বাবা ছিল হয় ইতালিয়ান অথবা স্প্যানিশ! ভূমধ্যসাগরের কাছাকাছি থাকত।

অপ্রস্তুত হয়ে বলি, আর তোমার মা?

—হ্যাঁ! মাকে আমার স্পষ্ট মনে আছে। আমার আট বছর বয়সে সে মাটি নেয়। সে ছিল ফরাসি। আমাকে সে চার-চারটে জিনিস দিয়ে গেসল : প্রাণ, নাম, এই বেহালাটা আর সেটা বাজানোর কায়দা! ভারি ভাল মেয়ে ছিল সে! গাঁয়ে গঞ্জে নেচে-নেচে গান গাইত।

—তারই ‘সারনেম’ নিয়েছ বুঝি তুমি?

—না রে। সে ছিল জিপসি—তাই ওই ‘সারনেমটা’ বানিয়ে নিয়েছি।

এরপর ওর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়ে গেল। রোজই তার সঙ্গে এ-কথা সে-কথা আলাপ করতাম। সন্ধ্যার পর। ভক্তের দল যখন চলে যেত। যতক্ষণ না তাদের ‘ক্যান্ডেলস্টিক’গুলো দপ্‌দপ্ করে নিভে যায়। আলো আর অন্ধকার পরস্পরে মিশে যায়। প্রশ্ন আর উত্তরের মতো।

কিছুদিন পরে বুদাপেস্ট রেডিও ঘোষণা করল নাৎসি পার্টি গোটা হাঙ্গেরির দখল নিয়েছে। আমাদের শাসনকর্তা হের হোবর্কেই গদীতে রাখা হয়েছে। তবে নাৎসি পার্টি-লীডারের নিয়ন্ত্রণাধীনে। জার্মানির নাৎসি পার্টির নাম শুনেছি, অ্যাডলফ হিটলারেরও। এতদিন তারা ছিল দূরের মানুষ—সংবাদপত্রের মধ্যে অভিনেতা। এখন আর তা নয়। এক সপ্তাহের মধ্যেই ঘটে গেল একটা বিচিত্র ঘটনা। সরকারী নির্দেশে শিঘ্রো-শহরের বিদেশী ইহুদিদের বিতাড়ন করা হল। শুনলাম, সরকারী আদেশ হচ্ছে : হাঙ্গেরিতে থাকবে শুধু হাঙ্গেরিয়ান। কেন রে বাবা? আমরা বেশ তো ছিলাম! না! কর্তার ইচ্ছেয় কর্ম!

হাঙ্গেরিয়ান পুলিশ এ-শহর থেকে বিদেশী ইহুদিদের ধরে নিয়ে গেল। স্টেশনে এসে দাঁড়াল একসার ওয়াগন। গরু পাচার করার মালগাড়ি। শহরের অনেক অনাবাসী বাসিন্দা বউ-বাচ্চা নিয়ে উঠল সেই মালগাড়িতে। আমরা, হাঙ্গেরিয়ান-ইহুদিরা ভিড় করে দাঁড়িলাম স্টেশনে। সবাই সেদিন কাঁদছিল। যারা শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছে, আর যারা অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাদের বিদায় জানাতে এসেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই হুইসল দিয়ে মালগাড়িটা ছাড়ল। দশ মিনিটের মধ্যেই পাহাড়ের বাঁকে হারিয়ে গেল আমাদের প্রতিবেশীরা—যাদের মাতৃভূমি হাঙ্গেরি নয়, যারা খ্রিস্টানও নয়। যারা : জু! আরও কিছুক্ষণ টিকে রইল আকাশে ইঞ্জিনের কুণ্ডলী পাকানো কালো ধোঁয়া।

বেগ্নির দেশটা যে ‘পিরথিবী’—এ যুক্তি ওরা মানল না। তাকেও যেতে হলো।

দিন যায়। সপ্তাহ কাটে। মাস বদলে যায়। শহরের জীবনযাত্রা আবার স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। বাজার-হাট আগের মতোই রইল। বাচ্চারা রাস্তায় খেলা করে। বড়রা অফিস যায়। আমরা স্কুলে।

মাসছয়েক পরে একদিন সিনাগগে গিয়ে দেখি দরজার পাশে উবু হয়ে বসে আছে বেগ্নি। সেই সাজ-পোশাক, সেই খানদানি চেহারা। শুধু বেহালাটা নেই। বেগ্নি তার অভিজ্ঞতা সবিস্তারে জানাল আমাদের। মালগাড়িটা হাঙ্গেরি থেকে পোল্যান্ডের দিকে উত্তরমুখো যাচ্ছিল। হাঙ্গেরির সীমান্ত পার হবার পরেই, চেকোস্লোভাকিয়ায় পৌঁছানো মাত্র নাৎসি গেস্টাপোর একজন অফিসার লিস্ট মিলিয়ে যাত্রীদের দায়িত্ব নিল। তারপর একটা ফাঁকা মাঠের ধারে রেলগাড়িটা হঠাৎ দাঁড়িয়ে পরে। সেখানে দাঁড়িয়েছিল সারি সারি লরি। ওদের উপর আদেশ হলো লরিতে উঠে বসতে। যে যার পৌঁটলা-পুটলি সামলে বউ-বাচ্চা নিয়ে টপাটপ লরিতে উঠে বসল। ঘণ্টাখানেক লরি চালানোর পর একটা নির্জন জঙ্গলের ধারে লরিগুলো থেমে গেল। সেখানে আগে থেকেই খাড়া ছিল

মেশিনগানধারী গেস্টাপো বাহিনী, আর ডাঁই করা কোদাল গাঁইতি। ফাঁকা মাঠে সারিসারি চকখড়ির লম্বা লম্বা লাইন—যেন এ ময়দানে একটা স্পোর্টস্ হবে। দাগগুলো দৌড় প্রতিযোগিতার লাইন। একজন অফিসার হাঙ্গেরিয়ান ভাষায় অর্ডার দিল, মেয়েরা আর বাচ্চারা এপাশে জড়ো হও, আর জোয়ান মরদেরা এই লাইন ধরে গর্ত খুঁড়তে শুরু কর—চারফুট চওড়া, তিনফুট গভীর।

কেন—কী বৃত্তান্ত, কিছুই বোঝা গেল না। তবে আদেশকারীর দু-পাশে সার দেওয়া সৈনিক—তাদের হাতে মেশিনগান!

শতখানেক জওয়ান পালা-পালি করে সাত-আট ঘণ্টার পরিশ্রমে পাশাপাশি কতকগুলো নালা খুঁড়ে ফেলল। ওদের কাজ শেষ করতে সাত-আট ঘণ্টা লাগল বটে কিন্তু সুশিক্ষিত গেস্টাপো-বাহিনী তাদের কাজ শেষ করল আট মিনিটেই—খটা-খটা-খটা-খটা... মেশিনগানের অর্কেস্ট্রা থামল। আরও সাত-আট মিনিট সময় লাগল মৃতদেহগুলির অঙ্গ থেকে পোশাকগুলো খুলে নিতে। ছেলেদের মণিবন্ধ থেকে হাতঘড়ি। পকেট হাতড়ে পার্স, মেয়েদের আংটি, দুল, গলার মালা এমন কি বুকের উপত্যকায় হাত চালিয়ে লুকানো দামী গহনা। উলঙ্গ দেহগুলি চলে গেল ওদেরই বাবা-দাদা-স্বামীর খোঁড়া নালায়।

মাস্-গ্রেভ জমি সই সই করতে আরও আধঘণ্টা সময় লাগল। তারপর লুটের মাল যে যার পকেটে ভর্তি করে ওরা উঠে বসল লরিতে। ওদের কোনও চিহ্নই রইল না। না গেস্টাপো দলের, না যাত্রীদলের!

সত্যিকথা বলতে কি আমার বিশ্বাস হলো না।

বেহালাটা খোয়া গেছে। বেপ্পি কী করবে? বাড়ি বাড়ি গিয়ে ফিস ফিস করে তার বিচিত্র অভিজ্ঞতাটা সে শুনিয়ে আসে। দিনের পর দিন। আশ্চর্য! কেউ তার কথা বিশ্বাস করল না! এ কি বিশ্বাস করা যায়?

বেপ্পি আদ্যন্ত বদলে গেল। ছিল আধপাগলা, হয়ে গেল বদ্ধ পাগল!

সবাই তাকে এড়িয়ে চলে। ওর সেই বানিয়ে বানিয়ে বলা গল্পটা আমাদের শহরে কেউ বিশ্বাস করেনি। করার কথাও নয়। বেপ্পি কাঁদে না, সিনাগগের একটেরে চুপচুপ বসে থাকে।

একদিন তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কেন ওদের ওইসব গল্প কর?

—গল্প নয়, এলি! নিছক সত্যি কথা। আমার স্বচক্ষে দেখা। তোমরা বিশ্বাস কর। এবার তোমাদের পালা আসছে। তাই তোমাদের সাবধান করতে আমি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এতটা পথ এসেছি...

বেপ্পির পায়ে লেগেছিল মেশিনগানের গুলি। ও মড়ার ভান করে পড়েছিল খাদের ভিতর। লরিগুলো চলে যাবার পর সে মাটি ফুঁড়ে উঠে আসে। কেনুই-এর মতো! সে একা! আর কেউ সেই কবর থেকে উঠে আসতে পারেনি। ও খোঁড়া পা নিয়ে লরির

চাকার দাগ বরাবর রেললাইনের ধারে এসে পৌঁছায়। তারপর সেই রেলের জোড়া লাইনই ওকে পথ বাতলে দেয়। এগারো দিন পায়ে হেঁটে ও ফিরে আসে শিঘেট-শহরে। সারাজীবন সে যা করেনি, এবার তাই করেছে—ভিক্ষা! গ্রামবাসীরা তাকে খাদ্য-পানীয় দিয়েছে।

এ ঘটনা 1942 সালের শেষাংশে।

আমরা আর বুদাপেস্ট-নিউজ শুনতাম না। সেটা জার্মান-অধিকারে। বি.বি.সি. শুনতাম। লন্ডন থেকে প্রচারিত। নানা ভাষায়। হাঙ্গেরিয়ান নিউজ রাত দশটায়। তারা আশার বাণী শোনাতে—জার্মানিতে আর. এ. এফ. ক্রমাগত বোম্বার্বণ করছে। স্ট্যালিনগ্রাদ দখল করতে না পেরে হিটলারের অজেয় পানজার বাহিনী ল্যাজ গুটিয়ে ফিরে আসছে বার্লিনে। নাৎসি জার্মানির অন্তিম পরাজয় অনিবার্য। আমরা আশায় আশায় বুক বাঁধতাম।

এভাবেই কেটে গেল পুরো বছর : বেয়াল্লিশ থেকে তেতাল্লিশ।

1943-এর বসন্ত কাল। বেতারে নানান শুভ সংবাদ। যুদ্ধের গতির মোড় ফিরছে। জার্মানির আক্রমণাত্মক খেল্ খতম। এখন চলছে আত্মরক্ষামূলক খেলা। সবাই বলছে মিত্রপক্ষ দুর্ব্বার গতিতে এগিয়ে আসছে। আমাদের এলাকায় বিশেষ করে রাশিয়ান রেড আর্মি। হিটলার আর আমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

এই সময়ে আমাদের এক পারিবারিক বন্ধু বুদাপেস্ট থেকে এসে খবর দিল—বুদাপেস্টে ইহুদিরা চরম আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে। শহরের এখানে-ওখানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লেগেই আছে—একেবারে একতরফা নির্যাতন। নাৎসি গুপ্তারা ইহুদিদের দোকান লুট করছে, যখন-তখন গুলি চালিয়ে আমাদের লোকজনের লাশ ফেলে দিচ্ছে।

দুঃসংবাদটা আঙনের মতো ছড়িয়ে পড়ল সারা শহরে। তবুও আমাদের আশা : নাৎসিরা এতদূর নিশ্চয় আসতে পারবে না। এখন তাদের নিজেদের অবস্থাই তো কাহিল।

তিনদিনের মাথায় আমাদের চিন্তার অবসান ঘটল। জার্মান সৈন্যবোঝাই একঝাঁক সাঁজোয়া গাড়ি এসে থামল সেন্ট্রাল প্লাজার সামনে প্রকাণ্ড ময়দানে।

কিন্তু ওদের সঙ্গে প্রথম মোলাকাতে আমরা আতঙ্কগ্রস্ত হবার মতো কিছু পেলাম না। জার্মান সৈন্যরা তাঁবু খাটাল, কিন্তু অফিসারেরা সারা শহরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেল। অনেক অফিসার হাঙ্গেরিয়ান ভাষায় কথা বলতে পারে, অনেকে দোভাষীর মাধ্যমে কথা বলল। ওরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিভিন্ন সংসারে ‘পেয়িং-গেস্ট’ হয়ে গেল। রীতিমতো অর্থের বিনিময়ে। এমনকি কিছু কিছু ইহুদি পরিবারেও। আমাদের প্রতিবেশী ‘কাহ্ন’ পরিবারে উঠেছিলেন একজন নাৎসি মেজর। তিনি তো প্রথম দিনেই মিসেস কাহ্নকে ইয়া বড় এক প্যাকেট ক্যান্ডির বাস্ত্র উপহার দিয়ে বললেন, বাচ্চাদের দেবেন, আমার শুভেচ্ছাসহ।

ড্যাডি বললে, দেখলি তো তোরা? মানুষ কখনো পশু হয় না। মানুষমাত্রই বেসিক্যালি ভদ্র। জার্মান মানেই বর্বর নয়!

পরের সপ্তাহেই ছিল ‘পাসওভার’। ইহুদিদের বার্ষিক উৎসব। সাতদিন ধরে খানাপিনার হৈ-হুল্লাড়। তোমাদের যেমন দুর্গোৎসব। এ উৎসব মিশর থেকে মোজেস-এর মহানিষ্ক্রমণের স্মারক। আমরা আনন্দ উৎসব করলাম। কেউ বাধা দিল না। তবু ভয়ে ভয়ে কাটাতে হলো আমাদের সেই সপ্তাহটা।

তারপরেই একের পর এক আসতে শুরু করল নানান অর্ডার!

প্রথম নির্দেশ : আগামী তিনদিন ইহুদিরা যে যার বাড়িতে থাকবে। পথে বার হবে না। বাড়ির বাইরে কোনো ইহুদিকে পাওয়া গেলে সে আর বাড়ি ফিরতে পারবে না।

বেপ্পি এসে বললে, দেখলে তো? এখন কী বলবে? আমি পাগল?

তিনদিন পরে নির্দেশ এল : ইহুদিরা পথে বের হতে পারবে। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত। তবে তাদের বাঁ-হাতে একটা হলদে পট্টি পরতে হবে—ডেভিডের ঢাল আঁকা, যাতে দূর থেকে চিনতে পারা যায়, সে ইহুদি—খ্রিস্টান নয়।

ক্রমে আদেশ জারি হলো : আমরা রেস্তোরাঁয় খেতে পারব না, সিনেমা হলেও যেতে পারব না। রেলগাড়ি বা স্ট্রিটকারে চাপা আমাদের বারণ। বাজারে গিয়ে বিশেষ বিশেষ চিহ্নিত দোকান থেকে অবশ্য সওদা কিনতে পারি।

তারপরের পর্যায়ে এল : ঘেটো!

ঘেটো? তার মানে ? ওরা বুঝিয়ে দিল : শহরের বিশেষ বিশেষ এলাকা কাঁটাতার দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে। সেখানেই আমাদের থাকতে হবে। কাঁটাতারের বাইরে আসা চলবে না। আমাদের সুবিধার জন্য যে যে পাড়ায় ইহুদিদের ঘন বসতি সেখানেই চিহ্নিত হল ঘেটোর চৌহদ্দি। যারা বাইরে ছিল তারা নিজের নিজের বাড়ি ছেড়ে চলে এল, ঘেটোতে। তাদের ফাঁকা বাড়ি, আসবাবপত্র সব কিছুই দখল করল নাৎসি বাহিনী। আমাদের কিছু মাতব্বর ইহুদি দলপতিকে নিয়ে গঠিত হলো একটি ‘জুডেনরাট’—ঘেটো কাউন্সেল। এরপর থেকে সেই মাতব্বরেরাই সরকারী আদেশ জারি করতেন।

দিনসাতক এ ভাবেই কেটে গেল।

তারপর আমাদের উপর আদেশ হলো—প্রবিন্দিন সকাল আটটায় আমাদের এ শহর ছেড়ে যেতে হবে। সে কী? কোথায়? ঘেটোর জুডেনরাট বুঝিয়ে বললেন, ফ্যুরার ইহুদিদের জন্য পোল্যান্ডে একটা পৃথক এলাকা নির্দিষ্ট করেছেন। সেখানে শুধু ইহুদিরাই থাকবে, স্বায়ত্তশাসনে। অবশ্য জার্মান সরকারের তীব্রদারিতে—যেমন কানাডা বা অস্ট্রেলিয়ায় আছে স্বায়ত্তশাসিত সরকার—তারা ব্রিটিশ ক্রাউনকে মেনে চলে।

এতে আপত্তি করার কী আছে? এ তো সেই মোজেস-এর প্রমিসড ল্যান্ড। কিন্তু তার সঙ্গে ওটা ওরা কী বলল? প্রত্যেকটি ব্যক্তি এক-একটা সুটকেস বা ‘পিঠু’ নিয়ে

যেতে পারে—আ সে নিজে বহন করতে পারবে—কিন্তু তাতে যেন সোনাদানা, গহনাপাতি না থাকে। জামাকাপড়, টুথব্রাশ, তোয়ালে, ডায়েরি ইত্যাদি। মানে? আমরা যদি ‘প্রমিসড-ল্যান্ডে’ নতুন উপনিবেশ স্থাপন করতে যাই, তাহলে যা কিছু আমাদের নিজস্ব সম্পদ, তা সুঙ্গে নিয়ে যেতে পারব না? আর মাত্র এক সুটকেস? মাথাপিছু? আমাদের ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র...

এর কোনো সদুত্তর পাওয়া গেল না। পরদিন সকালেই হাস্পেরিয়ান পুলিশ আর নাৎসি সৈন্যরা তাদের পুলিশ ডগ নিয়ে ঘেটোয় হানা দিল : ‘আউট! আউট! ইউ বাস্টার্ডস! বেরিয়ে আয় বেজম্মার দল!’

এ আবার কী জাতের বিদেশযাত্রা?

শতশত ভীত সম্ভ্রান্ত ইহুদি পরিবার বেরিয়ে এল সড়কে। রাস্তায় দু-পাশে বন্দুকধারী এস.এস. আর পুলিশ কুকুর। আমাদের ঘেটো-গেট পার করে তাড়িয়ে নিয়ে এল স্টেশনে। সেখানে খান-পঞ্চাশ মালগাড়ি নিয়ে একটা ইঞ্জিন গজরাচ্ছে। আদেশ হলো কামরা পিছু আশিজন উঠিবেক। আশিজন? একটা মালগাড়ির ওয়্যগনে? জায়গা হবে কী করে? কে-কার কথা শোনে! পিছন দিকে বন্দুকের গুঁতো খেয়ে মানুষজন সামনের দিকে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। ড্যাড বললে, হুঁশিয়ার! দেখ, যেন দলছুট হয়ে যেও না। সবাই যেন এক কামরায়...

বাপি ধরেছে আমার হাত, আমি মায়ের, মা এঞ্জিপোরার, সে হিলডার...

ঠেলাঠেলি করে আমরা উঠে পড়লাম একটা মালগাড়িতে। সেটায় জানলা নেই—হুই উঁচুতে গরাদ-লাগানো একটা একহাত বাই একহাত ফোকর। এ গাড়িতে গরু পাচার করা হয় ‘স্লটার-হাউসে’। তাই ওই ফোকর। নাহলে গরুগুলো অক্সিজেনের অভাবে মারা যায়।

আমাদের মালগাড়িতে ‘আশিজন দাঁড়াইবেক’ হওয়ায়াত্র ড্রাম করে বন্ধ হয়ে গেল একমাত্র লোহার দরজাটা। তালা পড়ল বাইরে থেকে। তখন বেলা এগারোটা। ওই চৌকো ফোকরের একরত্তি সূর্যের আলো ছাড়া সবটাই অন্ধকার।

এই বীভৎস যাত্রার কথাটা জীবনে ভুলব না। আশিজন মানুষ ঠেলাঠেলি করে ঠায় দাঁড়িয়েছিলাম পুরো সত্তর ঘণ্টা। তিন দিন। কেউ বসতে পারেনি। দু-চারজন অজ্ঞান হয়ে গেল; কিন্তু অজ্ঞান হয়ে ‘পড়ে গেল না’। পড়ার ঠাঁই কোথায়? গাড়ি মাঝে মাঝে দাঁড়িয়েছে। ইঞ্জিন জল নিয়েছে, কয়লা নিয়েছে। হয়তো বা ড্রাইভার গার্ডদের ডিউটিও বদল হয়েছে। কিন্তু আমাদের মালগাড়ির দরজা খোলা হয়নি। তিনদিন-তিনরাত প্রত্যেকে অভুক্ত। তারচেয়ে বড় কথা—একবিন্দু জল পায়নি কেউ খেতে। তারও চেয়ে বীভৎস যে কথাটা, সেটা লিখতে আমারই কলম সরছে না, আপনারাই বা তা পাঠ করবেন কী ভাবে? তিনদিন না খেয়ে থাকা যায়, তৃষ্ণায় হয়তো ছাতি ফেটে যায়—কিন্তু জৈবিক নিয়মে যে বর্জ্যপদার্থ...ছেলেদের আন্ডারওয়্যার আর মেয়েদের প্যান্টিতে—তা তিনদিন

ধরে বহন করা? পার্শ্ববর্তী গায়ে গা লাগিয়ে! উপরের ওই ফোকর দিয়ে অক্সিজেন হয়তো আসছিল, মাঝে মাঝে সূর্যালোকও। কিন্তু এই কামরার পুরীষ-দুর্গন্ধ তো বাইরে নির্গত হচ্ছিল না। উঃ! সে কী নরক যন্ত্রণা! কাঁদছে, অনেকেই কাঁদছে! লজ্জায়, ঘৃণায়। দু-একজন প্রতিবেশীর গায়ে বমি করে দিতে বাধ্য হলো! তবু গাড়ি একটানা চলেছে—কোথায় কে জানে!

তৃতীয় দিন সকালে হঠাৎ মালগাড়িটা থেমে গেল। কে একজন একটা বাচ্চা ছেলেকে কাঁধের উপর তুলে ধরল। দেখতে—স্টেশনটার কী নাম। ছেলোটো—তার হাফপ্যান্ট নিজের পুরীষে মাখামাখি—বানান করে পড়ল : AUSCHWITZ!

আউসউইৎজ! নামটা আমি শুনি নি। কে একজন বললেন, আমরা পোল্যান্ডে এসেছি। এটা নাৎসিদের সবচেয়ে বড় কনসেন্ট্রেশন-ক্যাম্প। মৃত্যুপুরী।

অন্যদের কী হলো জানি না। আমার ভয় হলো না। মৃত্যুই কামনা করছিলাম তখন। ড্রাম করে দরজাটা খুলে গেল। হঠাৎ সূর্যালোকের ঝলকানিতে আমরা সবাই মুহূর্তে যেন অন্ধ হয়ে গেলাম। চোখ বন্ধ হলেও শ্রুতি তো কার্যকরী! বাইরে থেকে ভেসে আসছে পুলিশ-কুকুরের ভয়ঙ্কর গর্জন। তার সঙ্গে গেস্টাপো দলপতির সারমেয় হুঙ্কার : আউট! আউট! ইউ বাস্টার্ডস্!

হুড়মুড়িয়ে আমরা নেমে পড়ি প্ল্যাটফর্মে। আশিজন নয়, এ কামরা থেকে পাঁচাত্তর জন। পাঁচজন মারা গেছে ইতিমধ্যে। একজন নাৎসি সৈনিক নাকে রুমাল চাপা দিয়ে আমাদের দিকে তীব্র বেগে হোসপাইপে ধারান্নান করিয়ে দিল। আঃ! কী আরাম! প্যান্টের ভিতর যে বর্জ্য পদার্থ ছিল তার অনেকটাই গলে-গলে প্ল্যাটফর্মে নেমে এল। ওরা কয়েক বালতি জল নিয়ে এল। পানীয় জল না প্রক্ষালনের জানি না। আমরা পান করলাম, সে জলে ধৌত করলাম নিজেদের। ওই খোলা প্ল্যাটফর্মেই যতটা সম্ভব লজ্জাসরমের মাথা খেয়ে। তারপর ওরা আমাদের হাতে ধরিয়ে দিল এক-একটা ব্রাউন-ব্রেড—শুকনো পাউরুগি। গোগ্রাসে আমরা তাই গিলতে থাকি।

একজন নাৎসি অফিসার হাঙ্গেরিয়ান ভাষায় বলল : তোমাদের ক্যাম্প স্টেশন থেকে মাইলখানেক দূরে। তোমাদের হেঁটেই যেতে হবে। চার-চারটে লাইনে তোমরা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াও। আমি হুইসল দিলেই তোমরা হাঁটতে থাকবে। এটা একটা লেবার ক্যাম্প। স্ত্রীলোক, বাচ্চা আর অসুস্থরা ক্যাম্পে থাকবে, আর জোয়ান মানুষকে কাজ করতে হবে। কাজে ফাঁকি না দিলে খেতেও পাবে। কেউ পালাবার চেষ্টা করবে না। তাহলেই বেহুদা গুলি খেয়ে মরবে। বুঝতে পারলে কী বললাম?

কেউ জবাব দিল না।

—নাউ স্টার্ট মার্চিং! আগে বাড়। ডব্ল্ মার্চ!—হুইসল দিল সে।

আমরা ছয়জন তখনো হাতে-হাত ধরে আছি। আমাদের সুটকেস বা পিঠুগুলো ওই ওয়াগনেই পড়ে রইল। সেগুলো বহন করার দায়িত্ব থেকে ওরা আমাদের মুক্তি দিল।

ওরাই তা ভাগাভাগি করে আত্মসাৎ করবে। ঝাড়া-হাতপা হয়ে আমরা চলেছি ক্যাম্পের দিকে। বাঁক ঘুরতেই নজরে পড়ল কারখানাটা। কারখানা ? ওটা ? কোথায় ? ওটা তো শুধু একটা চিমনি। লকলক করে আগুনের শিখা আকাশটাকে লেহন করছে। আর এ কী ? বিশ্রী একটা মড়া-পোড়া গন্ধ ! কী পুড়ছে ওখানে ? কাঁটাতারে ঘেরা ওই কারখানায় কী তেরি হয় ? কী পোড়ানো হয় ?

ড্যাডির দিকে তাকাতেই সে বললে, ঝজিপোরার হাতটা শক্ত করে ধরে রাখিস। ও ভয় পাচ্ছে! হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়ে না যায়!

শুধু ঝজিপোরা একলা কেন ? আমারও তো কণ্ঠনালী ভয়ে শুকিয়ে কাঠ। কী পুড়ছে ওখানে ? এত মাংসপোড়া দুর্গন্ধ কেন, আকাশে-বাতাসে ? কে যেন তখন বলেছিল না—‘আউসউইৎজ’ মৃত্যুপুরী ?

কাঁটাতারে ঘেরা এলাকাটায় প্রকাণ্ড ফটক পার হলাম। কিছু দূরে দূরে উঁচু মঞ্চের উপর মেশিনগানধারী পাহারাদার। কাঁটাতারে কিছু দূরে দূরে বিজ্ঞপ্তি : তার ছুঁলেই মৃত্যু। আমাদের থামতে বলা হলো : ‘ছেলেরা ডাইনে, মেয়েরা বাঁয়ে সারি দাও!’

এ আদেশ মানতে কারও আপত্তি হলো না। মা, দুই দিদি আর ঝজিপোরা একটু দূরে সরে দাঁড়াল। সব মেয়েই তাই গেল। ড্যাডি আর আমি হাত ধরাধরি করে ডানদিকের সারিতে।

মাত্র ছয়টি শব্দ। কী অমায়িক কণ্ঠে আদেশটা দিল গেস্টাপো অফিসার। আমি স্বপ্নেও ভাবিনি—ওদের সঙ্গে সারাজীবনের মতো ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। লোকটা তেমনি নির্বিকার কণ্ঠে আবার বলল : ‘এবার মেয়েরা বাঁ-দিকের ক্যাম্পে চলে যাও। ছেলেরা ডানদিকের।’

মা, দিদিরা আর ঝজিপোরা আমার দৃষ্টির বাইরে চলে গেল।

সেই তাদের শেষ দেখি! কী ভাবে তাদের মৃত্যু হয়েছিল সেকথা জানতে পারিনি সারাজীবনে!

ছেলেদের ক্যাম্পে থ্রি-টায়ার বেঞ্চি। দুই সারির মাঝখান দিয়ে হাততিনেক চওড়া প্যাসেজ। এক-এক বেঞ্চিতে দুজনের শয়নব্যবস্থা। ক্যাম্প কমান্ডান্ট সহৃদয় ব্যক্তি। বলল, ‘তোমরা ক্লান্ত। বিশ্রাম নাও। কাল সকালে ঘণ্টা বাজবে সাতটার সময়। তার আগে রেডি হতে হবে।’

একজন কাপো* এক বালতি স্যুপ নিয়ে এল। মাথাপিছু একটা করে এনামেলের মগ আর এক-এক টুকরো পাঁউরুটি। ড্যাডি বললেন, আমার ক্ষিদে নেই। তুই আমারটা খেয়ে নে।

* কাপো = ইহুদিবন্দিই। তবু নাৎসি সৈন্যদের সহকারী হিসাবে কাজ করে। বাকি বন্দিদের পরিচালনাও করে—ওভারশিয়াবধর্মী। এরা দুর্ধর্ষ, নৃশংস।

আমি প্রচণ্ড ধমক দিয়ে উঠি : খিদে নেই মানে? ইয়ার্কি হচ্ছে? সারাদিন তো পেটে হুঁদুরে ডন দিয়েছে। খেয়ে নাও বলছি।

বলেই মনে হলো, কাকে কী বলছি? এ ভাষায় তো কখনো কথা বলিনি ড্যাডির সঙ্গে! এ আমার কী হলো? আশ্চর্য! লক্ষ্মী ছেলেটির মতো সে রুটি আর সুপটা নিয়ে নিল। ‘সুপ’ গৌরবে! আলু আর গাজর সিদ্ধ জল। তবে দয়া করে এক চিমটে লবণও দিয়েছে। দ্বিতীয়বার বলতে হলো না। খিদের জ্বালায় ড্যাডি গাঁৎ গাঁৎ করে সেগুলো গোগ্রাসে গিলে ফেলল।

পরদিন সকাল সাতটায় আমরা ক্যাম্পের ফাঁকা মাঠে লাইন দিলাম। ড্যাডি ঠিক আমার পিছনে। আশপাশে অনেক চেনাজানা মানুষ। সবাই আমাদের শহর থেকে একই ট্রেনে কাল এসেছে। নাৎসি অফিসারেরা তখনো হাজিরা দেয়নি। একজন যণ্ডমার্ক কাপো এগিয়ে এল ব্যাটন হাতে। লোকটা কুৎসিত। মহিষাসুরের মতো মুখখানা। দেহটাও দৈত্যের মতো। তার পিছন পিছন একজন ছোকরা কাপো। তার হাতে একটা নোট বই আর কলম। মহিষাসুর জনে-জনে আমাদের নাম আর বয়স জেনে নিচ্ছিল। লোকটা বোধহয় নিরক্ষর। তার নির্দেশমতো অল্পবয়সী কাপোটা খাতায় সবকিছু লিখে নিচ্ছে। মহিষাসুর আমার নাম জানতে চাইল। নির্দেশমতো তার সহকারী খাতায় নামটা লিখল। তারপর মহিষাসুর প্রশ্ন করে, বয়েস কত তোর?

বললাম, পনেরো।

—না সতেরো। ঠিক করে বল! কত বয়স তোর?

—বললাম তো। পনেরো।

ঠাই করে ব্যাটনের এক বাড়ি বসিয়ে দিল আমার হাঁটুতে। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় আমি কাঁতে উঠি। মহিষাসুর ধমকে ওঠে, এখানে কথার অবাধ্য হলে গুলি করে মারা হয়। বুয়েছিস? বল রাস্কেল, তোর বয়স কত?

প্রশ্ন করেই সে ব্যাটনটা উঁচু করে ধরেছে। ভয়ে ভয়ে বলি, সতেরো! মহিষাসুর হাসলেন : ‘এই তো বাছাধন! লক্ষ্মী ছেলের মতো কথা!’

তারপর পিছন ফিরে সাক্ষর কাপো-ছোকরাকে বললে, কিরে ব্যাটা? লিখেছিস ঠিকমতো : সতেরো?

ছেলেটা ঘাড় নেড়ে ‘হ্যাঁ’ জানাল। এবার মহিষাসুর ড্যাডির মুখোমুখি হলো : বল্ রাস্কেল, তোর বয়েস কত?

—বাহান্ন!

—গর্দভ! নিজের বয়েসটাও জানিস না? তোর বয়স তো উনপঞ্চাশ! বল ঠিক করে! কত?

জীবনে কখনো যা করেনি ড্যাডি আজ তাই করে বসল। মহিষাসুরের ওই উদ্যত যষ্টি আর আমার যন্ত্রণাকাতর মুখখানা একনজর দেখে নিয়ে ভয়ে ভয়ে বললে :
উনপঞ্চাশ!

—এই তো! গর্দভচন্দ্রের বুদ্ধি খুলেছে।

লোকটা এগিয়ে গেল পরবর্তী জুড়েনের দিকে। আমার তখন ভীষণ কান্না পাচ্ছে। ছিঃ ছিঃ! এ কী হয়ে গেল! আমার যন্ত্রণা শিঘ্রেই শহরের সর্বজনমান্য ওই বৃদ্ধ সতানিষ্ঠ মানুষটাকে ‘গাধা’ বলেছে বলে নয়—তাকে দিয়ে মিথ্যে কথা বলিয়ে নিতে পেরেছে বলে। আমার হাতে একটা ছোরা থাকলে আমি ওর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তাম। আমাদের দিয়ে মিথ্যে বলিয়ে নেওয়ায় ওর কেন এই স্যাডিস্টিক ভাইকেরিয়াস আনন্দ! কী স্বার্থ ওর?

অনেক পরে জানতে পারি : ওই মহিষাসুরটার আসল স্বরূপ। ওর চেহারা ই বীভৎস, বাচনভঙ্গি কদর্য। কিন্তু ও মানুষটা খারাপ নয়।

যাদের বয়স ষোলোর কম অথবা পঞ্চাশের বেশি, নাৎসি-আইনে তাদের কর্মক্ষম বলে ধরা হয় না। প্রাথমিক নির্বাচনেই তারা বাতিল হয়ে যায়। সরাসরি তাদের পাঠানো হয় গ্যাস-চেম্বারে। সেখান থেকে ইনসিনিরেটর!

সব কয়জনের নাম-বয়স লেখা শেষ হলে আমাদের বাঁ হাতে উল্লিচিহ্নে এক-একটা সনাক্তিকরণ নম্বর ঐকে দেওয়া হলো। সারাজীবনের সঙ্গী হিসাবে। আমার নম্বর হলো A.C.7239; ড্যাডির A.C.7240। আমাদের বলা হলো : এরপর থেকে নিজনিজ নাম ভুলে যেতে হবে। হাজরির সময় শুধু নম্বর ধরে ডাকা হবে। আমরা সবাই নাম হারালাম। হয়ে গেলাম এক একটা নম্বর।

নম্বর দেগে দেওয়া শেষ হলে আমাদের তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হলো একটা প্রকাণ্ড টিন-শেডের তলায়। তার একদিকে বিজ্ঞপ্তি : Friseur salon (চুলকাটার সেলুন), অপরদিকে : Badezimmer (স্নানাগার)। আমাদের প্রথমে যেতে হল নাপিতের কাছে। তার আগে হাঙ্গেরিয়ান ভাষায় একটিমাত্র শব্দে একটা নির্দেশ জারি করা হলো। একটিমাত্র শব্দে তা বাঙলায় অনুবাদ করার মতো বাঙলাভাষাজ্ঞান আমার নেই। দুটি শব্দে প্রকাশিত হলে ওই বীভৎস আদেশটার ব্যঞ্জনা ব্যাহত হবে। ইংরেজিতে বলা যায় অবশ্য। শব্দটা : Strip!

প্রকাশ্যে সর্বজনসমক্ষে আমাদের সম্পূর্ণ উলঙ্গ হতে হলো। কোট, জামা, প্যান্টালুন, আভারওয়্যার সবকিছু জমা দিতে হলো। সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় সারিতে আবার সামিল হলাম বাপ-বেটা!

দীর্ঘ বন্দি কালে সেই একটি খণ্ডমুহূর্তে আমার মনে হয়েছিল : আদোনাই করুণাময়! তিনি যা করেন তা আমাদের মঙ্গলের জন্যই। মা-দিদিদের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হবার দুঃখ সেই

একটিবার আমার কাছে বাঞ্ছনীয় মনে হয়েছিল। আমরা যদি একসঙ্গে থাকতাম, আর মা-দিদি-ৎজিপোরাকে আমার সামনে—সবার সামনে—ওই আদেশ পালন করতে হতো... উহ্ ভাবা যায় না।

এরপর যেতে হলো যৌথ স্নানাগারে। হোসপাইপের প্রচণ্ড জলশ্রোত আমাদের ভিজিয়ে দিল। জল নাতিশীতোষ্ণ। দীর্ঘদিনের মালিন্য ধুয়ে গেল তাতে। তোয়ালে বা গা-মোছার ব্যবস্থা নেই। রৌদ্রালোকে দাঁড়িয়ে থাকতে হলো মিনিট পনের। তারপর এলাম চুলকাটার মণ্ডপে। দশ-বারোজন নাপিত সেখানে উপস্থিত। আমাদের চুল ছোট ছোট করে ছেঁটে ফেলা হলো। তারপর হলো মস্তক মুগ্ধ। সে কাজ শেষ হতেই আদেশ হলো : দৌড়াও!

আমরা উলঙ্গ অবস্থায় দৌড়াতে থাকি একদিকে। সেখানে একদল কাপো দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের দিকে তারা ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে শার্ট-প্যান্ট। যার বরাতে যা জুটছে তাই লুফে নিতে হলো। বেঁটের ভাগ্যে লম্বা পাংলুন, মোটার ভাগ্যে খাটো জামা। অবশ্য আমরা যখন তা নিজেদের মাপ অনুযায়ী অদলবদল করে নিলাম তখন ওরা আপত্তি করল না। সবারই মাথা নেড়া, অঙ্গে ডোরাকাটা শার্ট, ডোরাকাটা পাংলুন। বহুদূর থেকেও ওদের বুঝে নিতে আর অসুবিধা হবে না—কে কাপো, কে সাধারণ বন্দি—জু।

আউসউইৎজ-এ আমাদের কাজ দেওয়া হলো ইটভাঁটায়। আমি জোয়ান মানুষ। তাই আমার হাতে ধরিয়ে দেওয়া হলো কোদাল। মাটি কোপানোর কাজ। ড্যাডি দুবলা মানুষ। মাটি কোপাতে পারবে না। মহিষাসুর করুণাময়। বললে, তুই গাধা হলে কী হয়, গাধার মোট বইবার ক্ষমতা তোর নেই। তোকে দিলাম ‘পাতেরা’র কাজ। ছাঁচে ফেলে কাদার ইট বানাবি। কিরে? পারবি তো?

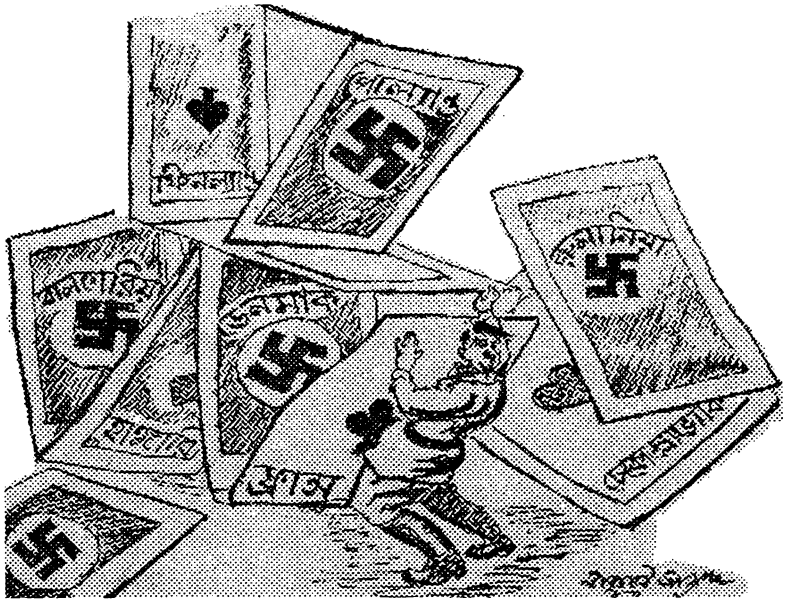
ড্যাড বললে, পারব!

—ভেরি গুড! কী নাম যেন তোর?

সাতদিন এক টেবিলে ডিনার করেও যে রেইজেল-আন্টির নামটা মনে রাখতে পারিনি, সেই এলোভুলো মানুষটা কী প্রচণ্ডভাবে বদলে গেছে। মৃত্যুভয়ের কী মহিমা! ড্যাড বললে, A.C.7240।

মহিষাসুর আমার দিকে ফিরে ফের হাসলেন। বললেন, তোর এই বুড়ো-হাবড়া বাপটা গাধা হলে কি হয়, ওর বুদ্ধি আছে।

আউসউইৎজ-ক্যাম্পের যতই বদনাম থাক সেটা রীতিমতো পরিচ্ছন্ন। মহিষাসুরের ব্যবস্থাপনায় বুড়ো-হাবড়া জু-বন্দিদের দিয়ে দিনে দুবার সবটা ক্যাম্প ঝাঁট দেওয়া হয়। মোছা হয়। সবকিছু ছিমছাম। আমাদের কাজও হালকা। বিশেষ করে ড্যাডির। কিন্তু এ সুখ বেশিদিন আমাদের বরাতে সইল না। মাসছয়েকের মধ্যেই অর্ডার এল এ ক্যাম্প খালি করে দিতে হবে। প্রতিদিনই লরিতে করে দু-চারশ বন্দি অন্যান্য ক্যাম্পে পাচার করা হচ্ছে। গুজব : রেড আর্মি দ্রুত এগিয়ে আসছে।



যুদ্ধের তখন প্রায় অন্তিম অবস্থা। হিটলারেরও। তার তাসের ঘর একের পর একটা ভেঙে পড়ছে। থার্ড-রাইখের বিশাল সাম্রাজ্য—যা নাকি হাজার বছর স্থায়ী হবার কথা—তার মৃত্যু-ঘণ্টা বাজতে শুরু করেছে। ফিনল্যান্ড, ডেনমার্ক, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, রুম্যানিয়া, হাঙ্গেরি। ফ্যুরারের অপরাজেয় বাহিনী বার্লিনমুখে ফিরে আসছে। বন্দিদের আউসউইৎজ থেকে সরিয়ে নিয়ে ক্যাম্প সম্পূর্ণ খালি করে ফেলা হবে। তারপর যাবতীয় রেকর্ড পুড়িয়ে ফেলা হবে। আউসউইৎজ নামে একটা কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প যে আদৌ ছিল, এটা ভবিষ্যৎ পৃথিবীকে জানতে দেওয়া হবে না। এটাই বড়কর্তাদের অর্ডার।

আমাদের বাপ-বেটার নম্বর যেহেতু পরপর তাই একই ট্রাকে আমাদের ঠাই হল। একদিন সকাল-সকাল আমরা জনাপঞ্চাশ বন্দি ট্রাকে চেপে রওনা হলাম। তখন জানতাম না—এখন জানি—আমাদের পাঠানো হল যে বন্দিশালায় তার নাম: প্লাশজাউ (Plaszow)।

আমরা গাদাগাদি করে খোলা ট্রাকে উবু হয়ে বসেছি। তিনজন এস. এস. মেশিনগানধারী বসেছে টুল পেতে। আর ড্রাইভারের পাশে ওদের দলপতি : ক্যাপ্টেন কী-য়েন। ঘণ্টা চার-পাঁচ পোল্যান্ডের গম-যব-বার্লির দিগন্ত অনুসারী ক্ষেত পার হয়ে আমরা দুপুর নাগাদ এসে উপস্থিত হলাম একটা আধা-শহরে। মেন-স্ট্রিটে একটা বড় পেট্রোল পাম্প এসে ট্রাকটা দাঁড়াল। গাড়ি এখানে তেল নেবে। আধঘণ্টার বিশ্রাম।

রক্ষীর প্রহরায় আমাদের একে একে হিসি করে আসার অনুমতি দেওয়া হলো। মাথা পিছু একটা করে রুটি আর সেই অনবদ্য ‘সুপ’ও দেওয়া হলো। রক্ষীদল প্যাকেট-লাঞ্চ সঙ্গে করেই নিয়ে এসেছিল। পেট্রোল পাম্পের বিপরীতে একটা বাড়িতে দেখলাম বিজ্ঞপ্তি দেওয়া আছে : ‘এস.এস. এবং গেস্টাপো বাহিনীর প্রবেশ নিষেধ!’

কী ব্যাপার? পোল্যান্ড রাজ্যটা তো নাৎসি অধিকারে। এখানে প্রতিটি প্রত্যন্তদেশে তো ওদের অবাধ অধিকার—মায় গৃহস্থের শায়নকক্ষে ‘নক্’ না করেই তো ওরা ছড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়ে। তাহলে ওই বিজ্ঞপ্তির অর্থ কী? পরক্ষণেই বুঝতে পারি ওটা ‘রেড-লাইট-এলাকা’! দেহ ব্যবসায়ীদের আস্তানা। সাধারণ জার্মান সৈনিকের জান্তব ক্ষুধা মেটানোর জন্য ওখানে কিছু-প্রফেশনাল যৌবনবতীকে রাখা হয়েছে; কিন্তু যেহেতু ফ্যুরার স্বয়ং জিতেদ্রিয় সন্ন্যাসী তাই তাঁর পেয়ারের এস. এস. এবং গেস্টাপোদের চরিত্ররক্ষার জন্য ওই নির্দেশ!

একটু পরেই সে বাড়ির সদর দরজা খুলে বার হয়ে এল একঝাঁক সুসজ্জিতা তরুণী—ষোলো থেকে ছাব্বিশ। উৎকট তাদের প্রসাধন। রুজ-লিপস্টিক-ম্যাসকারায় তাদের মুখ এনামেল-করা। সবাই যে সুন্দরী তা নয়, তবে যৌবনের উপাচারে তাদের তনুদেহ উপচীয়মান। সাজ-পোশাকও গা-দেখানো—তাদের মিনি স্কার্ট—তারাক্ষরের ভাষায় : ‘ওলঙ্গ বাহার’! লিপস্টিক-রঞ্জিত ওষ্ঠাধরে বার্ডসআই।

একটি মেয়ে আমাদের দিকে আঙুল তুলে জার্মান ভাষায় বললে : লুক! এ ট্রাকলোড অব হিডেন্স!

আর একটি দুঃসাহসিকা আমাদের রক্ষীদলকে লক্ষ্য করে ঠোঁটে আঙুল ছুঁয়ে ‘ফাইং-কিস্’ ছুঁড়ে দিল। তার একটা বিচিত্র প্রতিক্রিয়া হলো! নারীসঙ্গবর্জিত আমাদের রক্ষীদল সংযম হারাল। বুপবুপ করে নেমে পড়ল ট্রাক থেকে। ছুটে গেল মেয়েগুলোকে ধরতে। ঠিক তখনই সামনে এগিয়ে এল একটি ‘আমাজন’। বছর ত্রিশ বয়স হবে হয় তো। প্রায় ছয়ফুট লম্বা। তার হাতে একটা ছোরা রৌদ্রালোকে চকচক করে উঠল। সে গর্জন করে উঠল : লুক হিয়ার, জেরিজ! উই আর প্রফেশনালস্! ফাইভ মার্কস্ ফর আ der Kub (চুষন)—মাউথ টু মাউথ। ‘নাদার ফাইভার ফর ‘পঙ্গ’! অ্যান্ড ফিফটি ফর আ হোলহগ!

ছোরাটা মাথার উপর তুলে সব শেষে বললে : Empfang (স্বাগতম)!

ড্রাইভারের পাশের সীট থেকে ক্যাপ্টেনও লাফিয়ে নেমে পড়েছিল। মাঝপথে সে থমকে গেল। তারপর হিপপকেট থেকে ওয়ালেটটা বার করতে করতে বললে : Vielen Dank für die einladung. [ধন্যবাদ! তোমার স্বাগত আমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম।]

ছুটে গিয়ে সে জড়িয়ে ধরল বিপুলান্দীকে। দুজনে জড়াজড়ি করে ঢুকে গেল বাড়িটার ভিতর। যে-মেয়েটি ‘উড্ড-চুষন’ ছুঁড়েছিল তাকে সবলে আলিঙ্গন করল আর

একজন। আকণ্ঠ তৃষ্ণা নিয়ে তার মুখে মুখে চুষন করতে থাকে। পুরো এক মিনিট। আমার মনে হলো, মেয়েটির বুঝি দম বন্ধ হয়ে যাবে। আর একজন নাৎসি সৈন্য জাপটে ধরল তৃতীয়াকে। সে খিলখিলিয়ে হেসে উঠল। কামোন্মোদ সৈন্যটি তাকে চুমু খেল না। ফর ফর করে টেনে ছিঁড়ে দিল তার ব্লাউজের সামনেটা। ব্রা-এর বন্ধন খুলে...

আমি ড্যাডির দিকে ফিরি। দেখি, সে পিছন ফিরে চোখ বন্ধ করে বিড়বিড় করে ‘তোরা’ মন্ত্র জপ করে চলেছে। তৎক্ষণাৎ এ দিকে ফিরি, ড্যাডি আমাকে দেখছে না জানতে পেরে।

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। উন্মাদ হয়ে গেলাম। ছবিতে দেখেছি, ব্রোঞ্জ-মার্বেলে দেখেছি—কিন্তু রক্তমাংসের বাস্তব ওই দুর্লভ বস্তু দুটি আমার পনেরো বছরের কৈশোরকালে কখনো দেখিনি। মেয়েটি আমার চেয়ে দু-তিন বছরের বড়ই হবে। স্বাস্থ্যবতী, গৌরাঙ্গী। সম্পূর্ণ নগ্নবক্ষ। প্রকাশ্য সড়কে প্রখর সূর্যালোকে তার বুকে যৌবনের যুগল জয়ন্তস্ত উথাল-পাথাল! বৃত্তদুটিতে গোলাপী আভা।

আমার কান ঝাঁ-ঝাঁ করছে। মাথা বিমবিম করছে, চোখ বিস্ফারিত। নাসারন্ধ্র স্ফুরিত। অনুভব করি—কী লজ্জা—অন্তরালে আরও একটি গোপনাস্ত্র স্ফুরিত। আবার ড্যাডির দিকে নজর পড়ে। মুদিতনেত্র বৃদ্ধটি একমনে জপ করে চলেছে : “Yisgaddal, Veyiskaddash, shemy Rabbah...”

[তাঁর মহিমা বিশ্বব্যাপী হউক। তিনি আমাদের আশীর্বাদে ধন্য করুন!]

সাত মিনিট অথবা অনন্তকাল জানি না। আমার স্বর্গসুখের রৌরববাস সমাপ্ত হলো! সম্বিত ফিরে পেলাম একটা তীব্র হইসলের শব্দে। তাকিয়ে দেখি মাঝসড়কে প্রকাশ্য দিবালোকে ওদের যৌথ কামক্রিড়ার অবসান ঘটেছে। রক্ষীদল ফিরে এসে বসেছে নিজ-নিজ টুলে। ড্রাইভার গাড়ি স্টার্ট করে গিয়ার বদলাচ্ছে। মেয়েরা আমাদের দিকে পিছন ফিরে ব্লাউজের বোতাম লাগাচ্ছে। সেই বিকচউরসা অন্তহৃত। ‘আমাজন’ হাত নেড়ে তার ক্ষণিকের অতিথিকে টা-টা জানাচ্ছে। আবার ড্যাডির দিকে ফিরি। সে বলে, জানোয়ার! এক পাল জন্তু।

আমার কান্না পাচ্ছিল। তাহলে আমিও তো তাই। দর্শনকামীর পৈশাচিক আনন্দে আমিও কি আত্মবিস্মৃত হইনি? আমি—যে আমি একদিন উন্মুখ আগ্রহে ড্যাডিকে বলেছিলাম, ‘তুমি নিজেই আমাকে ‘কাব্বলায়’ তত্ত্বমতে ইন্দ্রিয়-সংযমের দীক্ষা দাও!’?

প্রাশজাউ-ক্যাম্পে লরিটা যখন ঢুকল তখন সন্ধ্যা হব-হব। তখনো আমাদের ফল-ইন-এর অর্ডার হয়নি। ট্রাক থেকে নেমে আমরা সবাই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে হাত-পায়ের জড়তা ছাড়াছি। এমন সময় এই ক্যাম্পের এক বন্দি বাসিন্দা এগিয়ে এলেন আমাদের দিকে। কোনোক্রমে ধুকতে ধুকতে। বয়স কত বোঝা গেল না, তবে তিনি যে জীবনের

শেষ সীমান্তে পৌঁছেছেন, মৃত্যু যে সপ্তাহখানেকের দূরত্বে এটা বুঝতে অসুবিধা হয় না। আমাদের কাছাকাছি এসে একজনকে শুধোলেন, ‘আপনাদের মধ্যে শিষেট শহরের হের উইজেনথল কোন জন?’

একজন আঙুল তুলে ড্যাডিকে ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিলে। কঙ্কালসার বন্দিটির চোখদুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এগিয়ে এসে তিনি ড্যাডির হাতখানা ধরে বললেন : গুটেন আবেন্ত (শুভ সন্ধ্যা), আপনিই শিষেট-এর হের উইজেনথল?

আমার সত্যনিষ্ঠ পিতৃদেব দুদিকে ঘাড় নেড়ে জানালেন : না।

—না? কিন্তু ওই উনি যে বললেন...

ভিড়ের মধ্যে কাকে যেন ব্থাই খুঁজলেন। তারপর ড্যাডিকে প্রশ্ন করেন, তাহলে আপনারা নামটা কী?

—A.C.7240.

হতাশ বৃদ্ধ এরপর কী করবেন বুঝে উঠতে পারেন না। প্রচণ্ড হাঁপাতে থাকেন। আমি এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করি, আপনি হের উইজেনথলকে কেন খুঁজছেন বলুন তো?

—না মানে আমার স্ত্রী আর তাঁর স্ত্রী সহপাঠী ছিলেন, দুজন খুব চিঠি লেখালেখি করতেন। তাই জানতে চাইছিলাম, ফ্রাউ উইজেনথল কি ইতিমধ্যে আমার স্ত্রীর কোনো চিঠি পেয়েছেন? বুদাপেস্ট থেকে...

আমি শুধাই, আপনি কি রেইজেল-আন্টির কথা বলছেন, স্যার?

—আরে হ্যাঁ, হ্যাঁ, ‘রেইজেল’। তুমি চেন তাঁকে?

—চিনব না? বাঃ! উনি তো সেবার আমাদের বাড়িতে এসে বেশ কিছুদিন ছিলেন। আমি এলি উইজেনথল। হের উইজেনথলের ছেলে।

বৃদ্ধ তাঁর কঙ্কালসার বুকো আমাকে টেনে নেন। বলেন, তোমার মাকে কি রেইজেল ইতিমধ্যে কোনো চিঠি দিয়েছে? মাস ছয়েকের মধ্যে?

—মাস-ছয়েক কী বলছেন আঙ্কল? মাস-তিনেক আগেও তো তাঁর চিঠি এসেছে মায়ের কাছে। কী লিখেছেন তা অবিশ্যি জানি না আমি, কিন্তু খামের উপর প্রেরিকার নাম লেখা ছিল রেইজেল-আন্টির হস্তাক্ষরে।

বৃদ্ধ কাঁদতে কাঁদতে মাটিতে বসে পড়লেন। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে আপনমনেই বললেন, তাহলে রেইজেল আজও বেঁচে আছে। অথচ আমি...

কঙ্কালসার বৃদ্ধ আমার কাছে বিদায় নিয়ে আনন্দাশু মুহুতে মুহুতে চলে যাবার পর ড্যাডি আমাকে প্রশ্ন করে, তুই মিছে কথা বললি কেন?

—রেইজেল-আন্টির স্বামী বোধহয় এক হপ্তাও বাঁচবে না। এই একটা সপ্তাহ ওবে যদি... তুমি কি আমার উপর রাগ করলে, ড্যাড?

ড্যাডি মিনিটখানেক কী যেন ভাবল। তারপর বললে, না, রাগ করিনি। তুই মিছে কথা বলিসনি। ওটাই ওর কাছে সত্য। কি জানিস, এলি, মৃত্যুতীর্থে সত্য আর মিথ্যা জাগতিক বিচার হারায়...আমরা, যারা মৃত্যুতীর্থে এখনো পৌছাতে পারিনি তাদের কাজ হওয়া উচিত ওই মৃত্যুপথযাত্রীকে শান্তিতে মরতে দেওয়া। না, রাগ আমি করিনি।

প্লাশজাউ কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পটা রীতিমতো নোংরা। সর্বত্র আবর্জনার স্তুপ। আউসউইৎজ-এ অবশ্য সব সময় মড়া-পোড়া গন্ধ-পাওয়া যেত—এখানে তা নেই। এখানে ইনসিনিরেটর নেই। জু-দের গুলি করে ‘মাস্ গ্রেভে’ পুঁতে দেবার ব্যবস্থা। কিন্তু মড়াপোড়া গন্ধ না থাকলে কি হবে—বর্জ্যপদার্থের উৎকট দুর্গন্ধে দম বন্ধ হয়ে আসে। এখানকার হেড-কাপো অবশ্য মহিষাসুরের মতো দুর্মুখ নয়। মহিষাসুর তার দ্বিগুণ-বয়সের বন্দিদের ‘তুই-তোকারি’ করত। খিস্তি-খেউড় বাদ দিয়ে কথা কইতে পারত না। এখানকার হেড-কাপো সে তুলনায় অনেক ভদ্র। দেখতে মহিষাসুরের মতো বীভৎস নয়, বাক্যালাপও করে বেশ ভদ্রভাষায়। প্রথম দিনই আমাকে আড়ালে ডেকে জানতে চাইল, তুমি কি পোলিশ, না হাঙ্গেরিয়ান?

তথ্যটা জেনে নিয়ে বলে, কী নাম গো তোমার?

—বলি, A.C.7239.

—আহা, সে তো তোমার নম্বর। নামটা কী?

নামটা শুনে বলে, এলিজর? বাঃ! খাসা নাম। আমারও এক কাজিন ব্রাদার ছিল—জানলে—তার নামও ‘এলি’।

তারপর গলাটা নিচু করে প্রায় কানে কানে বলে, ওই শয়তানগুলোর এস.এস. অ্যাকশনে মারা যায়।

কাপোরা সবাই জুডেন। তবে নাৎসি প্রভুদের পায়ে দাসখৎ লিখে দিয়ে ওরা বায়সমাংসভুক্ দগুধারী দগুবায়স। কোথাও কিছু নেই, হিপ-পকেট থেকে একটা চকলেট ‘বার’ বার করে আমার হাতে গুঁজে দেয়। ঘুষ দেওয়ার ভঙ্গিতে। দিয়েই সুট করে সরে পড়ে।

আমি তো বজ্রাহত! কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে ক্যাড্ডি! কালাস্তক কাপোর করুণায়! এ তো টাঙ্গানিকার ট্রপিক্যাল অরণ্যে গাছের মগডালে পাখির বাসায় নিদ্রারত ক্যাঙারু।

আগে আমার নজর হয়নি, এখন দেখি একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন এ ক্যাম্পের এক পোড়-খাওয়া প্রৌঢ় জুডেন। হের জালমান। পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে বললেন, তুমি তো নতুন এসেছ, ও-লোকটাকে চেন?

—চিনতাম না। এখন চিনলাম।

—না, ব্রাদার। এখনো ঠিক চিনতে পারোনি। ও এক বালভুক্ বদমাস! অল্পবয়সী লালটু-মার্কী ছেলেদের প্রতি ওর ভা—রী দরদ! ওকে আমরা আড়ালে ডাকি ‘গে-কাপো’। বুঝলে না? ও একটি পাঁড়-হোমো!

তিন-চার সপ্তাহের মধ্যেই প্লাশজাউ-ক্যাম্পে আমার জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়ে। গে-কাপোকে আমি এড়িয়ে চলি। দু-একবার ও বাড়তি পাঁউরুটি বা ক্যান্ডি দিতে এসেছিল—আমি নিইনি। ও থাকত কাপোদের কোয়ার্টার্সে। সেখানে আমাকে যেতে বলেছিল। আমি যাইনি। শেষমেশ ওকে হুমকি দিতে হলো—ওর ‘বস’, মানে নাথসি অফিসারের কাছে বলে দেব ওর কীর্তিকথা। মনে হয়, এর আগেও কেউ তা করেছে—তাই ও ঘাবড়ে গেল। তারপর শুরু হলো আমার উপর ওর দৈহিক অত্যাচার। পান থেকে চুন খসলে সে আমাকে মারতে মারতে অজ্ঞান করে ফেলে। আজও জানি না, ওর হোমোসেক্‌শ্যুয়াল প্রবৃত্তিটারই এটা একটা তির্যক প্রতিফলন কিনা—ধর্যকামিতায়। অথবা হয়তো ভেবেছিল মারের ভয়ে আমি রাজি হব।

ড্যাড শুধু বসে বসে কাঁদতো। তার কিছু করার নেই। মাঝে মাঝে আমাকে শুধাতো—ও লোকটা বিশেষ করে তোর উপরই এত নির্দয় কেন হয়ে গেল রে, এলি? তুই কি ওর অবাধ্য হয়েছিলি কখনো?

স্বীকার করি তা। ড্যাড জানতে চায়, কেন রে? কী চায় ও?

বলি, সে আমি মুখ ফুটে বলতে পারবো না, বাবা।

ড্যাড চুপ করে কিছুক্ষণ কী-য়েন ভাবল। তারপর বলল, বুঝছি। তুই মনে করেছিলি—ওর আদেশ মানলে আদোনাইকে অপমান করা হয়! তাই না?

আমি বাপিকে জড়িয়ে ধরে ঝরঝরিয়ে কেঁদে ফেলি : হ্যাঁ, বাবা!

গে-কাপো তার রণকৌশল পরিবর্তন করল।

সে ইতিমধ্যে বুঝে নিয়েছে আমাকে দৈহিক পীড়ন করে সে সিদ্ধকাম হতে পারবে না। আমাকে সে পস্কু করতে পারে, অন্ধ করতে পারে, আমার মৃত্যুর কারণও সে হতে পারে—নাথসি প্রভুরা তাতে জ্ঞক্ষেপও করবে না; এমনটা কনসেট্রেশন ক্যাম্পে তো কতই হয়—এন্তাই তো হোন্ডাই রহতা! কিন্তু তাতে সে যা চাইছে তা পাবে না।

ইতিমধ্যে সে সমঝে নিয়েছে কোনটা আমার দুর্বলতম স্থান। কোঁথায় ওর শিকার ‘ভাল্নারেল্ল’! অসহায় পিতার চোখের সম্মুখে মারতে মারতে পুত্রকে পস্কু করে দিলে, অন্ধ বা হত্যা করলে কোনো লাভ নেই; কিন্তু জোয়ান-ছেলেটাকে খুঁটির সঙ্গে পিছমোড়া করে বেঁধে রেখে যদি ওই বুড়ো-হাবড়ার উপর দৈহিক অত্যাচার চালানো যায়? মুচড়ে

একটা হাতের হাড় ভেঙে, একটা চোখ কানা করে দিলে, অথবা মারতে মারতে মাটিতে শুইয়ে দিলে? লালটু-মার্ক ছেলেটা সইতে পারবে?

লোকটা বুদ্ধিমান। প্রথম থেকেই হাই-পোটেনশিয়াল ওষুধ প্রয়োগ করল না—যাতে লালটুর মেজাজ না বিষিয়ে যায়। সে আমাকে মারধোর বন্ধ করে দিল, কিন্তু ড্যাডির সামান্যতম ভুল-ত্রুটিতে ঠাই করে বসিয়ে দেয় ব্যাটনের বাড়ি। প্লাশজাউ-ক্যাম্পে ইটভাটায় কাজ করতে হয় না আমাদের। এখানে বন্দিদের কাজ ‘মাস্-গ্রেভ’ খনন করা। ঘেটো থেকে যখন ট্রাকভর্তি জুডেন আসে তখন প্রথমেই হয় : ‘সিলেকশন’—নির্বাচন। যেসব ইহুদিদের বয়স ষোলোর কম—ছেলে অথবা মেয়ে, আর যাদের বয়স পঞ্চাশের ওপরে—বৃদ্ধ অথবা বৃদ্ধা, নাৎসি-দর্শনে তাদের বেঁচে থাকার অধিকার নেই। তারা জার্মানির যুদ্ধ প্রচেষ্টায় শ্রমদানে অসমর্থ। আউসউইৎজ-এ দেখেছি, তাদের সরাসরি পাঠিয়ে দেওয়া হতো গ্যাস-চেম্বারে। না, সরাসরি নয়। প্রথমে তাদের মাথা কামাতে হতো, সপরিবারে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হতে হতো—বাবা, মা, ছেলে, মেয়ে! তারপর তাদের প্রবেশাধিকার দেওয়া হতো মৃত্যুপুরীতে। পরের পর্যায়ে ইনসিনিরেটর। এই একবারই তারা কাপোদের নির্দেশ অগ্রাহ্য করত। গ্যাস-চেম্বার থেকে ইনসিনিরেটরে মার্চ করে যেত না। মৃতদেহগুলি বহন করে নিয়ে যেতে হতো।

প্লাশজাউ ক্যাম্পে আগুনে পোড়ানোর ব্যবস্থা ছিল না। উলঙ্গ বন্দিদের মাস্-গ্রেভের নালার সামনে দাঁড়াতে হতো সারি দিয়ে। আমাদের কাজ ছিল, সেই যৌথ-সমাধির নালটা খনন করা। তিন-চার হাত চওড়া, ততটাই গভীর, দেড়-দুশো হাত দৈর্ঘ্যের। এক একটা মাস্-গ্রেভে শতখানেক উলঙ্গ নরনারী জড়াজড়ি করে পড়ে থাকত।

যৌথ-কবরটা খনন করেই আমাদের—সকর্মক জুডেনদের—দায়িত্ব শেষ হতো না। দাঁড়িয়ে দেখতে হতো হত্যাপর্বটা। এক-একটি হতভাগ্যকে পিছন থেকে গুলি করা হতো। সে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যেত গর্তে। সে পর্ব সমাপ্ত হলে আমাদের বাকি কাজ। কোদাল-বেলচা দিয়ে মাটি টেনে-টেনে সুদীর্ঘ লাশনালাটা আবার ঢেকে দেওয়া।

মৃত্যুখাদের কিনারে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের শেষ প্রার্থনা করতে দেখেছি। ঈশ্বরের মহিমা কীর্তন করতে করতে তারা মৃত্যুবরণ করত। কখনো হয়তো কেউ প্রতিবাদ করেছে—মৃত্যুখাদের ধারে ওভাবে দাঁড়াতে অস্বীকার করেছে। তারা ব্যতিক্রম। সহজ মৃত্যুর পরিবর্তে তাদের ভাগ্যে জুটেছে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক দীর্ঘসময়ব্যাপী মৃত্যু। হাতে বা পায়ে গুলি করে তাদের ফেলে রাখা হত ফাঁকা মাঠে—মৃত্যুখাদের অদূরে। অনাহারে, বুকফাটা তৃষ্ণা নিয়ে তিন-চার-সাতদিন পরে প্রখর রৌদ্রে অথবা প্রচণ্ড তুষারপাতের মধ্যে তারা মৃত্যুবরণ করত। আদেশ না-মানলে কী পরিণাম হবে তা পরবর্তীদল প্রত্যক্ষ করত। তাই তারা সহজে রাজি হয়ে যেত উলঙ্গ অবস্থায় সারি দিয়ে দাঁড়াতে।

একটা জিনিস ভাবলে অবাক হয়ে যাই। এই ক্যাম্পে আসার পথে এক বিকচউরসা যৌবনবতীকে দেখে আমার উত্তেজনা হয়েছিল। এখানে প্রতিদিনই দেখি সম্পূর্ণ নিরাবরণ কিশোরীদের—দশ থেকে পনের—কিন্তু কোনোদিন চোখ তুলে তাকাইনি। তাকালেও কিছু দেখতে পেতাম না বোধ হয়। আমার দৃষ্টি সবসময়ে থাকত ঝাপসা হয়ে। অশ্রুজলে।

গে-কাপো ড্যাডিকে দিল কোদাল চালানোর কাজ। মাটিকাটা। সে কাজ ওর স্বাস্থ্যে কুলায় না। বৃদ্ধ মানুষ। সহজেই হাঁপিয়ে পড়ে। চলে চাবুক। গে-কাপো ড্যাডির দিকে তাকায় না—লক্ষ্য করে দেখে আমার উপর প্রতিক্রিয়াটা।

তারপর একদিন। গে-কাপো হঠাৎ আমার কাছে ঘনি়ে এসে বললে, হাঁ কর তো— লক্ষ্য করে দেখি ওর হাতে কিছু নেই, যে, চট করে মুখে পুরে দেবে। হাঁ করতে হলো। মুখের ভিতরটা চোখ দিয়ে খতিয়ে আমার নম্বরটা লিখে নিল। ব্যাপারটা কী হলো আমি বুঝলাম না। তবে সেটা জানা গেল দু-তিনদিন পরেই। আমার ডাক এল ডেন্টিস্ট-এর দফতর থেকে। ডেন্টিস্ট! আমার তো দাঁতে ব্যথা হয়নি। তাহলে? মনে ভাবি, নিশ্চয় ভুল হয়েছে। নম্বর টুকতে।

দন্তচিকিৎসকের ঘরটা ছোট। বাইরে একটা লম্বা বেঞ্চি। অনেকে বসে আছে সেখানে। তাদের পাশে গিয়ে বসলাম। পাশের লোকটিকে জিজ্ঞেস করি, আপনার কি দাঁতের ব্যথা?

—কেন? দাঁতে ব্যথা হবে কেন? তুমিও যেজন্য এসেছ, আমিও সেই একই কারণে এসেছি।

—আমি কেন এসেছি তা জানি না। আমাকে ডেকে পাঠানো হয়েছে।

লোকটা বলল, ও! তুমি বুঝি তা টের পাওনি। হাঁ করতো দেখি...

একটু পরে ব্যাপারটা বোঝা গেল। আমরা, যারা দন্তচিকিৎসকের ঘরের সামনে বারান্দায় বসে আছি তাদের প্রত্যেকের একটা করে সোনা-বাঁধানো দাঁত আছে— আমারও তা আছে। দন্তচিকিৎসক বন্দিদের চিকিৎসা করতে এখানে ক্যাম্প করেননি আদৌ। এসেছেন ইহুদিদের সোনার দাঁতগুলি উৎপাটন করে নাৎসি 'ওয়ার-ফান্ড'কে সমৃদ্ধতর করার শুভ উদ্দেশ্যে।

আমার যখন ডাক পড়ল তখন ডাক্তারবাবুকে বললাম—(ড্যাডিও তো বলেছিল, 'মৃত্যুর মুখোমুখি হলে সত্য ও মিথ্যা এক হয়ে যায়')—স্যার! আমার এখন অ্যাকিউট ডায়েরিয়া হয়েছে, হপ্তাখানেক বাদে আমার দাঁতটা তুললে চলে না?

ডাক্তারবাবু জার্মান নাৎসি দর্শনে নিশ্চয় বিশ্বাসী, কিন্তু তাঁর বিবেচনা আছে। বললেন, আজ তোমাকে ছেড়ে দিতে পারি এক শর্তে। সাতদিন পরে তুমি নিজেই আমার ঘরে চলে আসবে। ডেকে পাঠাতে না হয় যেন!

—থ্যাঙ্ক ইউ, স্যার! তাই আসব আমি। আপনি দাঁতটা তোলার আগে ইনজেকশন দিয়ে মাড়িটা অসাড় করে দেবেন তো?

—আমি কি পাগল না রাক্ষস?

—থ্যাঙ্ক ইউ স্যার!

গে-কাপো যেমন তার রণকৌশল বদল করেছিল, ড্যাডিও হঠাৎ তাই করে বসল। একজনের আক্রমণাত্মক রণনীতি, অপৰজনের আত্মরক্ষামূলক। না, আত্মহননমূলক! ড্যাডি তার বরাদ্দ রেশন গ্রহণে অস্বীকার করল। সে খাবে না। কিছুতেই কিছু মুখে দেবে না। না পাঁউরুটি, না সুপ। আগের বার ধমকে তাকে রাজি করিয়েছিলাম। এবার পারলাম না। অনুনয় বিনয় ধমক—না, কিছুতেই কোনো কাজ হলো না। শেষমেশ রাগ করে বললাম, বেশ, এস, তাহলে আমরা দুজনেই খাওয়া বন্ধ করি। তুমি যদি না খেয়ে মরতে পার, তাহলে আমি পরব না?

এবার ভেঙে পড়ল। আমার হাতদুটি ধরে বলে, অবুঝ হসনে, এলি! ভেবে দেখ। এ কালযুদ্ধ পাড়ি দেবার ক্ষমতা আমার নেই। আমার শরীর দিনদিন ভেঙে পড়ছে। কী যায় আসে দুদিন আগে আর পরে? তোর মা..দিদি..ৎজিপোরা...কিন্তু না। তুই কথা দে আমাকে—যতদিন আমি বেঁচে আছি ততদিন তুই ডব্ল-রেশন খেতে পাবি। তোর এখন বাড়ির বয়েস...তবে বাবা, তোকে একটা কাজ করতে হবে—এই কালযুদ্ধ তোকে পাড়ি দিতে হবে। সেই নরপিশাচটা—হিটলারের দিন ফুরিয়ে এসেছে। আর ছয় মাসের মধ্যেই সে ফৌত হবে! তার আগে সে তার এই অপকীর্তি সব মুছে দিয়ে যাবে... নিজে চোখেই তো দেখলি, আউসউইৎজে-এর সব কাগজপত্র ওরা পুড়িয়ে ফেলল। কিন্তু তুই বুদ্ধিমান, তোর মস্তিষ্কে তা মুছে যাবার নয়। আমাকে কথা দে, এলি — তুই বেঁচে থাকবি। এই যুদ্ধ পাড়ি দিবি! তারপর আমাদের এই যন্ত্রণার কথা তুই সারা দুনিয়াকে জানাবি। যারা আমাদের ধর্মের নিরীহ লক্ষ লক্ষ মানুষগুলোকে...

আর বলতে পারল না। কান্নায় ভেঙে পড়ল।

সাতদিন পরে মৃত্যুপথযাত্রী ড্যাডিকে ক্যাম্পে ফেলে রেখে আমি প্রতিশ্রুতি রাখতে গেলাম ডেন্টিস্টের চেম্বারে। আমাকে বেঁচে থাকতে হবে। দাঁতটা ওরা নিক! Ein Zahn für einen Zahn (একটা দাঁতের বদলে একটা দাঁত)। যুদ্ধশেষে আত্মজীবনীতে আমি এই দাঁতের বদলে ওদের একটা দাঁত তুলব! এই আমার পণ।

আমার সৌভাগ্য! সাতদিনেই যুদ্ধের পরিস্থিতি বদলে গেছে। রেড-আর্মি এবার এদিকপানে এগিয়ে আসছে। দাঁতের ডাক্তার তাঁর সাময়িক শিবিরটা গুটিয়ে জার্মানির দিকে চলে গেছেন।

না, আবার ভুল হলো—সেটা আমার সৌভাগ্য নয়, দুর্ভাগ্য!

গে-কাপো নাছোড়বান্দা! সে গিয়ে খবরটা জানাল ক্যাম্পের একজন নাৎসি এস. এস. নরপিষাচকে। লোকটা নির্দয়! নিষ্ঠুর প্রকৃতির। একরঙি সোনার লোভ সে সামলাতে রাজি হলো না। আমাকে একটা চেয়ারে দাঁড়ি দিয়ে পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলল। তারপর সেই নাৎসি অফিসার আমার বুকে তার বুটশুদ্ধ একটা ঠ্যাঙ চড়িয়ে আমার সোনা-বাঁধানো গজদন্তটা তুলে ফেলল, তার জিপের টুল-বক্স থেকে একটা নাট-বোস্ট-সাঁটার লোহার প্লায়ার্স দিয়ে।

অপরিসীম যন্ত্রণায় আমি জ্ঞান হারালাম। পরে শুনেছি, আমার মুখ থেকে ফিন্‌কি দিয়ে একটা রক্তের ফোয়ারা বেরিয়ে নাৎসি পাষণ্ডটাকে রক্তিম করে দিয়েছিল।

জ্ঞান হবার পর দেখি আমি পড়ে আছি ক্যাম্পের কাছাকাছি একটা হাসপাতালে। এটাতে নাৎসি সৈনিকদের চিকিৎসা হতো। ইহুদিদের সে সৌভাগ্য হতো না। আমার ক্ষেত্র একটি ব্যতিক্রম। পরে শুনেছি, নাৎসি অফিসারটা দাঁত তুলে নেওয়ার পর আমাকে গুলি করে খতম করতে চেয়েছিল। গে-কাপো তাকে সবিনয়ে বলে, ‘স্যার, ছেলেটাকে বাঁচিয়ে তোলা কঠিন নয়। সে কিন্তু এখনো অনেকদিন কর্মক্ষম থাকবে।’

অফিসার রাজি হয়।

জানি না, গে-কাপো কেন আমার হয়ে সুপারিশ করেছিল। সে কি আশা করেছিল যে, সে আমার প্রাণদাতা একথা জানার পর আমার মনটা নরম হবে?

প্রায় দশদিন থাকতে হলো হাসপাতালে। তারপর একটা মিলিটারি হাফট্রাক আমাকে পৌঁছে দিল প্লাশজাউ-ক্যাম্পে। প্রচুর রক্তক্ষরণে আমি বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছি। বেলা তখন চারটে। ক্যাম্পের বন্দিরা সব কাজে গেছে। প্রহরী ও কাপো ছাড়া ক্যাম্পে কেউ নেই। একটু পরে দেখতে পেলাম দূর থেকে বন্দিরা সার বেঁধে আসছে। আমি একটা পাইন খুঁটি ধরে উঠে দাঁড়াই। গেট পার হয়ে ওরা এল। সার দিয়ে দাঁড়াল। রোল কল হলো। আমি তখন পাগলের মতো একটা চেনা মানুষকে খুঁজছি। না, তার নাম ডাকা হলো না। AC7239-এর নাম ডাকা হলো না, সে তো খাতাকলমে এখন হাসপাতালে। AC7240-কেও ডাকা হলো না। খাতাকলমে সে নামটা রেজিস্টারে নেই।

এমন একটা আশঙ্কা ছিলই। ডিসপার্স অর্ডার হওয়ামাত্র আঙ্কল জালমান এগিয়ে এসে আমার হাতখানা তুলে নিয়ে চাপ দিল। বললে, আমি উপস্থিত ছিলাম দাদার শেষসময়ে। না, কষ্ট পায়নি সে। তবে শেষসময়ে তাকে দেখতে পেল না। এজন্য একটা মানসিক যন্ত্রণা তো থাকবেই।

আঙ্কল জালমান ঠিক আমাদের বাপ-বেটার উপরের বাঞ্চে রাত্রিযাপন করত। ঘুম-না-আসা রাতে দুই-বুড়োর আলাপচারী হতো দুই বার্থে! ওঁরা দু-জন প্রায় সমবয়সী। আঙ্কল জালমান ছিলেন স্কুলমাস্টার—স্কুলে ইতিহাস-ভূগোলের ক্লাস নিতেন। ড্যাডি নিচের বার্থ-থেকে শুধাতো, দুনিয়াটার এ কী হাল হচ্ছে, জালমান? কেন এমনটা হচ্ছে বলতো?

উপরের বার্থ থেকে আঙ্কল জালমান বলত, ও, তুমি বুঝি এখনো খবরটা পাওনি ? গড তো এখন ‘ভেকেশনে’ আছেন। ছুটি নিয়ে ফরেন কান্ট্রিতে ফুটি করতে গেছেন।

এসব রসিকতায় ড্যাডি বিরক্ত হতো। আদোনাইকে নিয়ে কি রসিকতা করতে হয় ? কিন্তু আমার মজা লাগত। জিঙ্গেস করতাম, তা গড ছুটিতে যাবার আগে কাকে চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন, আঙ্কল ?

—সেটানকে। শয়তানই এখন অফিশিয়েটিং লর্ড অব দ্য ইউনিভার্স! সেন্ট্রাল ইয়োরোপে সে গভর্নর নিয়োগ করেছে হিটলারকে!

ড্যাডি ধমক দিত, আহ! কী অসভ্যতা করছ তোমরা!

আমার কিন্তু উৎসাহ থামেনি। জানতে চাই, গড ভেকেশনে কোথায় বেড়াতে গেলেন জালমান আঙ্কল ?

—কই আর যেতে পারলেন ? তুমি আমি যা পারি, গড কি তা পারেন ?

ড্যাডি আবার ধমক দিত, গড সর্বশক্তিমান। কী পারেন না তিনি ?

আঙ্কল জালমান উপর থেকে বলত, কোনো ফরেন-কান্ট্রির ভিসা যোগাড় করতে! কী করে বিদেশ যাবেন ? সবই তো তাঁর এলাকা। মায় নরকটাও।

শুনে তৃপ্তি পেলাম যে, অন্তত শেষ সময়ে ড্যাডি একটা চেনা মুখ দেখতে পেয়েছিল। একজন মানুষের চোখের জল দেখতে দেখতে চোখ না বুঁজলে যে মরেও শাস্তি নেই!

রাত আটটায় ব্যারাকে এসে দুজন কাপো রুটি আর সুপ দিয়ে গেল। এ ওদের নিত্যকর্ম! আমার খেতে ইচ্ছে ছিল না একটুও; কিন্তু না! আমাকে বেঁচে থাকতে হবে। পিতৃ-আদেশ! এই কালযুদ্ধ পাড়ি দিয়ে আমাকে লিখতে হবে ইহুদিদের উপর নাৎসি-জার্মানির নৃশংস বর্বরতার ইতিবৃত্ত।

রাত নয়টায় প্রতিদিনের মতোই আমাদের ব্যারাকের আলো নিভে গেল। এখন আমাদের শয্যাভ্যাগ করা বারণ। যে যার বাস্কে পড়ে থাকবে রাত্রি প্রভাতের প্রতীক্ষায়। আমি নিজের বাস্কে উঠে বসি। ভাল করে বসা যায় না বাস্কে। কিন্তু ঘুমও আসছে না। হঠাৎ নজর হলো চার-পাঁচজন সহবন্দি—আমার চেয়ে সবাই বয়সে বড়, তবু বন্ধুস্থানীয়—দাভিদ, এজরা, সলোমন প্রভৃতির। গুটিগুটি আমার বিছানার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। আমি নেমে আসি। দাভিদ ধরা গলায় বলে, তোমাকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা আমার জানা নেই, এলি। তবু বলব.....

আমি বাধা দিয়ে বলি, না! আমাকে সান্ত্বনা দেবার কোনো চেষ্টা কর না দাভিদ, কিন্তু আমাকে তোমরা কি একটু সাহায্য করবে ?

—সাহায্য! কী করতে চাও তুমি ?

—প্রতিবাদ! একা আমার ক্ষমতা কম। কিন্তু তোমরা সবাই যদি আমার পাশে দাঁড়াও—

উপরের বাঙ্ক থেমে আঙ্কল জালমান ধমক দেয়, কী পাগলের মতো বকছিস? এই প্লাশজাউ-ক্যাম্পে চার-পাঁচজন নিরস্ত্র মানুষকে নিয়ে তুই নাৎসিবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবি? বিদ্রোহ করবি?

—না! সেটা আমার ক্ষমতার বাইরে। আমার প্রতিবাদ ওই নরপিশাচটার বিরুদ্ধে! হিটলার কি আদেশ করেছে; আমাদের বলেছে যে, একটা সেক্শ্যুয়াল পার্ভার্টের বিকৃত কাম চরিতার্থ করতে হবে?

সলোমন হঠাৎ আমার হাতটা মুঠো করে ধরে বললে, আমি তোমার সঙ্গে আছি, এলি! জান কবুল!

দাভিদ আর এজরাও সঙ্গে সঙ্গে সায়ে দেয় : আমরাও। ও হারামজাদাটাকে একটা শিক্ষা দেওয়া উচিত!

হঠাৎ আমাদের ব্যারাকের প্রকাণ্ড দরজাটা খুলে যায়। টর্চ হাতে গে-কাপো। সে ওখান থেকেই গর্জন করে ওঠে : এসব হচ্ছেটা কী? রাস্টার্ডস! তোরা জানিস না—রাতের ঘণ্টা বেজে গেলে.....

কথাটা তার শেষ হয় না। আমি বলে উঠি, তোকেই খুঁজছিলাম রে গে-কাপো! এগিয়ে আয়! তোকে কয়েকটা কথা বলার আছে।

মাথার উপর ব্যাটনটা তুলে বুনো মোষের মতো গে-কাপো ছুটে আসে। বলে : কী? কী বললি তুই হারামজাদা?

মাথার উপর ব্যাটনটা তোলায় সেটা আঙ্কল জালমানের নাগালের মধ্যে এসে গেছে। সে উপর বাঙ্ক থেকে খপ করে কেড়ে নেয় ব্যাটনটা।

গে-কাপো বজ্রাহত। এমনটা যে হতে পারে তার ধারণাই ছিল না। ও নির্বিচারে প্রহার করবে আর জুডেনরা মুখ বুজে মার খেয়ে যাবে—এটাই তার অভিজ্ঞতা, এটাই প্রত্যাশা।

আমি বলি, কেন রে শ্যুর-কা-বাচ্চা? তুই জানিস না, এ ক্যাম্পে সবাই তোকে আড়ালে ডাকে ‘গে-কাপো’? আমরা সবাই তো জানি মেয়েছেলে দেখলে তুই ভয়ে পালিয়ে যাস! কারণ তাদের স্যাটিসফাই করার হিম্মৎ তোরা নেই! না কি রে?

উপর থেকে আঙ্কল জালমান দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল ওর ব্যাটনটা, বললে, ওটা কুড়িয়ে নিয়ে কেটে পড়। আমরা এখন ঘুমাবো!

লোকটা নিচু হয়ে ব্যাটনটা কুড়িয়ে নিল। একা সে আমাদের যৌথ বিদ্রোহের মহড়া নিতে সাহস পেল না। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে বলল, কাল তোদের সবকটাকে যদি ফাঁসিতে লটকাতে না পারি...

ওর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে দাভিদ বলে, একটা কথা খেয়াল রাখিস, হারামজাদা! পাঁচ-সাতজন নিরস্ত্র মানুষ যখন মরিয়া হয়ে ওঠে তখন একটা ব্যাটন-সর্বস্ব নপুংসক

কাপোকে অনায়াসেই গুঁড়িয়ে দিতে পারে। আমরা পাঁচ-সাতজন মরব, তবে তাকে নিয়েই মরব বুঝলি? তখন রোজ সকাল-সন্ধ্যা যাদের পা চাটিস তারা বাঁচাতে আসবে না।

পরদিন রোলকলের পর ঘোষণা করা হলো আমাদের ক'জনকে ক্যাম্প-কমান্ডান্ট দেখা করতে বলেছেন—কাজে যাবার আগে। এ কিন্তু সেই নৃশংস জার্মানটা নয় যে আমার দাঁত উপড়ে নিয়েছিল। ইনি বর্তমানে প্লাশজাউ-ক্যাম্পের সর্বপ্রধান : ক্যাপ্টেন হার্স্বের্গ। খাঁটি নর্ডিক। জার্মান। শুনেছি, যুদ্ধে যোগ দেবার আগে কোন কলেজে বুঝি পড়াতেন। অত্যন্ত রাশভারী লোক।

আমরা তাঁর টেবিলের সামনে দুই সারিতে সার দিয়ে দাঁড়ালাম। তিনি উত্তেজিতভাবে পদচারণা করছিলেন। প্লাশজাউ ক্যাম্প ইতিপূর্বে কোনো প্রতিবাদ বা বিদ্রোহের আভাসমাত্র দেখা যায়নি। কাপোদের নির্যাতন জুডেনরা বরাবর মুখ বুঁজে সয়ে গেছে। কেউ কখনো কোনো কাপোর হাত থেকে ব্যাটন ছিনিয়ে নেবার দুঃসাহস দেখায়নি।

লক্ষ্য হলো ঘরের ও-প্রান্তে গে-কাপো অ্যাটেনশনে দাঁড়িয়ে আছে। তার বগলে ধরা আছে ব্যাটনটা। পায়চারি করতে করতে হঠাৎ থমকে থেমে গেলেন ক্যাপ্টেন হার্স্বের্গ। কাপোর মুখোমুখি হয়ে জানতে চাইলেন, এই কয়জনই তো? আর কেউ বাকি নেই?

—আজ্ঞে না, স্যার। এরাই আটজন। ওই বুড়োটা আমার ব্যাটন কেড়ে নিয়েছিল, আর ওই A.C.7239টা...

—চুপ কর! তোমাকে যেটুকু প্রশ্ন করব সেটুকুরই জবাব দেবে। ফালতু কথা একদম বলবে না।

—য্যা, হের ক্যাপ্টেন।

কাপোর সঙ্গে ওঁর এতক্ষণ হাঙ্গেরিয়ান ভাষায় কথা হচ্ছিল। এ ক্যাম্প শতকরা আশিজন হাঙ্গেরিয় ইহুদি। ফলে সেই ভাষাটাই চালু। যে সব জার্মান অফিসার স্থানীয় ভাষা জানেন তাঁদেরই সচরাচর ক্যাম্প-কমান্ডান্ট পদে শাসন করতে পাঠানো হয়। ক্যাপ্টেন হার্স্বের্গ এবার আমাদের দিকে ফিরে হাঙ্গেরিয়ান ভাষাতেই বললেন—তোমরা কালরাত্রে যে অপরাধ করেছ তার জন্য আমি তোমাদের কী শাস্তি দেব তা আন্দাজ করতে পার?

আমি দলের প্রতিনিধি। জার্মান-ভাষায় বলি, পারি, হের প্রফেসর। আপনি বিচার করতে বসে প্রতিবাদীর বক্তব্য শোনার আগেই যখন আমাদের 'গিলটি' বলে সিদ্ধান্তে এসেছেন, তখন কেন বুঝব না আপনি আমাদের কী শাস্তি দেবেন। মৃত্যুদণ্ড তো? বুঝতে পেরেছি।

ক্যাপ্টেন হার্স্বের্গ গম্ভীর হয়ে গেলেন। বলেন, আমি প্রফেসর নই, ক্যাপ্টেন!

—আমি অত্যন্ত দুঃখিত হের ক্যাপ্টেন। আমার ভুল হয়ে গেছে। কিন্তু আপনি যখন কলেজে পড়াতেন তখন এ ভাবে নিশ্চয় একপেশে বিচারে ছাত্রদের শাস্তি দিতেন না। তাই নয়, হের ক্যাপ্টেন?

একই রকম গম্ভীর মুখে উনি জানতে চান, তুমি কি জার্মান ?

—নাইন, হের ক্যাপ্টেন। আমি হাঙ্গেরিয়ান-জুডেন। তবে স্কুলে সেকেন্ড ল্যাঙ্গোয়েজ হিসাবে ‘জার্মান’ নিয়েছিলাম।

—কী নাম তোমার ?

—A.C.7239 .

—আমি নাম জানতে চেয়েছি। নম্বর নয় !

—আবার দুঃখিত, হের ক্যাপ্টেন। আপনার প্রেডিসেসার বলেছিলেন, বাকি জীবনে এই নম্বরটাই আমার নাম। আপনি রেজিস্টার খুঁজলেই আমার নামটা জানতে পারবেন, স্যার !

পুরো দশ সেকেন্ড আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে শেষে বললেন, তুমি প্রতিবাদীর স্টেটমেন্টের কথা তখন বলছিলে। কী বলতে চাও তুমি ? ওর ব্যাটন তোমরা কেড়ে নাওনি ? ওকে গালাগাল দাওনি ?

আমি তিলতিল করে বুঝতে পারছিলাম যে, গোয়েবল্‌স্-এর আরোপিত অন্ধ নাৎসি-সংস্কারকে ভেদ করে একজন অ্যাকাডেমিক শিক্ষক ওঁর মনোজগতে আত্মপ্রকাশ করতে চাইছে। তাই নির্ভয়ে বলি, এ কামরায় আপনি-আমি ছাড়া আর কে-কে জার্মান ভাষা জানেন, তা আমি জানি না, স্যার। আপনি যদি আমার ‘সত্য-বই-মিথ্যা-বলিব-না’ জবানবন্দিটা শুনতে চান...

উনি আমাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে আদেশ দিলেন ঘর খালি করে দিতে। আসামীরা পাশের ঘরে অপেক্ষা করবে, বাদী কাপোকেও সেখানে ডাক-পাওয়ার জন্য প্রতীক্ষায় থাকতে হবে। ওঁর ঘরটায় যখন আমরা শুধু দুজন রইলাম তখন বলেন, এবার বল ? ওই বুড়ো জুডেনটা কাপোর ব্যাটন কেড়ে নিয়েছিল ? তোমরা ওকে গালমন্দ করেছ ? সুযোগ পেলে ওকে মেরে ফেলবে, এমন হুমকি দিয়েছ ?

—ইয়েস স্যার !

—তাহলে তুমি তো কাপোর অভিযোগ স্বীকারই করছ। তুমি বলছ, কাপোটা মিথ্যাকথা বলেনি।

—কিন্তু আপনি কি একটা কথা ভেবে দেখেছেন, হের ক্যাপ্টেন ? আমরা এই সাত-আটজন তিন-চারটে ক্যাম্প বন্দিজীবন কাটিয়েছি, দশ-বিশজন কাপোর-নির্দেশে কায়িক পরিশ্রম করে গেছি—কই কোনোদিন তো কারও ব্যাটন আমরা কেড়ে নিইনি। আজই বা কেন নিলাম ?

—বল, সেটা। কেন নিলে ?

—আমাদের সকলের ধারণা ছিল যে, দৈহিক পরিশ্রম করে আমরা নাৎসি জার্মানির যুদ্ধ প্রচেষ্টার মদৎ দিচ্ছি।

—দ্যাটস্ কারেক্ট। কাপোরা তোমাদের দিয়ে সেই কাজ করিয়ে নেয়। নাৎসি জার্মানির যুদ্ধ প্রচেষ্টা ...

—মাপ করবেন হের ক্যাপ্টেন, একজন বিকৃতকাম সেক্‌শ্যুয়াল ম্যানিয়াকের হোমোসেক্‌শ্যুয়াল কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা কি নাৎসি জার্মানির সমর প্রচেষ্টার অন্তর্ভুক্ত?

পুরো বিশ সেকেন্ড আমার দিকে নির্বাক তাকিয়ে থাকলেন উনি। তারপর জানতে চাইলেন, ওই কাপোটা কি একটা হোমোসেক্‌শ্যুয়াল ম্যানিয়াক? তুমি প্রমাণ দিতে পার?

—আপনি এ ক্যাম্পের যে-কোনো পাঁচজন বন্দিকে র্যান্ডম-সাম্পলে আলাদা ডেকে নিয়ে এ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করুন, দেখবেন—অন্তত চারজন স্বীকার করবে তথ্যটা তারা প্রত্যক্ষজ্ঞানে জানে। যারা ওর ওই ঘৃণিত প্রস্তাবে রাজি হয় তাদের ও ডব্ল্-রেশন দেয়, কাজে ফাঁকি দিতে সুযোগ দেয়। যারা রাতে ওর ঘরে যেতে রাজি না হয় তাদের উপর ও প্রচণ্ড অত্যাচার করে।

ক্যাপ্টেন অনেকক্ষণ জবাব দিলেন না। তারপর বললেন, আমি কী ভাবে বুঝব যে, তোমরা সবাই ষড়যন্ত্র করে দল পাকিয়ে ওকে ফাঁদে ফেলছ না?

—প্রত্যক্ষ প্রমাণে, আপনি আপনার সিদ্ধান্তে আসবেন হের ক্যাপ্টেন। অর্থাৎ কে মিছে কথা বলছে—সারা ক্যাম্প, না আপনার কাপো।

—কী প্রত্যক্ষ প্রমাণ দাখিল করবে তুমি?

—আপনি জানেন, হের ক্যাপ্টেন, আমার হাতে উল্কি চিহ্নে নম্বরটা দেগে দেবার আগে আমাকে উলঙ্গ করিয়ে সার্চ করা হয়েছিল। আমার কাছে কপর্দকমাত্র থাকতে পারে না। আমি আপনাদের মিলিটারি ক্যান্টিনে গিয়ে চুরি করতে পারি না—এই পোশাকে, এই নেড়া মাথায়। তাহলে আমার প্যান্টের পকেটে এই বস্তুটা কী করে এল? আপনি আন্দাজ করুন।

ওঁর টেবিলের উপর আমি একটা না-খোলা চকলেটের ‘বার’ নামিয়ে রাখলাম। উনি নেড়েচেড়ে সেটা দেখলেন। প্রশ্ন করলেন, এটা তোমার পকেটে এল কী করে?

—একজন হোমোসেক্‌শ্যুয়াল এটা আমাকে অগ্রিম উৎকোচ দিয়েছিল। তার বিকৃতকাম চরিতার্থ করতে আমি অস্বীকৃত হয়েছিলাম। তার শাস্তি হিসাবে ও আমাকে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে আমার বাবাকে চাবুক মেরে মেরে হত্যা করে। এ তথ্যটাও আপনি ক্যাম্পের যে কোন পাঁচজন বন্দিকে আড়ালে ডেকে যাচাই করতে পারেন—অফকোর্স যদি সবাই মিলে ষড়যন্ত্র করে ক্যাম্পশুদ্ধ বন্দি আপনাকে মিথ্যা এজাহার না দেয়।

—তুমি ব্যারাকে ফিরে যেতে পার A.C.7239 !

পরে জানতে পারি, বাকি সাতজন আসামীকেও একে-একে ডেকে তিনি জনান্তিকে তাদের এজাহার নিয়েছিলেন। আরও জনাদশেক বন্দিকে র্যান্ডম-সাম্পলে ডেকে নিয়ে কী সব জিজ্ঞাসা করেন।

পরদিন সকালে আমরা ‘ফল-ইন’ করার পর ক্যাম্প কমান্ডারের অধীনস্থ একজন লেফটানেন্ট আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন আমাদের ক্যাম্পের নতুন হেড-কাপোর সঙ্গে। গে-কাপোকে ত্রিসীমানায় দেখতে পেলাম না। নয়-কাপোর অর্ডারে আমরা সার বেঁধে ক্যাম্পের বাইরে চললাম মার্চ করে। মূল প্রবেশদ্বারের ঠিক পাশেই একটা প্রচণ্ড বিষ্ময় প্রতীক্ষা করছিল। আমাদের পায়ের লেফট-রাইট গুলিয়ে গেল :

ক্যাম্পগেটের পাশেই ফাঁসির মঞ্চে দুলছে গে-কাপোর মৃতদেহটা। এলোমেলো হাওয়ায় পাক খাচ্ছে।

ফাঁসি হলে সচরাচর আটচল্লিশ ঘণ্টা লাসটাকে ঝুলতে দেওয়া হয়। যাতে সবাই সে নৃশংস দৃশ্যটা দেখতে পায়, ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হয়।

এক্ষেত্রে আরও একটা অদ্ভুত ব্যাপার হলো। দ্বিতীয়দিন আমরা সবাই অবাক হয়ে দেখলাম, গে-কাপোর শার্টে, পিঠের উপর, বড় বড় ক্যাপিটাল অক্ষরে রাতে কে যেন কী একটা লাইন লিখে গেছে। কে লিখেছে? বাক্যটা জার্মান ভাষায়। অনেকের কাছেই তার অর্থবোধ হলো না। তবে আঙ্কল জালমান ছিলেন শিক্ষক। তিনি জার্মান ভাষাটাও জানেন। পড়ে বললেন কথাটা :

Ein Zahn für einen Zahn/Eine Leiche für ein Leben.

[একটি দাঁতের বদলে একটি দাঁত/একটি জীবনের বদলে একটি লাশ।]

নয়া কাপো আন্দাজ করল এ কোনও বন্দি জুড়েনের কাজ। সে গোপনে তদন্তও করল। ধরতে পারল না। কে লিখেছে। কী করে লিখেছে। লালকালি সে পেল কোথায়? কলম? সমস্যাটার সমাধান হলো না।

সে রাত্রে আঙ্কল জালমান—সে এখন আমার সঙ্গে এক বাক্কেই শোয়, ড্যাডির খালি জায়গাটায়—হঠাৎ বললে, দেখি, এলি, তোর বাঁ হাতটা।

আঙ্কল জালমান জানত আমি বেঁয়ো। লেফট-হ্যাণ্ডে।

আমার বাঁ-হাতের তর্জনিটা পরীক্ষা করে বললে, আঙুলটা এমন বিশ্রীভাবে কেটে গেল কি করে রে?

আমি বলি, কেটে গেছে? তাই তো! আশ্চর্য! আমি তো টেরই পাইনি।

আঙ্কল জালমান বলল, তার চেয়েও বড় আর একটা আশ্চর্য : হাত কাটল তোর, তুই টের পেলি না, অথচ টের পেলাম আমি! কেমন করে হয়?

আজ পিছন ফিরে যখন তাকাই মনে হয়—আহা! আর মাত্র একশটা দিন, তিন মাসেরও কম—যদি ওই ধর্যকামী গে-কাপোটাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারতাম! ড্যাডির মৃত্যুর পর তিনমাসের মধ্যেই শেষ হয়ে গেল ফ্যুরারের বিশ্বজয়ের খোয়াব। আমরা—আমার পরিবারের একমাত্র আমিই মুক্তি পেলাম কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প থেকে। গে-কাপোর নিষ্ঠুরতা থেকে তাঁকে রক্ষা করতে পারলে আমরা বাপ-বেটা হাত ধরাধরি

করে বার হয়ে আসতাম। তাহলে এই স্মৃতিচারণ গ্রন্থখানি দুজনে মিলে লিখতাম। যৌথ-লেখক হিসাবে একসঙ্গে যেতাম : ‘The Prize’টা হাত পেতে নিতে।* কাকে বইটা উৎসর্গ করতে চাইতো ড্যাডি? মা, না এজিপোরা? তারপর আমরা দুজনে আবার হাত ধরাধরি করে চলে যেতাম তেল আভিভ এয়ারপোর্টে। সেখান থেকে পূবমুখো—রামলেহ্ গাঁ পার হয়ে—জর্ডন সীমান্তে লাত্রোন সালিয়েস্ত ঘুরে য়াদ ভাশেম-এর বিশ্ববিশ্রুত মক্‌বারায়। এটা মুসলমানদের মসজিদ নয়, ইহুদিদের মক্‌বারা। তার সম্মুখে প্রকাণ্ড ‘হল অব রিমেম্বারেন্স’ (স্মারকসৌধ)। সাদা মর্মরে কালো-আখরে শহিদদের নাম লেখা। শত-শত, হাজার-হাজার, লক্ষ-লক্ষ, নিযুত-নিযুত নাম! এ ঘরে আলো জ্বলে না। অনিবার্ণ শিখায় জ্বলছে যে স্মারক-প্রদীপ তাতেই এ বিশাল হল-কামরা ধ্যানমগ্ন—আধো-আলোয়, আধো-অন্ধকারে। সেখানে গিয়ে আমরা দুজনে হাত ধরাধরি করে দাঁড়াইতাম। সেই প্রতিশ্রুত ভূখণ্ডের (Promised Land) স্মৃতিমন্দিরে। মা, দিদিরা আর এজিপোরার স্মরণে দুজনে গলা মিলিয়ে উচ্চারণ করতাম খাদিশ্ :

“Yisgaddal, Veyiskaddash, Shemy Rabbah!”

এর সব কিছুই ঈশ্বরের কৃপায় করেছি। কিন্তু আমি একা।

বিশ্বযুদ্ধের শেষ অঙ্কে পট পরিবর্তন হচ্ছিল অত্যন্ত দ্রুতলয়ে। এপ্রিলের শেষদিনে—1945-এ, সেই ভৈরবনাদী তেহাই-এর বোল সমে-এ এসে থামল : ‘ধা’! অ্যাডলফ্ হিটলার—তখন জানতাম না, এখন শুনিছি—সত্ৰীক, বার্লিন বান্ধারে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়। তার আগে—ক্যাম্প থেকে মুক্তি পাবার আগে—আমরা কানা-ঘুষো খবর পেতাম জার্মানি হারছে। চতুর্দিক থেকে আক্রান্ত হয়ে নাৎসি যুদ্ধবিশারদেরা প্রাণপণে ছুটে চলেছে বার্লিনমুখো। তখন জানতাম না, এখন জেনেছি—অনেক ধুরন্ধর নাৎসি মাতব্বর দক্ষিণ আমেরিকায় পালাবার একটা বিরাট পরিকল্পনা করেছিল : Odessa File। পালিয়েও ছিল অনেকে—আইকম্যান, বোরম্যান ইত্যাদি। পাঁচ-সাত বছর পরে তারা ধরা পড়ে। ইসরেইলি গুপ্তচরদের তৎপরতায়। ফাঁসি যায়। কিন্তু সেসব তো পরের কথা। যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে যখন একে একে হিটলারের দুর্গগুলো ভেঙে পড়ছিল তখন

*এ কাহিনীর নায়ক গড়ে উঠেছেন একাধিক Holocaust Survivor-এর স্মৃতিচারণ গ্রন্থের উপাদানে। *The Sunflower* লেখক Simon Wiesenthal তাঁর গ্রন্থের জন্য, বহু পুরস্কার পেয়েছেন। *Night* স্মৃতিচারণ গ্রন্থের লেখক এলি উইজেল 1945-এ আউসউইৎজ ক্যাম্প থেকে মুক্ত হন। তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন মুক্তির পর দশবছর আত্মমগ্ন থাকবেন। দশবছর কিছু লেখেননি। ইন্টারভিউ পর্যন্ত দেখনি। তারপর লেখেন NIGHT; উৎসর্গ : ‘বাবা-মা আর ছোট্ট বোন এজিপোরাকে’। 1986-এ বিশ্বশান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার পান। *Fateless* গ্রন্থের হাঙ্গেরিয়ান লেখক ইম্‌রে কার্ভেজ সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান 2002-তে—বস্তুত বর্তমান লেখক Holocaust-এর উপর গবেষণা শুরু করার পরবর্তীকালে।

আমরা টুকরো টুকরো খবর পেতাম। ক্যাম্পে বসেই। রাত নয়টায় বাতি নিবে গেলে বি.বি.সি.নিউজে। একজন ইহুদি কাপো নিজেই রেডিওটা উপহার দিয়েছিল আমাদের। সে বুঝতে পেরেছিল জার্মানি হারবে। যুদ্ধোত্তর দুনিয়ায় বেঁচে থাকতে হলে তাকে আমাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে হবে। কাপোদের অত্যাচার শেষ হলো। আমাদের আর ‘মাস-গ্রেভ’ খুঁড়তে হয় না। ট্রাকে করে নতুন ইহুদিদের ঝাঁক বেঁধে আর আনাও হয় না। ট্রাকগুলো যে অন্য প্রয়োজনে অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। নাৎসি বীরপুঙ্গবদের পশ্চাদপসরণের দরকারে।

বি.বি.সি. জানাচ্ছে : হিটলার তার অনেক জেনারল আর কিছু মার্শালকে গুলি করে হত্যা করেছে। তাদের অপরাধ তিন জাতের—বিশ্বাসঘাতকতা (হিটলারকে হত্যা করার একাধিক নাৎসি ষড়যন্ত্র হয়েছিল), অপদার্থতা (যারা হিটলারের প্রতিশ্রুতিমতো পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ড ইত্যাদিকে রক্ষা করতে পারেনি—থার্ড রাইখকে ইউরোপে হাজারবর্ষব্যাপী স্থায়ী করতে পারেনি) এবং ব্যর্থতা (যারা মস্কো-স্ট্যালিনগ্রাদ অধিকার না করে শীতে মরতে মরতে উন্টেমুখো বার্লিনে পালিয়ে এসেছিল।)

[লেখকের প্রতিবেদন : এই সময় (দোসরা জানুয়ারি, ১৯৪৫) বিশ্ববিশ্রুত ব্রিটিশ কার্টুনিস্ট স্যার ডেভিড লো ম্যাগ্গেস্টার গার্ডিয়ানে একটি ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ করেছিলেন : এবার কার পালা ?



জানুয়ারি, ১৯৪৫।

সকালে রোলকলের পর আমাদের কয়জনের উপর আদেশ হলো জার্মান

সৈন্যদের জন্য নির্দিষ্ট হাসপাতালটাকে সাফা করতে যেতে হবে। এটা যুদ্ধের আগে ছিল পোল্যান্ডের একটি এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। জার্মান মিলিটারি তার দখল নিয়ে তাকে হাসপাতালে রূপান্তরিত করেছে। আমি নিজেও ক’দিন ওখানে ছিলাম, আমার দাঁত তুলে ফেলার পরে। কলেজে কোনো ইনসিনিরেটর ছিল না। দীর্ঘদিন ধরে হাসপাতালের বর্জ্য পদার্থ কলেজ-কম্পাউন্ডের এক দূরতম কোনায় সঞ্চিত হচ্ছিল। এখন সেটা সাফা না করলেই নয়। তাই বন্দিদের ট্রাকে করে পাঠানো হলো, বেল্‌চা, কোদাল, গাঁইতি সমেত। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ দয়া করে আমাদের এক এক টুকরো কাপড় দিলেন নাকে জড়াতে।

পড়ন্ত বেলায় বেল্‌চা দিয়ে ময়লা তুলে ব্যাগে ভর্তি করে ট্রাকে তুলছি। হঠাৎ হাসপাতালের দিক থেকে একজন নার্স আমাদের দিকে ফিরে হাঙ্গেরিয়ান ভাষায় প্রশ্ন করলেন : A.C.7239 নম্বর কার ?

আমি হাত তুলে আত্মঘোষণা করি। মেয়েটি আমাকে কাছে আসতে বলে। প্রায় আমার বড়দি হিল্ডার বয়সী। তবে হিল্ডা ছিল তব্বী, তার মুখখানা ছিল ভারি মিষ্টি। এ কিছু স্থূলকায়। আমি কাছে আসতে বললে, তুমি কি জার্মান ভাষা জানো? তোমার কাপো বলল, জানো?

বলি, অল্প অল্প।

—তাহলে তুমি আমার পিছন পিছন এস। তোমার কাপোর কাছ থেকে অনুমতি নেওয়াই আছে।

সিস্টারের পিছন পিছন হাসপাতালের গ্র্যান্ড-স্টেয়ার্স বেয়ে উঠি। ও বলে, এই পর্দা দেওয়া স্নানঘরে চলে যাও। তোমার জামাকাপড় সবকিছু খুলে রেখে একটা হটবাথ নাও। গরম-ঠাণ্ডা দু’রকম জলই পাবে। ডিসইনফেক্টেন্ট সাবান আছে, ওটা দিয়ে নিজেকে ভাল করে সাফা করবে। তোয়ালেও ওখানে আছে। আর একটা ‘হসপিটাল-ওভার-অল’ আছে। সেটা গায়ে জড়িয়ে বাইরে আসবে। আমি এখানেই অপেক্ষা করছি।

আমি অবাক হয়ে বলি, Seife und Badetuch, Schwester? [সাবান আর তোয়ালে, সিস্টার?]

—হ্যাঁ, সাবান আর তোয়ালে কাকে বলে জান না? ব্যবহার করতে জান না?

কী করে ওকে বোঝাই দীর্ঘ দীর্ঘ দিন ও দুটি বস্তু চোখেই দেখিনি।

স্নানান্তে ওভার-অল পরে যখন বার হয়ে এলাম তখন সিস্টার আমাকে তিনতলায় নিয়ে গেল। সিঁড়ি বেয়ে। লিফটটা অকেজো হয়ে পড়ে আছে। সারাবার মিস্ত্রি যোগাড় করা যায়নি। সবাই তখন পালাচ্ছে! একটা বন্ধ দরজার সামনে নিয়ে এসে আমাকে দাঁড় করাল। বললে, শোন! এই ঘরটার নাম ‘Letzte pouze’ (চিরশান্তি কক্ষ)। যেসব রুগি চিকিৎসার বাইরে, দু-তিনদিনের মধ্যে যাদের মৃত্যু নিশ্চিত, তাদের এখানে সরিয়ে

আনা হয়। শাস্তিতে মরতে দেওয়া হয়। যাতে অন্যান্য রুগির উপর কোনো প্রতিক্রিয়া না হয়। কী বললাম বুঝতে পারলে?

—য্যা! কিন্তু আমি তো সব চিকিৎসার বাইরে নই...

—না, না, না। তোমাকে এখানে এনেছি অন্য একটা কারণে। এ ঘরে এখন একজনই আছে—প্রায় তোমারই বয়সী। চব্বিশ—বড়জোর ছত্রিশ ঘণ্টার বেশি সে বাঁচবে না। তার শেষ ইচ্ছা অনুসারে তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছি। সে চেয়েছিল এমন একজন অল্পবয়সী ইহুদি যে জার্মান ভাষা বুঝতে পারে।

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করি, কিন্তু কেন? ও যদি রোমান ক্যাথলিক হয় তাহলে এখন তো ওর একজন পাদরিকে দরকার। তাই নয়?

—ও খ্রিস্চিয়ান। হ্যাঁ, রোমান ক্যাথলিকই। কিন্তু ও চেয়েছে একজন ইহুদিকে, যে জার্মান ভাষা শুনলে বুঝতে পারবে।

আবার প্রশ্ন করি, কিন্তু কেন?

—আমি জানি না। সে-কথা ও নিজেই বলবে। শোন, তুমি ওর কথা শুধু শুনে যাবে। ও কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে জবাব দেবে। কিন্তু নিজে থেকে ওকে কিছু জিজ্ঞেস কর না! বুঝলে?

দরজা খুলে আমরা 'চিরশান্তি কক্ষে' প্রবেশ করলাম। ঘরটা মাঝারি মাপের। একটাই বেড। অন্ধকার। একটা নীল বাতি জ্বলছে। চোখটা সয়ে গেলে দেখি বিছানায় একটি রুগি শুয়ে আছে। ছেলে কি মেয়ে, বৃদ্ধ না জোয়ান বোঝার উপায় নেই। গলা পর্যন্ত কম্বল দিয়ে ঢাকা। মুখখানা ব্যান্ডেজ-এ জড়ানো। শুধু নাক ও মুখটুকু বার হয়ে আছে। সিস্টার আমাকে ওর শয্যাপার্শ্বে একটা টুলের উপর বসিয়ে দিল। কম্বলের ভিতর থেকে ওর বাঁ হাতখানা — সেটাতে ব্যান্ডেজ জড়ানো নেই — বার করে এনে আমার হাতের উপর রাখল। রুগিকে বললে, এ একজন ইহুদি, প্রায় তোমারি বয়েসী। এ জার্মান জানে।

ছেলেটি বললে, অসংখ্য ধন্যবাদ, সিস্টার।

নার্স আমার দিকে ফিরে বলে, ঘণ্টাখানেক পরে আমি ফিরে আসব। তুমি টুল ছেড়ে কোথাও যাবে না। দরজাটা বাইরে থেকে তালা বন্ধ থাকবে। চাবি আমার কাছে। আর, কেউ তোমাদের বিরক্ত করতে আসবে না।

নার্স দরজাটা 'লক' করে দিয়ে তার ডিউটিতে চলে গেল।

ছেলেটি জানতে চাইল, আপনার বয়স কত?

জেল-রেকর্ডের হিসাবে জবাবে বলি, আঠারো।

—তাহলে আপনাকে 'তুমিই' বলি। আমার একুশ। তুমিও অনায়াসে আমাকে 'তুমি' বলতে পার। তা, তোমার নামটি কী ভাই?

—A.C.7239

একটু থমকে গেল। বললে, বুঝতে পারি, এখন আর বন্ধুত্ব করা যাবে না। আমার সময় নেই বলে নয়, তুমি আমাকে—আমাদের সবাইকে, জার্মানিকে, ঘৃণা কর বলে। জার্মানিমাএই তোমার কাছে ঘৃণার পাত্র। তাই নয়?

প্রশ্ন করলে জবাব দেবার অনুমতি আছে। তাই বলি, না। আপনার ভুল ধারণা—গ্যেটে, মার্টিন লুথার, কার্ল মার্কস, এঙ্গেলস্, ম্যাক্সমুলার, ফ্রয়েড, আইনস্টাইন—এঁরা সবাই তো জার্মান। সারা বিশ্ব তাঁদের শ্রদ্ধা করে। জুডেনরাও করে।

—‘জুডেন’ বলছ কেন নিজেকে? তুমি তো জিওনিস্ট!

এটা কি প্রশ্ন? না, একটা মন্তব্য। তবে আমার জবাবের জন্য অপেক্ষা না করে সে নিজে থেকেই বলে চলে, আমি কিন্তু জন্ম থেকেই খুনি-বদমায়েশ ছিলাম না। ভদ্রঘরেই জন্মেছি। আমার বাবা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে দেশের জন্য লড়েছিলেন। আজীবন পঙ্গু হয়ে কাটালেন। আমাকে তিনি বারণ করেছিলেন—বলেছিলেন যুদ্ধে নাম না-লেখাতে। আমি আমার বাবার পরামর্শ শুনিনি। নিজে থেকে হিটলার্স-ইউথে নাম লিখিয়েছিলাম। তখন—বিশ্বাস কর ভাই—আমার অনেক-অনেক জিওনিস্ট বন্ধু ছিল। ইন ফ্যাক্ট আমার গার্লফ্রেন্ডই একটি মিষ্টি মেয়ে। সেও ইহুদি। আমার চেয়ে একক্লাস নিচে পড়ত। তার নাম...

হঠাৎ আচমকা থেমে যায়। কেন? নামটা ভুলে গেছে? নাকি জানাতে ইতস্তত করছে? অথবা তার মুখখানা মনে পড়ে যাওয়ায় মৃত্যুপ্রহরে ওর চিন্তাসূত্র ছিন্ন হয়ে গেছে?

আমি সিস্টারের নির্দেশ লঙ্ঘন করে বসি। নিজে থেকেই প্রশ্ন করি, আপনি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন কেন?

—উঁ? ও হ্যাঁ। কী জান ভাই? আমার মনে হলো অনুতপ্ত স্বীকৃতিতে হয়তো মনটা হালকা হবে। শান্তভাবে মৃত্যুকে গ্রহণ করতে পারব। শুনেছ বোধহয় সিস্টারের কাছে—আমার মেয়াদ বড় জোর চব্বিশ ঘণ্টা?

এটা প্রশ্ন। কিন্তু আমি জবাব দিইনি। অন্য কথা বলি, আপনি যদি কনফেশন করতে চান তাহলে আপনাদের ধর্মের নির্দেশে আপনার তো...

—জানি। জানি। কিন্তু আমি তো খ্রিস্টান নই। আমার বাবা তাই, মা-ও তাই। জন্মসূত্রে আমি খ্রিস্টানই। কিন্তু যীশাস-এর নির্দেশ তো আমি মানতে পারিনি। প্রতিবেশীকে...না ভালবেসেছিলাম...সেও আমাকে...কিন্তু সে ভালবাসার মর্যাদা তো আমি রাখতে পারিনি।

এবারও সিস্টারের নির্দেশ লঙ্ঘন করে বসি। নিজে থেকেই প্রশ্ন করি:

—প্রতিবেশী বলতে আপনি কি আপনার গার্লফ্রেন্ডের কথা বলেছেন?

—হ্যাঁ তাই। প্রতিবেশীকে তো আমি মদের ঝাঁকে, অপমানই করেছিলাম। হের অটো ফ্রাঙ্ক আমাদের শহরের একজন মানী লোক! তাঁকে টাই ধরে টানতে টানতে মাটিতে পেড়ে ফেলেছিলাম। ...কিন্তু সে তো মাতাল হয়ে যাবার পর। অথচ আঙ্কল ফ্রাঙ্ক যখন আমাকে গলা ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয় তখন তো সে মত্তাবস্থায় ছিল না।

মাথামুণ্ডু কিছুই বোঝা যায় না। চুপ করে প্রতীক্ষা করি।

মিনিট দু-তিন ওর বোধহয় খেয়াল ছিল না যে, ওর কথা একজন শুনছে। শুনতে বাধ্য হচ্ছে। ও তার ‘মনোলগ’ শোনার জন্য একজন জুডেনকে পাকড়াও করে এনে ওর বেডের পাশে বসিয়ে রেখেছে। এরপর সে যা বলল তা তার আপনমনে বলা স্বগতোক্তি :

‘অন্তসূর্যের প্রত্যাশায় পশ্চিমদিগন্ত যেমন রাঙিয়ে ওঠে তেমনিভাবে সে প্রতীক্ষা করছিল। চোখ দুটি বোঁজা, ঠোঁট দুটি একটু ফাঁকা হয়ে গেছে... না!!’

আমার হাতটা হঠাৎ ও দৃঢ়মুষ্টিতে ধরেছে! আমি চমকে উঠে বলি, কী ‘না’?

—তুমি আমাকে ‘স্টপ ইট’ বললে না?

—না তো!... আমি তো কোনো কথা বলিনি।

—‘ও....বলনি?...না, তুমি কেন বলবে? এ তো আমার বিকার। মৃত্যুমুহুর্তে বোধহয় এমন সব বিকার দেখা দেয়। কিন্তু কীয়েন বলছিলাম? হ্যাঁ, আমার কনফেশন। আমার পাপের কথা। এই তো দিনদশেক আগেকার কথা। আমি আহত হবার ঠিক আগে। আমাদের স্কোয়াড্রনটা ফ্রন্ট-লাইন থেকে ফিরে এসেছে। দলের অনেকেই একে একে মারা পড়েছে। একসঙ্গে যারা ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে যাত্রা করেছিলাম তাদের মধ্যে টিকে আছি আমরা মাত্র দুজন—ক্যাপ্টেন কিটেল আর আমি। আইডেল, যোডল, ক্যাটকিন্স্কি সবাই মারা গেছে। আমরা তখন ক্যাম্প করে ছিলাম পোল্যান্ড আর হাঙ্গেরির সীমান্তে একটা গ্রামে। ...তুমি হাঙ্গেরি দেশটা দেখেছ?

বলি, আমি হাঙ্গেরিয়ান। ‘জার্মান’ আমার সেকেন্ড ল্যান্সোয়েজ।

ও শুনল কি না বোঝা গেল না। নিজের চিন্তাতেই বিভোর। আপনমনে বলে চলে, হঠাৎ খবর এল পাশের গ্রামে একটা কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের কাঁটা-তারের বেড়া ভেঙে কিছু জুডেন বন্দি পালিয়ে গেছে। তারা নাকি সদ্য এসেছিল বেলজিয়াম থেকে। এখনো তাদের সিলেকশন হয়নি, মাথা কামানো হয়নি, ডোরাকাটা জামা পরানো হয়নি। মানে তারা যদি হাঙ্গেরির গ্রামে জনারণ্যে মিশে যায় তাহলে তাদের শনাক্ত করা বা ক্যাম্পে ফিরিয়ে আনা কঠিন কাজ। ওরা পালাচ্ছে পায়ে হেঁটে, দৌড়ে। বুড়ো-বাচ্চা, পুরুষ-নারী সবাই। আর আমরা তাড়া করেছি মিলিটারি হাফট্রাকে, ওয়েপন-কেরিয়ারে। কিছু লুকিয়ে পড়ল শস্যক্ষেতে, বাকি দলটা আশ্রয় নিল একটা দোতলা ফাঁকা বাড়িতে। জুডেনদেরই

পরিত্যক্ত বাড়ি। পরিবারের সবাই বোধহয় অনেক আগেই কনসেন্ট্রেশন-ক্যাম্পে চলে গেছে।

...আমার লক্ষ্য হলো, সে নিজেই এখন ইহুদিদের জুডেন বলছে, জুইশ্ বা জিওনিস্ট নয়। দীর্ঘদিনের অভ্যাস—গোয়েবল্‌স্-এর প্রচার ওর মস্তিস্কের রক্তে রক্তে স্থায়ী আসন পেতেছে। ও আবার আত্মভোলার মতো আপনমনে বক বক করে চলেছে। আমার উপস্থিতি ভুলে—

আমাদের স্কোয়াড্রন-লীডারের নির্দেশে আমরা বাড়িটা ঘিরে ফেলি। খুব সম্ভব ওদের কাছে বন্দুক-টন্দুক নেই। তবু সাবধানের মার নেই। স্কোয়াড্রন-লীডার সদর-দরজা ভাঙতে বারণ করল। আমাদের বলল, ট্রাকে তিন-চার ব্যারেল পেট্রোল আছে। বাড়িটার চারদিকে তাই ছড়িয়ে দিতে। দরজা-জানলা কাঠের, তাতে মগে করে পেট্রোল ছিটিয়ে দেওয়া হলো। তারপর স্কোয়াড্রন-লীডারের নির্দেশে আমরা কিছু হ্যান্ড-গ্রেনেড ছুঁড়ে মারলাম। দাউ-দাউ করে বাড়িটা জ্বলে উঠল।’

শিউরে উঠেছিলাম আমি। একটা দোতলা বাড়ি। প্রাণভয়ে তাতে দু-তিনশ নরনারী আশ্রয় নিয়েছে—শিশু থেকে বৃদ্ধ ! এ লোকটা কি মানুষ! এ তো নরপিষাচ ! নিজের অজান্তেই আমি ওর মুঠি থেকে হাতটা ছাড়িয়ে নিতে চেয়েছি। ও খপ করে আবার আমার হাতটা ধরে নিয়ে বলল, প্লীজ! প্লীজ!

আমি বিরক্ত হয়ে বলে উঠি, কিন্তু কেন? কী জন্যে আপনি এসব বীভৎস গল্প আমাকে শোনাচ্ছেন? আমিই বা তা শুনব কেন?

—আমি স্বর্গে যেতে চাই না ভাই ! তাহলে আমি একজন পাদরিকেই ডেকে পাঠাতাম। আমি শুধু চাই : তোমাকে আমার পাপের কথা, আমার নৃশংসতার কথা খোলামনে জানিয়ে যেতে। তুমি আমাকে ক্ষমা করলেই আমি শান্তিতে মরতে পারব।

—কিন্তু আমি কে? আমার কী অধিকার?

—তুমি একজন জিওনিস্ট...

—না! আমি তো একজন ‘জুডেন’! তাই তো’ বারে বারে বললেন আপনি। প্রাণভয়ে পলাতক দু-তিনশ ‘জুডেনকে’...

—তাই বলেছি, না? কী বিশ্রী মগজ ধোলাই করেছে দেখ, সেই হাড-হারামজাদা গোয়েবল্‌স্‌টা!...কিন্তু প্লীজ! আমার দুর্ভাগ্যের বাকিটুকুও শোন। আমি হয়তো আর দশ-পনের ঘণ্টা বাঁচব। আমি জানি, বুঝতে পারি, জিওনিস্ট সম্প্রদায়ের লক্ষ লক্ষ নির্যাতিত মানুষের তুমি প্রতিনিধি নও। তবু আমার সব কথা শুনে তুমি যদি বল, ‘বেশ, আমি ব্যক্তিগতভাবে তোমাকে ক্ষমা করেছি’, তাহলেই আমি শান্তিতে মরতে পারব।

কী বলব ভেবে পাই না। উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল। কিছুক্ষণ বড়বড় নিশ্বাস নিয়ে হাঁপাল। তারপর আবার শুরু করল তার ক্লাস্তিকর উপাখ্যান। সে যেন ব্যান্ডেজ বাঁধা দু-চোখে দৃশ্যটা দেখতে পাচ্ছে।

—পাঁচ-সাত মিনিটের ভিতরেই আগুন বাড়ির ভিতর পৌঁছে গেল। দুমদাম খুলে গেল দোতলা-তিনতলার জানলাগুলো। কিছু লোক প্রাণভয়ে সিঁড়ি বেয়ে তিনতলার ছাদেও উঠে গেল। এবার শুরু হলো তাদের মরণ-ঝাঁপ! জানলা থেকে, তিনতলার ছাদ থেকে। তাদের অনেকের প্যান্ট-শার্ট, ফ্রক-গাউন দাউ-দাউ করে জ্বলছে। অনেক স্বামী-স্ত্রী হাত ধরাধরি করে একসঙ্গে লাফাচ্ছে। কোনো কোনো মহিলা বুকে সন্তানকে জাপটে ধরে।

হঠাৎ নজর হলো আমার পাশে বসা ক্যাপ্টেন কিটেল সেই ঝাঁপ খাওয়া নরনারীকে টিপ করে বন্দুক দাগছে। ওর ছিল অদ্ভুত টিপ। উড়ন্ত হাঁসের ঝাঁকের ভিতর বেছে বেছে গুলি করে নামাতে পারত।

আমি ওর হাত চেপে ধরে বলি, এ কী করছ কিটেল?

—টিপ প্র্যাকটিস করছি! মনে নেই, তোকে বলেছিলাম, সিটিং ডাক কখনো মারবি না। উড়তে উড়তে যাচ্ছে, ঘুরতে ঘুরতে পড়বে।

আমি ওর হাত চেপে ধরে বলি, কিটেল, ওরা পাখি নয়, জীবন্ত মানুষ! তুমি এত নৃশংস! ছিঃ!

অদ্ভুত হেসে ও আমার দিকে ফিরে বললে, আমি নৃশংস! না, বন্ধু, আমি ওদের যন্ত্রণার অবসান ঘটচ্ছি। ওরা তো মরবেই। হয় আগুনে পুড়ে, অথবা তিনতলা থেকে ঝাঁপ খেয়ে পড়ে। কিন্তু দ্যাখ! আমি ঠিক ওদের কানের পাশে গুলি করছি—উড়ন্ত অবস্থায়—ওরা মাটি ছোঁয়ার আগেই মরে যাচ্ছে। পতনজনিত আঘাত বা আগুনের উত্তাপ সব নিমেষে উধাও। এই দ্যাখ...

একটি মাঝবয়সী লোক তিনতলার জানলা থেকে অনেকটা মুখ বাড়িয়েছে। তার জামায় আগুন ধরে গেছে, তবু লাফাতে সাহস পাচ্ছে না। কিটেলের হাতের বন্দুক গর্জন করে উঠল। পাকা আমটির মতো লোকটা খসে পড়ল বাঁটা থেকে। কিটেল বলল, নেক্সট ইজ ইওরস্!

দেখলাম, সেই মাঝবয়সী লোকটা ঝরে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার জায়গাটা দখল করেছে একটা মেয়ে। প্রায় আমারই বয়সী। পরনে মেরুন ফ্রক, গায়ে ফুলশ্রিভ গোলাপী সোয়েটার। তার জামা-কাপড়ে কিন্তু আগুন লাগেনি। সে ইতস্তত করছিল ঝাঁপ খেতে। আগুনের আলোয় দেখি মেয়েটি আতঙ্কে বিহ্বল হয়ে পড়েছে। কোন দিকে লাফ দেবে, দেবে কি দেবে না, তাই ভাবছিল বোধহয়। আমি ওকে সে চিন্তা থেকে নিম্ভূতি দিলাম। কিটেলের মতো অব্যর্থ টিপ আমার নয়। তাই মাথায় নয়, ওর বুকের উপত্যকাটা লক্ষ্য করে ট্রিগার টেনে দিলাম। উড়তে পারল না। ঝরে পড়ল। ...প্লীজ! আর আঘাট।'

চমকে উঠি। আমি তন্ময় হয়ে গিয়েছিলাম ওর গল্পে। খেয়াল করিনি, সিস্টার নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছে আমার পিছনে। দৃষ্টিহীন মৃত্যুপথযাত্রী তা টের পেয়েছে তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দিয়ে। সিস্টার বললে, এনাফ অব ইট! আর নয়।

—না, আমার কথা শেষ হয়নি। তাছাড়া কিসের ‘এনাফ’? বেশি কথা বললে আমার কী ক্ষতি হবে? চব্বিশ ঘণ্টা কমে বিশ ঘণ্টা! এই তো? হোক!

মিস্টার বলে, অল রাইট! আর পনের মিনিট!

আবার দরজা বন্ধ করে দিয়ে সে চলে যায়। জার্মান ছেলেটি তার অসমাপ্ত কাহিনীর সূত্রটা তুলে নিল। আশ্চর্য! মৃত্যুর এত কাছাকাছি এসেও তার চিন্তাশক্তি আচ্ছন্ন হয়নি। যেখানে থেমেছিল সেখান থেকেই ফের শুরু করল :

—আধঘণ্টার মধ্যেই দোতলা বাড়িটা সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে গেল। আর কেউ লাফাচ্ছে না। আন্দাজ শ-দেড়েক মানুষ বাড়ির ভিতর পুড়ে মরেছে। জনা পঞ্চাশ মারা গেছে মরণ ঝাঁপ খেয়ে। সে দলে কেউ কেউ তখনো অবশ্য নড়াচড়া করছে। মরেনি। আমাদের স্কোয়াড্রনের একটি ছেলে লাফিয়ে উঠে পড়ে। বলে, কাম অন কার্ল। আমরা সার্চ করে জুডেনদের মৃতদেহগুলি পরীক্ষা করে দেখব। অনেকের হাতে ঘড়ি ছিল দেখছি। মেয়েদের গায়ে গহনাও থাকতে পারে...

কিটেল বলে, কী বকছিস পাগলের মতো! এরা সদ্য বেলজিয়াম থেকে এসেছে। টাকাপয়সা, গহনাগাটি বর্ডারেই বেহাত হয়ে গেছে।

—কিন্তু এদের তো সিলেকশন হয়নি। নেকেড বাথও হয়নি। দেখাই যাক না।

আমরা সদলবলে এগিয়ে যাই। মৃতদেহগুলোকে উন্টেপাণ্টে সবাই পরীক্ষা করতে থাকে। বর্ডার পুলিশকে লুকিয়ে কেউ কিছু আনতে পেরেছে কি না। ছেলেদের পকেটে, মেয়েদের ব্লাউজের ভিতর হাত চালিয়ে হাতড়াচ্ছে। আমার মন কিন্তু অন্যত্র। আমি খুঁজছিলাম সেই মেয়েটিকে। মেরুনরঙা ফ্রক, গোলাপী ফুলশ্রিভ ব্লাউজ। আর কিছুই নয়, আমি জানতে চাইছিলাম বুলেটটা ওর বুকের উপত্যকাতেই লেগেছিল তো? ...এই তো সেই মেয়েটি। উবুড় হয়ে পড়ে আছে। বন্দুকের কুঁদো দিয়ে আমি ওকে চিৎ করে দিলাম। হ্যাঁ, বুকেই লেগেছে গুলিটা। বামস্তনে। হৃদপিণ্ডে বিদ্ধ হয়েছে নিশ্চয়ই। মাথায় মারতে পারলে হয়তো পতনজনিত আঘাতটা সে টের পেত না। টর্চের আলোটা এবার ওর মুখের উপর ফেলি। তৎক্ষণাৎ চমকে উঠি!

এ কে? একে এত চেনা-চেনা লাগছে কেন?

আমার প্রশ্ন করা বারণ। তবু দূরন্ত কৌতূহলে আমার সব ভুল হয়ে গেল। প্রশ্ন করি, এ কী সেই মেয়েটি? আপনার গার্ল-ফ্রেন্ড?

ও গার্জে ওঠে : স্টপ ইট!

চমকে উঠি। সামলে নিই নিজেকে।

ও নিজেও উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সামলে নিল। বলে, না! তোমাকে বলিনি! এ আমার নিছক বিকার। হয়তো মৃত্যুকালে এমন হ্যালুসিনেশন সবারই হয়!

খানিকক্ষণ হাঁপিয়ে নিয়ে সে স্থির হলো। বললে, আমারও সেই একই ভুল হয়েছিল। ওর ওই ভঙ্গিটায়। মনে হয়েছিল ও লীলাই। রোজেলিনা! তা নয়। এ অন্য একটি মেয়ে। ও যদি রোজেলিনা হতো—তাহলে আজ আর আমি তোমাকে এ গল্প শোনাতে না। তখনই নিজের কানের কাছে বন্দুকটা এনে ট্রিগার টেনে দিতাম। লিনাকে কি ওভাবে... না, এ তারই বয়সী অন্য একটি জুডেন!...তা তুমি...কী নাম যেন তোমার?...বল, তুমি কি আমাকে ক্ষমা করতে পারলে? জুইশ কম্যুনিটির তরফে নয়, একান্ত ব্যক্তিগতভাবে? তোমার তরফে? পাপের শাস্তি তো আমি পেয়েছি ভাই! বল? পাইনি?

আমি কোনো জবাব দিই না। নিঃশব্দে ওর মুঠি থেকে আমার হাতখানা ছাড়িয়ে নিই।

পারব না। কিছুতেই পারব না। ওই জার্মান ছেলেটার দুঃখ কতটুকু? ওকে কি খুঁটির সঙ্গে বেঁধে ওর চোখের সামনে ওর বাপকে কেউ চাবুক মারতে মারতে মেরে ফেলেছে? বাপের নিষেধ না শুনে যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলায় মেতেছিল। তা যুদ্ধক্ষেত্র তো জুডেনদের কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প নয়! তুমি অনেককে মেরেছ! এখন নিজেই মরছ। যে মুহূর্তে বুঝতে পারলে ওই হতভাগিনী তোমার গার্লফ্রেন্ড নয়, অমনি সে হয়ে গেল একটা জুডেন-মাগী! বাঃ! কিসের ক্ষমা?

হাতটা টেনে নেওয়ায় ও বুঝল। বুঝল যে, আমি ক্ষমা করতে পারিনি। পারব না। আর কিছু বলল না সে।

পরদিন হাসপাতালে ময়লা সাফ্য করতে গিয়ে শুনলাম যে, সেই জার্মান ছেলেটা আগের রাতে মারা গেছে।

সিস্টারকে বলি, ওই ছেলেটির নাম, বাবার নাম, আর ঠিকানাটা আমাকে দয়া করে জানাবেন?

নার্স জানতে চায়, কেন বল তো? তোমার কী দরকার?

—ও আমাকে একটা গোপন-কথা বলে গিয়েছে, ওর বাবাকে জানাতে।

—কী কথা?

—আমি দুঃখিত, সিস্টার! ও আমাকে বলেছিল, কথাটা আর কাউকে না জানাতে।

সিস্টার একটু ভেবে নিয়ে বললে, অল রাইট! আমি তোমাকে তা জানাব। একটা ছেলের মৃত্যুকালীন শেষ ইচ্ছা পূরণ কর তুমি।

নার্স আমাকে ডাকটিকিট লাগানো একটা লেফাফা দিয়েছিল। খামের উপরে নাম-ঠিকানা লেখা। সে জানত, আমি কপর্দকহীন। ডাকটিকিট কেনার পয়সা আমার কাছে নেই। আমি ভেবেছিলাম, কার্লের বাবাকে জানিয়ে দেব যে, তাঁর একমাত্র সন্তান কোন

তারিখে, কোন হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে—কোন সিমেন্টারিতে তাকে সমাধিস্থ করা হয়েছে।

আমার মনে হয়েছিল—ওই ছেলেটির বাবা যুদ্ধ-বিরোধী। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তাঁর অঙ্গহানি হয়েছে, দীর্ঘ বিশবছর পঙ্গুজীবন যাপন করেছেন, পুত্রকে তিনি নিষেধ করেছিলেন হিটলারের এই খ্যাপামিতে নিজেকে না জড়াতে। যুদ্ধ না করতে। তাঁর প্রতি আমার সহানুভূতি আছে। জার্মানির সমরদপ্তর তখন এমন বিপর্যস্ত যে, হয়তো তারা আদৌ জানাবে না বৃদ্ধের একমাত্র পুত্রটি কোথায়, কী ভাবে মারা গেল।



বিগত ছয়মাস ধরেই ইউরোপের বিভিন্ন রাজ্য স্বাধীন হতে শুরু করেছে—
এবার উন্টে ডিগবাজি! তাদের ঘরের মতো!

এর পক্ষকালের মধ্যেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলো।

বার্লিন-বান্ধারে হিটলার আত্মহত্যা করতে বাধ্য হলো !

রাতারাতি আমাদের কনসেট্রেশন-ক্যাম্প খালি করে দিয়ে এস.এস. নাৎসি প্রহরীরা প্রাণভয়ে পালিয়ে গেল। কিন্তু যাবার আগে তারা ইহুদি বন্দিদের সার বেঁধে দৌড় করিয়ে নিয়ে গেল জার্মানি মুখো। মিত্রপক্ষের ট্যাঙ্ক আর আর্মার্ড-কার দ্রুতগতি এগিয়ে আসছে, বস্তুত অপ্রতিহত গতিতে। নাৎসিরা ইচ্ছা করলে আমাদের সারবন্দি দাঁড় করিয়ে মেশিনগান চালাতে পারত। কিন্তু তা ওরা করেনি। বিশেষ কারণে। তাহলে যুদ্ধোত্তর পৃথিবী যে এ তথ্যটা জানতে পারত। বন্দিশালায় মৃতদেহের পাহাড়ই হয়ে যেত জ্বলন্ত প্রমাণ। তাই ওরা আমাদের ক্যাম্প থেকে বার করে জার্মানি মুখো দৌড় করাল। যাতে প্রচণ্ড শীতে, অনাহারে, পথশ্রমে বন্দিরা একে একে মরে পড়ে থাকে রাস্তার দু-ধারে। ক্যাম্প চৌহদ্দির বাইরে। বেওয়ারিশ লাশ।

আমি প্রায় অলৌকিকভাবে প্রাণে বেঁচে যাই। আমি লুকিয়ে পড়েছিলাম একটা বর্জ্যপদার্থের ডাস্টবিনে। পুরো বাহান্তর ঘণ্টা। ক্যাটল-ভ্যানে আমাদের ক্যাম্প নিয়ে আসার সময়ও আমরা দ-তিনদিন অনাহারে, পতিগন্ধময় দম-আটকানো পরিবেশে

আবদ্ধ ছিলাম! কী ট্রেনিংই দিয়ে রেখেছে নাৎসি বর্বরগুলো। তাই তিন দিন, দুই রাত্রি। অনাহারে ডাস্টবিনে লুকিয়ে থেকেও আমি মারা যাইনি। মার্কিনবাহিনীর লোকেরা আমাকে উদ্ধার করে। হোসপাইপের জলে ধুয়ে ওদের ব্যবহৃত প্যান্ট-শার্ট পরতে দেয়। খাদ্য ও পানীয় দিয়ে আবার খাড়া করে তোলে।

মুক্তি পেয়ে আনন্দে আমার নৃত্য করার কথা। অথচ আনন্দের বদলে প্রচণ্ড বিষাদে আমি ভেঙে পড়ি। কিন্তু জীবনের দাবি অমোঘ। দু-তিন দিন সময় লাগল মনটাকে পোষ মানাতে। মনে পড়ে গেল: পিতৃদেবের সেই মৃত্যুকালীন আদেশ: যুদ্ধোত্তর দুনিয়াকে সব কথা আমাকে জানাতে হবে। স্থির করলাম সেখানেই আমার কর্তব্য শেষ হবে না। যেসব নরপিশাচ ইহুদিদের ধনসম্পত্তি লুট করে আজ জনারণ্যে মিশে যেতে চাইছে, ছদ্মনামে, ছদ্ম-পরিচয়ে নতুন জীবন শুরু করতে চাইছে—তাদের অপরাধের তথ্যপ্রমাণ আমাকে সন্ধান করে বার করতে হবে। ক্ষমা নয়, তিতিক্ষা নয়, প্রতিশোধ!

না, এ বৈরীনির্যাতনের বাসনা ব্যক্তিগত, পরিবারগত, বা জাতিগতভাবে প্রতিশোধ স্পৃহায় নয়। মানবসভ্যতার মুখ চেয়ে। সূর্যের এই তৃতীয় গ্রহে এমন কাণ্ড যাতে ভবিষ্যতে কোনও উচ্চাভিলাষী রাষ্ট্রনেতা না করতে পারে, সেজন্যই ওদের খুঁজে খুঁজে বার করতে হবে। শাস্তি ইহুদিরা দেবে না। দেবেন আন্তর্জাতিক ন্যায়নিষ্ঠ ধর্মাবতারেরা। তাহলেই ভবিষ্যতে কেউ এমন নরপিশাচের যাত্রাসঙ্গী হতে অস্বীকার করবে।

সবার আগে আমাকে ফিরে যেতে হবে আমার জন্মভূমিতে। আল্পস পাহাড়ের উত্তর-ঢালে হাঙ্গেরির সেই অখ্যাত জনপদে: শিঘেট। জানি, সেখানে আমার বাবা, মা, দিদিরা কেউ নেই। আমার প্রতিবেশীরাও সকলে মৃত। তবু সেই জন্মভূমিতে আমাকে একবার যেতে হবেই। সিনাগগটা ধ্বংস হয়ে গেছে। ঐ বু তার সমুখে নতজানু হয়ে আমি তোহ্রামন্ত্র আবৃত্তি করে আসব।

ট্রেন চলছে না। বহু জায়গাতেই রেল-লাইন উপড়ে পড়েছে। তবে মিত্রপক্ষের ব্যবস্থাপনায় রাস্তায় গাড়ি-ঘোড়া আবার চলতে শুরু করেছে। আমি দীর্ঘ সময় নিয়ে হিচ-হাইকিং করতে করতে একদিন এসে পৌঁছে গেলাম আমার জন্মভূমিতে। শিঘেটে।

সবার শেষে চেপেছিলাম একটা রেডক্রসের অ্যান্ডুলেন্স-ভ্যানে। সেটা আমার শহরের দিকেই আসছিল। বুদাপেস্ট যাবে। ড্রাইভার আমাকে নামিয়ে দিল আমাদের শহরের সেন্ট্রাল প্লাজার কাছাকাছি। ড্রাইভার জার্মান বা হাঙ্গেরিয়ান ভাষা জানে না, আমিও জানি না ইংরিজি। আকারে ইঙ্গিতে আমরা ভাববিনিময় করছিলাম। নামিয়ে দেবার সময় ও আমার হাতে ধরিয়ে দিল একটা ব্যাগ—তাতে এক বোতল বীয়ার, একটা পাঁউরুটি, আর একটা শার্ট। আমার পরনে, একটা নোংরা শার্ট। আমি বললাম: ডাক্কে! (ধন্যবাদ)। ও

বুঝল। হিপ-পকেট থেকে এক-গোছা ডয়েশমার্কের নোট বার করে দিতে গেল আমাকে। আমি নিতে রাজি হইনি। লোকটা জোড় করে আমার হাতে গুঁজে দিয়ে বলল, নাইন চ্যারিটি। ইটস্ এ leihen !

চ্যারিটি শব্দের অর্থ বুঝিনি, আন্দাজে মনে ছিল : ‘ভিক্ষা’ বা ‘দান’। কারণ পরবর্তী শব্দটি জার্মান—leihen হচ্ছে ioan অর্থাৎ ধার! হাত-পা নেড়ে জিজ্ঞেস করি : শোধ দেব কেমন করে? কাকে?

ও গাড়ির সাইনবোর্ডটা দেখিয়ে বললে, A u s Z a l e n R e d C r o s s !

অর্থাৎ সময়মতো যেন রেডক্রসকে এ ঋণ পরিশোধ করি। A u s Z a l e n মানে জার্মান ভাষায় : ঋণ পরিশোধ করা। চোখে জল এসে গেল আমার!

এই আমার জন্মভূমি? ছবির মতো শহর : শিষেট? রাস্তার দু-ধারে ভাঙা বাড়ির ধ্বংসস্তুপ। পথে জনমানব দূরের কথা, পশুপাখিও বিরল। সমস্ত চরাচরব্যাপি যেন এক শ্মশানের শূন্যতা, একটা অতীত স্মৃতির হাহাকার। আমাদের বাড়িটা কোথায় ছিল চিনতে পারলাম না। গোটা এলাকায় জড়াজড়ি করা ভূতপূর্ব ইমারতের মৃতদেহ। তারা যেন কোনো অতীত যুগের হাসি-কান্নাকে আগলে ধরে উবুড় হয়ে নিশ্চল পড়ে আছে।

সিনাগগটা অবশ্য একেবারে ভেঙে পড়েনি। আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। তার সামনে গিয়ে আমি নতজানু হয়ে প্রার্থনা করার আয়োজন করছি, হঠাৎ এক অন্ধকার গহ্বর থেকে টলতে টলতে আমার দিকে এগিয়ে এল একটি কঙ্কাল। ন্যাড়া মাথা, উদোম গা, পরিধানে শতচ্ছিন্ন একটা ডোরাকাটা পাংলুন। আমি স্তম্ভিত হয়ে আত্ননাদ করে উঠি, তুমি? আজও বেঁচে আছ? কেমন করে?

বেপ্লির শুকনো দুটি অধরোষ্ঠ নড়ে উঠল। কোনোক্রমে তার কণ্ঠনালী থেকে বার হয়ে এল জবাব : যম যে আমাকে ফিরিয়ে দিল, এলি! কেমন করে মরতে হয় তা কি আমি জানি? অনেক-অনেক চেষ্টা করেছি। তবু মরতে পারিনি। মা বলত, মরার সময় একজোড়া জলভরা চোখ দেখতে-দেখতে না মরলে, মরেও শান্তি নেই। আমার মা শান্তিতে মরতে পেরেছিল, আমার চোখে জল দেখে। এবার আমিও মরতে পারব। হ্যাঁরে, এলি, তুই কাঁদবি তো?

আমি ওর হাতটা খপ করে ধরে বলেছিলাম, না।

—না? আমি মরে গেলে তুই কাঁদবি না? কেন রে?

—না, কাঁদব না! কারণ তোমাকে মরতে আমি দেব না। তাহলে সিনাগগটা ঝাঁট দেবে কে? জল দিয়ে মুছবে কে?

—আমি যে আর পারি না, এলি? আমার কোমর ভেঙে গেছে!

—না, তোমাকে পারতে হবে। ধর দেখি এটা—

ঝোলা থেকে বীয়ার-বোতল আর পাঁউরুটিটা বার করে ওর হাতে গুঁজে দিই। অভুক্ত মানুষটা লোভাতুর হয়ে ওঠে। মুখে দিতে গিয়েও থমকে থেমে যায়। বলে, তুই যদি আধাআধি খাস তবেই খাব।

‘পাসওভার’-ব্রত উদ্‌যাপনের সময় এটাই আনুষ্ঠানিক কেতা। একটা রুটি থেকে সবাই ছিঁড়ে ছিঁড়ে ভাগ করে খায়। তাই খেলাম আমরা দুজন। আমি আর বেপ্লি। কী তৃপ্তি করে খেল সে। আচ্ছা, কতদিন পরে সে বীয়ার খাচ্ছে? হঠাৎ—কোথাও কিছু নেই—বেপ্লি আমার উপর খাপ্পা হয়ে ওঠে। বলে, তুই ভারি বজ্জাত! লোভ দেখিয়ে আমার ব্রত ভঙ্গ করে দিলি!

—ব্রত? কিসের ব্রত তোমার?

—আমি যে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, মরবার সময় একটা লোক কাঁদবে একথা জানলেই আমি না খেয়ে মরব। দেখি শালা যম কেমন করে আমায় ফেরায়।

আমি বলি, কিন্তু আমি তো তোমাকে মরতে দেখলে কাঁদব না।

—কাঁদবি না?

—না! কতবার এককথা বলব? তোমাকে আমি মরতে দেব না। তুমি এই সিনাগগের সামনে বসে গান গেয়ে আগামী যুগের মানুষকে জানাবে—আমরা, ইহুদিরা কী যন্ত্রণা ভোগ করেছি: বিশ্বযুদ্ধের আমলে। গান গেয়ে সবাইকে বলবে—আর কোনোদিন তোরা ওই যুদ্ধবাজদের কথায় ভুলবি না!

—কিন্তু কেমন করে গাইব, এলি? আমার গলার স্বর যে কর্কশ!

—আমি তো তোমাকে প্রেম-মহব্বতের গান গাইতে বলছি না। যে মর্মান্তিক দুঃখের গাথা তুমি আগামী যুগকে গেয়ে গেয়ে শোনাবে তা যে কর্কশ কর্তে গাইবারই গান।

বেপ্লির গলকণ্ঠটা বার-কতক ওঠা-নামা কুরল। তার পিচুটি-ভরা ঘোলাটে চোখদুটো পিট-পিট করল। তারপর আধা বিশ্বাস নিয়ে বলল, তুই বলছিস? আমি পারব?

—পারবে বেপ্লি, পারবে। স্বয়ং যমরাজ তোমার কাছে হার মেনে গেল আর এটুকু তুমি পারবে না?

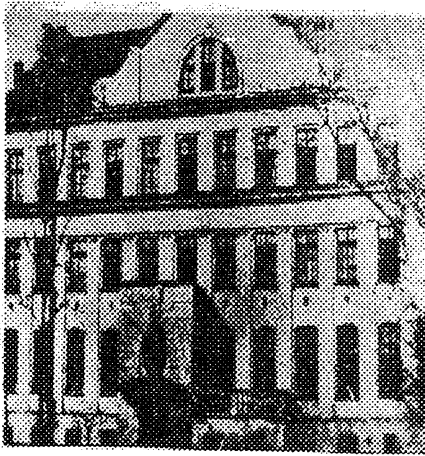
একগাল নিদন্ত হাসি হাসল বেপ্লি। বলে, ঠিকই বলেছিস, বেপ্লি পারবে।

নিতান্ত ঘটনাচক্রে পথে দেখা হয়ে গেল আর একজন পরিচিতের সঙ্গে। আমাদের সিনাগগের বৃদ্ধ রাব্বাই। চিনতে পেরে আমাদের তাঁর পাঁজরসর্ব্বশ্ব বুক জড়িয়ে ধরলেন। আমি ড্যাডির প্রসঙ্গ তুলতেই আমাদের থামিয়ে দিয়ে বললেন, থাম, এলি। আমি জানি।

আমাকে তাঁর ভাঙা বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তুললেন। অনেক অনেক কথা জানালেন। বুঝিয়ে বললেন, তাঁর পুরাতন সিনাগগ কমিটির বারোজন সদস্যের মধ্যে মাত্র দুজন এখন

জীবিত। অর্থের অভাব ওঁদের নেই। ইসরেইল থেকে উনি অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পেয়েছেন। সিনাগগটা আবার নতুন করে গাঁথে তোলায় ব্যবস্থা হচ্ছে। উনি নতুন একটি কমিটি গড়ে তুলেছেন। ওঁদের অভাব শুধু যুবকমীর। আমাকে জোর করে ওঁদের যুদ্ধোত্তর, সেবাপ্রতিষ্ঠানের কর্মী হিসাবে নিয়োগ করলেন। আমার গ্রাসাচ্ছাদনের সমস্যা মিটল। ওঁদের নির্দেশে মধ্য-ইউরোপের নানান এলাকায় এরপর ছোট্টাছুটি করতে হতো। নানান বিচ্ছিন্ন এলাকার নিঃসহায় ছেলেমেয়েদের সংগ্রহ করে একটি কেন্দ্রীয় অনাথাশ্রমে নিয়ে আসতে হতো। কেন্দ্রীয় অনাথ আশ্রমটি ছিল ওয়ারস-তে। প্রাকযুদ্ধকালে এটি ছিল শুধুমাত্র নিঃসম্বল ইহুদি শিশুদের আশ্রম। এখন শুধু ইহুদি নয়, খ্রিস্টান-ইহুদি দু-জাতের সহায়সম্বলহীনরাই সেখানে আশ্রয় পাচ্ছে। এই আশ্রমটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন একজন পোলিশ চিকিৎসক—ডক্টর জানুস কোরচক। তিনি ছিলেন খ্রিস্টান। রোমান ক্যাথলিক। অথচ তিনিই নির্মাণ করেছিলেন ওই ইহুদি অনাথ আশ্রমটি। পোল্যান্ড অধিকার করে নাৎসি সমরনায়করা অনাথ শিশু, তাদের শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং খ্রিস্টান প্রতিষ্ঠাতা ডক্টর কোরচককে গ্যাস-চেম্বরে পাঠিয়ে দেয়। চারতলা বাড়িটি হয়ে যায় নাৎসি যুদ্ধ বিশারদদের একটি সমরদপ্তর। যুদ্ধান্তে মিত্রপক্ষ আবার সেটিকে অধিগ্রহণ করে আশ্রমে রূপান্তরিত করেছে। আমাকে সেখানেই পাঠানো হলো।

[লেখকের প্রতিবেদন :



View of the Krochmalna Street Orphanage, Warsaw

ইন্টারনেট * থেকে সংগ্রহ করা কিছু তথ্য পরিবেশন করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। নাহলে কাহিনীর ধরতাইটা বোধহয় ঠিকমতো ধরা যাবে না। এখানে একই সূত্র থেকে পাওয়া অনাথাশ্রমের (Our home বা আমাদের বাড়ির) একটি দুর্লভ আলোকচিত্রও পরিবেশন করা হলো :

The Children's Home [Dom Sierot] was a Jewish orphanage established by Janusz Korczak in Warsaw in 1912. It was located at

92 Krochmalna Street in a building designed by Korczak himself to facilitate the implementation of his progressive educational theories. The orphanage was funded by the Jewish Orphans' Aid Society and served children between the ages of seven and fourteen. These children attended Polish public schools and government sponsored Jewish schools, known as 'Sabbath' schools, while they lived at the Krochmalna Street home. In 1921 the orphanage opened a summer camp on the Rozyczka farm in Goclawek. Rozyczka operated through the summer of 1940. Korczak's chief assistant and collaborated at the Krochmalna Street orphanage was Stefania Wilczynska.

• Korczak was highly regarded in Polish society for his contribution to Polish institutions, especially the 'Our Home' orphanage, which he established in 1919. Though he received numerous awards, increased anti-Semitism in the 1930s soon barred his participation in all but exclusively Jewish projects. In 1934 and 1936 Korczak made two trips to Palestine, where he was greatly influenced by the social experimentations of the Kibbutz movement. By 1937 he was convinced that all Jews should emigrate to the Jewish homeland. Soon after the German invasion of Poland in September 1939, the Jewish Orphans' Aid Society was disbanded and funding for the Krochmalna Street orphanage was taken over by the JDC and CENTOS. With the establishment of Warsaw ghetto in November 1940, the orphanage was moved to 33 Chlodna Street (or 16 Sienna Street, the second entrance) in the small ghetto. Though he received many offers to be smuggled out of the ghetto, Korczak steadfastly refused to abandon the children. He continued until the end to press hard for material resources for the orphans and to maintain a strict regimen at the home. The end came on August 5-6, 1942, when the nearly 200 children and staff-members of the orphanage were rounded-up for deportation. They marched in a silent procession of four columns to the Umschlagplatz, where they were saluted by ghetto police as they boarded the deportation train.

All were put to death at Treblinka gas chamber.*

* **Credit** : Miedzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusz Korczak, Courtesy of USHMM Photo Archives **Copyright** : Public Domain **Date** : Circa 1930. **Locale** : Warsaw, Poland, **Photographer**, no provenance.

[জানসু কোরচখ প্রতিষ্ঠিত 'শিশুসদন' (ডম সেরো) নামে একটি অনাথ-আশ্রম নির্মিত হয়েছিল 1912-এ ওয়ারসের 92 ক্রোচমালনা স্ট্রিটে। মাতৃপিতৃহীন ইহুদি নিঃসম্বল শিশুদের জন্য চারতলা বাড়িটির স্থাপত্যসংক্রান্ত পরিকল্পনা করেছিলেন কোরচখ স্বয়ং, তাঁর শিশুশিক্ষার উন্নতিশীল নানান কার্যক্রম বাস্তবায়িত করার আয়োজনে। প্রতিষ্ঠানটি অর্থনৈতিক ব্যয়ভার বহন করতেন 'জুইশ অরফ্যাপ এইড সোসাইটি'। সেখানে সাত থেকে চৌদ্দ বছরের ছেলেমেয়েরা থাকতো। আর কাছাকাছি অবস্থিত পোল্যান্ডের পাবলিক স্কুলে পড়াশুনা করতে যেত। সাধারণ স্কুলে এবং ইহুদি-সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষভাবে গড়ে ওঠা বিদ্যালয়ে। এগুলিকে বলা হতো 'সাবাথ স্কুল'। 1921 সালে এই অনাথাশ্রমের উদ্যোগে একটি গ্রীষ্মকালীন ক্যাম্পও খোলা হয়। রোজিৎস্কা খামার বাড়িতে। এই দ্বিতীয়োক্ত প্রতিষ্ঠানটি 1940 পর্যন্ত কার্যকরী ছিল। ক্রোচমালনা স্ট্রিটে অবস্থিত আশ্রমে ডক্টর কোরচখের প্রধান সহকারী হিসাবে কর্মরত ছিলেন **মাদাম স্টেফা বিলৎজিনস্কা**।

পোল্যান্ডের শিক্ষাব্যবস্থায় তাঁর অবদানের জন্য কোরচখের প্রতি পোলিশ সমাজ ছিল শ্রদ্ধাবিনম্র। বিশেষ করে তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'আমাদের বাড়ি' অনাথাশ্রমের জন্য। এটি গড়ে উঠেছিল 1919-এ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরে। পরবর্তী এক দশকে তিনি বহু সম্মান ও পুরস্কার লাভ করেন। কিন্তু 1930 নাগাদ (হিটলারের নাৎসি পার্টি বৃহত্তর জার্মানিতে প্রভাবশালী হয়ে পড়ায়) ইহুদি-সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে একটা বিরোধের ধারণা কার্যকরী হয়ে ওঠে। কোরচখের উপর নির্দেশ আসে যে, তিনি শিশুশিক্ষার বিষয়ে তাঁর উন্নতিশীল পরিকল্পনাগুলির প্রয়োগ কার্যকরী রাখতে পারেন যদি সেগুলি ইহুদি-সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পর্ক বিমুক্ত থাকে। 1934 এবং 1936-এ পরপর দুবার কোরচখ প্যালেস্টাইন পরিদর্শন করেন। সেখানকার 'কিব্বুজে' (ইহুদিদের সমবায় প্রতিষ্ঠান) সমাজ সংস্কারের কার্যাবলী দেখে তিনি মুগ্ধ হয়ে যান। 1937 নাগাদ তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, বিভিন্ন দেশ থেকে ইহুদিদের 'নিজভূমে' (প্যালেস্টাইন অঞ্চলে) গিয়ে নতুনভাবে বসবাস করাই বাঞ্ছনীয়। তার দুবছর পরে, 1939-এর সেপ্টেম্বরে নাৎসি বাহিনী পোল্যান্ড দখল করে। নয়া-শাসকদের আদেশে 'জুইশ' অরফ্যাপ এইড সোসাইটিকে বেআইনি ঘোষণা করা হয়। ফলে ক্রোচমালনা স্ট্রিটে অবস্থিত অনাথাশ্রমের দায়িত্ব অর্পিত হলো JDC এবং CENTOS প্রতিষ্ঠানের উপর (নাৎসি পরিচালিত)। 1940-তে ওয়ারসতে যখন ইহুদিদের জন্য 'ঘেটো' চালু করা হয় তখন ওই অনাথাশ্রমকে স্থানান্তরিত করা হল 33 শ্লোডনা স্ট্রিটের একটি ছোট বাড়িতে। কোরচখ তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন নিঃসহায় শিশুদের নিয়ে সেখানে যেতে বাধ্য হলেন। এরপর কোরচখের কাছে গোপনে একাধিক প্রস্তাব আসে যার সাহায্যে তিনি অধিকৃত পোল্যান্ড ত্যাগ করে অন্যত্র সরে যেতে পারতেন। কিন্তু অনাথ শিশুদের ত্যাগ করে তিনি একাকী মুজিল্লাভের প্রস্তাব বারম্বার প্রত্যাখ্যান করেন। প্রায় দু-বৎসর তিনি

নাৎসি শাসকদের কাছে নানাভাবে দরবার করে ওই শিশুদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার উপকরণ সংগ্রহের চেষ্টা করে যান। শেষ পর্যন্ত তাঁর উপর আদেশ আসে অনাথ শিশুদের কন্সেন্ট্রেশন ক্যাম্পে পাঠানো হবে। এবারও তিনি ওদের ত্যাগ করে একা মুক্তি পেতে পারতেন। কিন্তু সে প্রস্তাব তিনি পুনরায় প্রত্যাখ্যান করেন। অবশেষে 1942-এর পাঁচই অগস্ট রাত্রে তাঁদের সবাইকে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রায় শ-দুই শিশু, বালক-বালিকা আর তাদের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়ে ডক্টর কোরচখ অস্তিম পদযাত্রায় রওনা হয়ে যান। চারটি সারিতে তাঁরা মার্চ করে যান উম্‌শ্লাগ্‌প্লাৎস্ রেল-স্টেশনে। সেখানে প্রতীক্ষমান গবাদি পশু পরিবহনযোগ্য ওয়াগনে তাঁদের তুলে দেওয়া হয়। মালগাড়িটি শিশু ও তাঁদের পরিচালকদের নিয়ে ট্রেনিঙ্কা মৃত্যুশিবিরের দিকে রওনা হয়ে যায়।

শিশুবাহিনী, তাঁদের শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং পরিকল্পনাকার ডক্টর জানুস কোরচখকে কোন্ তারিখে গ্যাস-চেম্বারে প্রবেশ করতে বাধ্য করা হয় সে সম্বন্ধে ইতিহাস নীরব।

এলিজ্জর উইজেনথল :

ওয়ারসর অনাথ-আশ্রমে আমি যোগদান করি পঁয়তাল্লিশ সালের জুন মাসে। অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার মাস দুই পরে। ওয়ারস তখনো ধ্বংসস্তুপ। শহরের অর্ধেকের উপর ইমারৎ ভেঙে পড়েছে। সবগুলির আবর্জনাস্তুপ তখনো সরানো যায়নি। অত্যন্ত আশ্চর্যজনকভাবে ক্রোচ্‌মালনা স্ট্রিটে ডক্টর কোরচখ পরিকল্পিত চারতলা বিশাল বাড়িটি সেই ধ্বংসস্তুপের মাঝখানে মাথা খাড়া করে দাঁড়িয়ে আছে, মিশরসভ্যতার ধ্বংসাবশেষের মাঝখানে গিজা-পিরামিডের মতো। এককালে—কোরচখের আমলে—এখানে শ-দুয়েক ছেলেমেয়ের নৈশাবাসের আয়োজন ছাড়াও নানান ব্যবস্থা। গ্রন্থাগার, সেমিনার রুম, কিশোর-কিশোরীর খেলাঘর, বালক-বালিকার খেলনা ঘর। এছাড়া পাকঘর, খাবার ঘর, মিটিং রুম ইত্যাদি। ভিতর-উঠানে ছিল একটি প্রেক্ষাগৃহ—যেখানে বোয়াল্লিশ সালে পোলিশ ভাষায় রবীন্দ্রনাথের ডাকঘর অভিনীত হয়। শেষযাত্রার মাত্র সতের দিন আগে।

আমি যখন ওখানে গিয়ে কাজে যোগদান করি তখন সেখানে নিঃসহায় বালক-বালিকা ছিল মাত্র বাইশ জন। দু-তিনজন কর্মী ইতিমধ্যে নিযুক্ত হয়েছেন। প্রতিষ্ঠানের বর্তমান কর্ণধার : মেজর আর্নেস্ট স্নবেল।

আলাপ হলো তাঁর সঙ্গে। আমার চেয়ে পাঁচ-ছয় বছরের বড়। নাৎসি জার্মান বাহিনীতে যুদ্ধরত ছিলেন। স্বেচ্ছায় যুদ্ধে যোগদান করেননি। কনস্ক্রিপশনের বেড়াঙ্গলে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিলেন। তার পূর্বে ছিলেন বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের ছাত্র। আন্তরিকভাবে তিনি ছিলেন যুদ্ধবিরোধী। কিন্তু নাৎসি দর্শনে বিশেষ বয়সের জার্মান

নাগরিক যদি যুদ্ধে যোগ না দেয় তাহলে তার ছিল একটিমাত্র বিকল্প : ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড়ানো। এ জন্যই তিনি যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন। আর স্বভাবজাত কর্মদক্ষতায় মেজর-পদে উন্নীত হয়েছিলেন।

অথচ আশ্চর্যের কথা—স্নবেল ইহুদিদের উপর অত্যাচারের কোনও কার্যক্রমে নিজেকে জড়াননি। এমন কি বহু ইহুদি বন্দিকে নাৎসি রোষ থেকে বারেবারে রক্ষা করেছেন। তাঁর এই মানবিকতার বিচারেই তিনি যুদ্ধোত্তর অনাথাশ্রমের প্রধান হিসাবে নিযুক্ত হয়েছেন।

আমি কাজে যোগদান করার কিছুদিন পরে একবার তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, বস, এলি। গত সপ্তাহে তিনদিন আগে-পিছে আমি ফ্রাঙ্কফুট থেকে দু-খানি চিঠি পেয়েছি। রহস্যময় দুটি পত্র। তুমি পড়ে দেখ। তারপর আমাকে পরামর্শ দাও—কী করা উচিত আমাদের।

আমি ওঁর ভিজিটার্স চেয়ারে বসে চিঠি দু-খানি পড়তে থাকি। উনি ফাইলের বাড়িলে আবার ডুব দিলেন। প্রথম পত্রের লেখিকা একজন জার্মান বিধবা। আত্মপরিচয় দিয়ে লিখেছেন—তিনি শয্যাশায়ী, বস্তুত মৃত্যুর প্রতীক্ষায় প্রহর গুণছেন। জানিয়েছেন যে, যুদ্ধকালে তাঁর স্বামী—অবসরপ্রাপ্ত একজন মেজর—একটি নিঃসহায় ইহুদি কিশোরীকে উদ্ধার করে আনেন। মেয়েটির নাম—অ্যালিসিয়া। তার তিনকুলে কেউ নেই। গত দেড় বছর সে ওঁদের বাড়িতে লুকিয়ে আছে। প্রসঙ্গত উনি লিখেছেন—ওয়ারস’র ডক্টর কোরচখকে তিনি দীর্ঘদিন পূর্বে ব্যক্তিগতভাবে চিনতেন। তাঁর কাছে উনি বিশেষভাবে ঋণী। সারাজীবনে সে ঋণ তিনি পরিশোধ করতে পারেননি। অথচ তাঁর প্রতিষ্ঠানের কাছেই তিনি পুনরায় শিক্ষা চাইতে বাধ্য হচ্ছেন। সংবাদপত্র পাঠে তিনি জেনেছেন যে, ডক্টর কোরচখের অনাথাশ্রম পুনরায় সঞ্জীবিত হয়েছে, সেখানে যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর ভাগ্যহত বালক-বালিকারা আবার আশ্রয় পেতে শুরু করেছে। তাই তিনি আবেদন করছেন—তাঁর আশ্রিতা কিশোরীটির দায়িত্ব কি আমরা গ্রহণ করতে প্রস্তুত? এ জন্য কোনো আর্থিক সাহায্য দানে তিনি অসমর্থ। শুধু তাই নয়, আমরা স্বীকৃত হলে ওই নাবালিকাকে ফ্রাঙ্কফুট থেকে নিয়ে আসার খরচ ও ব্যবস্থা আমাদেরই করতে হবে। আমরা যদি স্বীকৃত হই তাহলে তিনি নিশ্চিন্তে মৃত্যুর সঙ্গে মোকাবিলা করতে পারেন।

দ্বিতীয় চিঠিখানি একই হস্তাক্ষরে দু-দিন পরে লেখা। লেখিকা ওই অনাথা কিশোরী মেয়েটি। লিখেছে, “গতকাল আমার হস্তাক্ষরে আপনাদের একটি চিঠি ডাকে দিয়েছি। স্বাক্ষর করেছেন—‘মা’, অর্থাৎ আমার আশ্রয়দাত্রী। তিনি প্রতিবন্ধী। তাঁর ডান হাত পঙ্গু। তাই তাঁর নির্দেশমতো আমিই চিঠিখানি লিখেছি। বর্তমান পত্রে আমি জানাতে চাই—তিনি যে কথা লিখেছেন তা সর্বৈব সত্য। কিন্তু মায়ের ভীষণদশায় আমি এ বাড়ি ছেড়ে যাব না। আপনারা আমাকে নিয়ে যাবার কোনো ব্যবস্থা না করলেই আমি বাধিত

হই। কারণ এ বাড়িতে ওই শয্যাশায়ী কপর্দকশূন্য পঙ্গু মহিলাটির একমাত্র সঙ্গী আমি নিজেই। আপনাদের অগ্রিম ধন্যবাদ জানিয়ে পত্র শেষ করছি। ইতি বিনীতা অ্যালিসিয়া।”

চিঠি দুখানি শেষ করে মুখ তুলতেই উনি ফাইল বন্ধ করে আমার দিকে ফিরে বললেন, খুবই মিস্টিরিয়াস, নয়?

আমি বলি, আশ্চর্য না! রহস্যজনক তো কিছু দেখছি না। দুজনের বন্ধুবাই তো পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে।

—তাহলে আমাকে বুঝিয়ে বল, জার্মান সৈন্যদলের একজন এক্স-মেজরের স্ত্রী কী ভাবে ডক্টর কোরচখের কাছে আজীবন ঋণী থাকতে পারেন? ডক্টর কোরচখ গাইনোকলজিস্ট ছিলেন, মানছি। যদি ধরে নিই তিনি ওই মহিলাটির চিকিৎসা করেছিলেন, তাহলে তাঁর স্বামী কি ডাক্তারের ফীজ মিটিয়ে দিতেন না?

—‘ঋণ’ শব্দটা হয়তো আর্থিক নয়, ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছেন উনি। সেটা কথা নয়, স্যার! কাকতালীয় ঘটনাটা হচ্ছে এই যে, হয়তো এই ভদ্রমহিলাকে আমি চিনি।

—তুমি চেন? কী ভাবে? তুমি কখনো ফ্রাঙ্কফুর্ট গেছ?

—না, যাইনি। ভদ্রমহিলাকে আমি চাক্ষুষ দেখিনি। কিন্তু ফ্রাঙ্কফুর্টের একজন মেজর এঞ্জিলার্ডকে আমি চিনতাম। বস্তুত তাঁকেও আমি কখনো দেখিনি। আমি চিনতাম তাঁর পুত্রকে, একটি জার্মান এস. এস. সৈনিককে—ক্যাপ্টেন কার্ল এঞ্জিলার্ডকে। কার্ল যখন যুদ্ধে আহত হয়ে মারা যায়, তখন তার হসপিটাল-বেড এর পাশেই দাঁড়িয়েছিলাম আমি।

উনি একটু চুপ করে কী ভাবলেন। তারপর বলেন, ‘এঞ্জিলার্ড’ একটি প্রচলিত জার্মান উপাধি। পারমাণবিক বোমার অন্যতম আবিষ্কারক ডক্টর এঞ্জিলার্ড তো বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তি। তেমনি কার্লও একটি সাধারণ জার্মান নাম। তাহলে কী করে ধরে নিচ্ছ যে, এই মহিলাটি কার্ল এঞ্জিলার্ড-এর মা?

—কার্লের বাড়ি ছিল ফ্রাঙ্কফুর্টে। তার বাবা ছিলেন রয়াল মেজর।

—তুমি কি যুদ্ধের সময় হসপিটালে কাজ করত?

—আশ্চর্য না। নিত্যন্ত ঘটনাচক্রে আমি তার মৃতশয্যার পাশে উপস্থিত ছিলাম। আপনার যদি সময় থাকে তাহলে বিস্তারিত বলতে পারি। বাস্তবে এ বিষয়ে আমার মনে একটা কাঁটা বিঁধে আছে, স্যার। আপনার সময় থাকলে আমার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে আমি জানতে চাই : আমি কি কিছু অন্যায় করেছি? এ প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করার মতো উপযুক্ত লোক পাই না।

উনি বললেন, আমার হাতে যথেষ্ট সময় আছে। বল, তোমার কী অভিজ্ঞতার কথা বলতে চাইছ। সম্ভব হলে তোমার প্রশ্নের জবাবও দেবার চেষ্টা করব।

আমি সবিস্তারে কার্ল এঞ্জিলার্ডের নৃশংসতার কথা আনুপূর্বিক বলে গেলাম। উনি ধৈর্য ধরে সবটা শুনলেন। তারপর বললেন, তুমি ঠিকই করেছ এলি। আমার মতে ওকে মৃত্যুদণ্ড—১৬

ক্ষমা করা তোমার উচিত হতো না। ইহুদিদের তরফ থেকে তো নয়ই, এমন কি ব্যক্তিগত ভাবেও নয়। কারণ সেটা হতো মিথ্যাচারণ। তুমি যে ওকে মন থেকে ক্ষমা করতে পারনি এটা তো বুঝতেই পারছি।

—কিন্তু, স্যার, একজন মৃত্যুপথযাত্রীর শেষ অনুরোধ...

উনি সামনের দিকে একটি হাত বাড়িয়ে দিয়ে ইস্তিতে আমাকে থামতে বললেন। তারপর গম্ভীরস্বরে ধীরে ধীরে বললেন, ত্রিশে এপ্রিল যদি আমি বার্লিন বৃষ্কারে উপস্থিত থাকতাম, স্বয়ং ফ্যুরার যদি আমাকে ওই একই কথা বলতেন নিজের কপালে ট্রিগার টানার ঠিক পূর্বমুহূর্তে, তাহলে আমিও তাঁকে ক্ষমা করতে পারতাম না।

আমি স্তম্ভিত! একজন প্রাক্তন জার্মান সৈনিকের এ জাতীয় উদ্ভিঙিতে স্তম্ভিত হবারই কথা। উনি চোখ থেকে চশমাটা খুলে নিয়ে তার কাচটা রুমাল দিয়ে মুছতে মুছতে বললেন, চল্লিশ সালে আমার বাবার বয়স ছিল আটচল্লিশ। সেই অপরাধে তাঁকে কনফ্রিক্ট করা হয়েছিল তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে। মস্কো থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় তিনি শীতে জমে মারা যান।

নিঃশব্দে স্থানত্যাগ করব কি না ভাবছি, তার আগেই উনি বলে বসলেন, কাকতালীয় ঘটনার প্রসঙ্গ যখন তুললে, এলি, তখন বলি : আমার একটি ছোট বোন ছিল —ওই একটিই বোন আমার। আর তার নামও ছিল : ‘অ্যালিসিয়া’!

প্রশ্ন করি, ‘ছিল’ বলছেন কেন স্যার?

—সে ছিল আমার বৈমায়েয় ভগিনী। আমার গর্ভধারিণী মায়ের মৃত্যুর পরে বাবা অ্যালিসিয়ার মাকে বিবাহ করেন। তিনি ধর্মে ছিলেন ‘জিওনিস্ট’—ইহুদি। সেটা নাৎসি পার্টি ক্ষমতায় আসার পূর্বযুগের ঘটনা। তখন নর্ডিক জার্মানের পক্ষে জিওনিস্টকে বিবাহ করার কোন আইনগত বাধা ছিল না।

আমি চুপ করে শুনছিলাম। উনি অস্ফুটে বললেন, ইহুদি হবার অপরাধে আমার বিমাতা ও ছোট বোনটিকে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে যেতে হয়েছিল।...না, না, তুমি যা ভাবছ, তা নয়। এই অ্যালিসিয়া আমার ছোট বোন নয়। আমার বোন কোন কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে কী ভাবে মারা যায় তা আমি জেনেছি। এতকথা বলছি শুধু বোঝাতে যে, নাৎসিবাদে আন্তরিক বিশ্বাস রেখে যারা লক্ষ লক্ষ ইহুদি আর জার্মানের মৃত্যুর কারণ হয়েছে মানবসভ্যতা তাদের কোনোদিন ক্ষমা করবে না। তুমি-আমি ক্ষমা করার কে?

ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরের অবস্থাও একই রকম। যুদ্ধের শেষাশেষি ল্যাফ্তাফের পক্ষ শায়ন করার পর আর. এ. এফ. এই শহরটার উপরেও নির্বিচারে কার্পেট বসিয়ে করে গেছে। যুদ্ধ যদিও থেমে গেছে হয়মাস আগে, তবু সব ধ্বংসস্তূপ এখনো সরানো যায়নি। মোটামুটি চওড়া রাস্তাগুলি সাফা করে ‘স্ট্রিট-কার’ চালানো সম্ভবপর হয়েছে। অনেক

সন্ধান করে ওদের বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়ই। বুঝতে পারি, সেটাও বোমাবর্ষণে বিধ্বস্ত। বাড়িটার সামনে গিয়ে যখন পৌঁছলাম তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনি়েছে। প্রাক্‌যুদ্ধকালে আলো-ঝলমল এ শহরের উৎসবমুখর নরনারী হয়তো বলত : ‘নাইট ইজ ইয়াং ইয়েট!’—রাত এখনো নাবালিকা। কালযুদ্ধ পাড়ি দিয়ে ফ্রান্সফুর্ট আজ স্থবির, বৃদ্ধা, সন্ধ্যারাତ্রেই নেমে এসেছে মধ্যরাত্রির নিস্তব্ধতা। পথে যানবাহন গোনাগুন্তি। নিয়ন-বাতির রোশনাই নাই। হারিয়ে গেছে কাফেটেরিয়ায়, সিনেমা-হাউসে, ক্যাবারে-হলের উদ্দামতা। দশজন পথচারীর মধ্যে জোয়ান বয়সের একটিও চোখে পড়েনি—পড়ে না। পড়লেও দেখা যায় তার গমনভঙ্গিমা ক্রাচনির্ভর।

ভাঙাবাড়ির একতলায় কাচের জানলা দিয়ে নজর হলো মোমবাতির আলো। কলবেল আছে। বাজে না। ইলেকট্রিক কারেন্ট নেই। বোধহয় বিজলির বিল মেটানো হয়নি বলে লাইন কেটে দিয়ে গেছে। সদর দরজার একটেরে একটা জীর্ণ নেমপ্লেট নজরে পড়ল ‘এক্স. মেজর হার্বার্ট থর্জিলার্ড’ প্রাক্তন গৃহস্বামীর পরিচয়।

দরজায় বারকতক জোরে জোরে থাক্কা দেবার পর সদর দরজা ইঞ্চি দুয়েক ফাঁক হল, তারপর সেফটি-ক্যাচে আটকে গেল। সেই ফাঁক দিয়ে নজরে পড়ল ও প্রান্তে একটি কিশোরী মেয়ের ভীত-চকিত একজোড়া হরিণ নয়ন :

—কাকে খুঁজছেন?

—তোমাকেই খুঁজছি অ্যালিসিয়া! দরজাটা খুলে দাও।

চোখদুটি বিস্ফারিত হয়ে গেল—বিস্ময়ে না আতঙ্কে?

—কে আপনি?

বলি, ভয় কি অ্যালিসিয়া? আমি তো গেস্টাপো পুলিশ নই—আমার সাজ-পোশাকেই দেখছ। আমি কোনো জুডেন-কিশোরীকে পাকড়াতে আসিনি।

এবার সাহস সঞ্চয় করে বলে, আমি জুডেন নই। ছিলাম। এখন আমি একজন জিওনিস্ট। কিন্তু আপনি কোথা থেকে আসছেন?

এবার বলি, কারেন্ট! তুমি আর জুডেন নও; কিন্তু আমি যে জুডেনই রয়ে গেলাম, সিস্টার। বাকি জীবনের জন্য! এই দ্যাখো—

হাতের আঙ্গিন গুটিয়ে ওই দু-ইঞ্চি ফাঁক দিয়ে দেখালাম আমার অপরিবর্তনীয় সনাক্তিচিহ্ন : A. C. 7239.

লোহার চেনটা সরে গেল। মেয়েটি বললে, আসুন, ভিতরে এসে বসুন। কিন্তু কোথায় বা বসতে বলি?

বৈঠকখানা ঘরটা একেবারে নেড়া। জানলায় ট্যাপেস্ট্রি নেই, চেয়ার, সোফা, কার্পেট কিছু নেই। দেওয়ালে দু-একটি ধূলিমলিন ফটোগ্রাফ আর গতবছরের একটি বাতিল

ক্যালেভার। এমনকি দেওয়ালের ওই গোলাকৃতি দাগটা সলজ্জে স্বীকার করছে যে, ওয়াল-ক্লকটাও অর্থাভাবে বিক্রয় করে দিতে হয়েছে।

একটা কাঠের প্যাকিং বাক্সে বসতে বসতে বলি, তুমি ব্যস্ত হয়ো না Schwester (বোনটি); এই তো আমি বসেছি। এবার নিজের পরিচয়টা দিই। আমি আসছি ওয়ারস থেকে। ডক্টর কোরচখের ‘আওয়ার হোম’ থেকে।

—সে কি! আপনারা আমার চিঠি পাননি?

—পেয়েছি। দুখানাই। তুমি যদি সেখানে না যেতে চাও, তাহলে আমরা তোমাকে জোর করে ধরে নিয়ে যেতে পারি না। কিন্তু তাতে তো তোমার বা তোমার আশ্রয়দাত্রীর সমস্যাটা মিটবে না। তাই চিঠির জবাব না দিয়ে আমি সমস্যাটা নিয়ে কিছু আলোচনা করতে এসেছি। তার আগে বল তো, অ্যালিসিয়া—মেজর হার্বার্ট থঞ্জলার্ডের পুত্রটির নাম কি কার্ল?

আবার একজোড়া অবাক দৃষ্টি—আপনি কেমন করে জানলেন? কার্ল তো ছয়মাস আগে মারা গেছে? আপনি তাকে চিনতেন?

—চিনতাম। তার মৃত্যুসময়ে আমি হাসপাতালে উপস্থিত ছিলাম।

ও অনেকক্ষণ জবাব দিতে পারল না। মেদিনীনিবন্ধ দৃষ্টিতে কী যেন ভাবল। তারপর নতনয়নেই বললে, কার্লকে আমি দেখিনি। সে যুদ্ধে যাবার পর আমি এ বাড়িতে আশ্রয় পেয়েছি। শুনেছি, কার্ল গেস্টাপো বাহিনীতে ছিল। আচ্ছা সে কী...

—থামলে কেন? বল? ‘সে কী’... কি?

—না, মানে কার্লকে তো আমি কখনো দেখিনি। তার ফোটো দেখেছি শুধু। তবে তার সম্বন্ধে অনেক—অনেক গল্প শুনেছি। ‘মা’-য়ের কাছে। ‘মা’-মানে আমার আশ্রয়দাত্রী। তিনি তো এখনো আমাকে দিবারাত্রি কার্লের গল্পই শোনান।

—কার্লের ফোটো দেখেছ?

—দেখেছি। অদ্ভুত সুন্দর দেখতে। যেন Prince Charming! দেখবেন?

আমার অনুমতির অপেক্ষা না করেই উঠে গেল পাশের ঘরে। ফ্রেমে বাঁধানো একটা ফোটো হাতে ফিরে এল পরক্ষণেই। সেটা মেলে ধরল আমার দিকে। সত্যিই কল্ললোকের রাজপুত্র! এ মেয়েটি সেই মায়ের আদুরে ছেলেটিকে দেখেনি—তার কীর্তি-কাহিনী, প্রশংসার কথাই শুধু শুনে গেছে। বুঝতে পারি, ওর কিশোরীমনে ওই অনুপস্থিত Prince Charming রেখাপাত করেছে। মায়ের মুখে শোনা তার গল্পে। হয়তো কার্লের পাওয়া কাপ-মেডেলগুলো ঝাড়াপোঁছা করেছে, মেজে-ঘষে চকচকে করেছে!

জিঞ্জেরস করি : রোজেলিনা নামে একটি ইহুদি মেয়ের নাম শুনেছ?

—কতবার! মায়ের কাছে। কার্লের গার্লফ্রেন্ড। ঠিক পাশের বাড়িটাতেই থাকত ওরা—আক্ষল অটো ফ্রাঙ্কের বাড়িতে। যুদ্ধ বাধার আগেই ওঁরা বেলজিয়ামে পালিয়ে যান। আপনি কেমন করে চিনলেন রোজেলিনাকে?

—না, চিনি না। কার্লের কাছেই তার নামটা শুনেছিলাম।

—কার্ল বুঝি আপনার বন্ধু ছিল?

কী বলব ভেবে পাই না। কী লাভ এই কিশোরীর স্বপ্নটাকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে? তাই কথা ঘোরাতে বলি, তুমি এ বাড়িতে এসে পড়লে কেমন করে?

ও সংক্ষেপে বলল ওর সংক্ষিপ্ত জীবনের ইতিকথা :

ওর নাম অ্যালিসিয়া নয়। এটা ওর ছদ্মনাম। পিতৃদত্ত নাম : রেবেকা রথচাইল্ড। আদি বাড়ি পোল্যান্ডের একটি ছোট্ট শহরে। ওরা ছিল পাঁচ ভাইবোন। যুদ্ধের প্রথম যুগেই রাশিয়ান আর্মি ওদের শহরটা দখল করে। অত্যাচারে ওর বাবা, বড়দা জাখারি আর মেজদা মোশেও মারা যায়। বাকি তিনটি সন্তানকে নিয়ে ওর মা কোনোক্রমে দুনিয়াদারী করে চলছিলেন। তারপর হলো নাৎসি বাহিনীর আক্রমণ ও যথারীতি অত্যাচার। ওরা চারজনে যেতে বাধ্য হলো যেটোয়। নিতান্ত ঘটনাচক্রে ও পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। দৈবাৎ এসে আশ্রয় পায় ওয়ারসতে ডক্টর কোরচখের অনাথ আশ্রমে। তারপর আবার সদলবলে ‘ট্রেন্স্কা-ক্যাম্পে’। নিতান্ত ভাগ্যক্রমে ও পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। হিচ-হাইকিং করতে করতে সে পোল্যান্ডের বাইরে চলে আসে। রেডক্রস অ্যাশ্বুলেসের এক ড্রাইভার ওকে পৌঁছে দেয় এই ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরে। নামিয়ে দেয় এক ইহুদি পরিবারের আশ্রয়ে। সেখানে আবার নাৎসি গেস্টাপো বাহিনীর আক্রমণ এড়াতে ও ছুটে পালাতে পালাতে নেমে পড়ে রাস্তার একটা ম্যানহোল-ঢাকনা খুলে শহরের সিউয়ার পাইপের গর্তে। গেস্টাপোর ওকে খুঁজে পায়নি। ঘটনাটা এই বাড়ির ঠিক সামনেই ঘটেছিল। মেজের হার্বার্ট থজিলার্ড তাঁর জামলা দিয়ে ব্যাপারটা দেখতে পান। গেস্টাপো-দল এলাকা ছেড়ে চলে গেলে বৃদ্ধ ভদ্রলোক ওকে সেই পুতিগন্ধময় নর্দমা থেকে উদ্ধার করে আনেন। গল্প শুনতে শুনতে আমার মনে হলো হয়তো ঠিক যখন তাঁর পুত্র পলাতক নরনারীর ভিড়ে-ঠাসা দ্বিতল বাড়িটায় পেট্রোল ছড়িয়ে দিচ্ছে। রেবেকাকে আশ্রয় দেন তাঁর বাড়িতে, প্রচণ্ড বিপদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন থেকে। প্রায় একবছর সে এ বাড়িতে লুকিয়ে থাকার পর একরাতে ব্রিটিশ রয়্যাল এয়ারফোর্সের বোমাবর্ষণে এ বাড়ির সবাই কমবেশি আহত হলো। মেজের থজিলার্ড এবং ফ্রাউ থজিলার্ডের ভগিনী সে রাতে মারা যান। জীবিত থাকেন ফ্রাউ থজিলার্ড —প্রচণ্ড আহত অবস্থায়, আর অনাহত ওই কিশোরী মেয়েটি। প্রথম দিনই ও হের থজিলার্ডকে বলেছিল যে, ওর নাম অ্যালিসিয়া। সেই নামটাই ওঁরা জানতেন। যুদ্ধান্তে যখন ওর আর লুকিয়ে থাকার প্রয়োজন থাকল না, তখন ওই গৃহস্বামিনীর একমাত্র সঙ্গী ও অভিভাবিকা হয়ে পড়ে। ফ্রাউ থজিলার্ডের সঞ্চয় থেকে আরও ছয়মাস

ওদের বেঁচে থাকা সম্ভবপর হয়েছে। এখন তিনি ওকে আবার সেই ওয়ারসর অনাথ আশ্রমে পাঠিয়ে দিতে চান; কিন্তু ও তাঁকে ত্যাগ করে যেতে রাজি নয়।

জিঞ্জেস করে জানতে পারি ফ্রাউ ওজিলার্ড আছেন পাশের ঘরে। পঙ্গু, শয্যাশায়ী, বস্তুত মৃত্যুশয্যায়। বড়জোর দু-এক মাস বাকি আছে তাঁর মুক্তিলাভের। প্রশ্ন করে আরও জানতে পারি, এই বাড়ির ওয়ারিশ কে তা ও জানে না। মেয়েটি বললে, এ ভাঙা বাড়িটার কোনো দাম না থাকলেও দু-দশ বছর পরে ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরের কেন্দ্রে এ জমিটার দাম আকাশছোঁয়া হবে। তখন নিশ্চয় মেজর ওজিলার্ডের কোনো ভাই, ভাইপো এসে দখল নেবে। তার পূর্বের ও এ বাড়ি ছেড়ে নিরুদ্দেশের পথে ভাগ্যান্বেষণে রওনা হয়ে পড়বে।

বললাম, তোমার হিসেবমতো এখন তোমার বয়স পনেরো। তুমি এখনো সাবালিকা নও। যতদিন তা না হতে পারছ ততদিন কি তুমি আমাদের আশ্রমে গিয়ে কাজ করবে? সেখানে অনেক ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে আছে। তাদের দেখভাল করতে পারবে? তোমার গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থাই শুধু নয়, এ বয়সে একটা নিরাপত্তারও তো প্রয়োজন।

মেয়েটি বেশ বুদ্ধিমতী। বললে, নিশ্চয় যাব আমি। মায়ের একটা ভালমন্দ হয়ে গেলেই। তখন আপনাদের আবার আমি চিঠি লিখব। আপনাকে আসতে হবে না। আমি নিজেই ওয়ারসতে চলে যেতে পারব। তাছাড়া ‘আওয়ার হোম’টা তো বাস্তবে ‘মাই হোমও’। সেখানে আমি অনেক দিন বাসও করেছি। আপনি ড্যাডকে দেখেননি, আমি কিন্তু তাঁর স্নেহ পেয়েছি।

—‘ড্যাড’ মানে?

—ডক্টর কোরচখকে আমরা সবাই ‘ড্যাড’ বলে ডাকতাম।

—তুমি তাঁকে দেখেছ?

—আলবাং! তাঁর লেখা নাটকে অভিনয়ও করেছি। আপনি পোয়েট টেগোরের নাম শুনেছেন? তাঁর লেখা একটি জার্মান নাটককে উনি পোলিশ ভাষায় অনুবাদ করেন। নাটকটার নাম ‘পোস্ট-অফিস’। তাতে একটিমাত্র মেয়ের চরিত্র ছিল। আমি সেই চরিত্র অভিনয় করেছিলাম। আমি যে চরিত্রটা অভিনয় করি সে আমারই বয়সী একটা বাচ্চা মেয়ে : ‘সুধা’। তারপর থেকে আশ্রমে আমাকে কেউ ‘রেবেকা’ নামে ডাকত না। ডাকত ওই পোয়েট টেগোরের দেওয়া নামে : ‘সুধা’।

পোয়েট টেগোর কে, কোন দেশের মানুষ তা আমার জানা ছিল না সেই সময়ে। পরে অবশ্য জেনেছি তিনি ভারতীয় এবং একজন নোবেল লরিয়েট।

মেয়েটি জানতে চায়, আপনি মায়ের সঙ্গে দেখা করবেন না?

—করব। নিশ্চয় করব। কিন্তু তার আগে একটা কাজের কথা বলে নিতে চাই, সুধা —

—‘সুধা’! আপনিও আমাকে ওই নামে ডাকছেন?

—তোমার আপত্তি আছে? তাহলে বল, কী নামে ডাকব? রেবেকা না অ্যালিসিয়া?

—না! আপনি ‘আওয়ার হোম’ থেকে আসছেন। আমাকে ‘সুধা’ নামেই ডাকবেন।
এবার বলুন—কী কাজের কথা বলতে চান?

—দেখ সুধা, তুমি যেভাবে তোমার বাবা-মা, ভাই বোনদের হারিয়েছ ঠিক সেভাবেই আমিও আমার নিকট আত্মীয়দের হারিয়েছি। তুমি যেমন ম্যানহোলের ভিতর আত্মগোপন করেছিলে, আমিও ঠিক সেভাবেই লুকিয়েছিলাম একটা ডাস্টবিনের ভিতর। আমি তোমার বড়দা—কী নাম যেন বললে তখন? জাখারি? হ্যাঁ প্রায় তারই বয়সী। সেই অধিকারে তোমাকে এটা দিচ্ছি : ধর।

ওয়ালেট বার করে এক গোছা ডয়েশমার্ক ওর দিকে বাড়িয়ে ধরি।

—আপনি যেভাবে বললেন, তাতে ওটা না নিয়ে আমি পারি না। কিন্তু তাহলে ছোটবোনের একটা আবদারও আপনাকে রাখতে হবে, দাদা—

—বল?

—আসছি এখনি—

ও চলে গেল পাশের ঘরে। একটু পরে ফিরে এসে আমার হাতে ধরিয়ে দিল একটা ভেলভেটের বাস্ম। খুলে দেখি তার ভিতর একটা দামী জড়োয়া ব্রোচ। অবাক হয়ে বলি, এটা কোথায় পেলে? আর এটা তোমার কাছে থাকা সত্ত্বেও কেন তুমি ইলেকট্রিক বিল মেটাতে পারনি? দেওয়ালঘড়িটা বেচে দিয়েছ?

সুধার নয়ন নত হলো। একটু ভেবে নিয়ে বললে, এটা বিক্রয় করে অর্থাৎ আপনি ‘আমাদের বাড়ি’ ফান্ডে জমা করে দেবেন। কেমন?

—তা না হয় দেব, কিন্তু এটা তো আমার প্রেমের জবাব নয়? কোথায় পেলে এটাকে? এতদিন বিক্রয় করনি কেন?

আগেই বলেছি, মেয়েটি অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। সুন্দর জবাব দিল সে। প্রথম কথা, ওর পক্ষে এটা স্যাকরার দোকানে বিক্রয় করতে যাওয়া বিপদজনক। শুধু ছিন্তাই হয়ে যাবার ভয়ে নয়, যেহেতু এর মালিকানা সে প্রমাণ করতে পারবে না, তাই ও চোরের দায়ে ধরা পড়ে যেতে পারে।

জিজ্ঞেস করি, তা এটা তুমি পেলে কোথায়?

সে-কথাও বুঝিয়ে বলে। এটা তাকে উপহার দিয়েছিলেন কার্লের মাসি। তিনি সেটা পেয়েছিলেন কার্লের কাছ থেকেই। ব্রোচটা ছিল তাঁর গচ্ছিত ধন। কার্ল বিয়ে করলে তার বউকে দিতেন। কিন্তু কার্ল তো যুদ্ধ থেকে ফিরেই এল না। তাই সেটা রেবেকাকে দিয়ে তিনি দায়মুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু রেবেকার ধারণা—এটি অপহৃত সম্পদ। ব্রোচের কাঁটায় বিঁধে আছে এক অভাগিনীর দীর্ঘশ্বাস। কোনো ইহুদি রমণিকে হত্যা করার পর সেটা নাৎসি গেস্টাপো দলের অধিকারে এসেছে। অ্যালিসিয়া বিশ্বাস করে না—কার্ল

নিজেই সেই ইহুদি রমণীকে হত্যা করেছিল। তার বিশ্বাস এটা ঘটনাচক্রে কার্লের অধিকারে এসে যায়। সে হয়তো গহনাটা নিয়ে এসেছিল তার গার্লফ্রেন্ড রোজেলিনাকে দেবে বলেই; কিন্তু তার আগেই রোজেলিনা হের ফ্রাঙ্কের সঙ্গে বেলজিয়ামে চলে যায়। তাই কার্ল ওটা মাসির কাছে গচ্ছিৎ রেখে যায়।

জানতে চাই, তুমি কেন ধরে নিলে যে, কার্ল নিজেই কোনো ইহুদি মেয়েকে হত্যা করে...

কথাটা ও আমাকে শেষ করতে দিল না। বললে, আমি শুধু ফোটা দেখেছি কিন্তু আপনি তো কার্লকে দেখেছেন—আপনি বিশ্বাস করতে পারেন, কার্ল এমন কাজ করতে পারে?

না। পারি না। কারণ তা পারলে একটা সব হারানো কিশোরী মেয়ের স্বপ্ন বোঝাই দ্বিতল বাড়িটা হ্যান্ড-গ্রেনেডে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে।

বরং বলি, গহনাটা তো এখন তোমার। চল, আমি তোমাকে স্যাকরার দোকানে নিয়ে যাব। তোমার তো অর্থের প্রচণ্ড প্রয়োজন।

একটু চুপ করে রইল তারপর বললে, আপনি এটা বিক্রয় করে দিন। আমাকে যা দিলেন তা বাদ দিয়ে বাকিটা আমাদের আশ্রম ফান্ডে জমা করে দেবেন। এ ব্রোচটা অভিশপ্ত। ওটা কোনোমতেই...

—বুঝেছি। তাই হবে। এবার তুমি ভিতরে গিয়ে ফ্রাউ ওজিলার্ডকে আমার কথা জানাও। আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করে যেতে চাই।

ও আমাকে অপেক্ষা করতে বলে ভিতরে গেল। খানিক পরে এসে বললে, আসুন।

কার্লকে যে অবস্থায় দেখেছিলাম ‘চিরশান্তি’ রাজ্যের দোরগোড়ায়, আজ তার মাকেও দেখলাম প্রায় সেই অবস্থায়। মৃত্যুশয্যায় শায়িত। তাঁরও আকর্ষণ একটি কন্সলে ঢাকা। তবে মুখটা দেখা যায়। ব্যান্ডেজ বাঁধা নয়। ঘাড় ঘোরাতে পারলেন। কথা বলতেও। আমাকে দেখে বললেন, এস বাবা! অ্যালিসিয়ার কাছে শুনলাম, তুমি নাকি ওয়ারস থেকে এতদূর এসেছ শুধু আমাদের সঙ্গে দেখা করতে?

বলি, না, মা। আমি নিজের নানান ধান্দায় ফ্রাঙ্কফুর্টে এসেছি। আমি ওয়ারসর কোরচখ-আশ্রমে কাজ করি। আপনি আমাদের যে চিঠি লিখেছিলেন...

উনি আমাকে বাধা দিয়ে বলেন, আমি? আমি তোমাদের চিঠি লিখেছিলাম? কবে? আমার কি চিঠি লেখার ক্ষমতা আছে?

আমি সুধার দিকে তাকাই। দেখি, সে নিজের মাথাটা দেখিয়ে চক্রাকারে আঙুলটা ঘোরাচ্ছে। অর্থাৎ বৃদ্ধামহিলার কিছুই মনে থাকে না। উনি যে আমাদের অনাথ আশ্রমবে একটি চিঠি লিখেছিলেন সে কথা বেমানুম ভুলে গেছেন।

আমি শুধরে নিয়ে বলি, আঞ্জেল, আমি এসেছিলাম কার্লের বিষয়ে আপনাকে দু-একটা তথ্য জানাতে...

উনি চমকে ওঠেন। বলেন, কার্ল? আমার ছেলে? কার্লের বিষয়ে কী কথা?

—আমার আশঙ্কা ছিল, জার্মান যুদ্ধমন্ত্রক হয়তো আপনাদের সবকথা জানায়নি। মানে, কার্ল কবে, কোথায়, কীভাবে...

উনি উত্তেজিতভাবে বললেন, ঠিকই বলেছ তুমি। ওয়র অফিস থেকে শুধু জানিয়েছিল শহিদদের তালিকায় তার নামটা আছে। ব্যস। কবে, কোথায়, কীভাবে...তা কিছুই জানায়নি। তুমি জানো? কেমন করে?

মৃত্যুর মহিমায় জাগতিক সত্য-মিথ্যা নাকি তাদের মূল্যবোধ হারায়।

অন্যায়সে বলি, আমি ছিলাম সেই হাসপাতালের অর্ডার্লি পিয়ন। শেষসময়ে আমি তার বেড-এর পাশেই ছিলাম। তার জ্ঞান ছিল। তবে যন্ত্রণা ছিল না। ডাক্তারবাবু তাকে কিছু ‘পেইন-কীলার’ ইনজেকশন দিয়েছিলেন।

বৃদ্ধা অনেকক্ষণ নিশ্চুপ তাকিয়ে রইলেন সিলিঙ-এর দিকে। তাঁর রোগজীর্ণ শীর্ণ গাল বেয়ে অশ্রুর ধারা নেমে আসছিল। অ্যালিসিয়া তা মুছে দিচ্ছিল, বারেবারে। শেষে বৃদ্ধা বললেন, একটা কথা বল তো বাবা : সত্যি করে বলবে : নাৎসি-গেস্টাপোর ছেলেগুলো ইহুদিদের উপর যে-সব অত্যাচার করেছিল বলে ইদানীং শুনছি — ওই বি. বি. সি. প্রচারে—তা কি সত্যি? না কি এ ওদের মিথ্যা প্রচার? যুদ্ধজয় করে ব্রিটিশ আর আমেরিকানরা এভাবেই প্রতিহিংসা চরিতার্থ করেছে?

কী জবাব দেব বুঝে উঠতে পারি না।

—অ্যালিসিয়াও বলে—ইহুদি বন্দিদের মাথা কামিয়ে সর্বসমক্ষে সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে...উফ!

অ্যালিসিয়া ওঁর কথার মাঝখানেই বলে ওঠে, না, না, মা! কার্ল যুদ্ধ করেছিল বটে, কিন্তু সে কখনো নিজে অমন অসভ্য বর্বরের মতো...

এবার বৃদ্ধাই তাকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দেন। বলেন, তুই চুপ কর, মুখপুড়ি। তুই কী জানিস? তুই কি যুদ্ধক্ষেত্রে ছিলি? ও ছিল। আমি ওর কাছে শুনতে চাই! বলো বাবা?

নতনয়নে বলি, আমিই বা সে-কথা কেমন করে জানব মা? আমার তো ডিউটি ছিল হাসপাতালে। যুদ্ধক্ষেত্রে কে কী করেছে তা তো আমি স্বচক্ষে দেখিনি!

না, মিথ্যা নয়! সত্যিই কার্লের কীর্তিকাহিনী আমি স্বচক্ষে দেখিনি। কিন্তু এটা কি হোল ট্রুথ? নাথিং বাট দ্যা ট্রুথ?

মৃত্যুপথযাত্রিণীর একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। আপন মনে যেন নিজেকেই সান্ত্বনা দেন: আমার বিশ্বাস হয় না। কার্ল এসব নৃশংসতায় নিজেকে জড়াতে পারে না। কিছুতেই না! আমি যে স্বচক্ষে দেখেছি...

একটু চুপ করে থাকেন। তারপর বলেন, ওর যখন মাত্র চার-বছর বয়স, ওর বাবা যখন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে আসেনি। তখন ও একঝাঁক শুঁয়োপোকা পুষতো! তাদের মার্গবেরি পাতা খাওয়াতো। আমরা মায়েপোয়ে তাদের কত যত্ন নিতাম। শুঁয়োপোকাগুলি তারপর হয়ে যেত প্রজাপতি—মনার্ক, এম্পারার, হলুদের ফুটি ফুটি দেওয়া একঝাঁক প্রজাপতি! কার্ল তাদের তখন খাঁচা খুলে উড়িয়ে দিত। আমাদের বলত, দেখ, দেখ মা! কী সুন্দর এক ঝাঁক প্রজাপতি! নীল আকাশের দিকে দল বেঁধে উড়ে যাচ্ছে...

আমি দু'চোখ বন্ধ করি। মনশ্চক্ষে দেখতে পাই : একটা বাচ্চা ছেলে বাটারফ্লাই নেট হাতে ফুলবাগানে ছোট্টাছুটি করছে...রঙ-বেরঙ প্রজাপতি ধরতে। তাদের গায়ে পিন ফুটিয়ে ওর কালেকশন বোর্ডে গুঁথে রাখছে! যারা উড়তে উড়তে নীল আকাশের দিকে যাচ্ছিল, তারা ঘুরতে ঘুরতে ফিরে আসে ওর বোর্ডে! বাটারফ্লাই কালেকটর্স সঙ্কলনে! ওর ট্রফি!

পিতৃ-আদেশ পালন করার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার! বন্দিজীবনের তিন্ত অভিজ্ঞতা সবিস্তারে লিপিবদ্ধ করেছিলাম। তাছাড়া আরও একটি কাজ করেছিলাম যুদ্ধান্তে। কয়েকজন বন্ধুর সহায়তায়, একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে। তাদের কাজ ছিল : যুদ্ধাপরাধী পলাতক বর্বরগুলোর সন্ধান সারা পৃথিবী দাবড়ে বেড়ানো। সেই নাৎসি বর্বরগুলোকে ধরে এনে আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের সামনে হাজির করা।

আমার স্মৃতিচারণ গ্রন্থটির বেশ কিছু কপি বিতরণ করেছিলাম বিশ্বের নানান জ্ঞানীগুণীদের মধ্যে। জানতে চেয়েছিলাম তাঁদের মতামত। আমি কি ভুল করেছি? অন্যায় করেছি? বাবা বলতেন : মৃত্যুতীর্থে যারা উপনীত সেই হতভাগ্যদের কাছে জাগতিক 'সত্য-মিথ্যা' তাদের প্রচলিত সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলে। সেই বিশ্বাসে আস্থা রেখেই সুধা বা কার্লের মাকে আমি আদ্যন্ত সত্য কথা বলিনি। কিন্তু কার্ল? তাকে ক্ষমা করতে না পারা কী আমার ব্যর্থতা? অন্যায়? অপরাধ?

জবাব যা পেয়েছি তাতে সমস্যার সমাধান হয়নি। আমার মন ভরেনি। আধাআধি জ্ঞানীগুণীরা আমাকে জবাবে জানিয়েছিলেন, আমি ঠিকই করেছি। বাকি অর্ধেকের মতে আমি অন্যায় করেছি। আপনারাও তো শুনলেন!

বলুন : এ বিষয়ে আপনারা কী বলেন?

[লেখকের প্রতিবেদন : যে মূল গ্রন্থটি অবলম্বনে বর্তমান লেখকের এই ‘হিন্দের বন্দী’ রচনার প্রচেষ্টা সেটার নাম: *The Sunflower*। সেটি 1976-এ প্রকাশিত। লেখক হাঙ্গেরিয়ান : সাইমন উইজেনহুস। ক্যালিফোর্নিয়ার ওয়ালনাট ক্রীকের অধিবাসিনী কল্যাণীয়া বসুধা সেনগুপ্তা সে বইয়ের যে কপিটি আমাকে উপহার দিয়েছিল (অগস্ট, 2002-তে) সেটি 1997-এর সংস্করণ। প্রকাশক জানাচ্ছেন যে লেখক তাঁর বইয়ের পাঁচশত কপি উপহার দিয়েছিলেন সারা বিশ্বের নানান জ্ঞানীগুণী পণ্ডিতকে। তাঁদের কাছে জানতে চেয়েছিলেন, মৃত্যুশয্যায় অনুতপ্ত জার্মান নাৎসি সৈন্যটিকে ক্ষমা করতে না পারা কি তাঁর ব্যর্থতা? অন্যায়? তাঁরা নিজেরা অনুরূপ অবস্থায় কী করতেন?

সেই সংস্করণে 53 জন মহাপণ্ডিতের মতামত সঙ্কলিত হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, ডীন, অধ্যাপক—বিভিন্ন ধর্মীয় নেতা (খ্রিস্টান, ইহুদি, মুসলমান ও হিন্দু, বৌদ্ধ—স্বয়ং দালাই লামা), বিভিন্ন দেশের চিন্তাবিদ—মার্কিন, ব্রিটিশ, ফরাসি, জার্মান, পোলিশ, চীনা, জাপানীর মতামত। গ্রন্থের ভূমিকায় অধ্যাপক Bonny V. Fetterman জানাচ্ছেন : যুদ্ধোত্তরকালে সাইমন উইজেনহুস একটি বিচিত্র প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। তার নাম : ‘Documentations zentrum’। তাদের মূল লক্ষ্য ছিল: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে যে সব নাৎসি তাদের অধিকৃত রাজ্যে অত্যাচার করেছে—ফিল্ডমার্শাল থেকে সাধারণ সৈনিক—তাদের তালিকা প্রস্তুত করা। তাদের অপরাধের যাবতীয় সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করা। এই প্রতিষ্ঠানের সংগ্রহ করা তথ্যে এগারো শ’ জন নাৎসি পলাতক যুদ্ধাপরাধীকে গ্রেপ্তার করা হয়। বিচারান্তে তাদের শাস্তিবিধান করেন আন্তর্জাতিক আদালত [*The Sunflower*, Schocken Books, N.Y. 1996, preface, p.x] বিশ্বের ষোলোটি বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সাম্মানিক ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত করে। পাঁচটি স্বাধীন রাষ্ট্র সে বছর তাঁকে বছরের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক হিসাবে পুরস্কৃত করে : গ্রেট ব্রিটেন, আমেরিকা, ইতালি, নেদারল্যান্ডস এবং ইজরেইল।

তা হোক, লেখক উত্থাপিত প্রশ্নের সমাধান কিন্তু হয়নি। আজও পৃথিবীতে ধর্মের জিগির তুলে, যুদ্ধান্ত্র-ব্যবসায়ী একদল প্রভাবশালী ব্যক্তি নাৎসিবাদের সমান্তরালে চিন্তাধারা চালিয়ে যাচ্ছে। সারা বিশ্বের শান্তিকামী সাধারণ মানুষ—নিউইয়র্ক থেকে কলকাতায়—যুদ্ধবিরোধী স্লোগান দিচ্ছে।

আমি-আপনি কি সে দলে সামিল হব না? নীরব দর্শক হয়েই থাকব?

কোরচখ-ডাকঘরের সন্ধানে

শেষ পর্ব

স্টেফানিয়া বিলৎজিন্সকা (Stefania Wilczynska)

ডক্টর জনসনকে বসওয়েল-সাহেব যত ঘনিষ্ঠভাবে চিনতেন তার চেয়ে অনেক অনেক ঘনিষ্ঠভাবে আমি চিনতাম ডক্টর জানুস কোরচখকে। স্কটিশ জীবনীকার জেমস বসওয়েল তো ডক্টর জনসনের সঙ্গে বছরের পর বছর এক ছাদের নিচে বসবাস করেননি; একই ঘরে রাত্রিবাসও করেননি। আমি কাটিয়েছি। ভুল বুঝবেন না—এক বিছানায় বলিনি। একই ঘরে। যখন আশ্রমের ভাঙাচোরা হচ্ছিল। স্থানাভাবে আমরা একই রুদ্ধদ্বার কক্ষে বাস করতে বাধ্য হয়েছি। কিন্তু বসওয়েলের মতো ডক্টর কোরচখের জীবনী আমি লিখতে পারিনি। সে ক্ষমতাই আমার ছিল না। থাকলে ডক্টর কোরচখ হয়তো নোবেল-লরিয়েট হয়ে যেতেন। তাতে অবশ্য ক্ষতি হয়নি কিছু—এম. কে. গান্ধী বা কাউন্ট টলস্টয়ও তো তা হননি। কিন্তু তাঁরা বিশ্ববিখ্যাত। ‘কোরচখ’ একটা অজানা নাম!

তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাতটা নাটকীয়। নিতান্ত ঘটনাচক্রে তাঁর সান্নিধ্যে এসে পড়ি। কিন্তু তাঁর অমোঘ আকর্ষণে চুম্বকের কাছাকাছি এসে পড়া লৌহখণ্ডের মতো সারা জীবনটা তাঁর সঙ্গে কাটিয়ে গেছি। অমন অদ্ভুত মানুষকে শ্রদ্ধা না করে, না ভালোবেসে থাকা যায় না। শিশুর মতো সরল, কৌতুকপ্রিয় অথচ বজ্রকঠিন ব্যক্তিত্ব। অন্যায়ের সঙ্গে, মিথ্যার সঙ্গে সারাজীবনে কখনো আপোস করেননি।

কিন্তু তার আগে নিজের সামান্য পরিচয় দেওয়া দরকার। আমার জন্ম ওয়ারস (Warsaw) শহরের উপকণ্ঠে। মাইল-ত্রিশ দূরের একটা উপনগরীতে। শৈশবেই আমি অনাথ। তাই পিতৃমাতৃহীন শিশুদের মানসিক যন্ত্রণাটা জীবন দিয়ে বুঝতে পারতাম। মানুষ হয়েছি একটি ইহুদি প্রতিষ্ঠানের বদান্যতায়। আমি খ্রিস্টান নই—ইহুদি। ছাত্রী ছিলাম ভালই। স্কুল-লীভিং পরীক্ষায় কাউন্টির মধ্যে প্রথম হয়ে স্কলারশিপ পাই। পড়তে আসি ওয়ারস কলেজে, ‘সোশালিজমে’ ছিল আমার মেজর। স্নাতক হবার পর পড়াশুনায়ে ক্ষান্ত দিয়ে চাকরি জুটিয়ে নিই। থাকতাম একটা ‘ওয়ার্কিং গার্লস্ হস্টেলে’। আমার রুমমেট একজন শ্রোটা নার্স। হাসপাতালে চাকরি করতে যেতেন। কনফার্মড স্পিনস্টার। আমরা পরস্পরকে ডাকতাম : ‘মেইন ফ্রয়েনডিন’ (Mein Freundin), বাংলা অনুবাদে : ‘সখী’ বা ‘বান্ধবী’।

চাকরিতে যোগ দেবার মাস ছয়েক পরে আমার একটা উটকো বিপদ হলো। হঠাৎ আমার শারীরিক চক্রাবর্তন ছন্দটা কি জানি কেন বন্ধ হয়ে গেল। পর পর দু-মাস। ঘাবড়ে গিয়ে ফ্রয়েনডিনকে খুলে বললাম সমস্যাটার কথা। উনি আমাকে আশ্বস্ত করে বললেন,

ঘাবড়াসনে স্টেফা! এমন উটকো বিপদ যেকোনো মেয়ের জীবনে আসতেই পারে। আমি ডাক্তারবাবুকে বলব। মাত্র দু-মাস বন্ধ আছে বললি তো? সহজেই খালাস হয়ে যাবি।

চমকে উঠে বলি, খালাস হয়ে যাব মানে? আমার কী হয়েছে?

—কী হয়েছে তা তুইও বুঝছিস, আমিও বুঝছি। তোর বয়-ফ্রেন্ডকে ব্যাপারটা জানিয়েছিস? সে কি দায়িত্ব এড়াতে চাইছে?

আমি বলি, এসব কী বলছ? তুমি যা ভাবছ আমার তেমন কিছু হয়নি। আমার কোন বয়-ফ্রেন্ডই নেই।

ও বলে, ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমাকে বলতে না চাস বলিসনে; কিন্তু ডাক্তারের কাছে কিছু গোপন করিস না। সেটা হবে চরম মূর্খামি।

নিয়ে গেল ওদের হাসপাতালে। ডাক্তারবাবু জেনারল প্র্যাকটিশনার। সে আমলে ওয়ারসতে ‘গাইনকলজিস্ট’ হয়তো কেউ ছিলই না। উনি ওঁর চেম্বারে আমাকে পরীক্ষা করলেন। পোশাকের উপর দিয়েই পেটটা টিপে টিপে দেখলেন। কয় মাস বন্ধ আছে জেনে নিলেন। জানতে চাইলেন বমনের বেগ হয় কি না, আহারে অরুচি হয়েছে কি না। ‘টক’ স্বাদ পছন্দ হয় কি না, ইত্যাদি। প্রশ্নের ধরন দেখে আমি বলে উঠি, লুক হিয়ার ডক্টর, আমি আদৌ ‘কনসিভ’ করিনি। আমার অন্য কোনো রোগ হয়েছে।

উনি গম্ভীর হয়ে বললেন, তুমি কী করে জানলে যে, তুমি কনসিভ করনি?

—সহজেই। যেহেতু আমার সঙ্গে কোনো পুরুষের সে জাতীয় ঘনিষ্ঠতা হয়নি।

উনি আরও গম্ভীর হয়ে বলেন, আমি তো তোমার বয়-ফ্রেন্ডের নাম জানতে চাইছি না। কিন্তু ব্যাপারটা আমার কাছ থেকে গোপন করে তুমি ভাল করছ না, মা!

—কী আশ্চর্য! কী গোপন করছি আমি?

—তোমার বয়-ফ্রেন্ডের অস্তিত্বটা! নামধাম নয়।

—আমার কোনো ‘বয়-ফ্রেন্ড’ নেই।

—তুমি কি বলতে চাও, এটা একটা রেপ-কেস?

—আজ্ঞে না। তেমন কোনো ঘটনাও ঘটেনি আমার জীবনে। বিশ্বাস করুন।

—কেমন করে করব, মা? তুমি যে গোটা চিকিৎসা-বিজ্ঞানটাকেই নস্যাৎ করতে চাইছ। বিজ্ঞান ‘ইম্যাকুলেট-কনসেপশনে’ বিশ্বাস করে না।

আমি উঠে দাঁড়াই। প্রশ্ন করি, আপনার ফী কত?

—না, মা। ফীজ তোমাকে দিতে হবে না। আমি তো তোমার চিকিৎসা করিনি। করব না। কিন্তু এটা তুমি ভাল করলে না।

ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এসেছিলাম তাঁর চেম্বার থেকে।

এ কী বিপদে পড়া গেল! হঠাৎ মনে পড়ে গেল, ওয়ারস রেডিও স্টেশন থেকে

এক বৃদ্ধ ডাক্তারের ‘মাতৃমঙ্গল’ প্রোগ্রাম হয়। প্রোগ্রামটার নাম : বদ্যবুড়োর আসর। বক্তা: ‘ওল্ড ডক’। খোঁজ নিতে গিয়ে জানতে পারি—ওয়ারসর চিকিৎসা-ভগতে তিনিই একমাত্র ‘গাইনকলজিস্ট’ এবং ‘পেডিয়াট্রিশিয়ান’। টেলিফোন ডাইরেক্টরি ঘেঁটে তাঁর পাতা পেলাম : ডক্টর জানুস কোরচখ। চেম্বারের ঠিকানাও পাওয়া গেল। শহরের কেন্দ্রস্থলে, সেন্ট্রাল প্লাজার কাছাকাছি; ফ্রোচমালনা স্ট্রিটে। পরদিনই ছুটি নিয়ে ছুটি তাঁর চেম্বারে। ‘বদ্যবুড়োর আসর’ প্রোগ্রামটা আমি প্রতি সপ্তাহে শুনতাম। মেয়েদের অনেক ভাল ভাল পরামর্শ দেন। আসন্ন ভ্রমণীদের, সদা সন্তানবতীদের, কুমারী মেয়েদের। এ ছাড়া বাচ্চা মানুষ করার নানান উপদেশ। কখনো বা যারা মেনোপজের দোরগোড়ায় এসে পৌঁছেছে, তাদের। এই বদ্যবুড়োই হয়তো ধরতে পারবেন আমার কী হয়েছে। আর বুড়ো-মানুষকে অনেক কিছু খুলে বলা সহজ।

স্ট্রিট-কার থেকে নেমে কিছুটা হাঁটতেই পেয়ে গেলাম বিরানবই নম্বর ফ্রোচমালনা স্ট্রিটের বাড়িটা। একতলা বাড়ি। দোতলায় মিস্ট্রি কাজ করছে। বাড়িটা উচ্চাভিলাষী। দোতলা হবে। সদর দরজার সামনে টুলের উপর বসে আছে একটা বাচ্চা ছেলে, বছর সাত-আট। সাজ-পোশাক শাস্ত্রীর। কাঁধে ঝুলছে একটা মিনি-রাইফেল। লোহার নয়, কাঠের। খেলনা বন্দুক।

আমাকে দেখেই সে তড়াক করে উঠে দাঁড়াল। মিলিটারি স্যালুট দিয়ে বললে, ডক্টর কোরচখকে খুঁজছেন নিশ্চয়? আসুন আমার পিছু পিছু—

বলি, দেখি তোমার কাঁধের বন্দুকটা?

ত্রিং করে লাফ মেরে দূরে সরে যায়। বলে, উইঁহু। ওতে হাত দেওয়া চলবে না। ওটা লোডেড। আনাড়ি হাতে ফায়ার হয়ে যেতে পারে।

আমাকে পৌঁছে দিল ডাক্তারবাবুর চেম্বারে। পর্দা সরিয়ে দেখি ভিতরে একটা টেবিলের ও-পাশে বসে আছেন একজন ভদ্রলোক। পঁয়ত্রিশ-চল্লিশ বছর বয়স হবে। বুঝি, ইনি বদ্যবুড়ো নন, তাঁর সহকারী। জানতে চাই, ডক্টর কোরচখ আছেন? মানে, ইয়ে...‘বদ্যবুড়ো’?

ভদ্রলোক একটা লাইনটানা জাবদা-খাতায় কী-য়েন লিখে চলেছেন। কলমে বা ফাউন্টেন পেন-এ নয়, পেনসিলে। দূর থেকে কিছু কিছু নজর হচ্ছিল। উনি বাঁ-হাতটা তুলে আমাকে গোল করতে বারণ করলেন। একমনে লিখেই চলেছেন। কালো ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, মাথার চুলগুলো ব্যাকব্রাশ করা। চোখে চশমা নেই। ঢালশে ধরেনি এখনো। কেমন যেন তন্ময় ভাব। ঝুঁকে পড়ে দেখতে গেলাম—কী ভাষায় লিখছেন। মালুম হলো না। পোলিশ বা জার্মান নয়। হরফগুলো অপরিচিত। আরবি, ফারসি, অথবা উর্দু হতে পারে। মনে আশঙ্কা জাগে, ডক্টর কোরচখের এই সেক্রেটারি ভদ্রলোক পোলিশ ভাষা বোঝেন তো? নিশ্চয় বোঝেন। না হলে বদ্যবুড়োর সেক্রেটারির চাকরি করা সম্ভব নয়। আবার

তাগাদা দিই, এককিউজ মি স্যার, ডক্টর কোরচখকে একটু খবরটা দিয়ে আসবেন কাইন্ডলি?
এবার পেনসিলটা নামিয়ে রেখে বলেন, হ্যাঁ বলুন? কী কষ্ট হচ্ছে আপনার?
বিরক্ত হয়ে বলি, সেটা ডাক্তারবাবুকেই বলব। তিনি কি আছেন ভিতরে?
উনি উঠে দাঁড়ান। বলেন, বুঝলাম। আপনি ‘বদ্যিবুড়ো’কে খুঁজছেন। আমার
মতো চ্যাণ্ডাকে কিছু বলবেন না। অল রাইট, তাঁকে ডেকে আনি।

পাশের ঘরে চলে গেলেন। একটু পরেই ফিরে এলেন গায়ে একটা সাদা ডাক্তারি-
অ্যাপ্রন জড়িয়ে। আবার নিজের চেয়ারে বসে বললেন, এবার বলুন।

—আপনিই বদ্যিবুড়ো? বদ্যিবুড়ো বুড়ো নন?

—কে বলল বুড়ো নন? তবে দেখে ঠিক বোঝা যায় না। আমার বয়সের গাছ-
পাথর নেই! আমি ‘ডোরিয়ান গ্রে’-র মতো। চেনেন তাকে?

—না! কে ডোরিয়ান গ্রে?

—লুক হিয়ার ইয়াং লেডি! তুমি আমার বয়স নিয়ে গবেষণা করতে এই
ডাক্তারখানায় আসনি। ‘ডোরিয়ান গ্রে’-র প্রসঙ্গ থাক। তোমার কথা বল বরং। তোমার
নাম, ধাম, বয়স, পার্মানেন্ট অ্যাড্রেস, এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন, ম্যারিটাল স্টেটাস...

ও লর্ড! ও কি পাত্রী খুঁজছে নাকি! রাগ করে বলি, আমি যেমন আপনার বয়স
যাচাই করতে আসিনি, তেমন চাকরির খোঁজেও আসিনি। অসুস্থ হয়ে ডাক্তার দেখাতে
এসেছি। আমার শিক্ষাগত যোগ্যতার কথা জানতে চাইছেন কেন?

—‘কেস-হিস্ট্রি’টা পুরো সমঝে নিতে। তুমি শিক্ষিতা কি আনপড় না জানলে
আমি কী ভাষায় কথা বলব? আমি যদি বলি, তোমার ‘ডুয়োডেনালে’ একটা
‘ডিফারেনশিয়াল ক্যালকুলাসের ট্র্যাংগুলেশন’ হয়েছে—তাহলে তুমি বুঝতে পারবে?

—পারব! বুঝব যে, আপনি একজন ‘কোয়াক’। হাতুড়ে ডাক্তার! আপনি কিছু
গালভারি শব্দই শুধু জানেন, অথচ জানেন না যে, ‘ডিফারেনশিয়াল ক্যালকুলাস’ এক
জাতের অঙ্ক। তা কোনো রোগীর বৃহদস্ত্রে গিয়ে জট পাকাতে পারে না।

এবার উনি হেসে বলেন, ওয়ান্ডারফুল! এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশনটা না
জানলেও চলবে। তোমার শারীরিক অসুবিধার কথাই বল শুধু।

—বলছি। তার আগে আমাকে দয়া করে বলুন, ওই খাতাটায় আপনি কী ভাষায়
লিখছিলেন এতক্ষণ?

একবার খোলা খাতা একবার আমার মুখের দিকে তাকিয়ে উনি বললেন, শর্ট-
হ্যান্ড।

—শর্ট-হ্যান্ড! সে তো স্টেনোরা লেখে! ডাক্তারে শর্ট-হ্যান্ডে লেখে? কেন?

—আপত্তি কিসের? মেয়েরা দাড়ি কামাতে পারে না বলে ডাক্তার শর্ট-হ্যান্ড

লিখতে পারবে না? কী জান ইয়াং লেডি,—আমি ডাক্তারি করি আবার বাচ্চাদের জন্য বই-টাইও লিখি। মাথায় আইডিয়াগুলো যত ছড়মুড়িয়ে আসে, লং-হ্যান্ডে অত তাড়াতাড়ি লেখা যায় না। তাই শর্ট-হ্যান্ডটা শিখে ফেলেছি। সময়মতো তাই দেখে টাইপড্ কপি তৈরি করে নিই। কিন্তু দেখ, সময়ের দাম তোমারও আছে, আমারও আছে। এবার বরং খোশ গল্প থামিয়ে তোমার রোগের কথা বল।

সবকথা খুলে বলি। নাম, ধাম, বয়স জানিয়ে। আমার রোগের উপসর্গের কথাও। পূর্ববর্তী ডাক্তারবাবুর সঙ্গে যেসব কথাবার্তা হয়েছে তাও।

উনি চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলেন। বলেন, তুমি বলছ আগের ডাক্তারবাবু আন্দাজ করেছিলেন যে, তুমি ‘মা’ হতে চলেছ। অথচ তুমি বলছ তোমার কোনো বয়স্ফ্রেণ্ড নেই। সমস্যাটা তো এখানেই? তা হোটেলের কি তুমি সিঙ্গল বেড-রুমে থাক?

—না, ডবল বেড-রুম। ওটা হোটেল নয়, ওয়ার্কিং গার্লস হোস্টেল। আমার রুমমেট একজন শ্রৌটা মহিলা নার্স।

—আই সী! না, তাঁর পক্ষে তোমাকে এভাবে অসুস্থ করা সম্ভবপর নয়।

আমি ধমকে উঠি, আপনিও সেই আগের ডাক্তারবাবুর মতো একটা পূর্বধারণা নিয়ে আমার চিকিৎসা করতে বসেছেন। আমি গর্ভিণী হইনি। হওয়া অসম্ভব। কারণ কোনো পুরুষের সঙ্গে আমার তেমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হয়নি। আপনি কি অনুগ্রহ করে আমাকে পরীক্ষা করে দেখাবেন?

—আলবাৎ! সেটাই তো আমার কাজ।

টানা-ড্রয়ার থেকে একটা হুইসল বার করে উনি সেটা বাজিয়ে দিলেন। গেট ছেড়ে সেই বন্দুকধারী বাচ্চা-সেপাই ছুটে এল। মিলিটারি স্যালুট দিয়ে বললে, ইয়েস ড্যাড?

ড্যাড! বাচ্চাটা তাহলে ওঁরই সন্তান! ভারি ফুটফুটে। বোধকরি ওর মাও খুব সুন্দরী। ডাক্তারবাবুর মাথার চুল কালো, বাচ্চাটার চুল সোনালী। বোধহয় ফ্রাউ কোরচখ একজন ব্লন্ড।

—পাগলা! তুই একবার ভিতরে যা। তোর মাসি বোধহয় রান্না করছে। তাকে ডাক্তার-খানায় চলে আসতে বল।

বাচ্চাটার মাসি, মানে বদিবুড়োর শালী। সে তার দিদির বাড়িতে থাকে তাহলে? একটু পরেই মেয়েটি এসে গেল। আমারই বয়সী। বলল, ডেকেছ ড্যাড?

এবারও ড্যাড! বদিবুড়োর বয়স তাহলে সত্যি কত? ওই বাইশ-চব্বিশ বছরের মেয়েটির পিতৃহের অধিকারী হতে হলে ওঁর বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। অথচ মনে হচ্ছে চল্লিশের নিচে।

—ভেনি, এই পেশেন্টটিকে একডামিনেশন চেম্বারে নিয়ে যা। আমি আসছি —

একটু পরেই উনি এলেন। আমি ততক্ষণে প্যান্টি খুলে অপারেশন টেবিলে শুয়ে পড়েছি। চিং হয়ে। পায়ের দিকে একটা জোরালো বিজলিবাতি জ্বলে উঠল। জেনি বলে, এবার আমি রান্না করতে যাই, ড্যাড?

বদিবুড়ো প্রচণ্ড ধমক দিয়ে ওঠেন, তোর মাথায় কি গোবর পোরা? সেদিন কী শেখালাম তোকে?

—ও হ্যাঁ, হ্যাঁ! মনে পড়েছে। আমাকে তো এখন এখানে থাকতে হবে।

বুঝতে পারি, শালীনতার খাতিরের তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি ছাড়া উনি কোনো রোগিণীকে পরীক্ষা করেন না।

গাউনটা উঠিয়ে দিয়ে গ্লাভস্পরা হাতে একটা ছোট ফরসেপ তুলে নিয়ে উনি ঝুঁকে পড়লেন। আমি দু-হাতে মুখ ঢাকি। শেষবকালের কথা জানি না, কিন্তু জ্ঞানবুদ্ধি হবার পর কোনো পুরুষমানুষ এভাবে—

তিন-চার মিনিটের বিড়ম্বনা। তারপর আমাকে বললেন, পরীক্ষা হয়ে গেছে। তুমি এস—আমি চেম্বারে গিয়ে বসছি।

জেনি রান্না করতে চলে গেল। আমি প্যান্টিটা পরে চেম্বারে ফিরে এসে ওঁর দর্শনাথীর চেয়ারে বসলাম। জানতে চাই, কী বুঝলেন?

—সবটা এখনো বোঝা যায়নি। তুমি বলছ যে, তোমার কোনো বয়ফ্রেন্ড নেই। কারও সঙ্গে সাম্প্রতিককালে ডেটিং করনি। ও. কে.! তার আগে কি ছিল? কোনো পুরুষ বন্ধু? বয়ফ্রেন্ড? আগে কারও সঙ্গে ‘ডেটিং’ করেছ?

—নো, স্যার! কোনো কালেই আমার কোনো বয়ফ্রেন্ড ছিল না। আয়াম এ ভার্জিন ইয়েট।

—নো, ইয়াং লেডি! ইউ আর নট!

—ইউ আর নট? মানে? কী নই আমি?

—এ ভার্জিন।

চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ি। ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে বলি, আপনার ফীজ কত?

উনি বলেন, আরে বস, বস! কথায়-কথায় অত ক্ষেপে ওঠ কেন? আমি তো তোমার বিরুদ্ধে কিছু খারাপ কথা বলিনি। এটা একটা ডাক্তারী আলোচনা—অ্যাকাডেমিক ডিসকাশন। অবিবাহিতা ছেলেমেয়েরা ডেটিং করে থাকে। সেটা একটা প্রচলিত সামাজিক প্রথা। অবিবাহিতা সব মেয়াকেই যে ‘ভার্জিন’ থাকতে হবে এমন কোনো কথা নেই?

—কী করে আপনি আমার ব্যাপারটা জানলেন?

—তোমাকে পরীক্ষা করে। আচ্ছা বল তো তুমি কখনো হাই জাম্প প্র্যাকটিস করেছ? কোনো আউট-ডোর গেমস্ খেলতে কখনো?

—বাস্কেট বলে আমি কলেজ-টিমে খেলতাম।

—তাই বল! তা সেকথা এতক্ষণ বলনি কেন?

অবাক হয়ে বলি, বাস্কেট বল খেলার সঙ্গে আমার অসুখের কী সম্পর্ক?

—অসুখের নয়। অন্য কিছুর। সে-যা হোক। এখন ব্যাপারটা মোটামুটি বোঝা গেছে। শোন, তোমার স্বাভাবিক চক্রাবর্তন ছন্দে এই যে গোলমালটা হয়েছে এর মূল কারণ দু-জাতের হতে পারে—শারীরিক অথবা মানসিক। শারীরিক কোনো কারণ আমার নজরে পড়ছে না। হয়তো হেঁতুটা মানসিক। এক কোর্স ওষুধ খেলেই আশা করি তোমার চক্রাবর্তন ছন্দ ফিরে আসবে। কিন্তু সেটা সাময়িক নিরাময়। যে কারণে রোগটা হয়েছিল সেই মূল কারণটা দূরীভূত না হলে এমন 'ইররেগুলারিটি' আবারও হতে পারে—

—আপনি আমাকে কী পরামর্শ দেন?

—আমি কী পরামর্শ দেব? তুমি নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করে দেখ। তোমার বয়সী একটি সুশিক্ষিতা 'প্রিটি গার্ল'-এর বয়ফ্রেন্ড হয়নি কেন? হয় না কেন? হয়তো তোমার মনের কোনো অবদমিত ইচ্ছে...

আমি ওঁকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বলি, বুঝেছি। আমি চেষ্টা করে দেখব। আপাতত কী ওষুধ দেবেন দিন।

উনি আমাকে সাতদিনের ওষুধ দিলেন। ফীজ নিলেন না। বললেন, পরের সপ্তাহে আবার রিপোর্ট করতে। তখন ফীজ নেবেন।

পরের সপ্তাহে আবার গিয়ে দেখা করি, বলি, আমি স্বাভাবিক ছন্দটা ফিরে পেয়েছি। ধন্যবাদ। এবার বলুন কী দেব?

উনি বলেন, কিন্তু আমি তোমাকে কী বলেছিলাম? এটা সাময়িক নিরাময়। পার্মানেন্ট সমাধানের কথা কিছু ভেবেছ? বয়ফ্রেন্ড?

বলি, ওটা কি স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সুপারমার্কেটে কিনতে পাওয়া যায়? দেখি চেষ্টা করে।

উনি বললেন, ঠিক আছে। সে সমস্যা তোমার। ধীরে ধীরে তার সমাধান করে ফেল। ...ভাল কথা, তুমি নিজে তো ইহুদি, অফ্রানিজ থেকে মানুষ হয়েছে বললে, তোমার জানাশোনা কোনো ইহুদি বেকার মেয়ে আছে? এই তোমার বয়সী? অন্তত স্কুলের শেষধাপ পার হয়েছে?

জানতে চাই, কেন বলুন তো?

আমার বাচ্চাগুলোকে একটু লেখাপড়া শেখাবে।

—আপনার বাচ্চাগুলো? কটা বাচ্চা আপনার?

—এখন আছে সাতজন। আরও দুজন এমাসেই আসবে।

আমি বোকার মতো তাকিয়ে থাকি দেখে উনি সব কিছু বুঝিয়ে বললেন। এটা

একটা ‘অনাথ আশ্রম’—Our Home। নিরাশ্রয় ইহুদি বাচ্চাদের। বাড়িটা ওঁর পৈত্রিক। আশ্রমটা উনি একাই গড়ে তুলেছেন কিছু দানশীল ব্যক্তির বদান্যতায়। আপাতত সাতটি অনাথ আছে। ছয়জনই বালক-বালিকা; শুধু জেনি আমার বয়সী। কিন্তু সে লেখাপড়া জানে না। উনি সারাদিন ডাক্তারি করেন, চাঁদা তোলেন, বাচ্চাদের পড়ানোর সময় পান না।

জিজ্ঞেস করি, আপনি অনাথ বেকার ইহুদি মেয়ে খুঁজছেন কেন?

স্নান হাসলেন। সে হাসি বিষম। বলেন, জানি এটা অন্যায় সুযোগ নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু কী করব বল? মাইনে দিয়ে টীচার রাখার মতো সঙ্গতি এখন আমার নেই—দোতলাটা বানাতে হচ্ছে তো? হয়তো কিছুদিন পরে সে আর্থিক ক্ষমতা আমার হবে। কিন্তু ততদিনে বাচ্চাগুলোও যে বড় হয়ে যাবে। কোন একটি মধ্যশিক্ষিতা বেকার ইহুদি মেয়ে হলে তার আশ্রয় ও ভরণপোষণের বিনিময়ে হয়তো... বুঝতেই পারছ...

বলি, ফ্রাউ কোরচখ সেটা পারেন না? বাচ্চাদের পড়াতে?

—ফ্রাউ কোরচখ? মানে আমার স্ত্রী? ও, না না, আমি একজন কনফার্মড ব্যাচেলর। আমার ঘর-সংসার সামাল দেয় ওই জেনি। ভা—রি ভাল মেয়েটা।

আমি রীতিমতো অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। উনি একজন লক্ষপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক, এতবড় বাড়িটা পেয়েছেন পৈত্রিক সম্পত্তি হিসাবে। অথচ উনি পরোপকারী সন্ন্যাসীর জীবন বেছে নিয়েছেন। অভিভূত না হয়ে পারি না। জানতে চাই, ‘জুইশ চ্যারিটেব্ল্ ফাউন্ডেশন’ থেকে আর্থিক সাহায্য পান না?

উনি হেসে বললেন, না। সে দোষটা আমার। সম্পূর্ণ আমার। আমি তো ইহুদি নই। তাই...

—আপনি ইহুদি নন? খ্রিস্চিয়ান?

—না গো। আমার বাবা খ্রিস্টান ছিলেন। জন্মসূত্রে আমাকে তাই বলে ধরে নেওয়া হয়। কিন্তু আমি নিজেকে খ্রিস্টধর্মের লোক বলে মনে করি না। ভ্যাটিকানের পোপ যা বলবেন, তাই নির্বিচারে মেনে নিতে আমি রাজি নই।

—তাহলে আপনার ধর্ম কী?

—মানবতা। আমি বিশ্বাস করি না যে, মোজেস -এর আদেশে সমুদ্র দু-ফাঁক হয়ে যেতে পারে, অথবা যীশুর স্পর্শে কোনো কুষ্ঠরোগী আরোগ্য লাভ করতে পারে। তবে ওই দুজনকেই মহামানব হিসাবে আমি শ্রদ্ধা করি।

মনে হলো, উনি যেন আমার মনের কথাটাই বলছেন। সিনাগগে গিয়ে আদোনাই-এর মহিমনগাথা গাইতে আমার ভাল লাগে না। মনে হয় : এই বিশ্বপ্রপঞ্চের যিনি মালিক তিনি তো উদাসীন—ভক্তদলের তোয়ামুদির কি তিনি তোয়াক্কা রাখেন? পার্থিব রাজ-উজিরের মতো? শুনলাম, ওঁর বাবাও ছিলেন ওয়ারসর একজন বড় ডাক্তার। বাবার

সমস্ত সম্পত্তিই উনি পেয়েছেন। ‘ওল্ড ডক’ ছিলেন তাঁর একমাত্র সন্তান। যে সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছেন আর যা নিজে রোজগার করেন সব কিছু খরচ করেন এই ‘আওয়ার হোম’-এ। অথচ কী আশ্চর্য! যেহেতু তিনি ধর্মে ইহুদি নন, তাই ‘জুইশ চ্যারিটেব্ল ফাউন্ডেশন’ গুঁকে অর্থসাহায্য করতে রাজি হয়নি।

বলি, এক কাজ করা যাক। যতদিন না আপনি একজন টীচার যোগাড় করতে পারছেন, ততদিন আমি অফিস ফেরত সরাসরি ‘আওয়ার-হোম’-এই চলে আসব। বাচ্চাদের ক্লাস নেব। অবৈতনিক শিক্ষিকা। তারপর রাতে ফিরে যাব আমার হস্টেলে।

—সো কাইন্ড অব ইউ। তবে এক শর্তে। বাচ্চাদের ক্লাস নেওয়া হয়ে গেলে এখানেই তোমাকে ডিনার সেরে যেতে হবে। খাবার টেবিলে আমরা আশ্রমের সম্বন্ধে আলোচনা করতে পারব।

হপ্তা-তিনেক এভাবেই চলল। ছুটির দিনে ব্রেকফাস্ট সেরে আশ্রমে চলে আসতাম। বাচ্চাদের ক্লাস নিতাম দুপুর বেলায়। এখানেই লাঞ্চ সারতাম। ক্রমে ক্রমে আশ্রমের সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে থাকি।

মাসখানেক পরে উনি বললেন, তুমি এক কার্জ কর, স্টেফা। হস্টেলের বেডটা ছেড়ে দাও। তাতে তোমারও কিছু আর্থিক সাশ্রয় হবে। আর আশ্রমও তোমার সাহায্য বেশি করে পাবে। এখান থেকেই তুমি চাকরি করতে যেও।

অগত্যা তাই। ইতিমধ্যে দোতলাটা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আরও দু-তিনটি অনাথ ইহুদি এসে যোগ দিয়েছে আশ্রমে। কয়েক সপ্তাহ পরে গুঁকে বলি, দেখুন ডক্, আপনার আশ্রিতের সংখ্যা এখন দশ হয়ে গেছে। ওদের বয়সের বেশ পার্থক্য আছে। সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে ক্লাস করা উচিত হচ্ছে না। ওদের অন্তত দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা দরকার। একটি সিনিয়ার, একটি জুনিয়ার। আপনি যদি নতুন টীচার নিতে না পারেন, তাহলে একটা ক্লাস আপনাকেই নিতে হবে।

উনি বলেন, আমার সময় কোথায়? নিজের ডাক্তারি আছে, বাড়ি তৈরির দেখাশোনা আছে, তার উপর আশ্রমের জন্য চাঁদা তুলে বেড়াতে হয়। আমি তো ক্লাস নেবার সময় পাব না।

—সে ক্ষেত্রে আমি ওই চাকরিটা ছেড়ে দিই বরং। এখানেই পাকাপাকিভাবে ডেরাডাঙা গাড়ি। যেমন আছি তেমনিই থাকব, জেনির সঙ্গে। আপনার সেক্রেটারির কাজও করব। আর দুপুরে বড়দের, সন্ধ্যায় ছোটদের ক্লাস নেব।

উনি চমকে উঠে বলেন, চাকরি ছেড়ে দেবে? সে কি! আমি তো...

—জানি! আমি এখানে অবৈতনিক কাজ করব। আপনি তো একজন বেকার, ইহুদি অরফানই খুঁজছিলেন। আমি ইহুদি এবং অনাথ, চাকরিতে ইস্তফা দেওয়ামাত্র হয়ে যাব বেকার।

ওঁর কথাটা পছন্দ হলো না। নীরবে কিছুক্ষণ মাথা নেড়ে বললেন, কাজটা তুমি ঠিক করছ না, স্টেফা। এ বাজারে আবার চাকরি জোটানো খুব মুশকিল!

—জানি। কিন্তু চাকরি করি কেন? নিরাপত্তা, আশ্রয় আর উদরপূর্তির জন্যই তো? তাই না?

—না! তোমার সামনে দীর্ঘ জীবন পড়ে আছে। নিজের সঞ্চয় না থাকলে... এটা তোমার হঠকারিতা হয়ে যাবে...

—আপনার সামনেও তো পড়ে আছে দীর্ঘ জীবন। আপনিও তো সঞ্চয় করছেন না। তাহলে আপনার তরফেও কি এটা হঠকারিতা হয়ে যাচ্ছে না?

—আমার কথা আলাদা। আমি এই আশ্রমটাকেই আমার ‘জীবন’ বলে ধরে নিয়েছি।

—আমিও তাই নেব। তাছাড়া আপনি আমাকে ডাক্তার হিসাবে একটা পরামর্শ দিয়েছিলেন—একটি বয়স্ফ্রেন্ড খুঁজে নিতে। এতদিনে তা আমি খুঁজে পেয়েছি। তাই এই আশ্রমটাকে আমিও আমার ‘জীবন’ করে নিতে চাই।

বেশ কিছুক্ষণ নীরব থেকে উনি বললেন, তা হয় না, স্টেফা! ছেলেমেয়েরা বন্ধুত্ব করে একটা বিশেষ লক্ষ্য মাথায় রেখে। একটা আনন্দময় পরিণতির স্বপ্নে। তোমার-আমার ক্ষেত্রে তেমন কিছু তো হতে পারে না। হবে না।

আমি কি মনে মনে আহত হয়েছিলাম এই প্রত্যাখ্যানে? এতদিন পরে সে কথা আর মনে পড়ে না। জানতে চেয়েছিলাম, কেন ওল্ড ডক?

—এই আশ্রমের ছেলেমেয়েরা আমার সন্তান। আমি ওদের ড্যাডি...

—জানি। আমিও তো বলতে পারি, এই আশ্রমের ছেলেমেয়েরাই আমার সন্তান। আমি ওদের : ‘মুটি’।

—আমি মেনে নিতে পারি এক শর্তে। আমাদের বন্ধুত্ব কোনোদিন ‘কন্জিউমেন্ট’ করবে না। আমি হব তোমার সাময়িক ‘বয়স্ফ্রেন্ড’। তুমি যেদিন তোমার জীবনসঙ্গীকে খুঁজে পাবে সেদিন তার সঙ্গে ঘর বাঁধবে। তোমার জীবনসাথীও যদি এই আশ্রমের সঙ্গে যুক্ত হতে চায়—ততদিনে আমার হয়তো সে সঙ্গতি হয়ে যাবে—তাহলে তোমরা দুজনেই এই আশ্রমে থেকে যেতে পার।

ইংরিজিতে একটা কথা আছে—‘ম্যান প্রপোজেস উওম্যান ডিসপোসেস।’ পুরুষেরাই প্রস্তাব দেয়, মেয়েরা তা খারিজ করে। এখানে হলো তার উল্টো।

ওল্ড ডক শর্ত-সাপেক্ষে আমাকে তার বান্ধবী বলে স্বীকার করে নিল। বেশ কিছুদিন পরে—যখন আমি আশ্রমের সঙ্গে জীবন-জীবন জড়িয়ে ফেলেছি—তখন একদিন তাঁকে সরাসরি প্রশ্ন করেছিলাম, সর্বস্বপণ করে তুমি এই আশ্রমটাকে আঁকড়ে ধরেছ, সেটা বুঝতে পারি। কিন্তু আজীবন চিরকুমার থাকার কেন এই পাগলামি?

ও বলেছিল জবাবটা তো তুমিই দিলে, স্টেফা। যেহেতু আমি পাগল।

—‘পাগল’? তুমি পাগল?

—হ্যাঁ, আমি পাগল। আমার বাবা পাগল। আমার ঠাকুর্দা পাগল।

স্তুভিত হয়ে যাই। পিতৃপুরুষ সম্বন্ধে কেউ এ ভাষায় কথা বলে?

ও বলে, টুথ, হোল টুথ অ্যান্ড নাথিং বাট দ্য টুথ। আমি ছিটগ্রস্ত, আমার বাবা ছিলেন আধপাগলা, ঠাকুর্দা বদ্ধ উন্মাদ! এটা একটা বংশানুক্রমিক ব্যাধি। আমি তার যবনিকা টানতে চাই।

—কিন্তু তার জন্য বিবাহ না করার কী আছে? সংসারী না হবার কী প্রয়োজন? তুমি ডাক্তার—জানো, কী ভাবে অবাঞ্ছনীয় সন্তান-সন্তাবনা এড়ানো যায়। তুমি বলবে, তোমার স্ত্রী কেন রাজি হবে? তাই না? যদি হয়?

—তার কী স্বার্থ?

—সেটা যদি এতদিনেও না বুঝে থাক, তাহলে সেটা না বুঝলেও চলবে। সেই শর্তে যদি সে আগ্রহ দেখায়?

—এটা তার প্রতি অন্যায় করা হবে।

নির্লজ্জের মতো বলতে পারিনি—হবে না, সে তো ধন্য হয়ে যেতেও পারে।

ক্রমে আমাদের বাড়ি দ্বিতল হলো, ত্রিতল হলো। একে একে অনেক কর্মীও এসে যোগ দিল। ডাক্তার হিসাবে ততদিনে ওর খুব নামডাক হয়েছে। উপার্জনও বৃদ্ধি পেয়েছে। কর্পোরেশনের নির্বাচনে, বা রাজনৈতিক ভোট যুদ্ধে ওর বারে বারে ডাক এসেছে। ও রাজি হয়নি ভোটযুদ্ধে যোগ দিতে। বলেছে, ‘মানুষের সেবার যে পথ আমি বেছে নিয়েছি তাতেই আমার দেহমন সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হয়ে আছে।’ ডাক এসেছিল স্থানীয় রোমান ক্যাথলিক চার্চ থেকেও। ফাদার বিশপ ওকে মৃদু ধমক দিয়ে বলেছিলেন, ‘শহরে তোমার তো খুব নাম ডাক শুনতে পাই, কিন্তু সানডে মাস-এ কোনোদিন তোমাকে দেখতে পাই না কেন?’

ও বলেছিল, আমি যীসাস-এর একনিষ্ঠ সেবক। কিন্তু ভক্তিমার্গ আমার জন্য নয়। আমি তাঁর একটিমাত্র আদেশই পালন করি শুধু : লাভ দাই নেবার। সেটাই আমার ধর্ম। আমাকে স্বধর্মচ্যুত হতে বলবেন না, ফাদার!

বেশ কিছুদিন পরে প্রসঙ্গটা আবার ও নিজেই তুলল, তোমাকে একটা কথা খোলাখুলি বলা প্রয়োজন মনে করছি—

—কী কথা?

—কেন আমি বিবাহ করতে অনিচ্ছুক।

—সেটা তোমার জীবনের ব্যক্তিগত সমস্যা। আমাকে বলার কী দরকার?

—আমি পাগল হতে পারি। অন্ধ নই। দরকার আছে বলেই প্রসঙ্গটা তুলেছি।

আমি যে দেখতে পাচ্ছি তুমি সেই ইন্ডিয়ান এপিকের মহারানির মতো আমার জন্য দু-চোখে পট্টি বেঁধেছ!

—মানে?

—ভারতীয় হিন্দুদের একটা এপিক আছে। তাতে পড়েছি দেশের রাজা জন্মান্ত হওয়ায় তাঁর স্ত্রী দু-চোখে ফেটি বেঁধে স্বেচ্ছাঅন্ধত্ব বরণ করে নিয়েছিলেন। তুমি আজ তাই করতে চলেছ—সেই রানির শতপুত্র হয়েছিল...

আমি বাধা দিয়ে বলি, তুমি দু-দুটো ভুল করছ হেনরিখ*। প্রথম কথা, সেই ভারতীয় এপিকের রাজা জন্মান্ত ছিলেন, স্বেচ্ছা-অন্ধ নন। দ্বিতীয়ত, তাঁর প্রতি যিনি সহানুভূতি দেখিয়েছিলেন তিনি রানি—মহারাজার স্ত্রী। সহকর্মী নন।

—সে জন্যই তো এ প্রসঙ্গ তুলেছি, স্টেফা। তুমি আমার সহকর্মী নও, তুমি এখানকার ‘আশ্রমমাতা’। তোমার সন্তানের দল তোমাকে ‘মুটি’ (মা) বলে ডাকে।

—মানছি। তা সেই ভারতীয় রাজা কি তাঁর স্ত্রীকে বরাবর নাম ধরেই ডাকতেন? ভুল করে কোনোদিন ‘হানি’ বলে ডাকেননি?

ও হেসে ফেলে। বলে, না হানি! মাঝে মাঝে রাজার এমন ভুলও হতো। কিন্তু সেটা তো ভুল করে ডাকা। আসল সত্যটাই তো তোমাকে জানাতে চাইছি—

—বল?

—না। এখনই বলব না। সাতদিন পরে বলব। তার আগে তোমাকে দুখানি বই পড়তে দিচ্ছি। তুমি পড়ে দেখ। তার পরে তোমার সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা হবে।

—অলরাইট। কী বই? কার লেখা?

—ফরাসি লেখক রোমা রোলঁর। জার্মান অনুবাদ। দুটিই জীবনী গ্রন্থ। দুজন ভারতীয় মহামানবের। তাঁরা গুরু-শিষ্য। তাঁদের অন্তত একজনের নাম হয়তো তুমি জান : স্বামী বিবেকানন্দ। শিকাগো ধর্মসভায় বক্তৃতা দিয়ে তিনি জগৎ বিখ্যাত হয়েছিলেন। দ্বিতীয় জীবনীটি তাঁর গুরুর।

পড়েছিলাম। মুগ্ধ হয়েছিলাম। কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাব তাতে পাইনি।

* ওঁর পিতৃদত্ত নাম Hersch Goldszmit। কিন্তু এই ইন্দিশভাষার নাম পরিবর্তন করে উনি পোলিশ ভাষায় নিজের নাম গ্রহণ করেন হেনরিখ (Henryk)। আরও পরে শিশু সাহিত্যিক হিসাবে তিনি যে ছদ্মনামটি গ্রহণ করেন সেই নামেই তিনি বিখ্যাত : ‘জানুস কোরচখ’। তাঁর রচিত শ্রেষ্ঠ কিশোর উপন্যাসটির নাম ‘কিং ম্যাট দ্য ফার্স্ট’। Richard Lourie কর্তৃক অনুবাদিত এর ইংরেজি অনুবাদটি প্রকাশ করেন Farrar, Straus & Girox, New York; আমি আমেরিকায় যে বইটি পেয়েছিলাম তা 1986-এ প্রকাশিত। ইংল্যান্ডে লুইস ক্যারলের ‘অ্যালিস অ্যাডভেঞ্চার’ যতটা জনপ্রিয়, পোল্যান্ডে এ বইটি তেমনিই বিখ্যাত।

দিনসাতেক পরে ও আমার ঘরে এল সন্ধ্যার পরে। জানতে চাইল, পড়ে দেখেছ ?
জবাব পেয়েছ তোমার প্রশ্নের ?

—না, পাইনি। আমি দুঃখিত। মাদার সারদা ‘ফ্রলিন’ ছিলেন না। তাঁর সামাজিক পরিচয় ছিল ‘ফ্রাউ রামকৃষ্ণ’। ওঁরা জাগতিক পরিচয়ে স্বামীস্ত্রী। সারদা ‘মা’কে তিনি স্ত্রীর মর্যাদা দিতে পেরেছিলেন। তাহলে তুমিই বা পার না কেন ?

ও স্নান হেসে বললে, এত বুদ্ধিমতী তুমি, আর এটুকু বুঝলে না ?

আমি রুখে উঠি, না বুঝিনি। তুমি দয়া করে আমাকে একটু বুঝিয়ে দেবে ?

—সহজ জবাবটা হচ্ছে : আমি জানুস কোরচখ। রামকৃষ্ণ পরমহংস নই। তিনি যা পারেন, যা পেরেছেন, আমি কি তাই পারি ? আমি তো সামান্য মানুষ। স্বয়ং স্বামীজীও তো তাঁর ভাবসঙ্গিনী শিষ্যাকে সেভাবে গ্রহণ করতে পারেননি—যদিও তিনি সিস্টার নিবেদিতাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন, ভালবাসতেন।

—স্বামীজী তো সন্ন্যাস নিয়েছিলেন !

—শ্রীরামকৃষ্ণ নেননি ?

জবাব দিতে পারিনি। কেঁদে ফেলেছিলাম। ও তার রুমালে আমার চোখদুটো মুছিয়ে দিয়ে বলেছিল, একটা অনুরোধ। তুমি আর কোনোদিন আমাকে ওঁদের সঙ্গে তুলনা কর না। আমি নিতান্ত রক্তমাংসে গড়া মানুষ। ‘সেইন্ট’ আর ‘সাভাস্ত’দের পদরেখা অনুসরণে প্রত্যাশীমাত্র। আমি আত্মসন্ন্যাস নিয়েছি। কিছুটা হিন্দু রাজযোগ, কিছুটা জেন-বুদ্ধিস্টদের ধ্যানযোগ, কিছুটা খ্রিস্টিয়ান সাভাস্ত ও সেইন্টদের পথে যোগসাধনা করছি।

বছর-খানেক পরে আমার একটা বিচিত্র ব্যাধি হলো : মেলাস্কোলিয়া। দুর্ম্নসাত্য। কিছুই আর ভাল লাগে না। আহারে রুচি নেই। রাত্রে সুনিদ্রা হয় না। যন্ত্রের মতো আশ্রমের যাবতীয় কাজ করে যাই। সহকর্মীদের কাছে শুনেছি, আমি নাকি সে সময় হাসতেও ভুলে গিয়েছিলাম।

ওয়ারসতে সেবার একটা বড় মেডিকেল কনফারেন্স হলো। ওল্ড ডক-এর এক সহপাঠী এসেছিলেন ভিয়েনা থেকে। তিনি বিশেষজ্ঞ ছিলেন মানসিক রোগের চিকিৎসায়। স্বয়ং সিগ্‌মন্ড ফ্রয়েডের শিষ্য। ওল্ড ডকের আমন্ত্রণে তিনি আমাদের আশ্রমে এসে ক’দিন থাকলেন। আমাকে নানাভাবে পরীক্ষা করলেন। মনঃসমীক্ষণ ব্যাপারটা তখনো বিশেষ পরিচিত ছিল না। উনি ডাক্তার কোরচখকে কী বলে গেলেন তা আমি জানি না।

তাঁর প্রশ্ননের পর হেনরিখ আমাকে একদিন পাকড়াও করল। বলল, আমার বন্ধু বলেছে, তোমার ‘মনের অসুখ’ হয়েছে। কোনও অতৃপ্ত কামনা থেকে তোমার অবচেতন মন ব্যাধিটা বারে বারে ফিরিয়ে আনছে। তুমি কিছু মনে কর না, স্টেফা। আমি তোমাকে এ বন্ধন থেকে মুক্তি দিচ্ছি। তুমি বৃহত্তর পৃথিবীতে ফিরে যাও। বিয়ে-থা কর। সংসার কর।

আমি অবাক হয়ে বলি, এ কী বলছ হেনরিখ? আমি কি এখানে বন্দি নী? আমি এ আশ্রমের ‘মুন্ডি’—আশ্রমমাতা। আমার শতাধিক সন্তান।

—সেটা তোমার চেতন মনের প্রবোধ। এ যুক্তিটা তোমার অবচেতন মন মেনে নিতে রাজি নয়। এ ব্যাপারে আমি তো তোমাকে কোনো সাহায্য করতে পারব না। তাই মুন্ডির কথা বলছিলাম—সাহায্য করতে পারে তোমার কোনো নতুন বন্ধু। আমার ডান্ডার বন্ধুর মতে তোমার সহজাত ‘নারীত্ব’ তৃপ্তি পাচ্ছে না বলেই এই মনের অসুখ।

আমি কেঁদে ফেলেছিলাম। ও আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বলে, সরি স্টেফা। আমি অসহায়—

হঠাৎ রুখে উঠি। বলি, আমি নিজেকে অসহায় বলে মেনে নেব না। তুমি যদি পার, তবে আমিই বা পারব না কেন?

—কী পারবে?

—আমিও তোমার মতো ‘আত্মসম্মান’ নেব। আমিও যোগাভ্যাস করব। তুমি আমাকে শিখিয়ে দাও!

এরপর ধীরে ধীরে আমি ‘মেডিটেশন’ শুরু করলাম। একই সাধনকক্ষে পৃথক আসনে। স্তিমিত নীল আলোয়, রুদ্ধদ্বার কক্ষে। প্রতিদিন সন্ধ্যায়। ও আমার বয়স্কেন্দ্র হতে পারেনি, কিন্তু গুরু হতে স্বীকৃত হলো। আশ্রমিকেরা জানত প্রতিদিন সন্ধ্যায় ফাটের আর মুন্ডি (ড্যাড আর মম) প্রার্থনাকক্ষে সাধনা করেন।

শুরু হলো আমাদের দুজনের নতুন জীবন।

[লেখকের প্রতিবেদন : প্রাক-বিশ্বযুদ্ধকালে মার্শাল পিন্‌মদস্কি ছিলেন পোল্যান্ডের একনায়কতন্ত্রী সর্বময় কর্তা। তাঁর প্রথম অভ্যুত্থান ১৯২৪ সালে। ক্ষমতাচ্যুত হবার দু’বছর পরে এক ‘ক্যু’-এর মাধ্যমে পুনরায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। বছর-পাঁচেক পরে তাঁর মৃত্যু হয়। এবার ক্ষমতালাভ করেন স্মিগলিরিৎজ (Smigly-Rydz)। প্রতিবেশী রাজ্যগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রামে আর গৃহযুদ্ধে বহু পোলিশ সৈন্য ত্রিশের দশকে প্রাণ হারায়। নিহত সৈনিকদের অনাথ শিশুদের একত্র করে ওয়ারস চার্চের বিশপ একটি খ্রিস্টান অনাথাশ্রম প্রতিষ্ঠান করেন। ‘ওল্ড ডক’-এর ডাক পড়ে। বিশপ অনুরোধ করেন সেই খ্রিস্টান অনাথাশ্রমের সর্বময় দায়িত্ব গ্রহণ করতে। ডঃ কোরচখ ফাদারকে বলেন, ‘সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণের সময় আমার নেই। তবে আপনি আদেশ করলে আমি সেই অনাথ-আশ্রমকে আমার হোমের সঙ্গে যুক্ত করে নিতে পারি।’ ওঁরা রাজি হন না। অনাথ খ্রিস্টান শিশু কী করে হিটলারদের সঙ্গে এক আশ্রমে থাকবে? তখন ডঃ কোরচখ বলেন, ‘সেক্ষেত্রে আমি ওই আশ্রমের নিয়ন্ত্রণ পরিষদের সদস্য থাকতে পারি মাত্র। সে ভাবে যেটুকু আমার সাধ্য সেটুকুই করব।’

তাই করেছিলেন তিনি। দুটি পৃথক ধর্মাবলম্বী অনাথ আশ্রমের যৌথ দায়িত্ব বর্তাল ডাল্লারের স্কন্ধে। একটির পূর্ণ দায়িত্ব, একটির আংশিক।

ওই ত্রিশের দশকেই ওঁদের যৌথজীবনে পরপর কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে গেল। একটি মহিলার চিকিৎসাসূত্রে তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠল একজন জার্মান মহাপণ্ডিতের। রোগিণী ফ্রাউ থজিমারের প্রাণদানের পর প্রফেসর জেড থজিমারের সঙ্গে তাঁর গভীর বন্ধুত্ব হয়ে গেল। প্রফেসর থজিমার বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অবসরপ্রাপ্ত ডীন। তিনি প্রাচ্যবিদ্যা-বিশারদ—ইংরাজি, ফ্রেঞ্চ, জার্মান ছাড়া আরবি, ফারসি, সংস্কৃত এবং বাঙলা চারটি ভাষায় তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য। ম্যাক্সমুলারের শিষ্য ছিলেন তিনি। ফ্রাউ থজিমারকে নিরাময় করার পর ডক্টর কোরচখ তাঁর স্বামীর কাছ থেকে কোন ফী নিতে অস্বীকার করেন। বলেন, অর্থ নয়, আপনি আমাকে কিছুটা ‘পরমার্থ’ দান করেন যদি, তাহলে আমি দু-হাত পেতে তা গ্রহণ করব। আপনি আমাকে প্রাচ্যদর্শনের মূল তথ্যগুলি শিখিয়ে দিন।

অধ্যাপক থজিমার হেসে বলেন, বুঝলাম! আপনার বক্তব্যটা হচ্ছে—‘যে ধনে হইয়া ধনী, মণিরে মান না মণি, তাহারই খানিক/মাগি আমি নতশিরে’—এ কথাই তো বলতে চান?

—সরি প্রফেসর। আমি বুঝলাম না। উদ্ধৃতিটা কার? কী ভাষা?

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের। বাঙলা ভাষা।

সেই প্রথম উনি রবীন্দ্রনাথের নাম শুনলেন। বাঙলা ভাষার কথাও।

অধ্যাপক থজিমার এই জ্ঞানপিপাসু ছাত্রটিকে আপন করে নিলেন। ম্যাক্সমুলার অবলম্বনে প্রাচ্যদর্শনের নানান দুরূহ তথ্য ও তত্ত্ব তাঁকে বোঝাতে থাকেন। সেই ক্লাসে স্টেফানিয়াও এসে বসতেন। বৌদ্ধ দর্শন, উপনিষদের মন্ত্র ও ব্যাখ্যা, জার্মান অনুবাদে ‘গীতাঞ্জলি’ পড়তে থাকেন। বার্লিনে ধীরে ধীরে জার্মান নাৎসিবাদ মাথা চাড়া দেওয়ায় বৃদ্ধ চলে এসেছেন স্বদেশভূমি ত্যাগ করে, ওয়ারসতে। এখানেই স্বামীস্ত্রীতে শান্তিতে বাকি জীবন কাটাবেন এটাই তাঁদের মনোবাসনা। ফ্রাউ থজিমার স্টেফানিয়ার ঘনিষ্ঠ ফ্রয়েনডিন (বান্ধবী) হয়ে ওঠেন ক্রমে।

দ্বিতীয় দুর্ঘটনাটি ঘটল মাদার স্টেফানিয়ার মনোজগতে। আবার তিনি দুর্মনস্যতার শিকার হয়ে পড়লেন। যান্ত্রিক পদ্ধতিতে আশ্রমের যাবতীয় কর্তব্য করে যান, সাক্ষ্য-উপাসনায় নিমীলিতনেত্রে যোগাভ্যাস করে যান। কিন্তু তাঁর মনে স্ফূর্তি নেই, মুখে হাসি নেই। অধ্যাপক থজিমারের পরামর্শে ওল্ড ডক তাঁর ‘উইনসাম ম্যারো’কে নিয়ে এক সপ্তাহান্তে ভিয়েনায় চলে গেলেন। তাঁর সেই মনস্তত্ত্ববিদ সহপাঠীর পরামর্শ নিতে। স্টেশনে তাঁদের তুলে দিয়ে এসেছিলেন সস্ত্রীক অধ্যাপক থজিমার। এটাই স্টেফানিয়ার প্রথম বিদেশযাত্রা। রেলগাড়ির কামরায় বসে অনেকদিন পরে প্রফুল্ল হয়ে ওঠেন স্টেফা। অধ্যাপক

তাঁর শিষ্যকে বলেন, লুক অ্যাট স্টেফা। ও আজ বিনুর মতো খুশিয়াল।

কোরচখ জানতে চান, ‘বিনু’ কে?

—তুমি তাকে চেন না ব্রাদার। আমার মনে পড়ে যাচ্ছে ‘বিনুর মনে জাগছে বারে বার/নিখিলে আজ একলা শুধু আমিই কেবল তার/কেউ কোথা নেই আর..’

কোরচখ বোকার মতো তাকিয়ে থাকেন।

মনস্তত্ত্ববিদ ডাক্তারবন্ধুটি বললেন, এমন একটা রোগের পুনরাব্রমণ যে হতে পারে, সেটা আমার আশঙ্কাই ছিল। ও যে জীবনের এক ক্রান্তিকালের কাছাকাছি এসে পৌঁছেছে : মেনোপজ! ওর অবচেতন মন ওকে বারে বারে বলছে : তোমার জীবন ব্যর্থ। তোমার নারীজন্ম বিফল। তুমি নতুন জীবন সৃষ্টি করতে পারলে না। তুমি তো বাতিলের দলে। এবার আবর্জনাস্থূপে তোমার অন্তিম গতি!

—এর কোনো চিকিৎসা নেই?

—চিকিৎসা তো তোমার নিজের মুঠোয়, মাই ভিয়ার পিগ্‌হেডেড ফ্রেন্ড! ওকে বিয়ে করে ফেল! মধুচন্দ্রিমা-রাড্রেই ও নিরাময় হয়ে যাবে। খিলখিলিয়ে হাসবে। আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি!

রোগিণীকে একথা জানানো হলো না। গুঁরা ফিরে এলেন।

ওয়ারসতে ফিরে ডক্টর কোরচখ এক যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নিলেন।

একদিন সন্ধ্যায় উনি স্টেফানিয়ার শয়নকক্ষে এসে বললেন, একটা ভিক্ষা আছে, স্টেফা! দেবে?

—তোমাকে অদেয় কী আছে হেনরিখ? বলো?

স্টেফানিয়ার হাতখানি ধরে বৃদ্ধ বলেছিলেন, আমি ফর্মালি তোমার কাছে ‘প্রপোজ’ করছি। তুমি আমাকে বিবাহ করতে রাজি?

স্টেফানিয়া বজ্রাহতা। ঝরঝরিয়ে কেঁদে ফেলেছিলেন তিনি।

কিন্তু ভাগ্যের কী নিষ্ঠুর পরিহাস! ততদিনে হিডেনবার্গকে হাটিয়ে ফ্যুরার হয়ে গেছে বৃহত্তর জার্মানির সর্বময় কর্তা। পোল্যান্ড তখনো জার্মান অধিকৃত হয়নি। কিন্তু ওয়ারসের কোনো চার্চ খ্রিস্টান ইহুদির বিবাহ-বন্ধনে সম্মতি দিত না। ভয়ে। সিনাগগের কর্তাব্যক্তিরও স্বীকৃত হলেন না। পোল্যান্ডের সর্বময় কর্তা মার্শাল স্মিগলিরিৎজ ততদিনে নাৎসি শাসকের একান্ত অনুগত বশব্দ হয়ে পড়েছে। সমস্ত পোল্যান্ডে আদেশ জারি হয়ে গেছে—‘নর্ডিক-সেমিটিক’ বিবাহ অসিদ্ধ। নামঞ্জুর। বরকনে তো বটেই পুরোহিতকেও কোতল করা হবে, এমন অনাচার যদি আদৌ ঘটে যায়!

তারপরই অত্যন্ত দ্রুত পটপরিবর্তন। ১৯৩৭ সেন্টেম্বরে পোল্যান্ড অধিকার করল নাৎসি প্যারট্রুপার্স। ওয়ারস চলে এল সরাসরি নাৎসি শাসনে। যুদ্ধের প্রথম দিকে ‘আওয়ার

হোম'-এর উপর নাৎসি কালনাগের বিষনিশ্বাস পড়েনি। ওয়ারস যেটো তৈরি হয়ে গেল। শহরের যাবতীয় ইহুদি অধিবাসী—বুড়োবাচ্চা, পুরুষস্ত্রীকে—ধরে নিয়ে গিয়ে আটক করা হলো ওয়ারস যেটোতে। একমাত্র মরুভূমির মাঝখানে মরুদ্যানের মতো তখনো টিকে ছিল 'আওয়ার হোম'! অনাথ শিশুদের সংখ্যা তখন দেড়শর উপর। বাড়িটি এতদিনে চারতলা। এই সময়েই আব্রাসা আর রেবেকাকে ওই আশ্রমে রেখে গিয়েছিলেন ক্যাপ্টেন আর্নস্ট স্নবেল।

অচিরেই এসে গেল পরপর কয়েকটি নাৎসি ফরমান। যাঁরা ছিল এই Dom Sirot (আওয়ার হোম)-এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক, সেই Jewish Orphan's Aid Society-কে সরকার থেকে বে-আইনি ঘোষণা করা হলো। তাদের স্থাবর-অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি নাৎসি-সরকারের হয়ে গেল। তারপরই এসে গেল আর একটি মর্মান্তিক ফতোয়া। নাৎসি সরকার কোরচখের চারতলা বাড়িটি 'অধিগ্রহণ' করছেন—যুদ্ধের প্রয়োজনে। 'ওয়ার এমার্জেন্সি' বলে কথা! শহরের কেন্দ্রস্থলে এই প্রাসাদটি রূপান্তরিত হলো নাৎসি-হেডকোয়ার্টার্সে। এ জন্য কোরচখকে অবশ্য যথোপযুক্ত খেশারত দেওয়া হবে—বাড়ি, সংলগ্ন জমি, আসবাবপত্র—সব কিছুর জন্যই। তবে...ইয়ে ...নগদে নয়। 'ওয়ার বন্ডে'। যুদ্ধশেষে নাৎসি সরকার হাই-প্রিমিয়ামে সেই বন্ড নগদ টাকায় আবার কিনে নেবেন। বছর দুই-তিনের মামলা। চার্লিস আর স্তালিন নতজানু হলেই। ব্রিটিশ আর সোভিয়েত সরকার যখন জার্মানিকে যুদ্ধবাবদ খেশারত দিয়ে সন্ধি করতে বাধ্য হবে। তাদের তা দিতেই হবে—কোটি কোটি ডয়েশমার্ক : থ্রু দেয়ার নোজেস্।

কোরচখের বিকল্প আবাসও নির্দেশিত হল। ওই অপোগণ্ডদের নিয়ে তিনি সদলবলে যেটোর কাঁটাতারে-ঘেরা একটা বাড়িতে গিয়ে এই তিন-চার বছরের জন্য সাময়িক ডেরা-ডাণ্ডা গাড়ুন। যেটো-এলাকায় তেত্রিশ নম্বর শ্লোডনা স্ট্রিটের (Chlodna St.) একটি দ্বিতল বাড়িতে।

মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল কোরচখের। তিনি ছুটে গেলেন নাৎসি দপ্তরে। সেখানকার সর্বাধিনায়ক ডঃ ফন ব্লুটেনৌ (Dr. Von Blutenau)-কে গিয়ে বললেন, হের ডক্টর, শ্লোডনা স্ট্রিটের ওই ছোট দোতলা বাড়িতে আমি কেমন করে এতগুলি অনাথকে আশ্রয় দেব? আমার অনাথ শিশুর সংখ্যা বর্তমানে একশ তেষটি। ওখানে বড়জোর পঞ্চাশজনের ঠাই হতে পারে!

হের ব্লুটেনৌর চটজলদি জবাব, এর তো সহজ সমাধান আছে হের কোরচখ। আপনি নিজেই বেছে নিন। আমরা আপনাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিচ্ছি। একশ তেষটি মাইনাস পঞ্চাশ ইজুকালটু একশ তের জনের দায়িত্ব আমরাই নেব। ওদের পাঠিয়ে দেব ট্রেন্সিল্বা কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের স্যানেটেরিয়ামে। সেখানে আরও অনেক-অনেক ইহুদি বাচ্চা আছে। সবারই সুবন্দোবস্ত হয়ে যাবে।

ডক্টর কোরচখ ইতিমধ্যেই জেনেছেন—ট্রেল্লিকা কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প নির্মিত হয়েছে একটি গ্যাস-চেম্বার এবং ইনসিনিরেটর। প্রতিদিন সেখানে শয়ে শয়ে, হাজার-হাজারে ইহুদি নরনারী গ্যাস-চেম্বারের মৃত্যুতোরণ পার হয়ে দানবচুল্লিতে পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে যায়। তিনি মাথা নিচু করে ফিরে এসেছিলেন।

এর পরেই এসে গেল সেই নিষ্ঠুরতম আদেশটি। আখেরি ফরমান।

মাসদেড়েক পরে ‘আওয়ার হোমের’ যাবতীয় ইহুদিকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে ট্রেল্লিকা স্যানেটোরিয়ামে। কোরচখ ইহুদি নন। তিনি বাদে।

কোরচখ পুরো চব্বিশ ঘণ্টা তাঁর ঘরে স্বেচ্ছাবন্দির জীবন কাটালেন। অনাহারে। অনিদ্রায়। যোগাসনে কি না তিনিই জানেন। তারপর ডেকে পাঠালেন তাঁর ক’জন ঘনিষ্ঠ অনুচরকে। সকলেই আশ্রমের শিক্ষক-শিক্ষিকা। তাদের খুলে বললেন এই অলঙ্ঘনীয় অনতিক্রম্য আদেশের কথা। পুরো দশ মিনিট সকলেই নির্বাক। সবাই এটা আশঙ্কা করছিলেন, বিগত কয়েক মাস ধরে। এখন এ চরম সর্বনাশ এসে দাঁড়িয়েছে দ্বারপ্রান্তে।

একজন সিনিয়র টীচার ডন ব্লচ বললেন, বাচ্চাদের কি সব কথা খুলে বলা হবে? যাতে ওরা মানসিক প্রস্তুতির কিছুটা সময় পায়?

—সেটা যে চরম নিষ্ঠুরতা হয়ে যাবে, ব্লচ! তুমি আমিই এটা সহ্য করতে পারছি না। বুকের মধ্যে মুচড়ে মুচড়ে উঠছে। ওরা ওদের ওই কচি বুকে—

—তাহলে কি সেটা আমরা গোপন রাখব? যেদিন গেস্টাপো বাহিনী ওদের মার্চ করিয়ে ধরে নিয়ে যাবে, আমরা বলব সেদিন আমরা পিকনিকে যাচ্ছি?

জানতে চাইলেন স্টেফা!

—এটা কী বলছ আশ্রমমাতা! বাচ্চাদের এমন মিথ্যা শেখাতে আছে?

ব্লচ রুখে ওঠেন, বাচ্চাদের আমরা মিথ্যা শেখাই না, যাতে বড় হয়ে ওরা মিথ্যাচারী না হয়ে ওঠে! ওদের বাকি জীবন বলতে তো মাত্র চার-পাঁচ সপ্তাহ! ওদের সান্ত্বনা দিতেই তো—

—ছিঃ ব্লচ। এটা কী বললে! বাচ্চাদের আমরা মিথ্যা অবলম্বন করতে বারণ করি নীতিগতভাবে। কোনো কারণেই সত্যকে ত্যাগ করা যায় না বলে। আদর্শগত কারণে।

Truth is not the best policy, it is the best creed.

—তাহলে তুমি কী করতে চাও?—আশ্রমমাতার সরাসরি প্রশ্ন।

—আমার মাথায় একটা ‘আইডিয়া’ এসেছে। রাতারাতি আমরা একটা নাটক অভিনয় করাব বাচ্চাদের দিয়ে। ‘হোলি সাভান্ত’ রবীন্দ্রনাথের ‘ডাকঘর’! পোস্ট-অফিস! আমার কাছে তার একটা জার্মান অনুবাদ আছে।

—তাতে কী লাভ ?

—তাতে ‘কবি’ বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, ‘মৃত্যু’ জীবনের শেষকথা নয়! মৃত্যু একটা পর্যায়—একটা উত্তরণ পথ। শেষ লক্ষ্যে পৌঁছানোর একটা তোরণ। তার ভিতর দিয়েই এই মরদেহকে ত্যাগ করে আমরা অমরত্ব লাভ করতে পারব। তত্বটা গভীর—বদ্ধতা দিয়ে তা বাচ্চাদের বোঝানো যাবে না। কিন্তু নাটকটা অভিনয় করতে করতে ওরা বুঝবে, বিশ্বাস করবে—মৃতুঞ্জয়ী হবার চেষ্টা করবে। এভাবেই আমি তত্বটা ওদের বোঝাতে চাই। শেখাতে চাই সেই উপনিষদের প্রার্থনামন্ত্রটা : “অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময় ॥ মৃত্যোর্ম্মা অমৃতং গময় ॥”

স্টেফা বলেন, কী ওই প্রার্থনামন্ত্রের অর্থ ?

—‘অসৎ থেকে আমাদের সত্যে নিয়ে যাও! অন্ধকার থেকে জ্যোতির্ময় আলোকলোকে উদ্ভীর্ণ কর, মৃত্যু থেকে আমাদের অমৃতে উত্তরণ হোক’! —আমেন!

তিনদিনের মধ্যে শর্ট-হ্যান্ডে নাটকটা অনুবাদ করে ফেললেন উনি। এক এক পাতা রচনা শেষ হয় আর স্টেফা—ততদিনে তিনিও শর্ট-হ্যান্ড শিখে নিয়েছেন—ডিসাইফার করে লঙ-হ্যান্ডে লিখে ফেলেন। তিনজন শিক্ষক শিক্ষিকা তিনটে টাইপ-রাইটারে তিন-ত্রিখ্যে ন-কপি নাটক তৈরি করে ফেললেন।

‘মিটিং হলে’ বাছা বাছা জনা দশ-পনের আবাসিক আর শিক্ষকদের সমবেত করে নাটকটা পড়ে শোনালেন উনি। বললেন, আমরা মাত্র দিন পনেরোর মধ্যে এটাকে মঞ্চস্থ করব। চরিত্রবন্টন এবার তাই স্টেফা আর রচক করে দেবে। যে যে পার্ট পাচ্ছ দু-দিনে মুখস্ত করে ফেল। প্রম্পটিং হবে না। এখন বল, কারও মনে কোনো প্রশ্ন আছে? নাটকটার বিষয়ে? শুনলে তো তোমরা?

উইনী জানতে চাইল : নাটকে যিনি অনুপস্থিত ‘রাজা’ তিনি তো আদোনাই স্বয়ং।

—ইয়েস, উইনী। তোমার আমার কাছে তিনি আদোনাই। খ্রিস্টিয়ানদের কাছে তিনি ‘গড’। মুসলমানের কাছে তিনি আল্লাহ্। তিনিই এ নাটকের নেপথ্যে ‘রাজা’।

মার্টিন বলে, আর ‘ডাকঘর’? পোস্ট-অফিসটা কিঁসের প্রতীক?

—যেখান থেকে সেই সর্বশক্তিমানের শাস্তির বাণী বিতরিত হয়। তোমার কাছে সেটা সিনাগগ, খ্রিস্টানের কাছে চার্চ, মুসলমানের কাছে মসজিদ। যেমন ডাকহরকরার দল হচ্ছেন রাব্বাই, সেন্টস, ইমাম! অমল তো সেজন্যই ডাকহরকরা হতে চেয়েছিল। প্রেমের কথা, ভালবাসার কথা জনে জনে বিতরণ করতে—পোস্ট অফিস থেকে যেমন চিঠি বিলি হয় আর কি।

অ্যালিসিয়া বলে, আমি ওই জায়গাটা বুঝতে পারিনি, ড্যাড! রাজা কেন অমলের

বাড়িতে এসে পান্তা আর স্ম্যাশ্ পটেটো * খেতে চেয়েছিলেন?

—ঝুলি না পাগলি? রাজা রাজভোগ খেতে চাননি। চেয়েছিলেন দুঃখী মানুষেরা যা খায়। পান্তা ভাত আর আলু সিদ্ধ।

এবার আব্রাসা জানতে চায় : আর ‘মৃত্যু’? ডাকঘর নাটকে ‘মৃত্যুর’ কী ভূমিকা?

—Eine Massive Tür—একটা বিরাট গেট। তোরণ। যা পার হয়ে অমৃতলোকে যাওয়া যায়। ‘রাজার’ খাশ তালুকে!

চরিত্রবর্নন শেষ হলো তখনই। অমল—আব্রাসা; সুধা—অ্যালিসিয়া; মোড়ল—মার্টিন; মাধব দত্ত—পুরুষবেশে উইনী, কবিরাজ—ব্লচ; আর ঠাকুরদা—যে চরিত্রে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ অভিনয় করেছিলেন—তাতে ড্যাডি। মৃত্তি হলেন পরিচালিকা।

ডক্টর কোরচখকে আবার যেতে হলো গেস্টাপো হেডকোয়ার্টার্সে। অনুমতি চাইতে।

ডঃ ফন ব্লুটেনৌ মাথা নেড়ে বললেন, সরি ডক্টর ডক্কি! এ নাটক করার তো অনুমতি দেওয়া সম্ভবপর নয়।

গেস্টাপো অধিকর্তা ডক্টর কোরচখকে ডাকতেন ‘ডক্টর ডক্কি’ নামে।

কোরচখ বললেন, কেন হের ডক্টর? এ নাটকটাতে আপনার আপত্তি কিসের? আপনি পড়েছেন ডক্টর টেগোরের ‘ডাকঘর’?

—পড়িনি তো বটেই। নামও শুনিনি। না নাটকের, না নাট্যকারের। সে জন্য নয়। ফ্যুরারের একটা ফরমান আছে যে, কোনো ইহুদি নাট্যদল কোনো নর্ডিক এরিয়ানের লেখা নাটক মঞ্চস্থ করতে পারবে না।

দশ সেকেন্ড অবাক দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকেন বৃদ্ধ। তারপর হঠাৎ বলে ওঠেন, এটা কী বলছেন স্যার? রবীন্দ্রনাথ তো নর্ডিক এরিয়ান নন—পিওর সেমেটিক। নাম শুনেই তো সে কথা বোঝা যায়! তিনি একজন বিখ্যাত ভারতীয় রাব্বাই।

—নাম শুনে বোঝা যায়? কেমন করে?

—বাঃ! ওঁর নাম তো রাব্বাই ইন্ড্রনাথ টেগোর। ‘ইন্ড্র’ মানে স্যাক্সটে ‘অফ দ্য’; ‘নাথ’ মানে হোলি, আর দ্যা টেগোর তো ওঁদের সিনাগগটার ভারতীয় নাম। ওঁর নামটার অর্থই তো হলো : Rabbi of the Holy Tagore-Synagogue! অর্থাৎ কিনা:

* অনুসন্ধিৎসু পাঠক-পাঠিকাকে এখানে জানিয়ে রাখা ভাল যে, ডক্টর কোরচখ জার্মান অনুবাদ থেকে পোলিশ ভাষায় আক্ষরিক অনুবাদ করেননি। মূলে আছে ‘মুড়ি-মুড়কি’; কোরচখের অনুবাদে তা ‘পান্তা আর আলুভাতে’! পোলিশ শিশুদের বোধগম্য ভাষায় তাই পাঁচমুণ্ডি গ্রামের বাঙলা ‘খড়ো-চাল কুঁড়েঘর’ওলি হয়ে গিয়েছিল ‘সারি-সারি লালটালির শেড’—তাদের চিমনি দিয়ে বের হচ্ছে নীল ধোঁওয়া; পাহাড়ের মাথায় উইন্ডমিল। যেমন ‘আম গাছ’ রূপান্তরিত হয়েছিল ‘আপেল গাছে’, ‘শ্যামলী’ নদী—হয়েছিল ‘ফুজ বারহগুন’ (শান্তির বার্তাবাহী শান্ত নদী)।

টেগোর-সিনাগগের রাব্বাই। এই দেখুন তাঁর ছবি।

জার্মান অনুবাদে ভাগ্যক্রমে প্রথম পৃষ্ঠাতেই কবির একটা ছবি ছিল। ওল্ড ডব সেটা মেলে ধরেন ওই নাৎসি ডক্টর ডব্লিউ নাকের ডগায়।

গেস্টাপো পণ্ডিত হাতে নিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখলেন।

বুড়ো লোকটার সাদা ধপধপে বড়ভো দাড়ি। তার ডেউ খেলানো চুল, চোখে অতলাস্ত সৌম্য দৃষ্টি। বিশ্বাস হলো। এ লোকটা খাঁটি জুডেন।

এ বুড়ো রাব্বাই না হয়ে যায় না।

আঠারোই জুলাই 1942—শেষযাত্রার মাত্র সতেরো দিন আগে। ঘেটোর নতুন আবাসে, মাঠের মাঝখানে মঞ্চ খাটিয়ে আশ্রমের ছেলেমেয়েরা অভিনয় করল : রবীন্দ্রনাথের ডাকঘর—পোলিশ ভাষায়। পোলিশ-ভাষায় বোধকরি এই প্রথম ও শেষবার।

মহড়ার সময় একটি বিশেষ দৃশ্যে রেবেকা বারে বারে ভুল করে বসত। সেখানে অমল আর সুধার কথোপকথন ছিল এই ধরনের :

সুধা। ...তুমি দুষ্টুমি করো না, লক্ষ্মী ছেলে হয়ে এইখানে স্থির হয়ে বসে থাকো, আমি ফুল তুলে ফেরার পথে তোমার সঙ্গে গল্প করে যাব।

অমল। আর আমাকে একটি ফুল দিয়ে যাবে?

সুধা। ফুল অমনি কেমন করে দেব? দাম দিতে হবে যে!

অমল। আমি যখন বড় হব, তখন তোমাকে দাম দেব। আমি কাজ খুঁজতে চলে যাব ওই ঝরনা পার হয়ে, তখন তোমাকে দাম দিয়ে যাব।

সুধা। আচ্ছা বেশ।

অমল। তুমি তাহলে ফুল তুলে আবার আসবে?

সুধা। আসব।

অমল। আসবে?

সুধা। আসব।

অমল। আমাকে ভুলে যাবে না? আমার নাম অমল। মনে থাকবে তোমার?

সুধা। না ভুলব না। দেখ, মনে থাকবে। (প্রস্থান)

অভিনয়ের এই অংশে প্রতিদিনই রেবেকা ভুল করত। ঝরঝরিয়া কেঁদে ফেলত। পরিচালিকা তাকে বারে বারে বুঝিয়েছেন—এখানে সুধার কান্নাটা অস্বাভাবিক, বেমানান। সে তো তখন জানে না—আর দেখা হবে না। জানে না যে, অমল শেষ দৃশ্যে মারা যাবে। রেবা বোধহয় বুঝত, কিন্তু কিছুতেই নিজেকে সামলাতে পারত না। ড্রেস-

রিহার্সালের দিনেও সেই একই ভুল। সেদিন উপস্থিত ছিলেন ওল্ড ডক। তিনি স্টেফাকে বললেন, আপত্তি করছ কেন? কাঁদুক না রেবা! সুধা না জানলেও দর্শকেরা সবাই জানতে পেরেছে যে, আর দু-সপ্তাহ পরে আমরা সবাই...

ঠিকই বলেছিলেন কোরচখ! অভিনয় রাত্রেও কান্নায় ভেঙে পড়েছিল সুধা। দর্শকদের সেটা অস্বাভাবিক লাগেনি। সবাই যে যার পকেট হাতড়ে তখন রুমাল বার করতে ব্যস্ত।

অভিনয় হয়েছিল অতি উচ্চমানের। কিন্তু কার্টেন-কল হয়নি। হাততালিও কেউ দেয়নি। মিনিট-দুয়েক স্ট্যান্ডিং ওভেশন দিয়ে দর্শকেরা নীরবে নির্গমনদ্বারের দিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন। মাথা নিচু করে। যেন অপরাধটা তাঁদেরই। অধিকাংশই পোলিশ। কিছু জার্মানও ছিল সে দলে। নাৎসি গেস্টাপোরা নয়।

শেষযাত্রার মাত্র তিনদিন আগে ডক্টর আবার এলেন গেস্টাপো হেড-কোয়ার্টার্সে।

মেজর ফন ব্লুটেনৌ বলেন, আবার কী চাই?...ও ভাল কথা ডক্টর ডব্লিউ তোমাদের নাটকটা সেদিন ভালই হয়েছিল। তোমাদের কনগ্র্যাচুলেট করা হয়নি। অবশ্য মূল কৃতিত্বটা সেই ইন্ডিয়ান রাব্বাইয়ের। দারুণ একটা প্রহসন লিখেছিলেন তিনি!

—প্রহসন, হের মেজর?

—নয়? দেশের রাজা বলছে প্যালেসের শেফ-এর সম্বন্ধে বানানো বাদশাহী খানা তার পছন্দ হয় না, তার লোভ পান্ডা আর পটেটো-স্ম্যাশ-এর উপর। ফানি নয়? তাছাড়া ওই বাচ্চাটা! তার 'লাইফস অ্যাম্বিশন' সে বড় হয়ে পোস্টাল পিওন হবে। হা-হা-হা! রিডিক্যুলাস নয়? পোস্টাল পিওন! মাই গড! অবশ্য একটা ইন্ডেসাইল জুডেন-বাচ্চা তার চেয়ে বেশি কী আশা করতে পারে?

ডক্টর মাথা নিচু করে এই নাট্য-সমালোচনাটা পরিপাকে প্রয়াসী হন।

—সে যা হোক, আজ কী নিয়ে দরবার করতে এসেছ? কী চাই?

—পাঁচ তারিখ সকালে আপনার গেস্টাপো পুলিশ যেন আমার আশ্রমিক বাচ্চাদের বেয়নেট দিয়ে না খোঁচায়, পুলিশ-কুকুর দিয়ে যেন..

—তাহলে তো ওরা ইঁদুর-গর্ত থেকে বের হতেই চাইবে না।

—আজ্ঞে না। আমি কথা দিচ্ছি, ওরা সারবন্দি হয়ে বার হয়ে আসবে। গান গাইতে গাইতে। শোভাযাত্রা করে স্টেশনের দিকে যাবে!

—হাউ কাম? কেমন করে তা হবে?

—আমি ওদের বুঝিয়ে বলেছি যে, আমরা সবাই পিকনিক করতে যাচ্ছি। ওরা 'মার্চিং সঙ' গাইতে-গাইতে মার্চ করে যাবে। আমি কথা দিচ্ছি আপনাকে।

একটু ভেবে নিয়ে ফন ব্লুটেনৌ বলেন, একটা গুজব শুনলাম, ডক্টর, তুমি নিজে

নাকি জুডেন নও ? পোলিশ ক্রিস্টিয়ান ? ফ্যাক্ট ?

—ফ্যাক্ট ! বাট নট দা ট্রুথ ।

—তার মানে ?

—সে আলোচনা থাক না, স্যার । আপনি আমার প্রস্তাবে রাজি ? আমরা গান গাইতে-গাইতে শোভাযাত্রা করে যেতে পারি ? কেউ বাধা দেবে না ।

—আই অ্যাকসেপ্ট ইওর প্রপোজাল ! রাস্তার মাঝখানে বাচ্চাগুলোকে প্রকাশ্যে বেয়নেট দিয়ে আমরা খোঁচা মারতে বাধ্য হলে পাবলিক সিম্প্যাথি খোয়াব । অল রাইট ! তোমরা প্রসেশন করেই যেতে পার । কেউ বাধা দেবে না ?

—থ্যাঙ্ক ইউ স্যার ।—উঠে দাঁড়ান উনি ।

ফন ব্রুটেনৌ বলেন, বস, শোন । তুমি যদি নিজে জুডেন না হও, আর হ্যামেলিনের সেই বাঁশীওয়ালার মতো ইঁদুরছানাগুলোকে নাচাতে নাচাতে ওয়াগনবন্দি করতে পার, তাহলে আমি তোমাকে পুরস্কৃত করব । তোমাকে আমরা স্পেয়ার করতে পারি । ইঁদুরছানাগুলোকে ক্যাটল-ওয়াগনে তুলে দেবার পর তুমি চুপচাপ সরে পড়বে । কেউ তোমাকে পাকড়াও করবে না । ট্রেন ছেড়ে দিলে বাচ্চারাও বুঝতে পারবে না, তুমি কেমন করে হারিয়ে গেলে ।

উনি এ প্রস্তাবের কোন জবাব দিতে পারেননি । মাথা নিচু করে ফিরে এসেছিলেন ।

কোরচখের জীবনীকার ঐতিহাসিক দলিলের সাহায্যে প্রমাণ করেছেন যে, শেষ-যাত্রার পূর্বদিন রাত্রে ডক্টর কোরচখের সঙ্গে গোপনে সাক্ষাত করেন, ক্যাপ্টেন আর্নস্ট স্নবেল । তাকে দেখে কোরচখ তো উচ্ছ্বসিত । বলেন, এই তো । তোমাকেই খুঁজছিলাম !

—কেন স্যার ?

—আমরা সবাই তো কাল সকালে রওনা দেব । কিন্তু আমাদের কাজটা তো শেষ হল না । বরং সেটা ক্রমশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে দিন দিন । দেখ, এ যুদ্ধ একদিন শেষ হবেই । তখন তোমরা দেখতে পাবে কর্মক্ষম মানুষেরা সংখ্যায় অত্যন্ত কম । যারা বেঁচে থাকবে তারা সব পঙ্গু । কী জার্মান, কী পোলিশ । কী খ্রিস্টান, কী ইহুদি । অথচ বেঁচে থাকবে লক্ষ লক্ষ শিশু—তারা অনাথ । তাদের বাপ-দাদারা হয়েছে যুদ্ধের বলি । তখন তো আরও বড় জাতের অনাথ আশ্রম বানাতে হবে...

স্নবেল বাধা দিয়ে বলেন, সে সব তো অনেক পরের কথা, স্যার । আমি এসেছি আপনাকে একটা জরুরি কথা বলতে । অত্যন্ত জরুরি এবং অত্যন্ত গোপন !

—বল ?

—আমি স্যার, আপনার জন্য একটা ফোর্জড পাসপোর্ট বানিয়ে এনেছি ।

আশ্রমমাতা, বা অন্যান্য আর সবাইকে বাঁচানো যাবে না। কিন্তু আপনাকে বেঁচে থাকতে হবে। নিজের স্বার্থে নয়, যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর স্বার্থে। আপনি খ্রিস্টিয়ান পোলিশ নাগরিক হিসাবে পোল্যান্ড ত্যাগ করে সুইজারল্যান্ডে চলে যাবেন। সেখান থেকে ইজরেইল। এই সেই পাসপোর্ট। ধরুন, স্যার।

ডক্টর কোরচখ হেসে বলেছিলেন, কী পাগল ছেলে গো তুমি! আমাকে না জানিয়ে এত সব কাণ্ড করেছে? তোমাকে বলা হয়নি, তুমি জান না, আমার ফোর্ড পাসপোর্টের কোনো দরকার নেই। আমি জন্মসূত্রে একজন পোলিশ খ্রিস্টিয়ান!

ক্যাপ্টেন স্নবেল বজ্রাহত হয়ে গিয়েছিলেন।

পাঁচই অগস্ট উনিশ শ' বেরাল্লিশ।

শেষ রাত থেকেই ‘আমাদের বাড়ি’ আশ্রমে সাজ সাজ রব। গেস্টাপো সৈনিক যখন এসে হইসল বাজাল, তাদের অভ্যাস মতো গাঁক-গাঁক শুরু করে দিল — ‘বেরিয়ে আয়, বেরিয়ে আয় ইঁদুর বাচ্চরা’—তৎক্ষণাৎ ওদের সদর দরজা গেল খুলে। উৎসবের সাজে সেজে ওরা সারি বেঁধে বার হয়ে এল আশ্রম থেকে। ছেলেদের টুপিতে একটা করে মোরগের রঙচঙা পালক গোঁজা, বাচ্চা মেয়েদের মাথায় বো-তে একটা করে ফুল। সবার আগে চলেছে আব্রাসা। তার হাতে সঙ্ঘের সবুজ পতাকা। তার বাম বাহুমূল ধরে পাশে-পাশে হাঁটছে রেবেকা। আজ সে পরেছে তার পাতানো দাদা স্নবেলের উপহার-দেওয়া রানি-কালারের সেই চমৎকার ফ্রকটা। ওদের পিছনে ওল্ড ডক। তাঁর কোলে একটি ফুট-ফুটে শিশু, পাশেই আশ্রমমাতা। তার পর উইনী—তার সেই সিডেরেলার সাজে। তার মাথায় টায়রা, আর মার্টিন প্রিন্স-চার্মিং-এর তুলে-রাখা টাইট-ব্রিচেস পরে।

এর পর দীর্ঘ লাইন ধরে আর সব বাচ্চারা। রাজপথে আজ খুকু-খোকারণ্য।

গেস্টাপো পুলিশের হাঁকাড বন্ধ হলো। স্তম্ভিত বিস্ময়ে তারা শুনল ওদের মার্টিং-সঙ! কেউ বাজাচ্ছে বাঁশি, কেউ বিউগল, কেউ ড্রাম!

ওরা কী যেন অজানা সুরে গাইছে একটা অচেনা গান।

মেজর রুটেনৌ তার পার্শ্ববর্তী ক্যাপ্টেন স্নবেলকে শুধায়, ওরা ওটা কী গাইছে হে? কার লেখা গান? কী সুর?

—ওদের মার্টিং সঙ। সেই ইন্ডিয়ান রাব্বাইয়ের লেখা গান। ডক্টর কোরচখ ওটা পোলিশ ভাষায় অনুবাদ করেছেন। সেই রাব্বাইয়ের দেওয়া সুরেই গাইছে ওরা।

—কিন্তু গানের মানে কী?

—সেটা বোঝা ভা—রি শব্দ!

বাচ্চাদের অনেকের চোখে নেমেছে জলের ধারা। কিন্তু গান চলেছে সমান তালে।

স্টেশনের সাইডিঙে দাঁড়িয়ে আছে সারি সারি ক্যাটল ওয়াগন। ওরা শৃঙ্খলতা মেনে ঢালু পাটাতন বেয়ে একে একে উঠে গেল চার চারটে ওয়াগনে। প্রতিটি মালগাড়িতে দু-তিনজন শিক্ষক-শিক্ষিকা। শেষ ওয়াগনে বাচ্চাদের তুলে দিয়ে উঠে গেলেন কোরচখ আর স্টেফ! ব্লুটেনৌ প্রতিমুহূর্তে আশা করছে এই বার টুক করে নেমে আসবে ওল্ড ডক্কি। উনি এলেন না। তাজ্জব! গার্ড হুইসিল দিল। ইঞ্জিন সাড়া দিল তীব্র শীৎকারে। ব্লুটেনৌ চিৎকার করে উঠল : হে-ই ইডিয়ট! ট্রেনটা এবার ছাড়বে। জাম্প! ইউ ইম্বেসাইল! জাম্প।

যার উদ্দেশ্যে বলা তিনি বধির। এ আহ্বান তাঁর কানেও গেল না। তিনি তখন আশ্রমিক বালক-বালিকাদের সঙ্গে মার্চিং-সঙের শেষ পংক্তিটা উদাত্তকণ্ঠে গেয়ে চলেছেন পোলিশ ভাষায় :

“তবে বজ্রানলে (আপন) বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে একলা চলো রে!”

সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল ওয়াগনের লৌহকপাট।

হিটলারের Euthanasia Program (ইহুদিনিধন যজ্ঞ)-এর কার্যসূচী মেনে পোল্যান্ডে ততদিনে গড়ে উঠেছে ছয়-ছয়টি সুবৃহৎ মারণাগার—কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প। বৃহত্তমটির নাম বিশ্বকুখ্যাত : Auschwitz (আউসউইংজ)। এছাড়া Birkenau (বির্কেনাও, Chelmno (শেলমো), Belzec (বেলজেক), Sobibor (সবিবোর), Majdanek (মাজদানেক) আর যে মৃত্যুপুরীর দিকে ওঁরা যাত্রা করলেন সেই Treblinka (ট্রেব্লিকা)।

দুদিন পরে ওঁরা সেখানে পৌঁছালেন। পুনরুজ্জী দোষ এড়িয়ে যেতে এই যাত্রাপথের বিবরণ বাদ দেওয়া গেল। দু-দিন তিন-রাত ধরে অভুক্ত শিশুযাত্রীরা ক্ষুধাপিপাসায় কাতর হয়েছিল কি না, প্রাকৃতিক আহ্বানে সাড়া দেবার জৈবিক অধিকার কেড়ে নিয়ে নাৎসি বর্বরগুলো কীভাবে হিটলারের পাশবিকতায় সামিল হয়েছিল সেসব কথা থাক।

তৃতীয়দিন সকাল : ট্রেব্লিকা ক্যাম্প। নির্বাচন হলো। প্রথা অনুসারে। বন্দিরা বিভক্ত হলো চারটি গ্রুপ-এ। নারীপুরুষ হিসাবে নয়, বয়সের বিচারে। প্রথম দল : দশ বছরের কম বালক-বালিকা। কয়েকটি অপেক্ষমাণ ট্রাকে স্টেশন থেকেই তাদের অপসারিত করা হলো। তারা ক্যাম্পে আদৌ গেল না। তাহলে কোথায় গেল? কোরচখ তা জানেন না। বাস্তবে তাদের জন্য মাথা পিছু এক একটি বুলেট ব্যয় করতে রাজি নয় জন ডেম্‌জানজুখ (John Demjanjuk)। ট্রেব্লিকার তদানীন্তন কমান্ডার। বুলেট তখন ওভাবে অপচয় করা চলে না। বাচ্চাদের নিয়ে ট্রাকগুলো সরাসরি পৌঁছে গেল ইনসিনিরেটরের অগ্নিকুণ্ডের ব্যাদিতবদনে। ঠ্যাঙ ধরে একের পর একটাকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হলো কুস্তীপাকে। জ্বলন্ত অগ্নিশিখা তাদের লুফে লুফে নিল। চিৎকার-চৈচামেচি কি হয়নি? হয়েছিল।

লাউড-স্পিকারে তারস্বরে মিউজিক বাজছিল বলে তা শোনা যায়নি—এই যা। উপায় নেই। ওদের চুল কামানো নিরর্থক—কতটুকুই বা মিলবে মাথা পিছু? তাই ওরা ক্যাম্পে গেলই না।

দ্বিতীয় দল : এগারো থেকে সতেরো। কিশোর-কিশোরী। এক দলে। এদের মাথায় চুল আছে। আছে তার বাজার দর। ওদের পোশাকও জার্মানির সেকেন্ড-হ্যান্ড মার্কেটে বিক্রি হয়। বিক্রয়লব্ধ অর্থ ‘ওয়ার ফান্ডে’ জমা পড়ার কথা। কিছুটা পড়েও। সিংহভাগ দখল করেন সিংহমশাই : জন ডেমজানজুখ্ আর তাঁর চেলাচামুণ্ডা। কিশোর-কিশোরীদের আপাতত ঠাঁই হলো ক্যাম্পে।

তৃতীয় দলে আছেন সেই সব ভাগ্যবান আর ভাগ্যবতীরা—যাঁরা সতেরো পার হয়েছেন, উনপঞ্চাশ অতিক্রম করেননি এবং যাঁরা দুর্বলদেহী নন। তাঁরা, নাৎসি-দর্শনের বিশ্বজয়ের এই প্রচেষ্টায় শ্রমদান করার অধিকার পেলেন। যতদিন কর্মক্ষম থাকবে—ছয় মাস, নয় মাস, পুরো বছর—তারা বেশনে ভাগ বসাবে। দিনান্তের দানা-পানি। শ্রমের বিনিময়ে সাময়িক জীবন। এভাবেই যুদ্ধোত্তরকালে জীবিত প্রত্যাবর্তন করেছিলেন ভবিষ্যৎকালের নোবেল লরিয়েট এলি উইজেল (Elie Wiesel), খ্যাতির গৌরীশৃঙ্গে উঠে আসা সাইমন উইজেন্থাল (Simon Wiesenthal), সম্প্রতি, মানে 2002 সালের সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারজয়ী হাঙ্গেরিয়ান ‘হলোকস্ট-সার্ভাইভার’ ইমরে কোর্তেৎজ (Imre Kertész) এবং আনা ফ্রাঙ্কের হৃদসর্বশ্ব পিতৃদেব : হতভাগ্য অটো ফ্রাঙ্ক।

আর চতুর্থ দল : পঞ্চাশোষর্ষ। অথর্বরা। তাদের সরাসরি প্রেরণ করা হয় গ্যাস-চেম্বারে। কিন্তু সেখানে স্থানাভাব। নিমন্ত্রণ বাড়ির অতিথিরা যেমন এক ব্যাচ শেষ হওয়ার জন্য প্যাণ্ডেলে অপেক্ষা করেন, তেমনি তাঁদের দু-একদিন জিইয়ে রাখতে হয়। ডর্মিটরিতে। ‘আওয়ার হোম’ থেকে সদ্য-আগত প্রায় দুশো নরনারীর মধ্যে এ দলভুক্ত হলেন মাত্র একজন। বৃদ্ধ ডক্টর কোরচখ একা। আর সবাই পঞ্চাশের নিচে।

কোথাও কিছু নেই তৃতীয় দলের লাইন ভেঙে ছটকে বেরিয়ে এলেন একটি মহিলা। বললেন, আপনাদের ভুল হয়েছে, হের অফিসার। আমার বয়স পঞ্চাশের বেশি।

গেস্টাপো কর্তা স্টেফাকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বলেন, নিজের বয়সটাও জানিসনে জুডেন ওয়েঞ্চ! তুই তো চল্লিশের কম!

—না! আমি ওই বৃদ্ধের সঙ্গে থাকব।

—কতক্ষণ? ইউ পিগ্-হেডড জুডেন! ও তো কালই ফৌত হবে! তুই কি কালই গ্যাস-চেম্বারে হুমড়ি খেয়ে পড়তে চাস? এ দলে থাক। গতর খাটাবি নাস্তায় পাস্তা পাবি।

—ধন্যবাদ হের অফিসার। আমি ওঁর সঙ্গেই যাব।

—তো যা!—বলে লোকটা স্টেফার নিতম্বদেশে এক মোক্ষম লাথি মারল। তিনি হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলেন। কোরচখ ওঁকে হাত ধরে তুলে বলেন, ও তো তোমাকে ভাল পরামর্শই দিচ্ছে স্টেফা! তোমাকে বাঁচবার সুযোগ দিচ্ছে। কেন অব্যাহা হচ্ছে?

—না—না—না ! আমি তোমাকে ছেড়ে যাব না।

—কী পাগল মেয়ে গো তুমি!

হ্যাঁ, তাই! পাগল! তবে দুনিয়ায় ওই জাতের পাগল আজও আছে বলে পৃথিবীটা শুক্রে মতো অগ্নিকুণ্ড হয়ে ওঠেনি, অথবা মঙ্গলের মতো মৃত্যুশীতল। সূর্য আজও ‘নোভা’ হয়ে ফেটে পড়েনি। ওই পাগলদের জন্যই বসন্ত আজও ফিরে ফিরে আসে, পাখিরা সূর্যবন্দনা করে, শরতে কাশফুল পাগল-পারা মাথা দোলায়, আর ‘মাহ ভাদরে’ শ্রীরাধা অশ্রুজলে ভেসে প্রাণের আকুতি জানান আজও :

‘কইসে গোঙাইবি হরি বিনে দিনরাতিয়া।’

এখানে অবশ্য ‘দিনরাতিয়া’ নয়, মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা।

আশ্রমপিতা ও মাতার প্রসঙ্গ আপাতত না হয় মূলতুবি থাক। তার আগে বরং শোনাই ‘সুধা-অমলে’র পরিণতি। তারা দুজন—আব্রাসা আর রেবেকা, কোনও কথাসাহিত্যিকের কল্পিত চরিত্র নয়, লেখকের সমকালের বাস্তব ব্যক্তিত্ব। ওঁদের একজনকে বৃদ্ধা বয়সে আমি দেখেছি, অপরজনের কথা শুনেছি মাত্র। চোখে দেখার প্রশ্নই ওঠে না।

ট্রেন্সিষ্কা ক্যাম্পে আগমনের পর তারা নির্বাচন কালে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল দ্বিতীয় শ্রেণীতে। শিশুদলের মতো স্টেশন থেকে সরাসরি ধরে নিয়ে গিয়ে দানব চিতায় তাদের ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলা হয়নি। আবার কৈশোরকাল পাড়ি দিতে না পারার অপরাধে তাদের দাসকর্মী দলভুক্তও করা গেল না। এমন কি বুড়ো-হাবড়াদের মতো তাদের গ্যাস-চেম্বারেও যেতে হলো না।

সেটা কেন? বলি শোন : গ্যাস-চেম্বারে ঠাশাঠাশি ভিড়। স্থানভাব। ট্রেন্সিষ্কায় একটিমাত্র গ্যাস-চেম্বার। দিবারাত্র তিন-শিফট চালালেও দৈনিক দু-আড়াই হাজারের বেশি জ্যান্ত বর্জ্যপদার্থ নিশ্চিহ্ন করা যায় না। আর ওদিকে স্টেশনে রুদ্ধদ্বার গাড়ির পর গাড়ি ক্যাটল-ওয়াগন আসছেই। গোটা মধ্য ইয়োরোপে নাৎসি অধিকৃত ভূখণ্ডে এ রক্তবীজ বংশের যেন আর শেষ নেই! নাৎসি বড়কর্তা জন ডেমজানজুখ অঙ্কে দড়। হিসেব কষে দেখেছে, কিশোর-কিশোরীদের আর. এ. এস্. টিকিট ধরিয়ে দিয়ে ডর্মিটারিতে বসিয়ে খাওয়ালে খরচ বেশি পড়ে। তার চেয়ে মাথাপিছু এক-একটি বুলেটে খরচ কম। শুধু কি গ্যাস-চেম্বার আর ইনসিনিরেটার? ডর্মিটারি-আবাসেও যে নিতান্ত স্থানভাব। তাই এই জুডেনাইল হিটলারদের জন্য জারি হলো এক নয়া ডিসপোজাল-ব্যবস্থা।

ক্যাম্প থেকে দেড়-দুমাইল দূরে এক নিবিড় জঙ্গলের কোল ঘেঁষে আছে অনুর্বর একটা ব্রহ্মাণ্ডের প্রকাণ্ড মাঠ। গতরে-সতরে যারা কর্মক্ষম জুডেন, তাদের প্রতিদিন পাঠানো হয় সে মাঠে। তারা সরাসরি সমান্তরাল পরিখা খনন করে—তিন-চার হাত প্রস্থ, ততটাই গভীর—হয়তো দুই-তিনশ ফুট লম্বা। মস্তকমুণ্ডন পর্ব শেষ হলে কিশোর-কিশোরীদের

ও তার বাঁ-হাতে রুমাল দিয়ে চেপে ধরেছে ক্ষতস্থানটা! বললে, তুই এত বড় হয়ে গেছিস রেবা? কী সুন্দর হয়েছিস রে তুই! ঠিক মায়ের মতো!

আব্রাসা—সম্পূর্ণ উলঙ্গ—হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছে গুঁর পাশে। বাঁ-হাত দিয়ে যোনাস্টা আবরিত করে। রেবেকার দিকে ফিরে প্রশ্ন করে, তুই একে চিনিস?

—বড়দা! জাখারি!—পোলিশ রেজিমেন্ট দলের গুপ্ত বিপ্লবী—

দু-হাতে না-কামানো-দাড়ি জাখেরির মুখটা তুলে ধরে জানতে চায় : তুমি জানতে? তুমি জানতে আজ আমাদের মাস্-গ্রেভ হবে এখানে?

কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিল জাখারির। বলে, না! এ একটা কোয়েসিডেন্স!

জানতে চায়, এ ছেলেটি তোর বয়-ফ্রেন্ড? কী নাম ভাই তোমার?

আব্রাসা জবাব দেবার আগেই রেবেকা বলে ওঠে : অমল!

—অমল! এমন জুইশ নাম জীবনে শুনিনি। যা হোক, শোন অমল! বুলেটটা আমার বুকে লেগেছে। দশ-বারো মিনিট হয়তো কথা বলতে পারব। কাজের কথাগুলো শুনে নাও...

—বলুন বড়দা?

—কাপোটা দৌড়ে ফিরে গেছে ক্যাম্পে। আধঘণ্টার মধ্যে ঝাঁকে ঝাঁকে নাৎসি-পুলিস এসে পড়বে এখানে। জঙ্গলে লুকোবার চেষ্টা করিস না। ওরা তন্ন তন্ন করে খুঁজবে। জঙ্গলের ওদিকে আধমাইলটাক দূরত্বে একটা ভাঙা পোড়ো ম্যানর-হাউস দেখবি। ওটাই আমাদের গুপ্ত আস্তানা। আমার কমরেডরা তোদের আশ্রয় দেবে। লুকিয়ে রাখবে।

আব্রাসা বলে, আমরা দুজনে ধরাধরি করে যদি আপনাকে...

—বললাম না? দশ থেকে পনের মিনিট বাঁচব আমি! ...শোন, আমার প্যান্ট-শার্ট-জুতো-মোজা সব খুলে নে। পকেটে কিছু ডয়েশমার্কও আছে। রাইফেলটা আব্রাহামকে দিস।...আর, আর...আমার এই চুন্মুন্ম বোনটাকে একটু দেখিস অমল, ও বড় ভাল মেয়ে!

রেবেকা কাঁদতে কাঁদতে কোনোক্রমে বললে, তোমাকে এই অবস্থায় ওই পিশাচগুলোর হাতে...

—কী পাগলামি করছিস, রেবা। ওরা আমাকে ছুঁতে পারবে না। বললাম না? দশমিনিটের মেয়াদ আমার? একী? কাঁদছিস? কেন রে? আমি তো ড্যাড-মম-মোশেদের কাছে ফিরে যাচ্ছি। মনে নেই, মমকে যাবার দিনে চিঠি রেখে গেছিলাম—আবার আমি ফিরে আসব বলে?

রেবার কানে কোনো কথা যাচ্ছে না। দু-হাতে মুখ ঢেকে সে আঝোরে কাঁদছে। তার ছোটবোনের ন্যাড়া মাথায় হাতটা রেখে জীবনের শেষ বাক্যটি উচ্চারণ করল জাখারি: Behatten Sic gut, ভাল থাকিস। আদোনাই তোর সহায় হোন।

হঠাৎ জঙ্গল ভেদ করে ছুটে এল জাখারিৰ বয়সী ওৱ এক কমৰেড। জাখাৰিকে দ্ৰুত পৰীক্ষা করে বলল, ও মুক্তি পেয়েছে। গেট আপ।

আব্রাসা জানতে চায়, তুমি কি আব্রাহাম? তাহলে এটা ধৰ—
রাইফেলটা বাড়িয়ে ধৰে।

আব্রাহাম ততক্ষণে জাখাৰিকে উলঙ্গ করে ফেলেছে। তার পরনে শুধু জাঙিয়া। আব্রাসাৰ দিকে ফিৰে বললে, জাখাৰিৰ রাইফেলটা এখন তোমাৰ কাছেই থাক। আমি ওই এস. এস. সোলজাৱেৰ ৰিভলভাৰ আৰ মেশিনগানটা ছিনিয়ে এনেছি। কিন্তু এখানে আৰ এক মুহূৰ্ত নয়। গেট আপ und laufen (আৰ দৌড়াও)।

জাখাৰিৰ ওভাৰকোটটা চাপাল উলঙ্গ আব্রাসা। শাৰ্ট-প্যান্ট দুটো ৰেবা। কিন্তু দৌড়াবে কেমন করে? এতক্ষণে উদ্ভেজনাৰ টেৰ পায়নি আব্রাসা—তার বাঁ-পায়েৰ হাঁটুৰ কাছে একটা মেশিনগানেৰ স্প্লিন্টাৰ ঢুকে আছে। তখনো তা থেকে ৰক্ত বৰছে। উপায় নেই—সেই অবস্থাতেই ওদেৰ দ্ৰুত গতি জঙ্গলেৰ ওপাৰে সেই ভাঙা ম্যানৰ-হাউসে আশ্ৰয় নিতে যেতে হলো। এই ভগ্নস্থপটাই পোলিশ প্ৰতিৰোধী বিপ্লবীদেৰ গোপন ঘাঁটি। ঘন জঙ্গলেৰ ভিতৰ। বাদুড়, চামচিকে আৰ কাঁকড়াবিছেৰ অস্তানা।

ইন্দিশ-ভাষাৰ স্মৃতিচাৰণে কতটা বিস্তাৰিত লিখেছিলেন জানি না। দেখছি, ইংৰিজি অনুবাদেৰ সময় এই অংশটা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আকাৰে ৰচনা কৰা। আব্রাসাৰ মৃত্যুপ্ৰসঙ্গে বাৰে-বাৰে ‘জাম্প-কাট’ কৰেছেন। নিজেৰ অনুভূতি বা আচৰণেৰ কথা বস্তুত কিছুই লেখেননি। বোধকৰি ওঁৰ মনে হয়েছিল সে বেদনা ওঁৰ একান্ত নিজস্ব। পাঠকেৰ সঙ্গে তা ভাগ কৰে নিতে চান না। পাঠকেৰ কোনো ‘আহা-উহ’ ওঁৰ সহ্য হবে না। তাই তথ্যগুলিই পৰ পৰ সাজিয়ে গেছেন শুধু।

বিপ্লবীদলে যোগদানেৰ আগে সলোমন—ওদেৰ আৰ একজন কমৰেড—দু’বছৰ মেডিকেল কলেজে পড়েছিল। বিনা অ্যানেস্থেশিয়ায় ছুৰি দিয়ে আব্রাসাৰ হাঁটু থেকে স্প্লিন্টাৰটা বাৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰে। অসীম যত্নগা সহ কৰে আব্রাসা সে ধাক্কাটা সামলায়।

লোহাৰ টুকৰোটো বাৰ কৰা গেল বটে কিন্তু ঘা-মুখে ‘গ্যাংগ্ৰিন’ শুৰু হয়ে গেল। সলোমন বললে, হাঁটু থেকে পাটা কেটে বাদ না দিলে এ পচনক্ৰিয়া সাৰা শৰীৰে ছড়িয়ে পড়বে। কিন্তু বিনা যত্নপাতিতে মেডিকেল-কলেজেৰ না-পাস-কৰা ছাত্ৰটি একা-হাতে তা কৰবে কেমন করে? অমলকে কোনো ডাক্তাৰখানা বা হাসপাতালে নিয়ে যাবাৰ সুযোগ নেই। সমস্ত এলাকাটা নাৎসি-গেস্তাপোৰ দখলে। কিছু বন্দি পালিয়ে যাবাৰ পৰ গেস্তাপো পুলিস হন্যে হয়ে গোটা চাকলাটায় ক্ৰমাগত হানা দিচ্ছে। ভূগৰ্ভস্থ আবাস থেকেও মাঝে-মাঝে শোনা যায় ওদেৰ পদধ্বনি। কখনো বন্দুকেৰ শব্দ।

আব্রাহাম বললে, সৰি কমৰেডস্! গেস্তাপো-গোয়েন্দাৰা আন্দাজ কৰেছে

আমাদের আকটিভিটি এই অঞ্চল থেকেই। হয়তো দু-একদিনের মধ্যে ওরা এখানে হানা দেবে। আমাদের এ আস্থানা গুটিয়ে ফেলতে হবে। আজ রাতেই!

সলোমন বলে, কিন্তু আমাদের পেশেন্ট? অমল?

আব্রাহাম 'শাগ' করল। জবাব দিল না।

আলোচনা হচ্ছিল রেবা-আব্রাসার সামনেই। রেবা পাথরের মূর্তি। আব্রাসা বললে, উপায় নেই, বিগ ব্রাদার। একটা বুলেট তোমাকে খর্চা করতে হবে।

সলোমন প্রতিবাদ করে, না! কিছুতেই না! ওদের বাঁচাতে কমরেড জাখারি জান দিয়েছে। সেকি এ জন্য?

আব্রাহাম বলে, আমি একটা প্রচণ্ড ঝুঁকি নিচ্ছি। একজন পোলিশ ড্রাইভার রাজি হয়েছে। সে অ্যান্থলেস চালায়। নিজের জীবন বিপন্ন করে সে আমাদের এখান থেকে সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থা করতে স্বীকৃত হয়েছে। আমি তার খোঁজে যাচ্ছি। এখনি...

সলোমন বলে, চল, আমিও যাব। একা-একা তোমাকে যেতে দেব না—

ওরা চলে যাবার পর আব্রাসা বললে, সুধা! সলোমনের ওই মেডিক্যাল কিটটা আমার কাছে এনে দিবি? প্লীজ!

অসীম মনোবলে রেবা জানতে চায়, কেন? কী করবি তুই?

—একটা 'পেইন-কিলার' খাব। বড় যন্ত্রণা...

রেবা ওষুধের বাক্সটা আর একগ্লাস জল ওর নাগালের মধ্যে এনে দিল। জানতে চায়, কোন ওষুধটা?

—আমি চিনি! তুই বরং আর একটা কাজ করবি, সুধা? আমাকে আর একটা জিনিস দিবি?

দাঁতে দাঁত দিয়ে কোনোক্রমে বললে, কী? তোকে অদেয় কী আছে, বল?

—পিছনের খিড়কি দিয়ে ওই বাগানে চলে যা। ওখানে অনেক বুনো ঘাস-ফুল ফুটে আছে। আমাকে একটা এনে দিবি?

রেবা তার অভ্যস্ত ডায়ালগ বলতে পারল না, 'ফুল অমনি কেমন করে দেব? দাম দিতে হবে যে।'

বরং দু-হাতে মুখটা ঢেকে সে ছুটে বেরিয়ে যেতে চাইল ঘর থেকে।

তাও পারল না। তার আগেই আবার আব্রাসা ডেকে ওঠে, আর শোন!

আন্ডারগ্রাউন্ড টানেলের দোরের কাছে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে রেবা। এ-পাশে ফেরে না। পিছন ফিরেই জানতে চায় : বল?

—আমাকে ভুলে যাবি না? আমার নাম অমল। মনে থাকবে তোর?

আর পারল না। লক্-গেটটা ভেঙে পড়ল। প্রচণ্ড কান্নার ধারাস্রোতে ভেসে গেল সুধা। ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল তার প্রাণের বন্ধুকে। আব্রাসাকে। অমলকে। লবণাক্ত চুমায়

চুমায় ভরিয়ে দিল তার মুখটা। অশ্রুটে তার ওষ্ঠাধর উচ্চারণ করে চলেছে : ভুলব না রে! কিছুতেই ভুলব না। সারাটা জীবন তোকে মনে রাখব! অমল! আমার অমল...

মিনিটদশেক পরে এক মুঠো ঘাসফুল হাতে ফিরে এসেছিল সুধা। তবে এবারও তার অমলের হাতে সে-ফুল দেওয়া হল না। মেডিকেল-বক্সটা খুলে ইতিমধ্যে একমুঠো ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে ফেলেছিল অমল। রাজকবিরাজের ভাষায় : অমল ঘুমিয়ে পড়েছে। দলের বাকি বিপ্লবীদের বাঁচাতে। তাদের বিড়ম্বনা থেকে মুক্তি দিতে।

*

*

*

একটা কথা স্বীকার করা প্রয়োজন। তন্নতন্ন করে খুঁজেও আমি জানতে পারিনি : ডক্টর জানুস কোরচখের জীবনের শেষ মুহূর্তের কথা। যুদ্ধোত্তরকালে অনেক পণ্ডিত এ নিয়ে গবেষণা করেছেন, তথ্যটা সংগ্রহ করতে পারেননি। আশ্রমিকদের নিয়ে ক্যাটল ওয়াগনটা রওনা হয়েছিল। উম্মাগাপ্লাংজ্ স্টেশনে অনেক প্রত্যক্ষদর্শীর সন্ধান পাওয়া যায়। গবাদি পশুর ওয়াগনে তাঁকে অনেকেই দেখেছেন। তারপর? ইতিহাস নীরব। ট্রেসিকা-ক্যাম্পের যাবতীয় নথি নাথসিরা পুড়িয়ে ফেলেছিল। কোন তারিখে তাঁকে গ্যাস-চেম্বারে প্রবেশে বাধ্য করা হয় তার কোনো সাক্ষ্য-দলিল নেই।

গুরুভাই আর গুরুভগিনীদের কাছে অনুমতি চেয়ে নিতে বাধ্য হচ্ছি। আপনারা গুরুবাক্য শিরোধার্য করুন—

আদিকবিকে দেওয়া নারদমুনির সেই ব্র্যাক্স চেকটা : ‘সেই সত্য যা রচিবে তুমি’!

অগাস্টের পাঁচ তারিখ রওনা হলে দূরত্বের বিচারে ওঁরা ট্রেসিকাতে পৌঁছেছিলেন সাত তারিখ সকালে। আশ্রমমাতার পাগলামিতে যেদিন ডক্টর কোরচখ স্ফোভ প্রকাশ করেন সেটা তাহলে অগাস্টের আট তারিখ।

একই দিনে পৃথিবীর আর এক প্রান্তে বসে আর এক ‘পাগল’ একটি খসড়া প্রণয়নে ব্যস্ত ছিলেন। ওয়ার্থা আশ্রমে।

পরদিন, যেদিন ‘পাগল’ কোরচখ তাঁর ‘পাগলিনী’ প্রিয়বান্ধবীর হাতটি ধরে গ্যাসচেম্বারে প্রবেশ করেন—বস্তুত ‘বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে’—সেটি তাহলে ভারত-ইতিহাসের এক চিহ্নিত খণ্ডকাল : অগাস্টের নয় তারিখ, 1942।

সেদিন ভারতের মন্ত্র ছিল : ‘করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে’।

স্টেফা কিন্তু ‘করেঙ্গের’ দল ত্যাগ করেছিলেন। দাসবৃত্তিতে দয়া ভিক্ষা করে জীবনধারণ করতে স্বীকৃত হননি। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ধরে রেখেছিলেন তাঁর জীবনসঙ্গীর হাত—‘মরেঙ্গে’-র দলে!

প্রথম যুগে সমস্ত ব্যবস্থাপনার উপর একটা কৃত্রিম ছদ্মবেশের প্রলেপ দেবার প্রচেষ্টা হয়েছিল। তখন পুরুষ এবং স্ত্রীলোকের জন্য ছিল পৃথক গ্যাস-চেম্বারের আয়োজন। গ্যাস-চেম্বারের মাথায় বড় বড় হরফে সাইনবোর্ড লেখা থাকত Badezimmer. অর্থাৎ কি না

‘বাথরুম’ বা ‘স্নানাগার’। গ্যাস-চেস্বারের বাইরে সমস্তে সাজানো হতো ফুলগাছের টব। নেপথ্যে মিঠে বাজনা। বন্দিদের বলা হতো যে, ‘প্রমিজড-ল্যান্ড’ বা ইহুদি-স্বর্গে প্রেরণের আগে ওদের যৌথ নগ্নস্নান করতে হবে—পুরুষস্বত্বী পৃথকভাবে—যাতে ওদের জীবাণুমুক্ত করা যায়।

কিন্তু তিনটি হেতুতে সে-ব্যবস্থা ক্রমে বাতিল হয়ে যায়। প্রথম কথা, তাহলে পরিবার থেকে শত্রু, সবল মানুষগুলোকে বিচ্ছিন্ন করা হচ্ছে কেন? জীবাণুমুক্ত স্নান কি শুধু বৃদ্ধ আর বাচ্চাদের প্রয়োজন? বাস্তবে কর্মক্ষম মানুষগুলোকে যে বিনা-মজুরিতে দাস হিসাবে চালান করা হচ্ছিল ক্রুপ এঞ্জিনিয়ারিং আর মার্সেল কেমিক্যাল কোম্পানির কারখানায়, একথাটা বলা যেত না। অথচ বিশ্বাসযোগ্য কোনো ব্যাখ্যাও দেওয়া যেত না। দ্বিতীয়ত, আগের দিন যারা জীবাণুমুক্ত হবার জন্য স্নানঘরে ঢুকেছিল সেই চেনামুখের মানুষগুলি স্নানান্তে কোথায় গেল? কেন তাদের আর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না? তৃতীয়ত, গোটা অধিকৃত ইয়োরোপে একটা ব্যাপক গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল : ওগুলো স্নানঘর নয়, ‘মৃত্যুপুরী’!

নাৎসি বড়কর্তারা বুঝলেন : সোজা আঙুলে আর ঘি উঠবে না। মিথ্যার প্রলেপ দেওয়া সাইনবোর্ডগুলি অপসারিত হলো। বন্দিদের সরাসরি বলা হলো : হ্যাঁ বাপু। আমরা অধিকৃত জার্মান সাম্রাজ্যকে ইহুদিমুক্ত করতেই এই ব্যবস্থা নিয়েছি। ওগুলো স্নানঘর নয়, ঠিকই বুঝেছ তোমরা : যম-ঘর। মৃত্যু তোমাদের অনিবার্য, অবধারিত, নিয়তি। তবে হ্যাঁ কী ভাবে মরবে সেটা বেছে নেওয়ার অধিকার তোমাদের আছে। তুমি অপ্রতিবাদে ওই গ্যাস-চেস্বারে যদি সারিবন্দি হয়ে প্রবেশ কর, তাহলে দশ-পনের মিনিটের মধ্যেই জীবনযন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবে। যদি প্রতিবাদ কর, রুখে দাঁড়াও, তাহলে তোমার ইচ্ছানুসারে সাত-দশ দিন ধরে তিল-তিল করেও ভবযন্ত্রণার অবসান ঘটাতে পার। ওই দ্যাখ, আমরা পথের দু-পাশে দু-পাঁচটা জ্যান্ত উদাহরণ সাজিয়ে রেখেছি। ওরা সাত-দশ দিন আগে সহজ-মুক্তির সরল পথটা মেনে নিতে অস্বীকার করেছিল। ওদের কী হাল হয়েছে দেখ। বিবেচনা করে জানাও—কী ভাবে মুক্তি পেতে চাও। যত যাই হোক, জীবনটা তোমার। আমরা কেন উপরপড়া হয়ে তোমার মুক্তিমাগটা নির্ধারণ করি?

ওরা দেখতে পেত গ্যাস-চেস্বারের দু’পাশে পথের ধারে—কিছুটা দূরত্বে—পড়ে আছে কয়েকটি উলঙ্গ বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, কিশোর-কিশোরী। তাদের পায়ে গুলি করে ওখানে ফেলে রাখা হয়েছে। প্রচণ্ড শীতে অথবা দাবদাহে তারা তিল তিল করে মরছে। হয় ক্রমাগত রক্তক্ষরণে, কিংবা গ্যাংগ্রিন হওয়ায় অথবা ক্ষুধা-তৃষ্ণায়।

তারপরের যুগে বন্দিরা হয়ে গেল গ্রে-সাহেবের ভাষায় : ‘ডাঙ্গ ড্রিভন ক্যাটল’! মাথা নিচু করে ওরা সারিবদ্ধভাবে মৃত্যুপুরীর দিকে এগিয়ে যায়। সর্বসমক্ষে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হতে হয়। জামা-জুতো, প্যান্ট-গাউন, জাঞ্জিয়া-প্যান্টি। সেগুলির বাজারদর আছে। এরপর নগ্নাবস্থায় যেতে হয় Herren Friscur-এ; চুলকাটার ছাউনিতে। তারপর নগ্নাবস্থায় সার

বেঁধে এগিয়ে যায় গ্যাস-চেম্বারের দিকে। ওদের নিমন্ত্রণ রাখতে।

গ্যাস-চেম্বারে ‘ব্যুফে-সিস্টেম’ চলে না। প্রয়োজনও হয় না। আয়োজন তো এক কোর্স আপ্যায়নের। ট্রেড নাম Zyklon B, অর্থাৎ ক্রিস্টালাইজড্ ফ্রসিড অ্যাসিড। যা থেকে উৎপন্ন হয় হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড গ্যাস। সরবরাহ করে ওই কেমিকাল-কোম্পানি, যাদের সাপ্লাই দেওয়া হয় পেটচুন্ডি দাসশ্রমিক।

এক-এক ব্যাচে—ট্রেন্সিকাতে—আপ্যায়িত হয় একশ জন। এক-এক ব্যাচ সময় নেয় এক ঘণ্টা। তা তো লাগবেই। টেবিল সাজানো, গ্লাসে জল দেবার হাঙ্গামা নেই বটে, আপ্যায়িত হতেও ওরা সময় নেয় মাত্র সাত-আট মিনিট। নেহাৎ কই-মাগুর হলে দশ মিনিট। কিন্তু এঁটো সাফা করা বড় সহজ নয়! সব কিছুই হয় যান্ত্রিক পদ্ধতিতে। নিখুঁতভাবে। ‘পিক-আপ্ গ্রিপার’-এর প্রকাণ্ড দাঁতাল হাঁ-মুখে বুলন্ত অবস্থায় মৃতদেহগুলি একপাশে লাদ করা হয়। বুলডোজার তাদের ঠেলে নিয়ে যায়। চাপিয়ে দেয় ‘কারি-অল ভ্যানে’। এভাবে এঁটো-কাঁটা সাফা হলে প্রচণ্ড বেগে হোস-পাইপ ঘরের মেঝেটা ধুয়ে দেয়। জুডেনগুলোর তো কোনো আক্কেল নেই। সেই তো মরবিই, তবে অমন রক্তে মাখামাখি হবার কী দরকার? আমরা তো কোনো আঘাত করিনি। তাদের ছুঁইনি পর্যন্ত। তবু ওদের নাকমুখ দিয়ে, মেয়েদের নিম্নাঙ্গ দিয়ে গল গল করে রক্ত বার হয়! গ্যাস-চেম্বার থেকে দানব চুল্লিতে পায়ে-হেঁটে যেতে ওরা রাজি নয়। এতক্ষণ সব আদেশ মেনেছে। এখন তারা বায়নাক্কা শুরু করেছে। তাই ট্রাকে করে নিয়ে যেতে হয়।

ইদানীং পুরুষ-স্ত্রীর জন্য পৃথক বিষবাষ্প-কক্ষের ব্যবস্থাও বর্জিত হয়েছে। দেখা গেছে, স্বামীর আলিঙ্গন থেকে স্ত্রীকে, মায়ের বাহুবন্ধ থেকে সন্তানকে বিচ্ছিন্ন করা মহা হাঙ্গামার। বন্দুকের কুঁদো দিয়ে পিটিয়ে একটাকে পেড়ে ফেলতে না পারলে সে বন্ধন ছাড়ানো যায় না। অথচ দেখা গেছে পরিবারের সবাই একসঙ্গে থাকলে এ জাতীয় উটকো ঝামেলা হয় না। সবাই শান্তভাবে অনিবার্য নিয়তিকে মেনে নেয়।

অবশ্য এ ব্যবস্থায় অন্য এক জাতের ঝামেলা দেখা দিল। বয়স্ক পুত্রের সামনে মা-মাসি, বাপ-জ্যেঠার সমুখে যুবতী মেয়ে বা পুত্রবধূ সম্পূর্ণ উলঙ্গ হতে সঙ্কোচ বোধ করে। কিন্তু কেন রে বাপু? ট্রেন্সিকা ক্যাম্পের কমান্ডান্ট জন ডেমজানজুখ তার দীর্ঘ কর্মজীবনে এই প্রশ্নটার উত্তর খুঁজে পায়নি। সে বন্ধুদের প্রায়ই বলত, আফটার অল, ওরা তো জুডেন! মানুষ নয়! ষাঁড়-গরু, পাঁঠা-পাঁঠি তো দিবিয় ন্যাংটো হয়ে কষাইখানার দিকে গুটিগুটি এগিয়ে যায়। তোরা পারিসনে কেন?

অবশ্য নুরেনবার্গ ট্রায়ালের পর ওই নাৎসি অফিসারটিকে যখন সেই ট্রেন্সিকা ক্যাম্পেই ফাঁসির মঞ্চে ঝোলানো হয় তখন তাকে কেউ শুধায়নি, কী আদর্শে বুঝেছ?

গ্যাস-চেম্বারের এক প্রান্তে প্রকাণ্ড একটা প্লেট-গ্লাসের পর্যবেক্ষণ কক্ষ। বায়ু-নিরোধক কাচের জানলা। ওপাশে ইউনিফর্মধারী গ্যাস-চেম্বারের সুইচবোর্ড-অপারেটর।

সবাই জড়ো হলে লাউড-স্পিকারে ভেসে আসে পূর্বে রেকর্ড করা যান্ত্রিক নির্দেশ :

আমি লক্ষ্য করছি তোমাদের কেউ কেউ বসে আছ বা শুয়ে পড়েছ। সেটা বোকামি। ওতে কষ্ট বেশি হবে। উঠে দাঁড়াও। শাওয়ারের ঠিক নিচে জড়াজড়ি করে সবাই দাঁড়াও। উর্ধ্বমুখে। দুবার ঘণ্টা বাজবে। দ্বিতীয়বার ঘণ্টা বাজলেই দেখবে ওই শাওয়ার থেকে গলগল করে নীল ধোঁওয়া মুক্তিবাস্প বার হয়ে আসছে। তখন বুক ভরে জোরে জোরে শ্বাস নিতে থাক। পাঁচ মিনিটেই মুক্তি পেয়ে যাবে।

ওরা সে কথা শোনে। নগ্ন-জননীকে আঁকড়ে ধরে উলঙ্গ পুত্র। বাপকে জাপটে ধরে বিবসনা বালিকা বনিতা।

আহা! মৃত্যুর কী অপার মহিমা! জীবনের শেষ কটি মুহূর্তে ওরা আর সামাজিক জীব নয়। লোকলজ্জাকে বিসর্জন দেয়। লজ্জা-ঘৃণা-ভয়, তিন থাকতে নয়! পরস্পরকে নিবিড় করে আঁকড়ে ধরে! সান্ত্বনা দেয়, মৃত্যুভয়কে জয় করার সাহস জোগায়! আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় সপরিবারে ঢলে পড়ে মৃত্যুর কোলে।

বুড়ো-বুড়ি আর কর্মক্ষমতা হারানো যুবক-যুবতীরা—যারা মৃত্যু পরোয়ানা পেয়ে গেছে, কিন্তু স্থানাভাবে গ্যাস-চেম্বারে প্রবেশাধিকারে বঞ্চিত, তাদের হয়তো দু-এক রাত ডর্মিটরিতে কাটাতে হয়। এখানেও পুরুষ-স্ত্রীর একত্র শয়ন ব্যবস্থা। গেস্টাপো-কর্তারা দেখেছে সপরিবারে শেষরাত্রিটা একত্রে ঘুমালে পরদিন শান্তভাবে ওরা নিয়তিকে মেনে নেয়। হাত ধরাধরি করে গ্যাস-চেম্বারে প্রবেশ করে। গেস্টাপো-কর্তারা জানে না—শেষ রাতটা সেই চিহ্নিত ডর্মিটরিতে কেউ ঘুমায় না। সারারাত জেগেই থাকে। জীবনের শেষরাতটা কি ঘুমিয়ে নষ্ট করার। এতো সেই প্রথম রাতটার মতো।

সেই ফুলশয্যার রাতে যুবকটি শোনায তার সদ্য জীবনসঙ্গিনীকে তার তারুণ্যের স্বপ্নকথা, যুবতীটি তার কৈশোরের অবাধ রূপকথা। সারারাত বকবক করেই কেটে যায়। এদের এই শেষ রাতটাও তেমনি। কত কথা যে বলা হয়নি! কত কথা জানান। জানানোর।

মাঝখানে চওড়া করিডোর। দু-পাশে তিন থাকে দ্বৈতশয্যা। কাঠের পাটাতন। তার উপর বালি-খড়ের বিচালি। মাথা পিছু এক-একটি কম্বল। কোরচখ আর স্টেফার শয্যা নির্দিষ্ট হয়েছিল আপার বার্থে। নিচে এক বৃদ্ধ দম্পতি। মাঝের বেঞ্চিতে তাঁদের পুত্র-পুত্রবধূ। তারা দুজনেই মেডিকাল-টেস্ট পাস করতে পারেনি। দু-বছরেই রোগজীর্ণ শীর্ণকায় হয়ে পড়েছে। ছেলটি কোরচখকে বললে, আমাদের একটু সাহায্য করলে আমরা দুজন উপরের বার্থে উঠে যেতে পারব, আক্ষল। আপনারা দুজন তাহলে মাঝের বার্থে ওতে পারেন।

কোরচখ তার পিঠে হাত দিয়ে বলেছিলেন, ধন্যবাদ ইয়াং ম্যান! আমরা অনায়াসে উপরের বার্থে উঠে যেতে পারব। তোমরা মাঝের বার্থেই থাক। তাহলে বাবা-মার সঙ্গে কিছু কথাও বলতে পারবে। এই তো শেষ সুযোগ!

সন্ধ্যারাতেই একজন কাপো (ইহুদি ওভারসিয়ার, যারা দাসখত লিখে দিয়ে ক্যাম্পে ভূত্যের কাজ করে) ওঁদের মাথাপিছু এক কাপ নিরামিষ স্যুপ আর বান-কুটির একটা টুকরো দিয়ে গেল। রাত নটায় লোহার গেট সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল। দরজা আবার খোলা হবে রাত ভোরে।

কোরচখ আর স্টেফা উপরের বার্থে উঠে পাশাপাশি শুয়ে পড়েন। এক ঘরে ওঁরা এর আগেও রাত কাটিয়েছেন। এক শয্যা নয়।

কোরচখ বলেন, তুমি অত আড়ষ্ট হয়ে দূরে শুয়ে আছ কেন? সরে এস। কাছাকাছি শুলে শীতটা কম লাগবে।

স্টেফা ওঁর দিকে একটু সরে আসেন। বৃদ্ধ তাঁর পিঠে একটি হাত রেখে বললেন, কেন এ পাগলামি তুমি করলে, স্টেফা?

স্টেফা জবাব দিলেন না। বৃদ্ধ আবার বলেন, দেখ, আমি তো বাতিলের দলে। কত বছরই বা বাঁচতাম? কিন্তু তুমি যুদ্ধ শেষে মুক্ত পৃথিবীতে হয়তো ফিরে যেতে। আমাদের স্বপ্নটা হয়তো নতুন করে বাস্তবায়িত করতে পারতে! এটা তুমি ঠিক করলে না স্টেফা! তুমি আমাকে ভালবাস। প্রচণ্ড ভালবাস। জানি। কিন্তু আমার মেয়াদ তো মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা। তুমি কেন যুদ্ধোত্তর পৃথিবীকে এভাবে বঞ্চিত করলে, স্টেফা?...আমি এর মাথা-মুণ্ড বুঝতেই পারলাম না।

এবার স্টেফা জবাব দিলেন। বললেন, আমিও তো তোমার আচরণের কোনো মাথা-মুণ্ড বুঝতে পারিনি হেনরিখ!

—আমার? কোন আচরণের?

—তুমি জুড়েন নও, তাহলে কেন এভাবে আমাদের ভাগ্যের সঙ্গে নিজেকে জড়ালে?

—বাঃ! আমি কি জানোয়ার? শেষ মুহূর্তে আমাদের ছেলেমেয়েগুলোকে ফেলে পালিয়ে যাব? জানোয়ারও তা করে না!

—কেন যাবে না? তুমিও তো জানতে এদের জীবনের মেয়াদ দু-তিন দিনের। অথচ তুমি অনায়াসে খ্রিস্টিয়ান অনাথ-আশ্রমের পুরোপুরি দায়িত্ব নিতে পারতে।

—ওদের জন্য লোকের অভাব হবে না। আমাকে বাদ দিয়েও ওরা খ্রিস্টিয়ান অর্থোডক্স চালাতে পারবে।

—যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে সেবাধর্মী মানুষেরও অভাব হবে না। আমাকে বাদ দিয়েও তারা জুইশ-অর্ফানেজ চালাতে পারবে।

বৃদ্ধের একটি দীর্ঘশ্বাস পড়ল। জবাব দিলেন না। দুজনেই কিছুটা চুপচাপ। তারপর কোরচখ বলেন, তোমার কি ভয় করছে, স্টেফা?

—ভয়! না! ভয় করবে কেন? তুমি তো থাকবেই আমার পাশে।

—‘পাশে’ কেন স্টেফা? আমি তো তোমাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে নিয়ে থাকব।

স্টেফা নিঃশব্দে কাঁদতে থাকেন। শব্দহীন অশ্রুপাত। কিন্তু তাঁর পিঠে বৃদ্ধের হাতটা থাকায় তিনি সেটা অনুভব করলেন। পিঠটা কেঁপে কেঁপে উঠছে। বললেন, কাঁদছ কেন স্টেফা?

স্টেফা দাঁতে-দাঁত দিয়ে বললেন, তুমি...তুমি পারবে? আমাকে বুক জড়িয়ে ধরতে? শেষমুহুর্তে? আমি তো তোমার স্ত্রী নই!

—পরস্ত্রীও নয়! তুমি তো আমারই। আমি কি সেটা জানি না?

—তাহলে আমাকে তোমার স্ত্রীর মর্যাদা দাওনি কেন? কেন আমার সামাজিক পরিচয় হতে পারল না—ফ্রাউ কোরচখ?

—কীসের সমাজ, স্টেফা? সেটা তো পরিচালনা করে রাজনৈতিক পাষাণরা। আজ অ্যাডলফ হিটলার অধিকৃত জার্মানির সমাজপতি। তুমি জান না? আমরা দুজনে তো জানি, আমরা অবিচ্ছেদ্য: পরস্পরের নিকটতম বন্ধু। পরস্পরের একমাত্র অবলম্বন: ম্যান অ্যান্ড উয়োম্যান!

—ম্যান অ্যান্ড উয়োম্যান? তুমি তা স্বীকার কর? গুরু-শিষ্য নই?

কোরচখ প্রথর বুদ্ধিমান! বুঝতে পারেন অভিমানিনীর বেদনার মূলে কোন অনুভূতি কাজ করছে। এটা স্টেফার দীর্ঘদিনের দুর্মনস্যতার বহিঃপ্রকাশ।

একটু চুপ করে কী-যেন চিন্তা করলেন। তারপর বললেন, তুমি তো জানই স্টেফা, আমি আত্মসম্মান গ্রহণ করেছি। আমি স্বামীজীর রাজযোগ অভ্যাস করেছি। ইন্দ্রিয়-সংযম আজ আমার ‘সেকেড নেচার’। কিন্তু এটাই যদি তোমার শেষ মনোবাঞ্ছা হয়...

—না, না, না—আর্তনাদ করে ওঠেন স্টেফা। অশ্রুধ্বকণ্ঠে বলেন, আমি তোমার প্রিয়বান্ধবী। তোমার সহধর্মিণী! তোমার ধর্মই আমার ধর্ম! তোমাকে ব্রতচ্যুত করার বিন্দুমাত্র অভিলাষ আমার নেই, হেনরিখ!

কোরচখ ওঁকে তাঁর পাঁজরসর্বস্ব বুক টেনে নিয়ে কপালে একটি নিবিড় চুম্বনচিহ্ন ঐঁকে দিলেন।

পরমপ্রাপ্তিতে স্টেফার চোখদুটি মুদে আসে।

পরদিন সকাল। ভারত ইতিহাসের সেই চিহ্নিত দিনটি : নয়ই অগাস্ট 1942।

মৃত্যুতীর্থের যাত্রীরা চারটি সারিতে একের-পিছে-এক দাঁড়িয়েছে।

প্রথম সারিতে সবার সামনে ডক্টর কোরচখ। পিছনেই স্টেফা।

স্টেনগানধারী গেস্টাপো-সার্জেন্ট শেষবারের মতো একই ক্লান্তিকর আদেশটা শুনিতে দিল। শান্তভাবে ওরা যদি সব নির্দেশ মেনে নেয়, তাহলে মাত্র পাঁচ-সাত মিনিটেই ওদের বন্দিদশার অবসান ঘটবে। ভবয়ন্ত্রণা থেকে ওরা মুক্তি পাবে। অবাধ্য হলে—উদাহরণ তো দেখছই—পাঁচ-সাত দিন ধরেও একই পরিণতিতে উপনীত হতে পার তোমরা।

কেউ কোনো জবাব দিল না।

লোকটা তখন সেই এক-শব্দবিশিষ্ট আদেশটা জারি করল : Strip.

ওরা অনেকেই জানত ব্যাপারটা। ডক্টর কোরচখ অন্তত জানতেন। নির্বিকারচিত্তে তিনি একে একে খুলে সাজিয়ে রাখেন তাঁর পাশে, নিজের সব আচ্ছাদন। গলাবন্ধ কোট, শার্ট, প্যান্ট, মোজা-জুতো, মায় আন্ডার-ওয়্যার। তারপর পিছন ফিরে দেখেন, স্টেফাও তাঁর অর্ধেক পোশাক উন্মোচন করেছেন। বাকি আছে মাত্র দুটি অঙ্গাবরণ : ব্রা আর প্যান্টি।

গেস্টাপো-সার্জেন্ট ওঁর কাছে এগিয়ে এসে বললে, হেই জুডেন ওয়েঞ্চ! ন্যাকামি করছিস কেন? আর সবাই তো উদোম ন্যাংটো হয়ে গেছে—দ্যাখনা তাকিয়ে! খুলে রাখ বাকি দুটো!

স্টেফা দু-হাতে মুখটা ঢাকেন!

—আই সী! তা বেশ! বল্ কোথায় গুলিটা ঝাড়ব? ঠ্যাঙে না পাছায়?

কোরচখ হুমড়ি খেয়ে পড়েন—! প্লীজ হের সার্জেন্ট! না, না, আমি দেখছি। ও আমার সঙ্গে একসঙ্গেই গ্যাস-চেম্বারে যাবে। ও আমার কথা শুনবে।

দীর্ঘজীবনে যা কখনো করেননি, আজ তাই করলেন। এতদিন গাইনো-ডাক্তারের হয়ে এ কাজটুকু করে দিত নার্স।

নির্দিষ্টসংখ্যক মৃত্যুপথযাত্রী গ্যাস-চেম্বারে প্রবেশ করা মাত্র সশব্দে লৌহকপাট রুদ্ধ হয়ে গেল। সুইচবোর্ড-অপারেটর কাচের জানলার ওপাশে মিলিটারি সাজে এসে বসল। চিরাচরিত রেকর্ডে ভয়েসটা বাজতে শুরু করল। কোরচখ তখন ব্যস্ত। সেই কঙ্কালসার দম্পতিকেকে বলছেন, ভয় কী, মাই চাইল্ড? মাথা খাড়া করে দাঁড়াও। আমরা তো আদোনাই-এর স্বরাজ্যে যাব এবার। অমৃতময় লোকে! এস, এই শাওয়ারের নিচে ঘনিয়ে এস! হাত-ধরাধরি করে।

অ্যালার্মবেলটা কর্কশকণ্ঠে শুনিয়ে দিল ফাস্ট বেল!

এতক্ষণে কোরচখ তাঁর সঙ্গিনীর দিকে নজর দেবার অবকাশ পেলেন। দুটি নগ্ন বাহু বাড়িয়ে দিলেন তাঁর দিকে। স্টেফা দ্বিধাস্বিতা। কিন্তু এই তো কথা ছিল। কাল রাত্রেও তো তিনি সম্মত হয়েছিলেন। শেষ-মুহূর্তে দুজনে নিবিড় আলিঙ্গনাবদ্ধ থাকবেন।

কিন্তু! কালরাত্রে ওঁর খেয়াল হয়নি—সেই শেষ মুহূর্তটি এমন নিলজ্জভাবে নিরাবরণ। কোরচখ কিন্তু নির্বিকার। বলেন, দ্বিধা কিসের হানি? এই বেশেই তো প্রথম দিন তাঁর কাজ করতে এসেছিলাম আমরা—এ বেশেই তাঁর কাছে আজ ফিরে যাচ্ছি। এস! আমাকে জড়িয়ে ধর!

হঠাৎ মনস্থির করে স্টেফা ঝাঁপিয়ে পড়লেন ওঁর বুকের উপর! থরথর করে কেঁপে উঠল তাঁর সর্বাঙ্গ। প্রচণ্ড একটা পরিবর্তন হলো দেহে-মনে। মৃত্যুর কথা আর মনেই রইল না। পরমতৃপ্তিতে তিনি ওঁর পাজরসর্বস্ব বুকে ন্যস্ত করলেন নিজের মুণ্ডিতমস্তক। গুরু নয়, স্বামী নয়, শুধু প্রিয়তম বন্ধুই নয়, তাঁর জীবনের ধ্রুবতারকার বুক।

তারপর আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থাতেই মুখটা তুলে বেশ অবাক হয়ে যান। বলেন, কী হলো তোমার? কী ভাবছ? হেনরিখ?

বৃদ্ধ সস্বিত ফিরে পান। বলেন, আমার... আমার বড় ভয় করছে, হানি!

স্তুভিত হয়ে গেলেন আশ্রমমাতা। ভয়! জানুস কোরচখের মৃত্যুভয়! অসম্ভব! জানতে চাইলেন সে কথা : ভয়? কীসের ভয় তোমার? 'আমার বুকের পাজর জ্বালিয়ে নিয়ে...'

—যদি তুমি আগেই আমাকে ছেড়ে যাও! যদি একই খণ্ডমুহূর্তে আমরা মুক্তি না পাই?

—কেন পাব না? হঠাৎ একথা তোমার মনে হল কেন এখন?...

তাঁর কণ্ঠলীনা প্রিয়বান্ধবীকে বুঝিয়ে বলার সময় কোথায়?

উনি প্রাণায়ামে অভ্যস্ত। ইদানীং কুণ্ডকে পুরো দশ মিনিট তিনি সমাধিস্থ হয়ে থাকতে সক্ষম। শ্বাসগ্রহণ না করেও! যদি অন্তিম মুহূর্তে তাঁর দেহ বিদ্রোহ করে!

ক্রিরিরিং...শেষ ঘণ্টাধ্বনি। মৃত্যুসঙ্কেত!

গলগল করে বিষবাপ্প নির্গত হতে থাকে শাওয়ারের মুখ থেকে। দুজনেই উর্ধ্বমুখ হলেন। নির্দেশ মোতাবেক স্টেফা ফুসফুসে টেনে নিলেন সেই মুক্তিবাপ্প!

কিন্তু কোরচখ পারলেন না। যা আশঙ্কা করছিলেন ঠিক তাই ঘটে গেল!

প্রতিবর্তী জৈবিক প্রেরণায় ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঠিক পূর্ববর্তী খণ্ডমুহূর্তে একবুক নিঃশ্বাস টেনে নিয়ে নিজের অজান্তেই যোগীবরের বাহাজ্ঞান লুপ্ত হয়ে গেল—কুণ্ডকে।

সস্বিত ফিরে পেলেন কিন্তু একটু পরেই। প্রিয়বান্ধবীর আলিঙ্গনপাশ শিথিল হতে

শুরু হওয়ামাত্র। স্টেফা মারা যাচ্ছে। যোগী নয়, এবার ডক্টর কোরচখের চোখ দুটি খুলে গেল। অনুভব করলেন : অক্সিজেনের অভাবে স্টেফা মারা যাচ্ছে!

তঁার নিজের মৃত্যুযন্ত্রণার তখনো আভাসমাত্র নেই।

এটা হতে পারে না। একই খণ্ডমুহূর্তে যে ওঁদের অমৃতলোকে উপনীত হবার কথা। উনি যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

কোরচখের একটা হাত সরে এল কণ্ঠলগ্নার পিঠের দিক থেকে। জোর করে ওর ওষ্ঠাধর বিমুক্ত করে ধরলেন। সজোরে ফুৎকার করলেন ওঁর মুখবিবরে। নিজ ফুসফুসের সঞ্চিত প্রাণবায়ু প্রবেশ করিয়ে দিলেন কণ্ঠলগ্নার কণ্ঠনালীতে।

ধীরে ধীরে আবার চোখ দুটি খুলে গেল স্টেফার। শেষবারের মতো জ্ঞান ফিরে এসেছে। জীবনের শেষ মুহূর্তে তিনি বজ্রাহত হয়ে লক্ষ্য করলেন তঁার হেনরিখ, তঁার ধ্রুবতারকা সজোরে তঁার মুখচুম্বন করছেন! হ্যাঁ, কপালে নয়, গালে নয়, তঁার ওষ্ঠাধর বিমুক্ত করে। তঁার শিথিল মুষ্টি আবার দৃঢ় হয়ে গেল। পরমপ্রাপ্তিতে তঁার ওষ্ঠাধরে ফুটে উঠল বিচিত্র এক হাসির আলিম্পনরেখা। তিনি পেয়েছেন। তঁার নারীত্ব উপেক্ষিত নয়। পেয়েছেন তার প্রেমের মর্যাদা।

হোক ভ্রান্তি! তিনি পেয়েছেন! ‘রজ্জু’তে—না ‘সর্পভ্রম’ নয়। ‘পুষ্পমাল্যের’ ভ্রান্তি! তঁার নিজের তো মনে হলো পরমপ্রাপ্তি ঘটেছে! তঁার আজীবনের সাধনা ব্যর্থ হয়নি। প্রত্যাখ্যাতা মহাজনক-মহিষী সীবলী নন, আজ আশ্রমমাতা রাহুলজননীর মতোই পরমপ্রাপ্তিতে আনন্দময়ী!

ওঁরা অমৃতলোকে উপনীত হলেন একই খণ্ডমুহূর্তে!

গেস্টাপো প্রযুক্তিবিদদের প্রযুক্তিবিদ্যার কেরামতি হার মানল। বুলডোজারের ‘গ্রিপার’ ওঁদের বিচ্ছিন্ন করতে পারল না। আদোনাই-এর আশীর্বাদে দুজনেরই রিগর-মর্টিস শুরু হয়েছে একই মুহূর্তে! আলিঙ্গনাবদ্ধ দুজনকে শূন্যমার্গে ঝুলিয়ে নিয়ে চলল ‘ক্রেণ—ইনসিনিরেটরের দিকে!

মায় তঁাদের প্রস্তরকঠিন যুগল ওষ্ঠাধর পরস্পরের সঙ্গে নিবিড়বন্ধনে সংযুক্ত! বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই ডীন, অধ্যাপক ওঞ্জীমার, সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। থাকলে হয়তো তিনি ঈশোপনিষদ থেকে উচ্চারণ করতেন সেই অপরূপ প্রার্থনা মন্ত্রটি :

“অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্ বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।

যুযোধ্যাম্জজুহ্বরাণমেনো ভূয়িষ্ঠাং তে নম উক্তিং বিধেম।।”

—হে অগ্নিদেব!

তুমি ওদের অমৃতলোকে নিয়ে যাও!

হে দেব! তুমি তো জানো ওদের জীবনব্যাপি সাধনার সব কথা।

ওরা যদি কোনো ভুল করে থাকে তবে তুমি ওদের মার্জনা কর প্রভু।

তোমাকে শতকোটি নমস্কার।।